বহুতর মিথ্যার মধ্যে থেকে যেটা সত্যের সবচেয়ে সমীপবর্তী সেই মিথ্যাকে বেছে নেয়ার শিল্পই হচ্ছে ইতিহাস।

– বেনেদেত্তো ক্রোচে

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ

প্রথম খণ্ড

পিনাকী ভট্টাচার্য

চতুর্থ সংস্করণ
আগস্ট ২০২১

ইউরোপ প্রকাশনা:
সার্বিক ব্যাবস্থাপনায়-
আসিফ আরমানী
আরিক শামস
ড. মামুন রহমান
এমাদুর রহমান

প্রকাশনায়:
আহমেদ ময়েজ
হরপ্পা ইউকে

Publisher:
HOROPPA (UK)
S6, Whitechapel Centre
85, Myrdle Street
London E1 1HL
United Kingdom

Contact/Mobile: +447570084560
Email: crflondon@gmail.com

উ ৎ স র্গ

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম পর্বে নানা নিপীড়ক বাহিনীর হাতে প্রাণদানকারী এবং আহত ও পঙ্গু হয়ে জীবনধারণকারী নারী-পুরুষের স্মৃতির বেদীমূলে– তাঁদের উত্তরসূরিদের দীর্ঘশ্বাসের সাথী হয়ে।

ভূমিকা

বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার কাজ একাধারে বিপজ্জনক এবং দুরূহ। বাংলাদেশের ইতিহাসের যে বয়ানগুলো হাজির আছে, তার সিংহভাগ উদ্দেশ্যমূলক ও খণ্ডিত। এই খণ্ডিত ইতিহাসে বেশির ভাগ সময় ভীরুরা 'নায়ক' আর বীরেরা 'ভিলেন' বা 'খলনায়ক' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।

আমাদেরকে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান যাঁদের সবচেয়ে বেশি সেই তিতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজীরা আমাদের খণ্ডিত সেই ইতিহাসে হয় অনুপস্থিত, নয়তো উপেক্ষিত। আমাদের ইতিহাসের তথাকথিত সেক্যুলার বয়ান দাঁড়িয়ে আছে 'অসাম্প্রদায়িকতা' আর 'হাজার বছরের বাঙালি' ধারণার ওপর ভিত্তি করে। সেই বয়ানে জমিদারি উচ্ছেদের লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী মুসলিম লীগকে 'সাম্প্রদায়িক বিভেদকামী' রাজনৈতিক দল হিসেবে উপস্থাপন করে 'বাতিল' করে দেয়া হয়েছে।

সেই বয়ানে শেখ মুজিবের শাসনকাল ছিল 'স্বর্ণযুগ'। তাহলে আসুন, এবার এই বই-এর হাত ধরে প্রবেশ করি সেই কথিত স্বর্ণযুগে। দেখে নিই, কেমন ছিল সেই দিনগুলো।

মুছে দেয়া আর ভুলিয়ে দেয়া সেই ইতিহাসের জগতে আপনাকে স্বাগত জানাই। গল্পের মতো করে লেখা সেই ইতিহাস আপনাকে কখনো বিস্মিত করবে, কখনো আতঙ্কিত করবে, কখনো-বা কাঁদাবে। আর নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারবেন, এত রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে যেই স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার তওফিক হয়েছিল, আমাদের কোন আদি পাপে সেই রাষ্ট্রটা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

অতীতের ভুলগুলো জেনে আগামী প্রজন্ম নতুন এক ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে– এটাই হোক সবার আকাঙ্ক্ষা।

পিনাকী ভট্টাচার্য

সূচি

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য বই

১. মার্কিন ডকুমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ '৭১ (মুক্তিযুদ্ধ)
২. মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম
৩. বালাই ষাট (স্বাস্থ্য ও সমাজ সম্পর্কিত রচনা)
৪. মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ : সাফল্যের তত্ত্ব-তালাশ (ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য পেশাগত বই)
৫. ধর্ম ও নাস্তিকতা : বাঙালি কমিউনিস্টদের ভ্রান্তিপর্ব
৬. সোনার বাঙলার রূপালী কথা (কিশোরদের জন্য রচিত বাঙলার ইতিহাস)
৭. রবীন্দ্রনাথ : অন্য আলোয় (রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার দার্শনিক ব্যাখ্যা)
৮. মুক্তিযুদ্ধ, ধর্ম ও রাজনীতি (প্রবন্ধ সংকলন)
৯. নানা রঙের রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু স্বল্প জানা বিষয় নিয়ে রচনা)
১০. ভারতীয় দর্শনের মজার পাঠ
১১. মন ভ্রমরের কাজল পাখায় (পশ্চিমা চিত্রকলা সমঝদারির হাতেখড়ি)
১২. এনলাইটেনমেন্ট থেকে পোস্ট মডার্নিজম : চিন্তার অভিযাত্রা
১৩. ইতিহাসের ধুলোকালি
১৪. ডিসকোর্স অন মেথড; রেনে দেকার্ত (অনুবাদ)
১৫. ওয়েদার মেকার (থ্রিলার সাইন্স ফিকশন)
১৬. চীন কাটুম (ছোটদের জন্য চীন ভ্রমণ কাহিনী)
১৭. রবি বাবুর ডাক্তারি (রবীন্দ্রনাথের ডাক্তারি চর্চা ও স্বাস্থ্য চিন্তা নিয়ে লেখা বই)

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ
পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ

'বেদনাদায়ক হলেও বাংলার এই বিভাজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য।'[১৫]

ভালো হতো, যদি আমাদের শাসকেরা সময়মতো এটা উপলব্ধি করে ভারতের হাতে এর অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের চলে যেতে দিত।'[১৫]

এক

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর, সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। ঢাকার অদূরে ডেমরায় কিছুক্ষণ আগেই সূর্যোদয় হয়েছে। শীতের কুয়াশাভেজা সকাল। আঁধার তখনো ভালোভাবে কাটেনি। দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রায় ৮০০ সৈনিকের সঙ্গে তিন নম্বর সেক্টরের আরো কিছু মুক্তিযোদ্ধা সমবেত হয়েছেন। কাকডাকা এই শিশিরসিক্ত শীতের ভোরে, আধো-আলো-অন্ধকারে ঢাকার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের এই দলটির মার্চ করে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এরমধ্যেই খবর এসেছে, পাকিস্তানি বাহিনী মিত্রবাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছে।

যদিও তখন পর্যন্ত জেনারেল নিয়াজি নিজে থেকে আত্মসমর্পণের কোনো ঘোষণা দেননি কিংবা মিত্রবাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ নিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়নি। তবু পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় যে অবধারিত সেটা সকলের মনেই বদ্ধমূল ছিল। সকলের মধ্যেই বিজয়ের আনন্দের এক অনির্বচনীয় অনুভূতি। মুক্ত ঢাকায় প্রবেশের উত্তেজনায় যেন টগবগ করে ফুটছে মুক্তিযোদ্ধারা। একে অন্যকে জড়িয়ে ধরছে, অনেকের চোখেই আনন্দাশ্রু। নয় মাসের মরণপণ লড়াই তাহলে শেষ হলো!

হঠাৎ তারা লক্ষ্য করলেন, ঘন কুয়াশার বুক চিরে একটা সামরিক জিপ আসছে পূর্ব দিক থেকে। সতর্ক হয়ে জিপটিকে লক্ষ্য করতে থাকলেন সবাই। জিপ একটাই, আর সেটা নির্ভয়ে আসছে দেখে সবাই ধরেই নিলেন এটা মিত্রপক্ষীয় সামরিক যান। আরো কাছে আসতেই দেখলেন, তাদের অনুমান নির্ভুল। জিপে ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং, বেসামরিক পোশাকে পাকিস্তান আর্মির স্পেশাল কমান্ডো ব্যাটালিয়নের মুক্তিযোদ্ধা মেজর হায়দারকে পাশে বসিয়ে ঢাকার দিকে যাচ্ছেন। এই দু'জন বিজয়ী বীর ইতিহাসের সাক্ষী হতে জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। কিছুক্ষণ পরে দু'জনেই বিজয়ীর বেশে ঢাকায় প্রবেশ করবেন। শত্রুর সঙ্গে এই যুদ্ধে বিজয়ী হলেও কে জানতো এর কয়েক বছর পরেই এই দুই বীর নিজ নিজ দেশে সহযোদ্ধাদের হাতে সামরিক অভিযানেই নিহত হবেন। নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছিল, মেজর হায়দার নিহত হবেন ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর জেনারেল খালেদ মোশাররফের সঙ্গে, আর সাবেগ সিং নিহত হবেন ১৯৮৪ সালে স্বর্ণমন্দিরের ভেতরে শিখ সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা জারনাইল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের সঙ্গে। জেনারেল সাবেগ সিং অবসর নেবার পর ভিন্দ্রানওয়ালের সামরিক উপদেষ্টা হয়েছিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে, বিজয়ী বীরদের উপাখ্যানের সঙ্গে, তাদের এ ট্র্যাজিক মৃত্যুর শর্তও কি লেখা ছিল?

ঢাকা নগরী রক্ষার জন্য পাকিস্তানিদের কোনো সুসংগঠিত বাহিনী ছিল না। আত্মসমর্পণের আগে পদাতিক, প্রকৌশল, অর্ডন্যান্স, সিগন্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভিস কোর নিয়ে মোট ফোর্স ছিল বারো কোম্পানি। এ ছাড়া প্রায় ১৫০০ ইপিসিএএফ, ১৮০০ পুলিশ এবং ৩০০ রাজাকার ও আল্-বদর মিলে পাকিস্তানের পক্ষে মোট সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। এই সৈন্যদের যুদ্ধ করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তারা নিজ নিজ পজিশনে স্থবির-নিশ্চল দাঁড়িয়েছিল এবং ছোট্ট একটা চাপেই ভেঙে পড়ার জন্য প্রস্তুত ছিল।[১]

ক্যান্টনমেন্ট বাদে বাকি ঢাকা শহরের রক্ষার দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার বশীরের ওপর। ১৫ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় তিনি জানতে পারেন, মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ফোর্স একত্রিত করে এক কোম্পানি সৈন্য দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর সকালের দিকে মেজর সালামতকে তিনি মিরপুর ব্রিজের সুরক্ষার জন্য পাঠান। এদিকে ১৬ ডিসেম্বর সকালেও মিরপুর সেতু অরক্ষিত অবস্থায় আছে– এই খবরটা মুক্তিবাহিনীর মাধ্যমে পৌঁছে যায় ভারতীয় কমান্ডো বাহিনীর কাছে। খবর পেয়ে তারা সকাল হবার কিছু আগেই ঢাকার দিকে রওয়ানা হন। এদের পৌঁছানোর আগেই মেজর সালামত মিরপুর ব্রিজে অবস্থান নিয়ে নেন। ফলে সেখানে পৌঁছে কমান্ডো বাহিনী প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। এই কমান্ডো দলকে অনুসরণ করে পেছনে আসছিলেন ১০১ কমিউনিকেশন জোনের জেনারেল নাগরা। তাদের অগ্রযাত্রা থেমে গেল সেতু থেকে কিছু দূরে। জেনারেল নাগরার বাহিনীর সাথে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী স্বয়ং এবং 'কাদেরিয়া বাহিনী'র চৌকস মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অগ্রবর্তী দল।

জেনারেল গান্ধর্ব সিং নাগরা আর জেনারেল নিয়াজি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে কোর্সমেট ছিলেন, একসঙ্গে কমিশন পেয়েছিলেন এবং দু'জন দু'জনের বন্ধু ছিলেন। নাগরা নিয়াজিকে 'আব্দুল্লাহ' বলে ডাকতেন। আজ ভাগ্যের পরিহাসে দুই বন্ধু যুদ্ধরত দুই শিবিরে। এক বন্ধু পরাজিত, আরেক বন্ধু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিজয়ীর বেশে নগরে ঢুকবেন। নাগরা মিরপুরে আমিনবাজার ব্রিজের ওপার থেকে নিয়াজিকে যে চিঠি লিখেছিলেন সেটি ছিল কোনো বন্ধুর কাছে লেখা বন্ধুর চিঠি। লিখেছিলেন: প্রিয় আব্দুল্লাহ, আমি এখানে এসেছি, তোমার খেলা শেষ। আমি পরামর্শ দিচ্ছি– আমার নিরাপত্তায় চলে আসো, আমি তোমার বিষয়টা দেখবো। তোমার প্রতিনিধি পাঠাও।

সকাল ন'টায় চিরকুটটা জেনারেল নিয়াজির হাতে আসে। সেই সময় তার পাশে ছিলেন মেজর জেনারেল জামশেদ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান ও রিয়ার এডমিরাল শরিফ। মেজর জেনারেল রাও ফরমান নিয়াজিকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার কোনো রিজার্ভ বাহিনী আছে? জেনারেল নিয়াজি নিরুত্তর। রিয়ার এডমিরাল শরিফ পাঞ্জাবিতে কথাটা অনুবাদ করে বললেন: 'কুজ পাল্লে হ্যায়?' (থলেতে কিছু কি আছে?)। নিয়াজি বৃহত্তর ঢাকার রক্ষক জেনারেল জামশেদের দিকে তাকালেন। জেনারেল জামশেদ মুখে কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন, যার অর্থ হলো– কিছুই নেই, শূন্য। ফরমান আর শরিফ তখন একসঙ্গে বলে ওঠেন: যদি এ-ই হয়, তাহলে যান, যা সে (নাগরা) করতে বলে তা করেন গিয়ে। জেনারেল নিয়াজি জেনারেল নাগরাকে অভ্যর্থনা

জানানোর জন্য জেনারেল জামশেদকে পাঠালেন।[২]

ঢাকা শহরের মতিঝিলে পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ (পি অ্যান্ড টি) কলোনি। টেলিগ্রাফের বিহারি প্রকৌশলী ইমতিয়াজ আলম খানের সরকারি ফ্লাটে দূর থেকে ফজরের আজানের শব্দ ভেসে আসছে– আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান নাউম। আজানের শব্দ ভেদ করে দরোজায় উত্তেজিত করাঘাত। ইমতিয়াজ আলম খান দরোজা খুলে দিতেই দেখলেন বাঙালি প্রতিবেশী মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুর উত্তেজিত চেহারা । মাল্লু সাহেব ধীর-স্থির মানুষ, কিন্তু আজকে তার চেহারা উত্তেজনায় টগবগ করছে।

> ইমতিয়াজ তুমি খবর শুনেছ?
>
> কী খবর, মাল্লু ভাই?
>
> 'আকাশবাণী' থেকে বলছে, পাকিস্তানি আর্মি আজ সারেন্ডার করবে।
>
> হো হো করে হেসে উঠে ইমতিয়াজ আলম খান বললেন:
>
> মাল্লু ভাই, আপনি 'আকাশবাণী'র কথা বিশ্বাস করেন?

তখন ইমতিয়াজ আলম খান ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি, এটাই তার শেষ হাসি হতে যাচ্ছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার জীবন ওলট-পালট হয়ে যাবে।

> আরে না, বের হয়ে দেখ, খুব নিচু দিয়ে ইন্ডিয়ান বিমান উড়ে যাচ্ছে, পাকিস্তানি আর্মির এন্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ গানগুলো কোনো গুলিই ছুঁড়ছে না।

ইমতিয়াজ আলম খানের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা রক্তস্রোত বয়ে গেল। মুখটা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বললেন:

> মাল্লু ভাই, এটা কীভাবে সম্ভব? ইন্ডিয়ান আর্মি তো ঢাকা পর্যন্ত এখনো পৌঁছতে পারেনি। আর কার কাছেই-বা নিয়াজি সারেন্ডার করবে?

ইমতিয়াজ আলম খানের এই শীতল জবাব মুহাম্মদ আলী খান মাল্লুকে তৃপ্ত করতে পারলো না, বিড়বিড় করতে করতে বাসায় ফিরে গেলেন তিনি।

এরপর আর বিছানায় যাওয়া হয়নি ইমতিয়াজের। বার বার বারান্দায় গিয়ে দিগন্তে চেয়ে থাকছেন। কী যেন খুঁজছেন। অবশেষে সকাল দশটার দিকে

সেই প্রতীক্ষিত আতঙ্ক– বজ্রনিনাদে উড়ে এলো খুব নিচু দিয়ে– ভারতীয় ফাইটার জেট। এত নিচে যে, পাইলটের চেহারা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নিচ থেকে কোনো গুলি নেই, কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া নেই, বোমাবর্ষণ নেই। কিন্তু প্লেনের পেটের ভেতর থেকে অসংখ্য টুকরো কাগজ উড়ে এলো, ঢাকার আকাশ ছেয়ে গেল লিফ্‌লেটে। বাংলা, ইংরেজি আর উর্দুতে লেখা পাকিস্তানি বাহিনীকে 'আত্মসমর্পণের আহ্বান'।[৩]

ঠিক সাড়ে ন'টায় মিরপুর ব্রিজের দিক থেকে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসা গাড়ির গর্জন শুনে মিরপুর ব্রিজের পশ্চিম প্রান্তে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মাটি কাঁপিয়ে কয়েক ঝাঁক গুলির শব্দ। চার-পাঁচটি মেশিনগান একসঙ্গে বিকট শব্দে গর্জে উঠে থেমে যায়। চকিতে ঘটে যাওয়া ঘটনার পর আবার থমথমে নীরবতা। গুলি ছুড়তেই দ্রুত ধেয়ে আসা গাড়ি দু'টি নিশ্চল হয়ে যায়। মিত্রবাহিনীর ভুল ভাঙে। গাড়ি দু'টি শত্রুর নয়, মিত্রবাহিনীর। গাড়িতে কোনো সাদা পতাকা বা কাপড় না থাকায় শত্রু ধেয়ে আসছে ভেবে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা গুলি ছুড়েছিল।

পাকিস্তানি হানাদাররা আত্মসমর্পণ করছে– এই দারুণ সুখবরটি পৌঁছে দিতে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছিল ওরা। আসার পথে আনন্দের আবেশে কখন গাড়িতে সাদা পতাকার বদলে লটকানো সাদা জামাটি প্রচণ্ড বাতাসে উড়ে গেছে তা তারা জানতেও পারেনি। ভুল যখন ভাঙলো তখন যা হবার হয়ে গেছে। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে শহিদ। আমিনবাজার স্কুলের পাশে দু'টি জিপই নিশ্চল হয়ে আছে। একটিতে তিনজনের মৃতদেহ। রক্তে জিপটা ভেসে গেছে। তখনও রক্ত ঝরছে।

এত যন্ত্রণার মাঝেও আহত একজন জিপের স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। দারুণ সুখবরটা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবে, ততই যেন সহযোদ্ধা হারানোর দুঃখ ও গুলিতে আহত হওয়ার নিদারুণ যন্ত্রণার উপশম হবে। আহত যোদ্ধার গলার স্বর জড়িয়ে আসা সত্ত্বেও যতদূর সম্ভব প্রত্যয় মেশানো কণ্ঠে বিজয়ীর ভঙ্গিতে বললো: শত্রুরা আত্মসমর্পণে রাজি। তাদের দিক থেকে এখনই কোনো জেনারেল আসছে।

যে মিত্রসেনা এই সংবাদ দিলো, তার হাঁটুর নিচের অংশ বুলেটে এফোঁড়-

ওফোঁড় হয়ে গেছে। তিনি তার ক্ষতস্থান দু'হাতে চেপে ধরে সর্বশেষ সংবাদ দিলেন। দুই হাজার বছর আগের ইতিহাস যেন ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ও ভিন্ন পটভূমিতে জীবন্ত হয়ে উঠল। ম্যারাথন থেকে এথেন্স নয়, ঢাকা থেকে মিরপুরে গুলিবিদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট দেহের দ্রুত নিঃশেষিত শক্তি শেষবারের মতো একত্র করে শত্রুর আত্মসমর্পণ তথা, পূর্ণ বিজয়ের দারুণ সংবাদ দিলেন এ যুগের বীর সেনানী, এই শতাব্দীর ফিডি পাইডিস।

আহত ও নিহতদের সরিয়ে নেয়ার জন্য হেলিকপ্টার আনা হলো। হেলিকপ্টার আমিনবাজার স্কুলের পাশে পাকা বাড়ির সামনে মসজিদের মাঠে নামিয়ে আহত ও নিহতদের উঠিয়ে দেয়া হলো। হেলিকপ্টার মির্জাপুর হাসপাতালের উদ্দেশে উড়ে যাবার কয়েক মিনিট পর ঢাকার দিক থেকে মার্সিডিজ বেন্‌জ্‌ জিপে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর একজন মেজর জেনারেল, দু'জন লে. কর্নেল, একজন মেজর, দু'জন ক্যাপ্টেন ও কয়েকজন সিপাহী আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিক পর্ব সারতে এলো।

হানাদারদের পক্ষ থেকে সিএএফ প্রধান মেজর জেনারেল জামশেদ আত্মসমর্পণের প্রথম পর্ব সারতে আসেন। মিত্রবাহিনী যথারীতি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। মেজর জেনারেল নাগরার বামে ব্রিগেডিয়ার সানসিং, তারপর ক্লের, সবশেষে কাদের সিদ্দিকী। জেনারেল সামরিক অভিবাদন জানিয়ে কোমর থেকে রিভল্‌ভার বের করে প্রসারিত দুই হাতে নাগরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মেজর জেনারেল নাগরা বুলেট রেখে রিভল্‌ভারটি জামশেদকে ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আগের মতো দুই প্রসারিত হাতে তার টুপি দিলেন। নাগরা লাইন থেকে বেরিয়ে জামশেদের টুপিটি কাদের সিদ্দিকীর হাতে দিলেন। 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' নাগরার হাতে দিলে সেটা তিনি ব্রিগেডিয়ার সানসিং-কে দিলেন। জেনারেল জামশেদ সবশেষে তার কোমর থেকে বেল্ট খুলে দিলে নাগরা তা ব্রিগেডিয়ার ক্লেরকে দেন। তিনি সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য জামশেদকে আবার তা ফিরিয়ে দেন। মেজর জেনারেল নাগরার গাড়ি থেকে যৌথবাহিনীর জেনারেল ফ্ল্যাগ খুলে তা পাকিস্তানি বাহিনীর মার্সিডিজ বেন্‌জে লাগিয়ে জামশেদকে নিয়ে সকলে অবরুদ্ধ ঘাঁটির দিকে এগোলেন।

যৌথবাহিনীর 'জেনারেল ফ্ল্যাগ' উড়িয়ে মার্সিডিজ বেন্‌জ্‌ সকাল ১০টা ৫ মিনিটে নিয়াজির ১৪তম ডিভিশন সদর দপ্তরের সামনে এসে দাঁড়ায়।[৪] কর্নেল মেহতা এবং একজন পাকিস্তানি অফিসারকে পাঠানো হয় টঙ্গীতে। তাদের হাতে ছিল সাদা পতাকা। কিন্তু একটা ট্যাংকের গোলা এসে আঘাত করে তাদের জিপে। জিপের আরোহী চারজনই নিহত হন। টঙ্গীতে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল

বিকেল চারটার দিকে।[৫] জেনারেল নাগরা কয়েকজন সৈন্য নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করলেন সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে। তিনি ঢুকলেন গৌরবের শিরোপা ধারণ করে। জেনারেল নিয়াজির অধিকৃত ঢাকার পতন ঘটলো ঠিক তখনই।[৬]

চার

সকাল নয়টা, 'সাকুরা' রেস্টুরেন্টের সামনে ও পাশের গলিতে মুক্তিযোদ্ধাদের কয়েকটা দল জড়ো হয়েছে। বর্তমান কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে দলে দলে পাকিস্তানি আর্মি হেঁটে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাচ্ছে। তাদের বাম হাতের বাজুতে সাদা কাপড় বাঁধা। আত্মসমর্পণের আগে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানি বাহিনীর অবশিষ্ট অংশকে একত্রিত করার জন্যই তাদের ক্যান্টনমেন্টে নেয়া হচ্ছে। কে বলবে এই বিষণ্ন, ভীত এবং নতমুখ সেনারাই গত সাড়ে নয় মাস ধরে অবর্ণনীয় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল সোনার বাঙলায়। এদের সবার হাতেই রক্তের দাগ।

১১টার দিকে শাহবাগের দিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ধরে ধীর গতিতে আর্মির একটি কনভয় এগিয়ে এলো। কনভয়ের প্রথম জিপটিকে আমরা কাকডাকা ভোরে ডেমরা থেকে ঢাকার দিকে আসতে দেখেছি। সেই জিপে আছেন ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আর মেজর হায়দার। কনভয়টি ডানে মোড় নিয়ে বিজয়ীর বেশে নিউট্রাল জোন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেজর হায়দার আর সাবেগ সিং অগ্রবর্তী দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেছেন। তাদের মূল দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করা। ধীরে ধীরে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এলাকায় মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা বাড়তে থাকলো। মুক্তিযোদ্ধারা এর মধ্যেই শাহবাগে 'রেডিও পাকিস্তান' ভবন থেকে পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। অবরুদ্ধ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। রাজপথে উৎফুল্ল জনতা মিত্রবাহিনী আর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে কোলাকুলি করছে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটা বড় দল 'সাকুরা'র সামনে দিয়ে হেঁটে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় উৎসাহী জনতা তাদের ঘিরে ধরলো প্রবল উত্তেজনায়। সবাই চিৎকার করে তাদের উদ্দেশ করে বলতে লাগলো: বল শালারা, 'জয় বাংলা'!

চিত্র-কথন:

শেরাটনের সামনে 'সাকুরা'র পাশে জনতা ঘিরে ধরেছে রাও ফরমান আলীকে, শ্লোগান তুলছে– রাও ফরমানকে ধরো, কুত্তার মতো মারো।

ফটো ক্রেডিট: ড. গোলাম নবী কাজীর সংগ্রহ থেকে

ওরা ভয়ে ভয়ে বলে: 'জুই বাংলা', 'জুই বাংলা'। জনতা চেপে ধরে: শালারা শুদ্ধভাবে বল, 'জয় বাংলা', ওরা তাও বলে: 'জুই বাংলা', 'জুই বাংলা'। কেউ কেউ ওদের সঙ্গে শুদ্ধ ভাষায় 'জয় বাংলা' বলানোর জন্য হাতাহাতি শুরু করে দিলো। এমন সময় কে যেন ফাঁকা বার্স্ট ফায়ার করলো, সঙ্গে সঙ্গেই গর্জে উঠলো পাকিস্তানিদের হাতে থাকা অস্ত্র। উৎসাহী জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মিত্রবাহিনী ছুটে এসে পাকিস্তানিদের ঘেরাও করে ফেললো। অবস্থা বেগতিক দেখে পাক সেনারা অস্ত্র মাটিতে ফেলে চিৎকার করে বলতে থাকলো: 'জুই বাংলা' 'জুই বাংলা'। গোলাগুলিতে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়। একজন ভারতীয় সেনা অফিসার ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী তখন ইন্টারকন্টিনেন্টালেই ছিলেন। তিনি ভারতীয় কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মৃত অফিসারের লাশের পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাও ফরমান আলীকে দেখে জনতা আবার ফুঁসে উঠলো। শ্লোগান উঠলো: রাও ফরমানকে ধরো, কুত্তার মতো মারো। রাও ফরমানকে ঘিরে ধরলো উত্তেজিত জনতা আর মুক্তিবাহিনী। মেজর হায়দার উত্তেজিত জনতা আর মুক্তিযোদ্ধাদের আটকালেন। সাবেগ সিং ইংরেজিতে বললেন, 'নো মোর ফাইট'। রাও ফরমান আলীও বললেন: নো মোর ফাইট, পিস্ পিস্ পিস্। বাংলাতেও বললেন 'আর যুদ্ধ নয়, শান্তি শান্তি শান্তি'।

সেই সময় জান বাঁচানোর জন্য বাংলা বলার চেয়ে ভালো কোনো বিকল্প পাক সেনাদের গণহত্যার অন্যতম কুশীলব জেনারেল রাও ফরমান আলীর মাথায় আসেনি নিশ্চয়।[৭]

১৬ ডিসেম্বর সকাল সোয়া ন'টায় মিত্রবাহিনীর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল মানেক শ'র কাছ থেকে একটা ফোন কল পান। ফোনে মানেক শ' সন্ধ্যার মধ্যে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণ করানোর সকল ব্যবস্থা করতে তাকে নির্দেশ দেন। জ্যাকব বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী থেকে জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও উপ-অধিনায়ক উইং কমান্ডার এ কে খোন্দকার যেন উপস্থিত থাকেন সেই ব্যবস্থা করতে নিজের দপ্তরকে ব্রিফ করে একটা হেলিকপ্টার নিয়ে যশোর হয়ে ঢাকার তেজগাঁ বিমানবন্দরে নামেন। জ্যাকবের সঙ্গে আসেন আরেক শিখ অফিসার কর্নেল খারা।

পাকিস্তান ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার বকর সিদ্দিকী জ্যাকবকে বিমানবন্দর থেকে জেনারেল নিয়াজির ঢাকা ক্যানটনমেন্টের দপ্তরে নিয়ে আসেন। সেখানে কিছুক্ষণ আগে মেজর জেনারেল নাগরাও এসে উপস্থিত হয়েছেন। তখনও টঙ্গীসহ নানা অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানি বাহিনী রক্তক্ষয়ী আক্রমণ চালাচ্ছিল। জ্যাকব সেই পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য নিয়াজিকে বলেন, তিনি যেন এই লড়াই বন্ধের নির্দেশ দিয়ে একটা অর্ডার ইস্যু করেন। তখনও নানা জায়গা থেকে গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছিল ক্যান্টনমেন্টে। জেনারেল জ্যাকব ভারতের প্যারাসুট রেজিমেন্ট ও একটা পাকিস্তানি ইউনিট দিয়ে জেনারেল অরোরাকে রেসকোর্স ময়দানে গার্ড অব অনার প্রদানের ব্যবস্থা করতে বলেন জেনারেল নাগরাকে।

কর্নেল খারা আত্মসমর্পণের শর্ত জেনারেল নিয়াজিকে পাঠ করে শোনান। নিয়াজির দুই চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকে। ঘরে নেমে আসে সুনসান নীরবতা। যে দম্ভ নিয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার আর গণহত্যার নির্মম ইতিহাস তৈরি করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী, জেনারেল নিয়াজির চোখের পানিতেই তা ভেসে যাবার কোনো কারণ ছিল না। পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য আরো চূড়ান্ত অপমান অপেক্ষা করছিল।

লাঞ্চের সময় হয়ে যায়। জ্যাকবকে সঙ্গে নিয়ে জেনারেল নিয়াজি আর্মি মেসে লাঞ্চ সারতে যান। তাদের সঙ্গী হন ব্রিটিশ 'অবজারভার'-এর সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াং। মুরগির রোস্ট দিয়ে মেইন কোর্সের স্বাভাবিক খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। পাকিস্তানি অফিসাররা স্বাভাবিকভাবে খোশগল্প করতে করতে দুপুরের ভোজ সারছেন। জেনারেল জ্যাকব আর কর্নেল খারা এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছেন। দ্যা ভিঞ্চি এই ছবিটা আঁকলে হয়তো নাম দিতেন, 'দ্য লাস্ট লাঞ্চ'। ভিঞ্চি না থাকলেও খ্যাতিমান সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াং ছিলেন। তিনি পরদিন ব্রিটিশ 'অবজারভার'-এ এই লাঞ্চ নিয়ে বিশাল নিউজ করলেন, তার শিরোনাম ছিল 'দ্য সারেন্ডার লাঞ্চ'।

লাঞ্চ সেরে জেনারেল নিয়াজিকে নিয়ে জেনারেল জ্যাকব বেলা তিনটার দিকে তেজগাঁ এয়ারপোর্টে যান জেনারেল অরোরাকে রিসিভ করার জন্য। এরমধ্যেই

চিত্র–কথন:

আত্মসমর্পণের আগে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জেনারেল নিয়াজির শেষ লাঞ্চ। পেছনে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জ্যাকবকে।

ফটো: সংগৃহীত

চিত্র–কথন:

আত্মসমর্পণের আগে ঢাকা সেনানিবাসে ভারতীয় সেনার সাথে হাস্যোজ্জ্বল জেনারেল নিয়াজি। কোমড়ের এই রিভল্ভার সমর্পণ করেই আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সারা হবে। পেছনে দেখা যাচ্ছে জেনারেল রাও ফরমান আলী ও বৃটিশ সাংবাদিক গ্যাভিন ইয়াংকে।

ফটো: সংগৃহীত

নানা দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। চারদিক থেকে হালকা অস্ত্রের বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দ ভেসে আসছে। নিয়াজিকে বহনকারী গাড়িকে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা আটকে দেয়। কেউ কেউ গাড়ির বনেটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শিখ অফিসার তার পাগড়িবাঁধা মাথা গাড়ি থেকে বের করে বলেন, নিয়াজি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি, তাদের এভাবে বাধা দেয়া মুক্তিবাহিনীর উচিত হচ্ছে না। মুক্তিবাহিনী ভারতীয় বাহিনীকে চিনতে পেরে নিয়াজিকে ছেড়ে দেয়। এয়ার ফিল্ডে নিয়াজিকে নিয়ে পৌঁছলেও বিপদ কাটে না। অসংখ্য মুক্তিবাহিনীর সদস্য ঢাকায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু তখনো পর্যাপ্ত ভারতীয় সেনা ঢাকায় এসে পৌঁছয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিয়াজিকে অক্ষত কীভাবে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন সেটাই বড় দুশ্চিন্তা। এরই

চিত্র–কথন:

মিত্রবাহিনী ঢাকায় ঢুকে পড়েছে। পাকিস্তানি সেনারা জানে না যুদ্ধে তারা পরাজিত। তখনো তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। শেরাটনের সামনে পাকিস্তানি সেনাদের একটি দল তখন শক্ত অবস্থানে। পাকিস্তানি অবস্থানের কাছে এসেই মিত্রবাহিনীর কর্নেল কে এস পান্নু দুই হাত মাথার উপরে তুলে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের দিকে অসমসাহসে এগিয়ে গেলেন। শান্তভাবে বললেন আর গোলাগুলি নয়, যুদ্ধ শেষ। বিহ্বল পাকিস্তানি সেনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

ফটো: সংগৃহীত

মধ্যে এয়ারপোর্টে এক ট্রাক বোঝাই মুক্তিযোদ্ধা এসে দাঁড়ায়। জ্যাকব প্রমাদ গোণেন। ঝটপট সেই ট্রাক থেকে তিনজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা নেমে আসেন। সামনে দু'জনের পেছনে শ্মশ্রুমণ্ডিত চেহারার এক যুবক জ্যাকব আর নিয়াজির দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আসতে থাকেন। যুবকের কাঁধে মেজর জেনারেলের র‍্যাঙ্কব্যাজ লাগানো আছে। কাছে আসতেই জ্যাকব তাকে চিনলেন– তিনি কাদের সিদ্দিকী, যিনি তার বীরত্বের জন্য ইতোমধ্যেই 'বাঘা কাদের' নামে খ্যাত হয়েছেন। দেশের মধ্যে থেকে শত্রুবাহিনীর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে এক বিপুল শক্তিধর বাহিনী গড়ে যুদ্ধ করে গেছেন এই যুবক। জ্যাকব নিয়াজিকে পেছনে

রেখে কাদের সিদ্দিকীর দিকে এগিয়ে যান। তিনি কাদের সিদ্দিকীকে বলেন, আত্মসমর্পণের জন্য নিয়াজিকে বেঁচে থাকতে হবে।[৮]

জেনারেল নিয়াজি নির্লজ্জের মতো কাদের সিদ্দিকীর দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন বাঘা কাদের। ভারতীয় কমান্ডার নাগরা কাদের সিদ্দিকীকে দু'বার বলেন, 'টাইগার, পরাজিতের সঙ্গে হাত মেলাও।' কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'নারীর সম্ভ্রমহরণকারী, খুনির সঙ্গে হাত মেলালে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন না।' পেছন ঘুরে কাদের সিদ্দিকী দৃঢ় পদক্ষেপে ট্রাকের দিকে ফিরে যান।[৯]

মুক্তিবাহিনীর তরফ থেকে কে থাকবেন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে সেটা তখনো স্থির হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী আছেন রণাঙ্গন পরিদর্শনে। যিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার উজ্জ্বল গুপ্ত আর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল আব্দুর রবকে নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সিলেটে মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে গেছেন। ১৩ ডিসেম্বর ওসমানী এই সফরের পরিকল্পনা করেন। যুদ্ধ পরিস্থিতি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে এবং চূড়ান্ত পরিণতির দিকে যাচ্ছে, তাতে এখন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়কের বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না– এই মর্মে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এ কে খন্দকার পরামর্শ দিলেও ওসমানী সেটায় কর্ণপাত করেননি।[১০]

১৩ ডিসেম্বর বিকালে মুক্ত হয়েছে কুমিল্লা। একটা এম-৮ হেলিকপ্টারে ব্রিগেডিয়ার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে কুমিল্লা পৌঁছেন শেখ কামাল, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, জেনারেল ওসমানী আর মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এমএ রব। বিশ্রামের জন্য কুমিল্লা সার্কিট হাউজে পৌঁছে সবাই হতভম্ব। ওসমানী সাহেবকে হাত বাড়িয়ে 'রিসিভ' করছেন কয়েকজন ভারতীয় বাঙালি। একে একে তারা পরিচয় দিলেন– 'আমি মুখার্জি আইএএস; আমি গাঙ্গুলি আইপিএস ইত্যাদি।' ওনারা বললেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে তারা গতকাল এখানে পৌঁছেছেন কুমিল্লা মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তারা শহরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার সমন্বয় করবেন।[১১]

১৬ ডিসেম্বর সকালে ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন, আজ ঢাকায় পাকিস্তান সেনারা আত্মসমর্পণ করবে। আশ্চর্য! ওসমানী সাহেব একবারে চুপ, কোনো কথা

বলছেন না।

জেনারেল ওসমানীর এডিসি, শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল জাফরুল্লাহ চৌধুরীকে বললো:

> স্যার কখন রওনা হবেন তা তো বলছেন না। জাফর ভাই, আপনি যান– জিজ্ঞেস করে সময় জেনে নিন। অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।

ডা. জাফরুল্লাহ জিজ্ঞেস করায় ওসমানী সাহেব ইংরেজিতে বললেন:

> ঢাকার পথে রওনা হওয়ার জন্য কলকাতা থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহেবের কোনো নির্দেশ পাইনি।
>
> আপনাকে অর্ডার দেবে কে? আপনি তো মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক। জাফরুল্লাহ বললেন।
>
> যুদ্ধক্ষেত্রে আমি সর্বেসর্বা; কিন্তু মূল আদেশ আসে মন্ত্রিসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদের বরাতে।

বিষণ্ন মুখে বললেন জেনারেল ওসমানী।

তিনি আসন্ন ঢাকা পতনের সংবাদ জানেন এবং প্রবাসী সরকারের নির্দেশের অপেক্ষা করছেন। সঙ্গীদের অস্থিরতা দ্রুত বাড়ছে আর বাড়ছে। শেখ কামাল বারবার ডা. জাফরুল্লাহকে চাপ দিচ্ছেন আবার ভালো করে বুঝিয়ে বলে ওসমানী সাহেবকে রাজি করাতে, ঢাকা রওনা হওয়ার জন্য।

ঘণ্টাখানেক পর জেনারেল ওসমানী অত্যন্ত বেদনাতাড়িত কণ্ঠে বললেন:

> আমার ঢাকার পথে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ নেই। আমাকে বলা হয়েছে পরে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে একযোগে ঢাকা যেতে, দিনক্ষণ তাজউদ্দীন সাহেব জানাবেন। গণতন্ত্রের আচরণে যুদ্ধের সেনাপতি প্রধানমন্ত্রীর অধীন, এটাই সঠিক বিধান।

তিনি ব্রিগেডিয়ার গুপ্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন:

> সিলেটের কী অবস্থা?
>
> সিলেট ইজ ক্লিয়ার। ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত জানালেন।
>
> তাহলে চলুন আমরা সিলেট যাই। সেখানে গিয়ে আমার বাবা-মায়ের কবর জিয়ারত করবো, শাহ্জালালের পুণ্য মাজারে আমার পূর্বপুরুষরা আছেন।

জেনারেল ওসমানী শেখ কামালকে ডেকে সবাইকে তৈরি হতে বললেন। আধা

ঘণ্টার মধ্যে হেলিকপ্টার উড়লো আকাশে, নিরুপদ্রব যাত্রা সিলেটের পথে। পরিষ্কার আকাশ। হেলিকপ্টারের যাত্রী জেনারেল ওসমানী ও তার এডিসি শেখ কামাল, মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল এমএ রব এমএনএ, রিপোর্টার আল্লামা, ব্রিগেডিয়ার গুপ্ত, ভারতীয় দুই পাইলট এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কেউ কথা বলছে না, সবাই নীরব।

অতর্কিতে একটি প্লেন এসে হেলিকপ্টারের চারিদিকে চক্কর দিয়ে চলে গেল। হঠাৎ গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ, ভেতরে জেনারেল রবের আর্তনাদ, পাইলট চিৎকার করে বললেন:

> উই হ্যাভ বিন অ্যাটাক্‌ড।

রবের উরুতে গোলার আঘাতের পর পরই তার কার্ডিয়াক এরেস্ট হলো। ডা. জাফরুল্লাহ এক্সটার্নাল কার্ডিয়াক ম্যাসাজ দিতে শুরু করলেন। পাইলট চিৎকার করে বললেন:

> 'অয়েল ট্যাংক হিট হয়েছে, তেল বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি বড়জোর ১০ মিনিট উড়তে পারবো' বলে গুনতে শুরু করলেন– ওয়ান, টু, থ্রি... টেন... টুয়েন্টি... থার্টি... ফোরটি... ফিফটি... ফিফটি নাইন, সিক্সটি– ওয়ান মিনিট গান।

এভাবেই পাইলট মিনিট গুনছে, উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত পাইলট। ধীরস্থিরভাবে পাইলটের আসনে বসা অন্য পাইলট। ওসমানী সাহেব লাফ দিয়ে উঠে অয়েল ট্যাংকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন– 'জাফরুল্লাহ, গিভ মি ইয়োর জ্যাকেট।' ডা. জাফরুল্লাহর গায়ের জ্যাকেটটা ছুড়ে দিলে ওসমানী সাহেব ওটা দিয়ে ওয়েল ট্যাংকের ফুটা বন্ধের চেষ্টা করতে থাকলেন। ইংরেজিতে বললেন:

> ভয় পেয়ো না বাছারা, আমি সিলেটকে আমার হাতের তালুর মতো চিনি।

যে বিমানটি থেকে নিখুঁতভাবে হেলিকপ্টারের অয়েল ট্যাংকারে গুলি ছোড়া হয়েছিল তা পাকিস্তানের ছিল না এটা নিশ্চিত। পাকিস্তানের সব বিমান কয়েক দিন আগে ধ্বংস হয়েছে কিংবা গ্রাউন্ডেড করা হয়েছে। তাই আক্রমণকারী বিমানটি ভারতীয় হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। গোলা ছুড়ে সেটা হয়তো গুয়াহাটির পথে চলে গেছে।

জেনারেল ওসমানী চিৎকার করে নিচে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন:

> এখানে নামো। শত্রুর গুলির স্বাদ নেয়ার জন্য আমাকে প্রথম নামতে দাও, যদি কোনো শত্রু এখনো থেকে থাকে।

এই বলে তিনি তরুণের মতো হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নামলেন।

হঠাৎ গ্রামবাসী এসে ওসমানী সাহেবকে ঘিরে ধরলো– 'দুষমন আইছে-রে-বা দুষমন আইছে, দুষমনরে ধর।' পরক্ষণেই ভালো করে তাকিয়ে দেখে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো:

> আমাদের, কর্নেল সাব-রে-বা।

গ্রামবাসী জেনারেল ওসমানীকে ঘিরে নাচতে শুরু করলো।

জনতার বিজয়-উল্লাসে যেন জেনারেল রবের ঘুম ভাঙলো, তিনি চোখ খুলে তাকালেন, সবার মুখে হাসি।[১১]

সিদ্ধান্ত হয়েছে, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এ কে খন্দকার আত্মসমর্পনের সময়ে ঢাকায় উপস্থিত থাকবেন। তিনি তখন অফিসে ছিলেন না। তাকে চারিদিকে খোঁজ করতে করতে কলকাতা নিউ মার্কেটের কাছে পাওয়া যায়। সেখান থেকেই তাকে দমদম এয়ারপোর্টে চলে যেতে বলা হয়। তিনি তখন সিভিল ড্রেসে ছিলেন। তাই সামরিক পোশাক পরার সময় পাননি। পরিকল্পনা হয়েছে, দমদম থেকে বিমানে আগরতলা গিয়ে আগরতলা থেকে হেলিকপ্টারে আসা হবে ঢাকায়। ঢাকার বিমানবন্দরে বিমান ল্যান্ড করার অবস্থা ছিল না, ইতোমধ্যেই ভারতীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়েছে।[১০]

দমদম এয়ারপোর্টে এ কে খন্দকার দেখেন, মিত্রবাহিনীর কমান্ডার জেনারেল অরোরা সস্ত্রীক বিমানে উঠছেন। অরোরা তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় আসছেন– তা ভারতীয় বাহিনীর জেনারেল জ্যাকব জানতে পারেন অরোরার স্ত্রী ভান্তি অরোরার কাছ থেকে। মিসেস ভান্তি অরোরা গর্বভরে জেনারেল জ্যাকবকে জানিয়েছিলেন, তিনি আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে অরোরার পাশেই থাকবেন। রণাঙ্গনে স্ত্রীকে নিয়ে না আসার জন্য জ্যাকবের অনুরোধ অরোরা পাত্তা দেননি। তিনি তার সামরিক জীবনের সবচেয়ে শৌর্য্যমণ্ডিত অধ্যায়ের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছেন। স্ত্রীকে রণাঙ্গনে নিয়ে যাওয়াটাও তার অংশ। তিনি সেদিন কলকাতা থেকে গাঢ় কালো কালির একটি শেফার্স্ কলমও কিনেছিলেন আত্মসমর্পণের

চিত্র-কথন:

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রাইফেল কাঁধে ঝুলানো, কালো চামড়ার জ্যাকেটের কলার উঁচিয়ে এক সুপুরুষ মুক্তিযোদ্ধা– মেজর এটিএম হায়দার। এই কালো জ্যাকেটটা মেজর হায়দারের খুব প্রিয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় পাকিস্তানের ল্যান্ডিকোটাল মার্কেট থেকে কিনেছিলেন। গত এপ্রিলে কিশোরগঞ্জ ব্রিজ ভাঙার সময় যখন কয়েক ঘণ্টার জন্য কিশোরগঞ্জের বাসায় গিয়েছিলেন, তখন তার ছোটবোন আরেক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা অন্য কয়েকটা কাপড়ের সঙ্গে এই জ্যাকেটটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। একপাশে জেনারেল অরোরা মাঝে নিয়াজিকে রেখে মেজর হায়দার ভিড় ঠেলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে ঢুকলেন; এরপর এগিয়ে গেলেন আত্মসমর্পণ টেবিলের দিকে।

ফটো: সংগৃহীত

দলিলে স্বাক্ষরের জন্য।

বিকাল চারটায় পাঁচটি এমআই-ফোর ও চারটি আল্যুয়েট হেলিকপ্টারের বহর ঢাকায় ল্যান্ড করে। এই বহরে বেগুনি রঙের শাড়ি পরিহিতা মিসেস অরোরার সঙ্গে ছিলেন জেনারেল অরোরা, এয়ার মার্শাল ধাওয়ান, ভাইস এডমিরাল কৃষ্ণন, জেনারেল স্বগত সিং আর মুক্তিবাহিনীর উপ-প্রধান উইং কমান্ডার এ কে খন্দকার।[১২]

জেনারেল জ্যাকব আর জেনারেল নিয়াজি তাদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন মেজর হায়দার আর সাবেগ সিং। এয়ারপোর্টের নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছে মিত্রবাহিনী। তেজগাঁ থেকে সরাসরি জিপের বহর ভারতীয় ও বাংলাদেশি সেনা কর্মকর্তাদের নিয়ে রমনার দিকে রওনা দেয়। রাস্তায় জনতার উপচেপড়া ভিড়, কনভয়ের গতি শ্লথ। জিপের আরোহীরা লক্ষ্য করেন, চারিদিকে হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। সকলের চোখে-মুখে অপার আনন্দ। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সাক্ষী এই অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে আজ মুক্তির আনন্দ। পথে পথে তারা ঘিরে ধরছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, হাত মেলাচ্ছেন, সহোদরের মতো বুকে জড়িয়ে ধরছেন। মুহুর্মুহু উল্লাসে ফেটে পড়ছেন সবাই। এক অপার্থিব আনন্দ তাদের চোখেমুখে। মেজর হায়দারের জিপটি ভিড় ঠেলে অনেক সামনে এগিয়ে গেল।

বিকাল প্রায় পৌনে পাঁচটা। মিত্রবাহিনী আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর শীর্ষ কমান্ডারদের কনভয় রেসকোর্সের পাশের রাস্তায় পৌঁছায়। রমনায় ততক্ষণে জনতার ভিড়, সেই ভিড় ঠেলে সামনে এগোনো মুশ্‌কিল। নিয়াজির দিকে বর্ষিত হচ্ছিল বিভিন্ন গালি ও তিরস্কার। নিয়াজিকে জনতা ছিনিয়ে নিয়ে যায় কি-না সেই আশঙ্কা সবার। মিত্রবাহিনীকে দিয়ে একটা নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করা হলো। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রাইফেল কাঁধে ঝুলানো, কালো চামড়ার জ্যাকেটের কলার উঁচিয়ে এক সুপুরুষ মুক্তিযোদ্ধা– মেজর এটিএম হায়দার। এই কালো জ্যাকেটটা মেজর হায়দারের খুব প্রিয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে থাকার সময় পাকিস্তানের ল্যান্ডিকোটাল মার্কেট থেকে কিনেছিলেন। গত এপ্রিলে কিশোরগঞ্জ ব্রিজ ভাঙার সময় যখন কয়েক ঘণ্টার জন্য কিশোরগঞ্জের বাসায় গিয়েছিলেন, তখন তার ছোটবোন আরেক মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন সিতারা অন্য কয়েকটা কাপড়ের সঙ্গে এই জ্যাকেটটাও দিয়ে দিয়েছিলেন। একপাশে জেনারেল অরোরা মাঝে নিয়াজিকে রেখে মেজর হায়দার ভিড় ঠেলে নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে ঢুকলেন; এরপর এগিয়ে গেলেন আত্মসমর্পণ টেবিলের দিকে।[১৩]

ঢাকা ক্লাব থেকে একটা টেবিল আর দু'টো চেয়ার আনা হয়েছিল। সেখানেই বসলেন দুই কমান্ডার। একজন বিজয়ী, আরেকজন বিজিত– পরাজিত। টেবিলে রাখা হয় আত্মসমর্পণের দলিল। অনেক শখ করে কিনে আনা কলম

এগিয়ে দেন জেনারেল অরোরা। স্বাক্ষর করতে গিয়ে জেনারেল নিয়াজি দেখলেন কালি আসছে না। দু'-দু'বার ঝাঁকিয়ে নিয়ে আবার চেষ্টা করায় অবশেষে কালি এলো। এই চরম অসম্মানের দলিল স্বাক্ষর করার সময়ে নিয়াজির গলা শুকিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কলমের কালিও হয়তো শুকিয়ে গিয়েছিল। আত্মসমর্পণের দলিলে প্রথম স্বাক্ষর করেন জেনারেল নিয়াজি, তারপর স্বাক্ষর করলেন জেনারেল অরোরা। জেনারেল নিয়াজি দাঁড়িয়ে কাঁধ থেকে এপলেট খুলে ফেললেন এবং ল্যানিয়ার্ডসহ রিভল্‌ভার জেনারেল অরোরার হাতে তুলে দিলেন। জেনারেল নিয়াজির চোখে তখন অশ্রু। ঘড়ির কাঁটায় চারটা পঞ্চান্ন মিনিট। এরপরে পরাজিত পাকিস্তানি বাহিনীর বাকি সকল সদস্য অস্ত্র সমর্পণ ও ব্যাজ খোলার আনুষ্ঠানিকতা পালন করলেন।

ঢাকা শহরের সমস্ত বাড়িতে গাঢ় সবুজের মধ্যে হলুদ রঙে রাঙানো বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত পতাকা উড়তে শুরু করলো। রমনা রেসকোর্সের এই ময়দানেই শেখ মুজিব ৭ই মার্চে তার ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন– 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না'। কী অপূর্ব সংযোগ। সবকিছুই ঠিকঠাক হলো, কিন্তু মিসেস্ ভান্তি অরোরার জন্য আরেকটা অতিরিক্ত চেয়ার ছিল না। ভারতের সামরিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটলো না, পাকিস্তানি জেনারেলের আত্মসমর্পণের সময় বীর ভারতীয় জেনারেল স্বামীর বাহুলগ্না হয়ে থাকার স্বপ্নটা তার অপূর্ণই রয়ে গেল।[১৬]

একজন ফরাসি সাংবাদিক এগিয়ে এসে জেনারেল নিয়াজিকে জিজ্ঞেস করলেন: এখন আপনার অনুভূতি কী, টাইগার? জবাবে নিয়াজি বললেন: আমি অবসন্ন। পাশে থেকে অরোরা জেনারেল নিয়াজির সমর্থনে এগিয়ে এসে বললেন: এক চরম বৈরী পরিবেশে তাকে এক অসম্ভব দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। কোনো জেনারেলই এ পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভালো করতে পারতেন না।[১৪]

পাকিস্তানের এককালের 'লৌহমানব' ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান সেই রাতে, ইতিহাসের সেই সমাপনী পর্বে, তার রোজনামচায় লিখলেন– 'বেদনাদায়ক হলেও বাঙলার এই বিভাজন ছিল অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা এই কুহকী বিশ্বাসে মজে ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের শত্রু। ভালো হতো, যদি আমাদের শাসকেরা সময়মতো এটা উপলব্ধি করে ভারতের হাতে এর অস্ত্রোপচারের দায়িত্ব না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঙালিদের চলে যেতে দিত।'[১৫]

সূত্র:

১. নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল; সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর: মাসুদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ১৯৪-১৯৫

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০০-২০১

৩. History: The Fall of Dhaka From Bihari Eyes; Engr. Imtiaz Alam Khan, 15 December 2019

৪. মুক্তিযুদ্ধ কাদেরিয়া বাহিনীর জনযুদ্ধ; বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম, চিত্রা, ২০১৭, পৃষ্ঠা: ২৮৮

৫. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৬২

৬. নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল; সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর: মাসুদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, পৃষ্ঠা: ২০০-২০১

৭. মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তার বিয়োগান্ত বিদায়; জহিরুল ইসলাম, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৪৪-১৪৭

৮. সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : একটি জাতির জন্ম; লে. জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব, আনিসুর রহমান অনূদিত, ইউপিএল, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১১৪-১১৯

৯. বাঘা সিদ্দিকী বললেন, হাত মেলাবো না নিয়াজির সঙ্গে; নিজস্ব প্রতিবেদক, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬

১০. ১৯৭১ : ভেতরে বাইরে; এ কে খন্দকার, প্রথমা প্রকাশন, আগস্ট ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২০৭

১১. মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি খণ্ডচিত্র; ডা. মোঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৭ বণিক বার্তায় প্রকাশিত

১২. সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা : একটি জাতির জন্ম; লে. জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব, আনিসুর রহমান অনূদিত, ইউপিএল, জানুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২০

১৩. মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তার বিয়োগান্ত বিদায়; জহিরুল ইসলাম, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৪৮-১৫১

১৪. দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান; লে. জে. এ এ কে নিয়াজি, অনুবাদ: ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, আফসার ব্রাদার্স, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৬৯

১৫. বিজয়ের প্রথম সূর্যোদয়; সাজ্জাদ শরিফ, প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৬

১৬. সেদিনের বিজয় মিছিল, মুক্তিকামী বাঙালির সবচাইতে আনন্দের মুহূর্ত। ওই সোনালী মুহূর্তটি হৃদয়ে শিহরণ জাগায়। না জানি সাত কোটি বাঙালির মনে কি বয়ে গিয়েছিল এই দিনে! সেই ভিডিওটি দেখতে নিচের কিউআরকোডটি স্ক্যান করুন:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মসমর্পণের পর

> ‘উদ্দিন-আলি-হোসেনদের এবার আর রক্ষা নেই, দেশে গিয়েই তো ওদের হাতের নাগালে পাওয়া যাবে, দেশটা স্বাধীন হলো কাদের কৃপায়? ‘আমাদের’ ইন্দিরা গান্ধী সাহায্য দিয়েছিল বলেই তো–না হলে বোঝা যেতো কত ধানে কত চাল!’

বিজয়ের আনন্দে উল্লসিত ঢাকার মানুষ দলে দলে এসে প্রথমেই ভিড় জমালেন বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে। এই বাড়ি থেকেই তাদের প্রিয় নেতা পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে এক মহাকাব্যিক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রিয় নেতা তখনও পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকলেও সেই বাড়িটি হয়ে উঠেছিল মুক্ত বাংলাদেশের প্রতীক। উল্লসিত জনতার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মোহম্মদপুরের আওয়ামী লীগের উর্দুভাষী বিহারি নেতা মোহম্মদ আলাউদ্দিন। পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ করার কারণে স্বজাতি বিহারিদের কাছ থেকে তাকে লুকিয়ে-পালিয়ে থাকতে হয়েছিল। আজ মোহাম্মদ

চিত্র-কথন:

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১, বিজয়ের আনন্দে অবরুদ্ধ ঢাকার জনগণ ভিড় করেছে ধানমন্ডি ১৮ নম্বর সড়কের ২৬ নম্বর বাড়ির সামনে। প্রিয় নেতা পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি, শেখ মুজিবের স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জনতার অভিবাদন গ্রহণ করছেন।
শেখ মুজিবকে বন্দি করে পাকিস্তানে নিয়ে যাবার পরে তাঁর পরিবারকে বন্দি করে রাখা হয় ধানমন্ডির ১৮ নম্বর সড়কের ২৬ নম্বর বাড়িতে। ওই বাড়ির ছাদে পাকিস্তানি বাহিনী দুদিকে দুটো বাঙ্কার করে মেশিনগান বসিয়েছিল। এছাড়া আরেকটি বাঙ্কার গ্যারেজের ছাদে করা ছিল। ১৭ ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে উদ্ধার করে বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে। বিজয়ের দিনও বন্দি থাকার দুঃসহ অনুভূতি বর্ণনায় শেখ হাসিনা লিখেছেন, '...আজ এসেছে বিজয়ের দিন। কিন্তু হায়! আমরা তো রুদ্ধদ্বার, মুক্তপ্রাণ!'

ফটো: সংগৃহীত

আলাউদ্দিনের চোখে-মুখে মুক্তির আনন্দ। প্রিয় নেতার বাসায় তিনি এসেছেন সেই আনন্দ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে উদ্‌যাপন করতে। সকল অবরুদ্ধ আবেগমুক্ত হয়ে গগণবিদারী শ্লোগানে মূর্ত হয়ে উঠছে। মোহাম্মাদ আলাউদ্দিনের কণ্ঠে সকলের মতোই উচ্চকিত শ্লোগান: জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু!!

৩২ নম্বর থেকে ফেরার পথে হঠাৎ নরক নেমে এলো তার উপর, চড়াও হলো উন্মত্ত জনতা। শত্রুজ্ঞানে প্রকাশ্যেই হত্যা করা হলো মোহম্মদ আলাউদ্দিনকে। যাদের সতীর্থ মনে করতেন আলাউদ্দিনের জীবনপ্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে

তিনি অবাক বিস্ময়ে তাদের বর্ণবাদী জিঘাংসা দেখে অবর্ণনীয় কষ্ট নিয়ে চিরতরে চোখ মুদলেন।[১] এরপর থেকেই শুরু হলো বাংলাদেশের ১১০টি শহরে পরিকল্পিতভাবে হাজার-হাজার উর্দুভাষীকে হত্যা, ধর্ষণ আর তাদের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠনের ঘটনা। অনেক বাঙালি পরিবার কিছু ভীত-বিহ্বল আর পলায়নপর অবাঙালিকে আশ্রয় দিয়েও অসংখ্য উর্দুভাষীর নির্মম হত্যা-মৃত্যুকে রুখতে পারেনি। স্বাধীনতার ঊষালগ্নে এই নির্মম আর বীভৎস হত্যাকাণ্ড বিষয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে এখনও কেউ তা স্বীকার করে লজ্জা বা দুঃখ প্রকাশ করেনি। এমনকি বামপন্থিরাও নয়। যদিও এই নিহত আর অত্যাচারিত বিহারিরা ছিল মূলত বামপন্থি দলের ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত রেলওয়ে ও পাটকলের শ্রমিক আর নিম্নপদস্থ কর্মচারী।[২]

আজ কেউ কি স্মরণ করেন, 'পাক ফ্যাশন টেইলার্স' নামের দোকান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা সেলাই করা হয়েছিল, সেই দোকানের অবাঙালি দরজি মোহাম্মদ হোসেন, নাসির উল্লাহ ও আবদুল খালেক মোহাম্মদীর কথা![৩]

দুই

ঢাকা শহরে সেই সময় তিন লাখের মতো বিহারি ছিল। মূলত মিরপুর আর মোহম্মদপুরে বেশি বিহারি জনগোষ্ঠী থাকলেও সারা শহরেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিহারিরা বসবাস করতো। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহারি পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙে যাক সেটা চায়নি। প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে বেশির ভাগ বিহারিই। রাজাকার বাহিনীতেও বিপুলসংখ্যক বিহারিকে রিক্রুট করা হয়েছিল। নয় মাসে তারা বিপুল উৎসাহে লুট, খুন এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে গণহত্যায় অংশ নিয়েছে। এই জনগোষ্ঠীর ওপর বাঙালিদের ঘৃণা সৃষ্টির মতো উপাদান অবশ্যই ছিল।

রমনার আত্মসমর্পণের মাঠ থেকে ফেরা উল্লসিত জনতার মিছিলগুলো থেকে শ্লোগান উঠতে থাকলো– 'একটা দুইটা পাকিস্তানি ধরো, সকাল-বিকাল নাশ্‌তা করো'। এই সম্মিলিত ঘৃণা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা বিহারি রাজাকারদের কিছু করতে না পারলেও নিরস্ত্র বিহারিদের ওপর সকল জিঘাংসা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই রাতেই বিহারিদের বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হতে শুরু হলো সব জায়গায়। খুন, লুট ও বিহারি নারীদের ধর্ষণে মেতে উঠলো উন্মত্ত জনতা।

চিত্র-কথন:

আত্মসমর্পণ ও অস্ত্র জমা দেয়ার পর পাকিস্তানি সেনাদেরকে বন্দি শিবিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিচে পড়ে আছে পাকিস্তানিদের অস্ত্র।

ফটো: সংগৃহীত

মিরপুর এক ও দুই নম্বরে বিহারি বসতি এলাকায় বিপুল অস্ত্রে সজ্জিত মুক্তিযোদ্ধারা ঢুকে পড়লো। অস্ত্রধারী বিহারি রাজাকারেরা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারেনি। মুক্তিবাহিনী ৩০টি বাড়ি ডিনামাইটে উড়িয়ে দেয় আর যত্রতত্র গুলি ছুঁড়তে থাকে। মাইকে ঘোষণা করা হয়: বিহারিরা বাঁচতে চাইলে ঈদগাহে জড়ো হও। সবাই ঈদগাহে জড়ো হয়। তাদের ওপর নির্বিচারে গুলি ছুঁড়ে অসংখ্য নিরস্ত্র বিহারিকে হত্যা করা হয়। ঈদগাহ্ মাঠের সবুজ ঘাসের রঙ পরিবর্তিত হয়ে যায় উজ্জ্বল লাল রঙে।

একটি বীরোচিত রাষ্ট্র-বিপ্লবে অংশ নেয়া গণমানুষের বাহিনীর এমন নির্দয়, নির্মম ও অসৈনিকোচিত গণহত্যায় বাঙালির বিজয়ের পালকে যে কালিমা লেপন হয়ে গেল তার দায় কেউ কখনো স্বীকার করেনি। বাংলাদেশের সকল ইতিহাস থেকে এই গণহত্যার ঘটনা মুছে দেয়া হয়েছে কিংবা মুছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[৪]

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলো। যারা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলেন তাদের সবাই প্রবীণ। তাদের কারো কারো মুখে বিজয়ীর আনন্দের বদলে বিজিতের বেদনার ছাপ পড়েছিল বটে, কিন্তু সে বেদনার সোচ্চার বহিঃপ্রকাশ তারা ঘটাননি। এই প্রবীণদের মধ্যে যারা ভারতের শরণার্থী শিবিরে ছিলেন তারা নিঃশব্দে এই সময়টা পার করছিলেন। এ এক বৈপরীত্যপূর্ণ মানসিক অবস্থান। বিপরীতে শরণার্থী শিবিরে হিন্দু প্রবীণদের বিজয়ের উল্লাস প্রকাশের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

শরণার্থী শিবিরে 'প্রবীণ মুসলিম'দের বিপরীতে 'প্রবীণ হিন্দু'দের উল্লাস যেন ছিল হারানো সম্পত্তিতে অধিকার ফিরে পাওয়ার উল্লাস। পাক সেনাদের আত্মসমর্পণের খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে সব সোচ্চার স্বগতোক্তি করে চলছিলেন, তাতে কোনো রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার প্রকাশ ছিল না। কিংবা ছিল না কোনো মননশীল সংস্কৃতি-চেতনার পরিচয়।

একান্ত স্থূল স্বার্থচেতনা কিংবা প্রতিশোধস্পৃহাই তাদের একেকজনের কথাবার্তায় অনাবৃত হয়ে পড়ছিল। পাশের বাড়ির 'অমুক উদ্দিন' গত চব্বিশটি বছর ধরে তাকে জ্বালাতন করছে, 'অমুক আলি' তার জমি বেদখল করে রেখেছে, 'অমুক হোসেন' তাকে অহেতুক নানা কথা শুনিয়েছে– স্মৃতির ঝাঁপি থেকে ওই সবই সাপের মতো কিলবিল করে বেরিয়ে আসছিল।

উদ্দিন-আলি-হোসেনদের এবার আর রক্ষা নেই, দেশে গিয়েই তো ওদের হাতের নাগালে পাওয়া যাবে। দেশটা স্বাধীন হলো কাদের কৃপায়? 'আমাদের' ইন্দিরা গান্ধী সাহায্য দিয়েছিল বলেই তো– না হলে বোঝা যেত কত ধানে কত চাল! এই চিন্তাই পরবর্তীকালে পল্লবিত হয়ে নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার জন্ম দিয়েছিল।[৫]

পাকিস্তানের আত্মসমপর্ণের খবর কলকাতায় পৌঁছতেই কলকাতা উল্লাসে ফেটে পড়লো। চারিদিকে বাজি ফুটছে, লোকজন রাস্তায় নেমে এসেছে। ইন্দিরা গান্ধীর ছবি নিয়ে একদল লোক সিপিএমের অফিস তছনছ করে দখল নিতে শুরু করলো। কংগ্রেসের কাছে এটা ছিল ইন্দিরার বিজয়ের ইমেজ কাজে লাগিয়ে সিপিএমকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিতাড়নের একটা মওকা।[৬]

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১; সকাল ৮টা ১০ মিনিট। স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী

ঢাকার রেডিও থেকে প্রথমবারের মতো ভেসে এলো মুক্তিযোদ্ধা ফতেহ্ আলী চৌধুরীর কণ্ঠস্বর। তিনি ঘোষণা দিলেন: এখন জাতির উদ্দেশে কিছু বলবেন সেক্টর টু'র কমান্ডার-ইন-চার্জ মেজর আবু তাহের মোহাম্মদ হায়দার।

ইথারে ভেসে এলো এক দৃপ্ত কণ্ঠস্বর: আমি মেজর হায়দার বলছি। প্রিয় দেশবাসী, আমাদের প্রিয় দেশকে মুক্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশ এখন মুক্ত। আপনারা সবাই এখন মুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক। সকল গেরিলার প্রতি আমার নির্দেশ– আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। কোথাও যেন আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়। লুটপাট বন্ধ করতে হবে। এলাকায় এলাকায় পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার দেশে ফিরে দায়িত্ব না নেবেন, ততদিন পর্যন্ত গেরিলাদের যার যার এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। জনগণের প্রতি আমার আবেদন– আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আল্-বদর, আল্-শাম্স, রাজাকার ও দালালদের ধরিয়ে দিন। নিজ হাতে আইন তুলে নেবেন না।

একইভাবে ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে মেজর হায়দার, মুক্তিযোদ্ধা ফতেহ্ আলী চৌধুরী, মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান, মুক্তিযোদ্ধা আলম, মুক্তিযোদ্ধা শহিদসহ আরো কয়েকজন মিলে ডিআইটি ভবনের টিভি সেন্টারে পৌঁছেন। শামসুল হুদা চৌধুরী, শাহাদাত চৌধুরী, আব্দুল্লাহ্ আল মামুন, সখিনা আক্তারসহ আরো কয়েকজনের সহযোগিতায় ফতেহ্ আলী চৌধুরীর ঘোষণার পর মেজর হায়দারের বক্তব্য প্রচারিত হয়। পরে তার বক্তব্যটির ইংরেজি স্ক্রিপ্ট পাঠ করেন মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান।[৭]

আত্মসমর্পণ নিয়ে আলোচনায় সাব্যস্ত হয়, ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলেও জেনারেল নিয়াজি ও তার বাহিনী তখনই অস্ত্র সমর্পণ করবে না। জেনারেল জ্যাকব ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের অস্ত্র রাখার অনুমতি দেন। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী যুদ্ধবন্দি হলেও ঢাকা সেনানিবাসে তাদের অবস্থান ছিল সশস্ত্র। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। পাকিস্তানি সৈন্যদের এই ভীতি খুব অবাস্তব ছিল না; তারা জানতো, তাদের কৃতকর্ম বাঙালিরা কখনো ক্ষমা করবে না। পাকিস্তানি বাহিনীকে সামনাসামনি পেলে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের আস্ত রাখতো না।

চিত্র-কথন:

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ কলকাতায় অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হাস্যোজ্জ্বল তাজউদ্দীন আহমদ। দূরে দেখা যাচ্ছে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে। তাজউদ্দীন আহমদকে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই নয়, নিজ দলের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই করে বাঙালি জাতিকে বিজয় উপহার দিয়েছিলেন। আজকে তাঁর চোখে-মুখে বিজয়ের আনন্দ আর মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে ফেরার আকুতি, বুকে স্বপ্ন। কিন্তু তাজউদ্দীনের এই স্বপ্ন কিছুদিন পরেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে সেটা হয়তো সেদিন কেউ কল্পনাতেও আনেননি।

ফটো: সংগৃহীত

পাকিস্তানি বাহিনীর বিপর্যয় সম্পর্কে জেনারেল আরোরা ১৭ ডিসেম্বর বলেছিলেন, মেঘনা ও মধুমতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের অবস্থান কেন্দ্রীভূত করলে, আমার মনে হয়, তারা আরো কয়েক মাস টিকে থাকতে পারতো।[৮]

তিন দিন পর ১৯ ডিসেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের গল্‌ফ মাঠে অস্ত্র সমর্পণ করে পাকিস্তানি বাহিনীর ৩০ হাজার সৈন্য। তাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। মিত্রবাহিনীর পক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল স্বগত সিং অস্ত্র গ্রহণ করেন। 'অফিসার্‌স্ হুঁশিয়ার! হাতিয়ার বাহার জমিন!' পাকিস্তানি স্থলবাহিনীর মেজর জেনারেল জামশেদ কমান্ড দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের গল্‌ফ মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর ৪৭৮ জন পাকিস্তানি অফিসার তাদের অস্ত্রগুলো সাজিয়ে রাখলেন। তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে অ্যাটেন্‌শন্ হয়ে দাঁড়ালেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার গিয়ে অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিলেন। নানা ধরনের অস্ত্র– পিস্তল, রিভল্‌ভার, এলএমজি, স্টেনগান।

ডিসেম্বরের সূর্যের দিকে মুখ করে ম্রিয়মাণ বিষণ্ন মুখে ক্যান্টনমেন্টের দিকে তাকিয়েছিলেন পাকবাহিনীর দীর্ঘদেহী জেনারেল রাও ফরমান আলি। ঠিক সেই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন ইউনিটে তার বাহিনীর ৩০ হাজার পরাজিত সৈন্য নিজেদের হাতিয়ার সমর্পণ করেছিল।[৯] সেদিনই বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা বলেন: ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় বাংলাদেশে অবস্থান করবে না।[১০] কিন্তু 'প্রয়োজনীয় সময়' কোনটা সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি।

মুক্তিযুদ্ধ এবং পাক-ভারত যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত দলিলে উল্লেখ আছে– সেদিন থেকে বাংলাদেশে প্রায় এক লাখ পাকিস্তানি সৈন্য ভারতের যুদ্ধবন্দি হয়। এমনকি সিমলা চুক্তিতেও এক লাখ সৈন্যের কথা বলা হয়েছে। ভুট্টোও নানা বক্তব্যে ৯৬ হাজার সৈন্যের কথা উল্লেখ করতেন। কিন্তু ইস্টার্ন কমান্ডে পাকিস্তানের নিয়মিত বাহিনীর সৈন্য ছিল মাত্র ৩৪ হাজার। রেঞ্জার্স, স্কাউট, মিলিশিয়া ও বেসামরিক পুলিশ মিলিয়ে আরো ১১ হাজার। সব মিলিয়ে ইস্টার্ন কমান্ডের সশস্ত্র সদস্য ছিল ৪৫ হাজার। ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর, সামরিক আইন প্রশাসকের কার্যালয়, ডিপো, প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ওয়ার্ক্‌শপ ও ফ্যাক্টরি প্রহরায় নিয়োজিত ব্যক্তি, নার্স, মহিলা ডাক্তার, পাচক, ধোপা, নাপিতসহ

হিসাব করলে এ হিসাব বড় জোর ৫৫ হাজারে পৌঁছে। ৪৫ হাজারের বাইরে যাদের ধরা হয়েছে তারা বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী, মহিলা ও শিশু।[১১] তবুও এই এক লাখ পাকিস্তানি সেনার কথা কেন প্রচারিত হয়েছিল সেটা এক বিস্ময়।

অবশ্য উপরে উল্লেখিত হিসাব পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় বিজিত সেনাপ্রধান জেনারেল নিয়াজির দেয়া হিসাব।

এমনকি ভারতীয় সংসদে ১৯৭২ এর ১৪ এপ্রিল পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের একতা হিসাব দাখিল করা হয় সেইখানে সামরিক বাহিনী ও প্যারামিলিটারি বাহিনীসহ মোট ৭৪,০৮১ জন যুদ্ধবন্দির একটা তালিকা দেয়া হয়। তবে পরে বলা হয় ৭০৪ জনের হিসাবে গরমিল আছে আর সিভিলিয়ান বন্দির সংখ্যা ১৬,৩৭০ জন।[১৫]

পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির সংখ্যা কোনভাবেই এক লক্ষ নয়। অন্য অনেক হিসাবের মতোই এই সংখ্যাটি এখনো অমীমাংসিত থেকে গেছে।

নিজ বাহিনী লজ্জাজনকভাবে আত্মসমর্পণ করা সত্ত্বেও ওইদিন সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া 'চূড়ান্ত বিজয় অবধি যুদ্ধ চালানোর সংকল্প' প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের সর্বত্র এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়ায় পরদিন ১৭ ডিসেম্বর ভাঙচুর, দাঙ্গা আর গণবিক্ষোভ শুরু হয়।[১২] পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের ভারতে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২০ ডিসেম্বর। এই প্রক্রিয়া ১৯৭২ সালের জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত চলে।[১৩]

এই বর্বর বাহিনী পেছনে ফেলে যায় নির্মম ধ্বংস, নির্যাতন, রক্তপাত আর অপমানের ইতিহাস।

'হাম যা রাহা হ্যায়, লেকিন বীজ ছোড় কার যা রাহা হ্যায়'। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ভারতীয় সেনার প্রহরায় পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়ার প্রাক্কালে হতাশ ও ক্ষুব্ধ এক পাকিস্তানি সেনা সমবেত উচ্ছ্বসিত বাঙালিদের উদ্দেশে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গিতে এই কথাটাই বলেছিল।[১৪] এই ছোট্ট কথার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল সাড়ে নয় মাস ধরে বাঙালি নারীদের ওপর স্মরণকালের সবচেয়ে নির্মম অত্যাচারের ইতিহাস, যা স্কুলছাত্রী থেকে বিধবা বয়স্ক মহিলা, বস্তিবাসী নারী থেকে এলিট শহুরে মধ্যবিত্তের কন্যাকেও বাদ রাখেনি।

সূত্র:

১. Bihari : The Indian Emigres in Bangladesh; Ahmed Ilias, December 2003, Shamsul Huque Foundation, Syedpur, Bangladesh, Page: 119-120

২. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৬৯-১৭০

৩. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৩০

৪. History: The Fall of Dhaka From Bihari Eyes; Engr. Imtiaz Alam Khan, 15 December 2019

৫. পাকিস্তানের ভূত দর্শন; যতীন সরকার, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৭-১৮

৬. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ২০১২, পৃষ্ঠা: ২৮৮-২৮৯

৭. মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার ও তার বিয়োগান্ত বিদায়; জহিরুল ইসলাম, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৫৫-১৫৬

৮. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১৫; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২৮

৯. মহান বিজয় দিবস আজ, ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ, ১৯ ডিসেম্বর অস্ত্রসমর্পণ; নিজস্ব প্রতিবেদক, প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫

১০. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১৫; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২৯

১১. দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান; লে. জে. এ এ কে নিয়াজি, অনুবাদ: ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, আফসার ব্রাদার্স, আগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৭১

১২. মূলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২০২

১৩. নিয়াজির আত্মসমর্পণের দলিল; সিদ্দিক সালিক, ভাষান্তর: মাসুদুল হক, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ২০৩

১৪. The Year of the Vulture; Amita Malik, Orient Longman, 1972, Page: 154

১৫. A History of the Pakistan Army: Wars and Insurrections; Brian Cloughley, Carrel Books 5th edition, page: 530

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নজিরবিহীন লুটপাট

'ঢাকায় এতসব বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়! এসব তো আগে দেখেনি ভারতীয়রা। রেফ্রিজারেটর, টিভি, টু-ইন-ওয়ান, কার্পেট, টিনের খাবার– এসব ভর্তি হতে লাগলো ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে।'[৫]

ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্টে বলা হয়, পাকিস্তানের অন্তত চারটি ডিভিশনের অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, কয়েক হাজার যান, প্রাইভেট কার, মিল-কলকারখানার মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ, খাদ্যশস্য, পাট ও সুতা, এমনকি সমুদ্রগামী জাহাজ পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যায় ভারতীয় বাহিনী। সে সময় যার আর্থিক মূল্যমান ছিল ২২০ কোটি ডলার।[৩]

১২ মার্চ ১৯৭২ ঢাকা স্টেডিয়ামে ভারতীয় বাহিনীর বিদায়ী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বিদায়ী শুভেচ্ছাবাণীতে শেখ মুজিব তাদের উদ্দেশে বলছেন: আমাদের মহাসংকটের সময়ে আপনাদের প্রসারিত সাহায্যকে আমরা সর্বদা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো। ...ইচ্ছা থাকলেও বাংলাদেশের জনগণ তাদের আতিথেয়তার হস্ত আপনাদের

চিত্র-কথন:

আত্মসমর্পণের পরে খুলনায় পাকিস্তানি বাহিনীর জমা দেয়া অস্ত্রের একাংশ

ফটো: সংগৃহীত

দিকে প্রসারিত করতে পারেনি। কারণ, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের কারণে তাদের (বাঙালিদের) আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু আপনাদের প্রতি তাদের রয়েছে অকৃত্রিম ভালোবাসা। আমার অনুরোধ, আপনারা বাংলাদেশের জনগণের ভালোবাসা সঙ্গে করে নিয়ে যান।[১]

কিন্তু দুঃখজনক যে, ভারতীয় বাহিনী ফিরে যাওয়ার সময় 'ভালোবাসার' সঙ্গে লুটপাটকরা বিপুল সম্পদও সাথে করে নিয়ে যায়। কিছু শিখ অফিসার ও তাদের অধীনস্ত সেনারা যশোর, কুমিল্লা, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে এবং খুলনার শিল্পাঞ্চলে লুটপাট শুরু করে।[২] সেই সময় ভারতীয় বাহিনী সদ্যস্বাধীন দেশে যে সর্বব্যাপী এবং নজিরবিহীন লুটপাট চালায় তা বিদেশিদেরকেও হতবাক করে তোলে। ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান'-এর রিপোর্টে বলা হয়: মিল-ফ্যাক্টরির মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ পর্যন্ত লুটপাট করে ভারতীয় সেনারা। পাকিস্তানি বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও খাদ্যশস্য এবং পাট, সুতা, যানবাহন; এমনকি সমুদ্রগামী জাহাজ, কারখানার মেশিনপত্র ও যন্ত্রাংশ পর্যন্ত লুট করে। এই লুণ্ঠিত সম্পদের আর্থিক মূল্যের পরিমাণ ছিল সব মিলিয়ে সেই সময়ের হিসাবে ২.২ বিলিয়ন ডলার।[৩] পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অন্তত চারটি ডিভিশনের অস্ত্রশস্ত্র, ভারী কামান, গোলাবারুদ, যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রতিবাদ করলে টোকেন হিসেবে অল্প কিছু পুরনো অস্ত্র ফেরত দেয়া হয়।

এই ভারতীয় বাহিনী এতই নির্লজ্জ ছিল যে, এত কিছু নিয়ে যাবার পরেও

চিত্র-কথন:

রণাঙ্গনে মেজর জলিল যিনি ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটের প্রতিবাদ করায় স্বাধীন বাংলাদেশে গুম হন। তিনিই ছিলেন বাংলাদেশে গুমের শিকার প্রথম ভিকটিম। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

ফটো: সংগৃহীত

ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফ্রিজ, আসবাবপত্র, ক্রোকারিজ ট্রাকে ভর্তি করে ভারতে পাচার করেন। ব্রিগেডিয়ার মিশ্র নামে একজন ভারতীয় অফিসারের এই লুটের অপরাধে কোর্ট মার্শালও হয়।[৪] প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তার 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসে এই লুটপাট নিয়ে লিখলেন–

'ঢাকায় এতসব বিদেশি জিনিস পাওয়া যায়! এসব তো আগে দেখেনি ভারতীয়রা। রেফ্রিজারেটর, টিভি, টু-ইন-ওয়ান, কার্পেট, টিনের খাবার– এসব ভর্তি হতে লাগলো ভারতীয় সৈন্যদের ট্রাকে।'[৫]

পাকিস্তানি বাহিনীর কয়েক হাজার সামরিক-বেসামরিক যান, অস্ত্র, গোলাবারুদসহ অনেক মূল্যবান জিনিস এমনকি প্রাইভেট কার পর্যন্ত সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই লুণ্ঠন এমন বেপরোয়া আর নির্লজ্জ ছিল যে বাথরুমের আয়না এবং ফিটিংস্‌ও সেই লুণ্ঠন থেকে রেহাই পায়নি। নবম সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জলিল তখন খুলনায়, তিনি যতগুলো কার পেলেন তা রিক্যুইজিশন করে সার্কিট হাউসে মুক্তিযোদ্ধাদের তত্ত্বাবধানে রেখে কিছু সম্পদ রক্ষার চেষ্টা করেন।
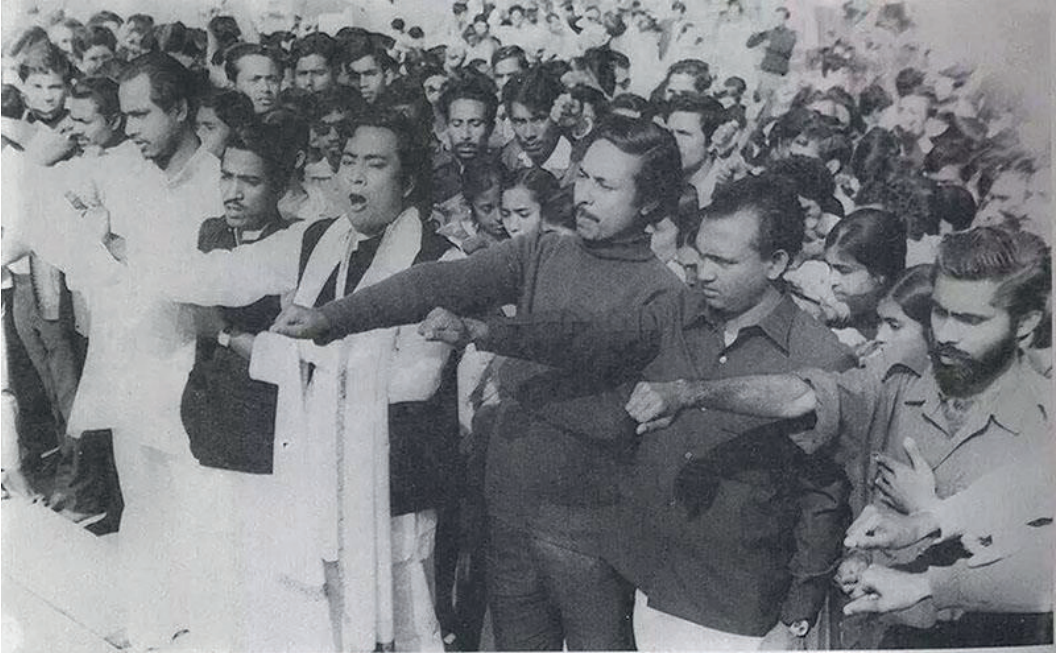
চিত্র-কথন: ছাত্রনেতাদের শিক্ষা-চেতনা-উপলব্ধি ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব

স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের মাত্র কুড়ি দিন পর, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমবেত হয়েছেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতারা, শপথবাক্য উচ্চারণ করছেন– দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখবেন। তখনকার ছাত্রনেতারা, যারা প্রধানত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং যাদের প্রায় সকলের নামের সাথেই 'মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক' পরিচয়টি যুক্ত হয়েছিল, তারা সকলেই ছিলেন মুখচেনা। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে এদের অনেককেই নানা সুপথে কিংবা বিপথে ধাবিত হতে দেখা গেছে।

কিন্তু সেটা পরবর্তী অধ্যায়ের অর্জন কিংবা আত্মবিসর্জন। বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের স্বাধিকার সংগ্রাম ও তা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছবার চূড়ান্ত পর্ব, ১৯৬৯ থেকে '৭১ পর্যায়ে 'সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত, দেশবাসীর প্রিয়' ছাত্রনেতারা জাতীয় চরিত্র নির্ণয় ও নির্ধারণে কতটা বুদ্ধিদীপ্ত, ভবিষ্যৎমুখী ও বাস্তবসম্মত চেতনার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন। জাতির ভাগ্য নির্ধারণী রাজনীতির গতিপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ কিংবা তার ওপর প্রভাব বিস্তারের কালে এই ছাত্রনেতারা জাতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং প্রত্যাশা ও লক্ষ্য সম্পর্কে কতটা ওয়াকিফহাল আর সতর্ক ছিলেন।

দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যেই জাতীয় ইতিহাসের এই পর্বের ছাত্রনেতাদের সাধারণভাবে স্বল্পশিক্ষিত ও অদূরদর্শী হিসেবে চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন। পূর্ব বাঙলায় পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের কালে এই ছাত্রনেতাদের মধ্যে যে সমাজতান্ত্রিক ধারণার জন্ম হয়, স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে চেতনা ও বিশ্বাস তৈরি হয়, তা ছিল অস্বচ্ছ-অপক্ব ও অগভীর।

বিভিন্ন দেশে এসব আদর্শের প্রকাশ্য সাফল্য ও শক্তিমত্তা তাদের বিমোহিত

করেছিল। কিন্তু এসব আদর্শ অনুসরণ এবং অনুশীলন ও ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য যে আদর্শিক তাড়না, ত্যাগ-তিতিক্ষা, ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সংযম-মিতাচারের প্রয়োজন হয় সেই শিক্ষা-বোধ-উপলব্ধি ছিল না তাদের। অনেক ক্ষেত্রে তারা বহুল আলোচিত আঞ্চলিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ কব্জায় রাখতে ইচ্ছুক বিদেশি শক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ছিলেন।

সংযুক্ত ছবিটিতে স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র ক'দিন পর আলোচ্য ছাত্রনেতাদের ক'জনকে নবীন 'রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখার শপথ' নিতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওই সময়ই স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তাকারী মিত্রবাহিনীরূপী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সৈনিকরা সমস্ত রাজনৈতিক ও সামরিক রীতিনীতি পদদলিত করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সহায়-সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল। সরকারি-বেসরকারি মিল-কলকারখানা, ফ্যাক্টরি-ওয়ার্কশপ, ডিপো-গোডাউন, সমুদ্রগামী জাহাজ, বাস-ট্রাক-মোটরকার লুট, আধুনিক ঘরবাড়ির যাবতীয় ফিটিংস্, মূল্যবান যন্ত্রপাতি, ফ্রিজ, টিভি, কার্পেট থেকে শুরু করে সবকিছু তারা ট্রাক বোঝাই করে সীমান্তের ওপারে পাঠাতে শুরু করলো।

সামরিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে পাকিস্তানের অন্তত চারটি ডিভিশনের বিশাল বাহিনীর বিপুল পরিমাণ হালকা থেকে ভারি সমুদয় অস্ত্র ও গোলাগুলি, যাবতীয় সাঁজোয়া যান ও কয়েক হাজার বেসামরিক ও সামরিক যানবাহন, বিপুলসংখ্যক প্রাইভেট কার, ভারি কামান লুট করে নিয়ে যায় ভারতীয় সেনাবাহিনী। বাধা দিয়েছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নবম সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিল। এজন্য ভারতীয়রা তাকে গুম করে এবং মুজিব সরকার মিডিয়া সেন্সরশিপের মাধ্যমে আড়াই মাস সেই গুমের ঘটনা গোপন রাখে। এজন্য মুজিব সরকার মেজর জলিলের কোর্ট মার্শালও করেছিল।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে পরিচিত সেদিনের ছাত্রনেতাদের সার্বভৌমত্বের এই ইস্যুতে বিন্দুমাত্র ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি। ভারতীয় সৈন্যদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে 'মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক' এই ছাত্রনেতাদের কোনো রকম প্রতিবাদ জানাতে দেখেনি সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ। সেদিনের সেই শপথ অনুষ্ঠানে সামনের সারিতে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ, আ স ম আব্দুর রব প্রমুখ।

ফটো: সংগৃহীত

ভারতীয় বাহিনীর লুটপাটের বিরুদ্ধে এই বীর সেক্টর কমান্ডার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। ফলও পেলেন দ্রুত। ২৮ ডিসেম্বর তিনি যশোর থেকে অন্তর্হিত হন।[৬] মেজর জলিল পরে জানান, ৩১ ডিসেম্বর ভারতীয় বাহিনীর হাতে তিনি গুম হন। যশোর সেনানিবাসের অফিসার্স কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে তাকে আটক রাখা হয়। বাড়িটি ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর একটি নির্যাতন সেল। বাড়িটি অন্ধকার, রুমে মানুষের রক্তের দাগ ও এলোমেলো ছেঁড়া চুল, কিছু নরকঙ্কাল, সঙ্গে শকুন আর শেয়ালের উপস্থিতির মধ্যে একটা খাটে ডিসেম্বরের শীতের রাতে আধাছেঁড়া কম্বল গায়ে দিয়ে দেশের প্রথম রাজবন্দি এক বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিল শুনতে পেলেন পাশেই ভারতীয় সেনাদের বর্ষবরণের উল্লাস, নর্তকীর ঘুঙুরের শব্দ আর সেইসঙ্গে নারী-পুরুষের হল্লা।[৭] মেজর জলিলের এই গুম হবার সংবাদ আড়াই মাস পরে সরকার স্বীকার করে।[৮] এটাই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মিডিয়া সেন্সরশিপ।

এই বীর মুক্তিযোদ্ধা জলিল মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন দেশের কনিষ্ঠতম মেজর। পাকিস্তান আর্মির সাঁজোয়া বাহিনীর সদস্য এবং অকুতোভয় এক সৈনিক। জলিলের সঙ্গে সেদিন ভারতীয় বাহিনী আরো গুম করে একই সেক্টরের আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত নৌবাহিনীর প্রাক্তন লিডিং সি-ম্যান সুলতানউদ্দিন আহমেদ ও মো. খুরশিদকে। বাকি দু'জন খালাস পেলেও জলিলের কোর্ট মার্শাল হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, সেই সামরিক আদালতের বিচারক ছিলেন আরেক সেক্টর কমান্ডার কর্নেল তাহের। বিচারে জলিল নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু মেজর জলিল এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের একটা বাসায় উঠেছিলেন, সেখান থেকেও তাকে বের করে দেয়া হয়। ঢাকায় তার কোনো থাকার জায়গা ছিল না। মতিঝিলে একটা অফিস ছিল সুলতানউদ্দিন আহমেদের। সেখানেই তার সাময়িক আশ্রয় হয়। তার অফিসেই কাঠের পাটাতন দিয়ে বানানো চৌকিতে তিনি রাতে ঘুমাতেন। মফস্বলের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসার কারণে অনেক সেক্টর কমান্ডার তাকে 'এলিট' মনে করতেন না এবং তাকে এড়িয়ে চলতেন।[৯]

১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লি সফরকালে বাংলাদেশি প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিদল অস্ত্র ফেরতদানের প্রশ্নটি উত্থাপন করে প্রত্যুত্তরে এক নির্লিপ্ত সাড়া পান। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদে একজন আওয়ামী লীগ সদস্যের প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী বলেন যে, 'ভারত ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে দখলিকৃত পাকিস্তানি অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের এক বিরাট অংশ ফেরত দিয়েছে এবং এই ফেরতদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।' অবশ্য মন্ত্রী 'জাতির স্বার্থে' ফেরত প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রের সংখ্যা বা পরিমাণ উল্লেখ করতে অস্বীকৃতি জানান।[১০]

সূত্রঃ

১. কারা মুজিবের হত্যাকারী?; এ এল খতিব, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২, পৃষ্ঠাঃ ১২৩-১২৪

২. মূলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ১৯৯

৩. The political economy of rural poverty in Bangladesh; Kamal Uddin Siddiqui, 1st ed., Dacca National Institute of Local Government, 1982. Page: 427

৪. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০; পৃষ্ঠাঃ ১৯-২০

৫. পূর্ব-পশ্চিম (দ্বিতীয় খণ্ড); সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ ৪৮৭

৬. মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক 'হক কথা' সমগ্র; সম্পাদনাঃ আবু সালেক, ঘাস ফুল নদী, বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৯

৭. অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা; মেজর (অব.) এম এ জলিল, কমল কুঁড়ি প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৫২-৫৪

৮. মওলানা ভাসানীর সাপ্তাহিক 'হক কথা' সমগ্র; সম্পাদনাঃ আবু সালেক, ঘাস ফুল নদী, বইমেলা ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৪০

৯. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৮২-৮৩

১০. বাংলাদেশ অবজারভার; ১৮ জুন ১৯৭৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
স্বাধীন দেশে ভারতীয় বাহিনী

> 'বাংলাদেশিদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী।'[৬]

> আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশিদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। আমাদের রাজনীতিকরা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।
>
> –ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'[৬]

১৬ ডিসেম্বরের পরে ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কিছু কিছু অফিসার নিজেদেরকে বাংলাদেশের ত্রাতা হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেন। এক ধরনের অযাচিত অহংবোধ নিয়ে তারা ঢাকায় চলাফেরা করতেন। ঠিক এই ধরনের মানসিকতার জন্যই পশ্চিম পাকিস্তানিদের সঙ্গে বাঙালিদের, বিশেষ করে আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন সামরিক অফিসারদের সৌহার্দ্যপূর্ণ বা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বরং তাদের প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাস ও বিতৃষ্ণা ছিল।[১]

ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল অরোরা ১৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী ২-৩ মাস যতবার ঢাকা এসেছেন ততবারই ঢাকা সেনানিবাসের 'কমান্ড হাউজ'-এ তার থাকার ব্যবস্থা হতো, যেখানে স্বাধীনতার আগে থাকতেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান। ওই সময় ঢাকায় চলাফেরার সময় অরোরার গাড়িতে ইস্টার্ন কমান্ডের পতাকা শোভা পেত। তার গাড়ির সামনে-পিছনে ভারতীয় রক্ষীরা রাস্তার স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ করে অরোরার যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেন, অনেকটা এখন যেভাবে দেশের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে করা হয়। অরোরার 'চলাফেরার এই ধরন' এতটাই বিস্ময় তৈরি করে যে, সেই সময়কার ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সুবিমল দত্তকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বলতে হয়, স্বাধীন দেশের প্রতি প্রতিবেশী দেশের একজন আঞ্চলিক সেনা প্রধানের এই আচরণ যথাযথ নয়।[২]

স্বাধীনতার পর পর ঢাকার বিত্তশালী কিছু কিছু পরিবারের সঙ্গে ভারতীয় আর্মি অফিসারদের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। এসব লোকজনের অধিকাংশই স্বাধীনতাবিরোধী ছিল এবং মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের সঙ্গেও তাদের একই রকম হৃদ্যতা ছিল। এরা বিভিন্ন সময় পার্টি দিয়ে ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার ও রাজনৈতিক নেতাদের আপ্যায়ন করতেন, ঠিক যেভাবে তারা গত সাড়ে নয় মাস পাকিস্তানি সেনা অফিসারদের আপ্যায়ন করেছেন।[৩]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিম্নপদস্থ সদস্যরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না। তারাও নিজেদের এই দেশের ত্রাতা মনে করতো। তারা মিষ্টির দোকানে এসে ইচ্ছেমতো মিষ্টি খেয়ে দাম না দিয়ে চলে যেত, কখনো কখনো ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্য গ্লাস-প্লেট ভেঙে রেখে যেত। প্রথম প্রথম দোকানদাররা সন্তুষ্টচিত্তেই মিষ্টিমুখ করাতো, কিন্তু দিনের পর দিন তারা এটাকে সহজাত অধিকার হিসেবে ধরে নিয়ে সাধারণ দোকান মালিকদের অতিষ্ঠ করে তুললো। তখন মিষ্টি দোকানদাররা প্রধানত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাদেরকেই ভারতীয় বাহিনীর মিষ্টি খাওয়ার জুলুম পোহাতে হয়।[৪]

ভারতের ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশে আসতে শুরু করেন নতুন বাজার ও লুটের জায়গা খুঁজতে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে থাকে। জনগণ মুজিব সরকারকে ভারতের বশংবদ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে। পত্রিকার ডিক্লারেশন নিতে হলে একটা শর্ত মানতে হতো– 'বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।'[৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারতের সেনা প্রধান ও পরবর্তী অধ্যায়ে সম্মিলিত মিত্রবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেক শ' পরে বলেছিলেন: বাংলাদেশিদের কখনোই

চিত্র-কথন:

১৯৭২ সালের ১২ মার্চ। সেদিন সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ থেকে বিদায়ী ভারতীয় সৈন্যদের সম্মান জানাতে একটি কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে। ভারতীয় বাহিনীকে বিদায় জানাতে এবং স্বাধীন বাংলার রূপকার শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখতে সেদিন স্টেডিয়ামে ভিড় করেছিল হাজারো জনতা। 'জয় বাংলা জয় হিন্দ' স্লোগানে মুখরিত হতে থাকে পুরো এলাকা।

ফটো: সংগৃহীত

ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশিদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সবরকম সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।[৬]

মানেক শ' রাজনীতিবিদদের এককভাবে দোষী করার চেষ্টা চালালেও শুধু রাজনীতিবিদ নন, ভারতীয় সৈনিক ও অফিসাররাও একই ধরনের আচরণ করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে।

জেনারেল মানেক শ' তো এটাও বলেননি যে, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর সমস্ত সামরিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করে তার বাহিনী বিজিত পাকবাহিনীর সমুদয় সমরাস্ত্র ও কয়েক হাজার সামরিক যানবাহন, বিপুলসংখ্যক প্রাইভেট কার এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের সমুদ্রগামী জাহাজ থেকে শুরু করে আরো বিপুল সহায়-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল। আর ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে তিনি সে সব বন্ধ করারও কোনো পদক্ষেপ নেননি।

চিত্র-কথন:

১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও সিরাজুল আলম খান - এই চার যুবনেতার উদ্যোগে মুজিব বাহিনী নামে এক বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনী অস্থায়ী মুজিবনগর সরকারের এবং একই সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল অরোরার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল সুজন সিং উবান, যিনি ভারতীয় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের কমান্ডার (ইন্সপেক্টর জেনারেল) ছিলেন। ভারতের দেরাদুনে এই বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো যার তত্ত্বধাক ছিলেন ব্রিগেডিয়ার টি. এস ওবেরয়। কর্ণেল বি ডি কুশাল এই বাহিনীর প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখাশোনা করতেন। মেজর জেনারেল এস. এস. উবান ১৯৯৫ প্রকাশিত 'ফ্যান্টমস্ অব চিটাগাং' গ্রন্থে লিখেছেন যে, এই মুজিববাহিনী মুক্তিযুদ্ধকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সহযোগী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের শেষে স্বাধীন বাংলাদেশে রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়। এ সময় মুজিব বাহিনী বা বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্সেস-এর সদস্যদের নবগঠিত রক্ষীবাহিনীতে আত্মীকরণ করা হয়।

১৯৭১ এর ১৯ ডিসেম্বর মুজিববাহিনীর অন্যতম নেতা শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির সাথে জেনারেল উবান ঢাকায় আসেন একটি সামরিক হেলিকপ্টারে চড়ে। ঢাকা বিমানবন্দরে ল্যান্ড করার পরে মুজিববাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ছাত্রলীগের সদস্যেরা শেখ মণি ও জেনারেল উবানকে মাল্যভুষিত করে অভ্যর্থনা জানায়। ছবিতে ডান থেকে আবদুল কুদ্দুস মাখন, শেখ মণি, আ স ম আব্দুর রব, জেনারেল উবান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ ও শাজাহান সিরাজ।

ফটো ক্রেডিট: ইত্তেফাক

সূত্রঃ

১. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠাঃ ২১

২. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২২৪

৩. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠাঃ ২০

৪. বলেছি বলছি বলব; শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, অনন্যা প্রকাশ, ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৩৪-১৩৫

৫. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠাঃ ৩২৪-৩২৫

৬. স্টেট্স্ম্যান; ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনের প্রত্যাবর্তন

> ‘কাদের তুই চারজনকে মেরেছিস, চার শ’ লোক মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না’

> ১৬ ডিসেম্বর রাত্রি থেকেই মুক্তাঞ্চলের ‘মুক্তিযোদ্ধা’ ও ‘সিক্সটিন্থ ডিভিশন’-এর মুক্তিযোদ্ধা নামধারীরা জনপদে আর ঢাকার রাজপথে বিজয়ের উল্লাস করতে থাকে। এদের হাতে দেখা যায় একে-৪৭ বা এসএলআর-এর মতো অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র।[১০]

> পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এরা অন্যের গাড়ি-বাড়িসহ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দখল ও লুটতরাজ করতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যোগ দেয় এসব দখল ও লুটতরাজে।[১০]

সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যারা নিরাপদ আশ্রয়ের লোভে সীমান্ত অতিক্রম করেছিলেন, তারা পাকিস্তানি প্রশাসনিক কাঠামো বজায় রেখেই পদোন্নতি ও নিজেদের ভাগ্যের উন্নতির পরিকল্পনায় সময় অতিবাহিত করছিলেন। আমলাদের মধ্যে দেশ গড়ে তোলার কোনো নতুন চিন্তা-ভাবনা বা উন্নয়ন কৌশল অবলম্বনের প্রয়াস দেখা যায়নি।[১]

স্বাধীনতার আগে ১৯৭১-এর ১০ ডিসেম্বর ভারতে অবস্থানরত মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী পাকিস্তান সরকারের অধীনে চাকরিরত ছিলেন, বিনা বিচারে তাদের শাস্তি দেয়া হবে না। যুদ্ধকালে অফিস ত্যাগ করে যারা বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন, তারা পূর্ব পদে যোগদান করবেন এবং পাকিস্তান সরকারের অধীন কর্মকর্তারা 'ওএসডি' হবেন। এরই ভিত্তিতে স্বাধীনতার পরে প্রশাসনিক কাজ শুরু করার জন্য ১৭ ডিসেম্বর দেশের ১৯টির সব ক'টি জেলায় ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হয়।

১৮ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মুখ্যসচিব রুহুল কুদ্দুস ও পুলিশ মহাপরিদর্শক আব্দুল খালেক ঢাকায় পৌঁছে তাদের দায়িত্ব নেন। সেদিন ছিল শনিবার। তারা একাই আসেননি, সঙ্গে এসেছিল ভারতের সরকারি আমলা ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদল। এই ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তার কাজ শুরু করে।[২] ১৯ ডিসেম্বর রোববার সেই সময় সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার আবেগ-আনন্দে আপ্লুত সরকারি কর্মচারীগণ কাজে যোগদান করেন।

শুধু বিশেষজ্ঞদল পাঠানোই নয়, স্বাধীনতার পরপরই ভারত সরকার বাংলাদেশকে ৩ কোটি টাকা অনুদান দেয়। এটাই বাংলাদেশের গৃহীত প্রথম বিদেশি অনুদান। বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে তখন তেমন কোনো অর্থ মজুত ছিল না। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজয় নিশ্চিত জেনে ডিসেম্বরের প্রথম দিকে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের ঢাকা অফিসে রক্ষিত সব অর্থ ও স্বর্ণ পাকিস্তানে পাচার করেছিল বা পুড়িয়ে ফেলেছিল।[৩] পাচার করার পরেও ১০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ নোট ঢাকায় থেকে যায়; যা পাকিস্তানি বাহিনী শেষ মুহূর্তে জ্বালিয়ে দেয়।[৪]

দেশের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেন, অক্টোবর মাসেই ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ৭ দফার একটা গোপন চুক্তি হয়। সেই চুক্তির ধারাগুলো যা ছিল বলে প্রচারিত হয় তাতে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কোনো স্বাধীন অস্তিত্বই থাকে না। ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা আর বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে রাষ্ট্রীয় কাজ শুরু হলে এবং সর্বব্যাপী ভারতীয় রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দৃশ্যমান হলে এই বিশ্বাস সবার মনেই বদ্ধমূল হয়।

প্রবাসী সরকারের দিল্লি মিশনের প্রধান এবং পরে রাষ্ট্রদূত, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সাবেক স্পিকার ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীও এক সাক্ষাৎকারে এই গোপন চুক্তি হয়েছিল বলে নিশ্চিত করেছেন। তার মতে, এই

চিত্র-কথন:

স্বাধীনতার পর যারা কখনো মুক্তিযুদ্ধের আশেপাশেও যায়নি, তারাই রাতারাতি পাকিস্তানি বাহিনী আর রাজাকারদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র হাতে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় মহড়া দেয়া শুরু করে। এদের 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন' নামে ডাকা হতো। স্বাধীনতার পর মতিঝিলে অস্ত্র হাতে গুলি ফোটানো অবস্থায় সিক্সটিন্থ ডিভিশন-এর কিছু সদস্য। হাতের অস্ত্র ধরার ভঙ্গি ও পোশাক বলে দিচ্ছে তারা কখনো রণাঙ্গনে ছিল না।

***ফটো:** সংগৃহীত*

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। এই চুক্তি স্বাক্ষর করার পরপরই না– কি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৫]

স্বাধীনতার পর থেকে এই বিষয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন থাকলেও আওয়ামী লীগের কোনো নেতা এ প্রসঙ্গে প্রকাশ্যে কোনো জবাব বা ব্যাখ্যা দেননি। অনেক পরে ১৯৭৪-এর জানুয়ারিতে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক জনসভায়

বলেছিলেন, 'স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ কোনো গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেনি'।[৬]

২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা, যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সূতার ছিলেন একজন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা তার কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব রাখেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন, 'ইয়ে না মুমকীন হ্যায়।'[৭]

মুক্তিযুদ্ধের ফলে সামাজিক ক্ষতি হয়েছিল অনেক। ছাত্ররা হারিয়েছিল তাদের শিক্ষাজীবনের একটা বছর। অনেকেই লেখাপড়া আর শেষ করতে পারেনি। অনেকে হারিয়েছিল তাদের পেশা। অনেক পরিবারেই ছিল এক বা একাধিক স্বজন হারানোর বেদনা। কোনো কোনো পরিবারের সকল নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে আটক থাকা নারীরা মুক্ত হয়ে তাদের স্বজনের কাছে ফিরছিল। সেই স্বজনেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষিত নারীদের সহজভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মানুষের মূল্যবোধ। সামাজিক মূল্যবোধ এবং আইনশৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সদ্যস্বাধীন দেশে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য শুরু হয়েছিল।

যাদের ক্ষমতা ছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। অনেকে দেশে ফিরে প্রথমেই পূর্বশত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছিল। ১৬ তারিখ নিয়াজীর আত্মসমর্পণের পর থেকেই শুরু হয়েছিল বহু মুক্তিযোদ্ধার উন্মত্ত আচরণ। মুক্তিযোদ্ধারা পটকা ফুটানো, বাজি পোড়ানোর বদলে রাইফেল অথবা স্টেনগানের গুলি ছুড়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করতে আরম্ভ করে।[৮] সন্ধ্যা হলেই প্রচুর ফাঁকা গুলির আওয়াজ শোনা যেত। এটা নাকি ছিল বিজয় উল্লাস। শেখ মণি এসব দেখে বলেছিলেন, 'ছেলেরা করছে কী? এত গুলি নষ্ট করছে কেন? এসব তো রাখা দরকার ভবিষ্যতের জন্য'।[৯]

১৬ ডিসেম্বর রাত্রি থেকে বিজয়োল্লাসে মত্ত যে সব মুক্তিযোদ্ধা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের অনেকের হাতেই ছিল একে-৪৭ রাইফেল। এসব অস্ত্র কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ইউনিট কমান্ডার এদের শনাক্ত করতে পারেনি। এদের বেশির ভাগই প্রভাবশালী অভিভাবকের নিরাপদ আশ্রয়ে এই নয় মাস কাটিয়েছে, যুদ্ধের ধারে-কাছেও তারা যায়নি।

চিত্র-কথন:

***১৯৭১**-এর **১৯** ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি দালালকে ধরে এনে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কার্যালয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে।*

ডানে হাতকড়া পরা প্রহৃত ব্যক্তি ৪০ জন বাঙালি বুদ্ধিজীবি হত্যায় সম্পৃক্ত ছিল বলে অভিযোগ আনা হয়েছিল। নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু পরবর্তীকালে ঢাকার নাট্যমঞ্চের একজন গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক হয়ে ওঠেন। তার প্রতিষ্ঠিত ঢাকা থিয়েটার বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতের বরেণ্য ও জনপ্রিয় শিল্পীরা ঢাকা থিয়েটারের মঞ্চনাটক করতেন। এভাবেই ঢাকা থিয়েটারের আফজাল ও সুবর্ণা জুটি আশির দশকের তারুণ্যের ক্রেজ হয়ে ওঠে। ঢাকা থিয়েটারের মঞ্চের নায়কেরা অনেকেই ছিলেন রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা। পদ্মা নদীর মাঝির কুবের চরিত্রে অভিনয় করা রাইসুল ইসলাম আসাদ ও ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয়তম ভিলেন হুমায়ুন ফরিদী দুজনেই ঢাকা থিয়েটারে নাট্যকর্মী ছিলেন।

ফটো: *সংগৃহীত*

চিত্র-কথন: কাদের সিদ্দিকীকে মুজিবের প্রশ্রয়

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের ঠিক একদিন পর, ১৮ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের 'কাদেরিয়া বাহিনী'র অধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী ও তার বাহিনীর কয়েকজন মিলে দুষ্কৃতকারী অভিযোগে চার যুবককে আটক করে নিয়ে এলেন ঢাকার আউটার স্টেডিয়াম বা পল্টন ময়দানে। তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানা গেল না। দেশের সংবাদপত্রের রিপোর্টার ও ফটো সাংবাদিক এবং বিদেশি টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে আধা ঘণ্টা ধরে পিটিয়ে, তারপর কাদের সিদ্দিকী নিজ হাতে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করলেন চার যুবককে।

ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক ও নির্মম এই ঘটনার ছবি দেখানো হলো বিশ্বের বহু দেশে। যুদ্ধ চলাকালে আইনের বিচারে সঠিক নয় এমন ঘটনা হয়তো অনেকই ঘটেছে। কিন্তু যুদ্ধ যখন শেষ তখন এরকম ঘটনা এবং একটি বৃহৎ মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীর অধিনায়ক স্বহস্তে সেটা ঘটিয়েছেন, বিশ্বসমাজে বাংলাদেশের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

এমনিতেই মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সামাজিক ক্ষতি হয়েছিল অনেক। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সামাজিক মূল্যবোধ। আইনশৃঙ্খলা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। বিজয় পরবর্তী কথিত মুক্তিযোদ্ধারা লুটতরাজ, দখলবাজিতে মেতে উঠলো। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যোগ দিলো এসবে।

শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্ব এসব তৎপরতা প্রতিহত কিংবা এমন পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য যোগ্য এবং প্রস্তুত ছিল কি? জনবহুল স্থানে শত শত মানুষের সামনে এরকম নারকীয় ঘটনার পরও কাদের সিদ্দিকীকে প্রকাশ্যে প্রশ্রয় পেতে দেখা গেছে। প্রকাশ্য জনসভায় সরকার প্রধান শেখ মুজিব তাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'কাদের, তুই চারজনকে মেরেছিস, চার শ' লোক মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না'।

ফটো: *সংগৃহীত*

এরাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সমর্থকবাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্র এবং পাকিস্তানি অস্ত্রাগার থেকে লুট করা অস্ত্র নিয়েই রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধা বনে যায়। এদেরই একটি অংশ অন্যের গাড়ি-বাড়ি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে দখল করে নেয়।[১০]

যারা কোনো দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারে-কাছে যায়নি, তারাই ১৭ তারিখ রাস্তায় বের হয় দর্পভরে, কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ গাড়িতে। এদের কেউ কেউ অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করতে শুরু করে। অন্যদের ওপর চড়াও হয়। এদের তখন নাম হয় 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন'– 'ষোড়শ বাহিনী'। কারণ, এর সূচনা হয় ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ। অবাঙালিদের সম্পত্তি লুটপাট করায় যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, এই 'সিক্সটিন্থ ডিভিশন'-এর মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। তথাকথিত ভদ্রলোকরাও তাতে সমান উৎসাহী এবং সমান বিবেকবর্জিত ছিলেন। 'ষোড়শ ডিভিশন'-এর এই ব্যাধি অচিরেই সংক্রমিত হয় মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশের মধ্যে।

ভারতের সাহায্য ছাড়াই মুক্তিযুদ্ধে দেশের ভেতরে থেকেই এক অজেয় মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন কাদের সিদ্দিকী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাবেক এই তরুণ নন-কমিশন্ড অফিসারের অস্ত্র চালনা এবং সামরিক বিদ্যার প্রাথমিক ধারণা ছিল। কিন্তু তিনি ছিলেন এক সহজাত যোদ্ধা এবং সংগঠক। টাঙ্গাইলের একটি বিরাট অঞ্চল তিনি পুরো মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্ত রেখেছিলেন। তার অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে ওঠে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রে। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য তাকে 'বাঘা সিদ্দিকী' বলে ডাকা হতো। কিন্তু ১৮ তারিখে এক নির্মম অসৈনিকসুলভ ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। তিনি ঢাকায় আউটার স্টেডিয়ামে বিদেশি টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে আধা ঘণ্টাকাল পিটিয়ে ও তারপর নিজে হাতে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অজ্ঞাত অভিযোগে ধৃত চারজন বন্দিকে নির্মমভাবে হত্যা করেন। অন্য অনেক দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সাথে সেই হত্যাকাণ্ডের সময় উপস্থিত ছিলেন তরুণ ইতালিয়ান সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে তিনি একটি কঠোর প্রতিবেদন লিখেছিলেন। শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরলে ওরিয়ানা আবার ঢাকায় আসেন এবং পরপর দু'দিন তাঁর সাক্ষাৎকার নেন তিনি। বহু দেশেই আউটার স্টেডিয়ামের এই নির্মম ঘটনার ছবি দেখানো হয়। ফলে যুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের প্রতি বিশ্বসমাজের যে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছিল তখন থেকেই তাতে ভাটা পড়তে শুরু করে।[১১]

এই বর্বর হত্যাকাণ্ড শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করেনি। বরং কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যেই প্রশ্রয় পেয়েছিলেন। তার অস্ত্রসমর্পণ অনুষ্ঠানে প্রকাশ্য জনসভায় শেখ মুজিব তাকে উদ্দেশ করে বলেন, 'কাদের, তুই চারজনকে মেরেছিস, চার শ' লোক মারলেও আমি তোকে কিছুই বলতাম না।'[১২]

সকল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভঙ্গ করে তরুণ মুক্তিযোদ্ধারা রেডক্রসের নিরাপত্তা বলয়ে থাকা ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (পরবর্তী সময় হোটেল শেরাটন) আক্রমণ করার হুমকি দেয়। কারণ, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মালেক আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে বিচারের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের হাতেই তুলে দিতে হবে– এই ছিল তাদের দাবি। মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডাররা অসহায়ভাবে স্বীকার করেন, অনুসারীদের ওপরে তাদের আর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।[১৩]

সেদিন ১৮ ডিসেম্বর এক ভয়াবহ আবিষ্কার সকলকে স্তব্ধ করে দেয়। বিজয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে যায়। নির্বাক বিস্ময়ে ঢাকাবাসী রায়ের বাজারের কাটাসুরে পরিত্যক্ত ইটখোলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, লেখক, চিকিৎসকসহ বুদ্ধিজীবীদের প্রায় ২০০ বিকৃত ও গলিত মৃতদেহ আবিষ্কার করে। ইটখোলায় তখনো অল্প পানি। সেই অল্প পানিতে হাত ও চোখ বাঁধা মৃতদেহ পড়ে আছে। দেখলেই বুঝতে পারা যায়, মৃত্যুর আগে তাদের প্রত্যেককেই ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন ছিলেন বরেণ্য হৃদরোগ চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি। তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তার হৃদপিণ্ড উৎপাটন করা হয়েছিল। এই বুদ্ধিজীবীদের সকলেই স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। আত্মসমর্পণের দু'দিন আগে প্রায় সবাইকেই একটা কাদামাখা মাইক্রোবাসে তাদের বাসগৃহ থেকে তুলে নেয়া হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের এই অপারেশন পরিচালনা করেছিল 'আল্-বদর' নামে পাকিস্তানি একটি মিলিশিয়া বাহিনী। মূলত পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামি দলটির তরুণ শহুরে সদস্যদের দিয়ে এই খুনিবাহিনী গঠন করা হয়েছিল।[১৪-১৬] তবে জামায়াতে ইসলামি আল বদর বাহিনী গঠনে দলের সাংগঠনিকভাবে যুক্ত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। আল বদরেরাই বুদ্ধিজীবিদের থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তেমন কোন জোরালো প্রমান নেই।

সূত্র:

১. কাজী নূরুজ্জামান নির্বাচিত রচনা; সিরাজুল ইসলাম, সংহতি প্রকাশন, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ১৫

২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২।

৩. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১

৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২৯

৫. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫; অলি আহাদ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ঢাকা, চট্টগ্রাম, অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা: ৪৩৩-৪৩৫

৬. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৩৬

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ; মাসুদুল হক, মীরা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃষ্ঠা: ১৪০-১৪৩

৮. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৭৫

৯. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী ২০১২, পৃষ্ঠা: ২৯৩

১০. মূলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৯৬-১৯৭

১১. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৭৬-১৭৭

১২. রাজনীতির তিন কাল; মিজানুর রহমান চৌধুরী, অনন্যা, জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা: ১৩৯

১৩. দ্য গার্ডিয়ান; ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

১৪. 'আল্-বদর' গঠনের প্রামাণ্য দলিলটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন:

১৫. John Stone House, British Labour M.P. to P.T.I. in an interview in New Delhi (published in the Hindus Times on 21.12.1971)

১৬. বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা, দৈনিক বাংলা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রবাসী সরকার ও শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

> 'জাতীয় সরকারে'র দাবিকে অগ্রাহ্য করা হলো। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে যে সংহত ও ব্যাপকভিত্তিক ঐক্য সূচিত হতে পারতো শুরুতেই তা নস্যাৎ করা হলো। এই জাতীয় অর্জনকে একটি দলের কুক্ষিগত করে ফেলা হলো। প্রধানমন্ত্রী তখন তাজউদ্দীন আহমদ

> 'লৌ (রক্ত) আনছি লৌ (রক্ত), আর (আমার) লৌ (রক্ত) নিয়া আইছি, সেক সাবেরে দিমু'।

> মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দালাল হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত ড. কামাল হোসেন শেখ মুজিবের সাথে মঞ্চে উঠলে সমবেত জনতা উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে।[২৯]

> উত্তেজিত জনতাকে মোকাবিলা করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মুজিব বললেন: কামাল হোসেন আমার সাথেই জেলে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামাল হোসেন সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় পাকিস্তানেই ছিলেন।[২৯]

> মুজিব প্রশ্নের সুরে বললেন... আর জাতীয় সঙ্গীত? সুন্দর, কিন্তু জনপ্রিয় এই সঙ্গীতটি যে রক্ত টগবগানো নয়? জাতীয় সঙ্গীত তিনি মেনে নিয়েছিলেন দ্বিধা নিয়েই।[১৯]

সারা দেশ অপেক্ষায়, স্বাধীন বাঙলা সরকার এসে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তরফে সমন্বয়ের দায়িত্ব ছিল ডিপি ধরের। তিনি কলকাতায় এলেন ১৮ ডিসেম্বর। তখনো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কলকাতায়।

১৮ থেকে ২১ ডিসেম্বর বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার সঙ্গে তার আলাপ-আলোচনা চলে। বিভিন্ন বিষয় বাংলাদেশ মন্ত্রিসভার অনুরোধে এই আলোচনার মধ্যেই ভারতীয় সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। ঠিক হয় রাষ্ট্রযন্ত্র সচল করা ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্য ভারত সাহায্য করবে। ডিপি ধরের সঙ্গে আলাপ সেরে ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা বাংলাদেশে ফেরে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয় দিন পরে তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে একটা ডাকোটা বিমানে দেশে ফেরেন। ঢাকাবাসী মুজিবনগর সরকারকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা দেয়। কিন্তু স্বাধীন দেশে ফিরে আসার ক্ষেত্রে এই বিলম্বের কারণে দেশের মানুষের মধ্যে, বিশেষতঃ শহরে মধ্যবিত্ত সচেতন অংশের মধ্যে তারা কিছুটা সমালোচিত হন।[১]

একই দিনে পাকিস্তানের মিলানওয়ালি কারাগার থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্থানান্তর করে গৃহবন্দি রাখা হয়। ৩ জানুয়ারি করাচিতে আহূত এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলি ভুট্টো উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেন, তিনি যদি শেখ মুজিবকে শর্তহীনভাবে মুক্তি দেন তারা সেটা অনুমোদন করবেন কি-না? সমবেত জনতা উচ্চৈঃস্বরে তা সমর্থন করে।[৪]

আগের দিন, ২১ ডিসেম্বর ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ এক সংবাদ সম্মেলনে স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি মন্তব্য করেন, সব সংগ্রামী শক্তিকে আস্থায় নেয়া এবং তাদের কাজে লাগানো দরকার এবং একটি জাতীয় সরকারই কাজটি করতে পারে। সংগ্রামী শক্তি বলতে তিনি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি, মওলানা ভাসানীর দল ও বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস—এ পাঁচটি দলের নাম উল্লেখ করেন। তার এ বক্তব্য নিয়ে কিছুটা হইচই পড়ে যায়। আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো 'দাবিদার' আছে, এটা অনেকেই ভাবতে পারতেন না।

২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সমাজসেবা সম্পাদক কে এম ওবায়দুর রহমান সংবাদ সম্মেলন ডেকে বললেন, এই মুহূর্তে বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকার নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। এটা মানুষকে শুধু বিভ্রান্ত করবে।

সেদিন ঢাকায় অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের মাধ্যমে শুরু হয় নতুন

AIRPORT SPEECH

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ মিশন
নিউ দিল্লী

MISSION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
NEW DELHI

10th January 1972

Your Excellencies and friends,

For me this is a most gratifying moment. I decided to stop over in this historic capital of your great country, on my way to Bangladesh, for this is the least I could do to pay a personal tribute to the best friend of my people - the people of India and to your Government under the leadership of your magnificient Prime Minister Mrs. Indira Gandhi who is not only a leader of men, but also of mankind. You all have worked so untiringly and sacrificed so gallantly in making this journey possible.

This journey is a journey from darkness to light, from captivity to freedom, from desolation to hope. I am at last going back to Sonar Bangla, the land of my dreams, after a period of nine months. In these nine months my people have traversed centuries. When I was taken away from my people, they wept, when I was held in captivity they fought, and now when I go back to them they are victorious. I go back to the sun shine of their million victorious smiles. I go back now to a free, independent and sovereign Bangladesh. I go back to join my people in the tremendous tasks that now lie ahead, in turning our victory into the road of peace, progress and prosperity.

I go back, not with any hatred in my heart for anyone, but with the satisfaction that truth has at last triumphed over falsehood, sanity over insanity, courage over cowardice, justice over injustice and good over evil.

Joy Bangla - Jai Hind

চিত্র-কথন:

১০ জানুয়ারী ১৯৭২ দেশে ফেরার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধুর এয়ারপোর্টে দেয়া বক্তব্যের লিখিত টেক্সট। তিনি বলেছিলেন গত নয় মাসে আমার দেশবাসী শতাব্দী অতিক্রম করেছে। তিনি বলেছিলেন তিনি কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন না, তিনি বেইনসাফির বদলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য ফিরে যাচ্ছেন। বাস্তবে সেটা আর ঘটেনি।

ফটো: সংগৃহীত

চিত্র-কথন:

দেশে ফেরার আগের দিন লণ্ডনে হোটেলে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের সাথে শেখ মুজিব।

ফটো: সংগৃহীত

রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পথযাত্রা। মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা, স্টেট ব্যাংক-কে 'বাংলাদেশ ব্যাংক', মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত এবং প্রেস ট্রাস্ট বিলুপ্ত ও যুদ্ধ চলাকালে অনুষ্ঠিত সব একাডেমিক ও পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল বাতিল ঘোষণা করা হয়।[৫]

২৫ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গভবনে এক সংবাদ সম্মেলন করেন। প্রস্তাবিত জাতীয় সরকার সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেন, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'জাতীয় সরকার'ই গঠিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, পাঁচদলীয় উপদেষ্টা কমিটি বৈধ থাকবে এবং কমিটির সব সদস্য ঢাকায় ফিরে এলে এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।[২] তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই পাঁচদলীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সব মানুষের ঐক্যের শীর্ষবিন্দু মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে সদ্যস্বাধীন দেশে যে সংহত ও ব্যাপক ঐক্যের সূচনা হতে পারতো, শুরুতেই সেই সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে এই জাতীয় অর্জনকে একটি দলের কুক্ষিগত করে ফেলা হলো।

মধ্যবিত্তের উজ্জ্বল অংশের আকাঙ্ক্ষা ছিল অনেক তীব্র। প্রবাসী সরকারকে অবিলম্বে ঢাকায় এসে নতুন রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব নেবার জন্য অব্যাহতভাবে তাদের পক্ষ থেকে চাপ দেয়া হচ্ছিল। এমনকি এ ধরনের চাপ দেয়া হচ্ছিল পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে থেকেই। কিন্তু ভীরুতা এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় নেতারা 'বিপদ্সংকুল আর অনিশ্চিত পরিস্থিতি'র মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন।[৩]

১৯৭২-এর ১ জানুয়ারি সরকারি ব্যবস্থাপনায় শরণার্থীদের দেশে ফেরা শুরু হয়। ২৩ জানুয়ারির মধ্যে মোট ৯৮ লাখ ৯৩ হাজারের মধ্যে ৫০ লাখ শরণার্থী প্রত্যাবর্তন করে।[৬]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু সে আহ্বানে বিশেষ কোনো কাজ হলো না। অনেকেই তখন প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। বাড়ি, গাড়ি, দোকান, অফিস দখলের উৎসব চলছে।

সিরাজুল আলম খানের অনুসারী ছাত্রলীগের একদল কর্মী ডিসেম্বরের শেষদিকে পুরনো ঢাকার র‍্যাংকিন স্ট্রিটে 'জনতা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস্' দখল করে

নেয়। সেখান থেকে জামায়াতে ইসলামীর দৈনিক পত্রিকা 'সংগ্রাম' ছাপা হতো। এই দখল অপারেশনের নেতৃত্ব দেন ছাত্রলীগ নেতা আফতাব উদ্দিন আহমেদ। তিনি পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হয়েছিলেন। এই প্রেস থেকেই 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা ছাপা হতে থাকে, যা পরবর্তী সময়ে জাসদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত হয়।

শেখ ফজলুল হক মণির গ্রুপও পিছিয়ে থাকবেন কেন? তারাও দলবল নিয়ে 'দৈনিক পাকিস্তান' (যা পরে 'দৈনিক বাংলা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল) ও 'মর্নিং নিউজ' অফিস দখল করতে যান। ঘটনাক্রমে ওই সময় ভবনটির বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত তথ্যসচিব বাহাউদ্দিন চৌধুরী। তিনি শেখ মণিকে ধমক দিয়ে বলেন, 'খবরদার, আমি যতক্ষণ আছি, এক পা-ও এদিকে নয়।' শেখ মণি আর সামনে অগ্রসর হওয়ার সাহস পাননি। 'দৈনিক পাকিস্তান' ও 'মর্নিং নিউজ' রক্ষা পায়; কিন্তু কপাল পুড়লো উর্দু দৈনিক 'পাস্‌বান'-এর। তিনি উর্দু দৈনিক 'পাস্‌বান'-এর দখল নিলেন এবং সে নাম বদলে হলো 'বাংলার বাণী'। 'বাংলার বাণী' হয়ে উঠলো আওয়ামী লীগের মুখপত্র।[৭]

নতুন সরকার কাজ শুরু করলেও শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে সরকার ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং পরিচালিত হতে থাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবে।[৮]

ওদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ৮ জানুয়ারি ভোররাত তিনটায় রাওয়ালপিন্ডি বিমানবন্দরে শেখ মুজিবকে বিদায় জানান। সেদিন স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় তিনি লন্ডনে পৌঁছেন। তাঁর জন্য রেডক্রসের একটি বিমান ভাড়া করেছিল ভারত সরকার। কিন্তু সেই বিমানে তিনি পাকিস্তান ত্যাগ না করে প্রথমে লন্ডনে যেতে চান। নয় মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী না জানা পর্যন্ত তিনি ভারত প্রসঙ্গে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে চেয়েছিলেন।[৯] লন্ডন থেকে শেখ মুজিবুর রহমান টেলিফোনে কথা বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এড্‌ওয়ার্ড্ হিথ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে। লন্ডনে তিনি এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য দেন। হিথ্রো বিমানবন্দরে বিমান থেকে নামার পর প্রথম কথা হয় 'বিবিসি-ওয়ার্ল্ড সার্ভিস'-এর পূর্ব পাকিস্তান বিভাগের সিরাজুর রহমানের সঙ্গে। তিনি বিবিসি'তে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধবিষয়ক সংবাদসমূহের আন্তর্জাতিক পরিবেশনার সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে শেখ মুজিবকে বলে উঠলেন–

চিত্র-কথন:

উর্দু দৈনিক পাস্‌বান দখল করে শেখ ফজলুল হক মণি তার নাম বদলে রাখেন 'বাংলার বাণী'। 'বাংলার বাণী' হয় উঠলো আওয়ামী লীগের মুখপত্র। মামা শেখ মুজিবকে প্রকাশিত বাংলার বাণী পত্রিকা সোৎসাহে দেখাচ্ছেন শেখ মণি।

ফটো ক্রেডিট: বাংলার বাণী

আপনি প্রেসিডেন্ট হয়েছেন।

আমি আবার কিসের প্রেসিডেন্ট হলাম?

আপনি তো দেশে ছিলেন না মুজিব ভাই, আপনার নামে আমরা গোটা দেশকে একত্র করে ফেলেছি। আমরা দেশ স্বাধীন করে ফেলেছি।

শেখ মুজিব গভীর আবেগে সিরাজুর রহমানকে জড়িয়ে ধরলেন। জড়িয়ে ধরে হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন। দু'জনেই কাঁদছেন। এর মধ্যে আরো অনেকেই এলেন, জাকারিয়া খান চৌধুরী, প্রফেসর সুরাইয়া আলম প্রমুখ। সবাই ধীরে-সুস্থে তাঁর পাশে বসলেন। গল্পগুজব করতে করতে শেখ মুজিব বললেন যে, মুক্তিযুদ্ধ হলো, কিন্তু কীভাবে হলো? কীভাবে হলো সেটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো। তিনি জানতে চাইলেন, কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির একটা প্রাথমিক ধারণা দেয়ার পর শেখ মুজিব হতবাক! বললেন–

তুই তো ভয়াবহ কথা বলছিস। কত লোক মারা গেছেরে?

কত লোক মারা গেছে কেউ তো হিসাব করেনি। তবে বিভিন্ন মিডিয়া থেকে, বিদেশি সংবাদপত্রের যে সাংবাদিকরা যাচ্ছেন, ভারতীয় সাংবাদিকরা খবর দিচ্ছেন– সব মিলিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীকেও আমরা বলেছি, সাংবাদিকদেরও বলেছি, এ পর্যন্ত প্রায় তিন লাখ বাংলাদেশি মারা গেছে।[১০]

শেখ মুজিব লন্ডনে পৌঁছে তিন ঘণ্টা বিমানবন্দরে অবস্থান করেন। বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে বিস্তারিত আলাপ না করে বলেন, 'আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি সুস্থ আছি, বেঁচে আছি। এ মুহূর্তে আপনারা শুধু আমাকে দেখুন, কিছু শোনার আশা করবেন না। তাই এখন আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না। সম্ভবত আজকের পরে একটা বিবৃতি দিতে পারি।'[১১]

তিন ঘণ্টা পর শেখ মুজিব বিমানবন্দর থেকে ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে ওয়েস্ট এন্ড-এর ক্ল্যারিজেস্ হোটেলের উদ্দেশে রওয়ানা দেন। এই ক্ল্যারিজেস্ হোটেলেই প্রথম শেখ মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন।

সেখানে বসেই তাজউদ্দীনকে ফোন করা হয়। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে তিনি বলেন, 'হ্যালো, তাজউদ্দীন, আমি এখন সাংবাদিকদের দিয়ে পরিবেষ্টিত, আমি তাদের কাছে কী বলবো? আমার প্রিয় দেশবাসী কেমন আছে, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা কি আমার দেশবাসীকে হত্যা করেছে?'

জবাবে তাজউদ্দীন বলেন, 'বর্বর পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাংলাদেশের লাখ-

চিত্র-কথন:
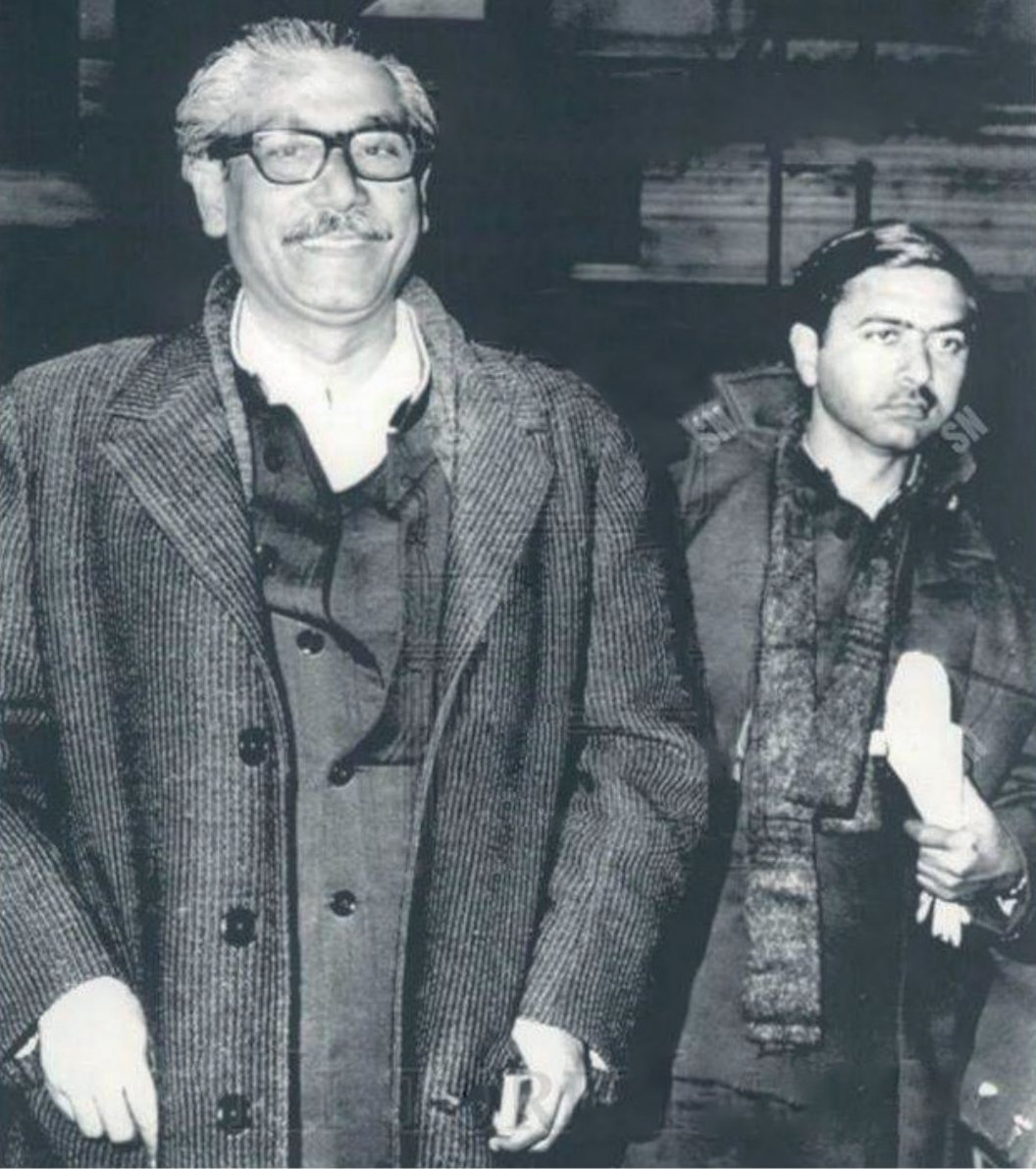
লন্ডনে পৌছে এয়ারপোর্ট থেকেই অভিজাত ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে পৌছেন শেখ মুজিব। হোটেলে ঢুকবার মুহূর্তে তোলা এই ছবিটাই বিশ্ব মিড়িয়ায় প্রকাশিত হয়। শেখ মুজিবের সাথে পাকিস্তান থেকেই আঠার মতো লেগে থাকা ড. কামাল হোসেনকে ভুল করে বাংলাদেশ মিশন প্রধান মি. কামাল হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। অবশ্য ঢাকায় পৌছে বিক্ষুব্ধ জনগণের সামনে শেখ মুজিবকে ড. কামাল হোসেনকে আরেক পরিচয়ে পরিচিত করতে হয়েছিল।

ফটো: সংগৃহীত

লাখ মানুষকে হত্যা করেছে এবং অসংখ্য লোককে দেশছাড়া করেছে'।[১২]

তিনি বলেন, 'আমি এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে রাজি নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।' শেখ মুজিব সাংবাদিকদের জানান, তিনি আগামীকাল বা পরের দিন ঢাকা ফিরবেন বলে আশা করছেন। বাংলাদেশ শিগ্‌গিরই জাতিসংঘে সদস্যপদের জন্য অনুরোধ করবে। বাংলাদেশের দাবিকে সমর্থনের জন্য ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড ও ফ্রান্সকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এখন অবিসংবাদিত সত্য এবং এদেশকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিতে হবে। আমি জানতাম বাংলাদেশ মুক্ত হবেই।'

লন্ডনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সম্মেলনকক্ষে প্রবেশের সময় শেখ মুজিব 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করেন। 'এটা জানতাম বাংলাদেশ মুক্ত হবেই। আমার দেশের লাখ-লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছে, নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়েছে। বেঁচে থাকলে হিটলারও লজ্জা পেত।'[১৩]

ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড্ ফ্রস্টের সাথে এক টিভি ইন্টারভিউয়ে তিনি প্রথম 'ত্রিশ লাখ' শহিদের কথা উল্লেখ করেন।[১৪] বাংলাদেশে ফিরে এসেও তিনি রেসকোর্সের ভাষণে শহিদ মানুষের সংখ্যা 'ত্রিশ লাখ' বলেছিলেন।[১৫]

তিন

দিল্লিতে ৮ জানুয়ারি, ১৯৭২-এর সূর্যোদয় হলো প্রাত্যহিক স্বাভাবিকতায়। সময়ের ব্যবধানে লন্ডনে তখন গভীর রাত। দুই মহাদেশ ভরা অন্ধকার চিরে পিআইএ'র বিশেষ বিমানটি তখন লন্ডনের পথে। দিল্লির চাণক্যপুরীর ছককাটা সুপ্রশস্ত রাজপথ, তাদের সদিচ্ছাবাহী নামফলকের সারি আর সুবিন্যস্ত উদ্যানরাজি কুয়াশার আবরণ থেকে ধীরে ধীরে চোখ মেলল। জনবিরল রাজপথে নির্ধারিত ক্রমিকতায় অবতীর্ণ হলো সাইকেল, স্কুটার, বাস আর সত্তরের দশকের দিল্লিতে আরোহীর বিত্ত কিংবা পদমর্যাদা অথবা দুয়েরই বার্তাসহ 'অ্যাম্বাসেডর' গাড়িতে উপবিষ্ট কর্মগামীদের ঝাঁক। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্যরা সচিবালয়ের নর্থ ব্লকের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সভা করছেন। সেখানে ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক চলছে। অকস্মাৎ সম্মেলন কক্ষের দরজাটি সশব্দে খুললেন মানি দীক্ষিত। চোখে-মুখে তার উত্তেজনার ছাপ। এইমাত্র খবর এসেছে শেখ মুজিব মুক্তি পেয়েছেন। খবর এসেছে, তিনি ইতোমধ্যে পাকিস্তান ত্যাগও করেছেন। ভেঙে গেল বৈঠক, সম্মেলন কক্ষ ভেঙে পড়লো

স্মরণে

চিত্র-কথন: একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা বনাম জাতীয় বিভাজন

’৭২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীন দেশে প্রথম ভাষা শহিদ দিবস। মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে নিয়ে আজিমপুর গোরস্থানে ভাষা শহিদদের কবর জিয়ারত করতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আরো অনেকের মতো তাগিদ ছিল তাঁরও। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনা স্বাধিকার আন্দোলনের পথকে অনুপ্রাণিত ও প্রশস্ত করেছিল।

ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভূমিকা অথবা সংযোগ ছিল না এমন তরুণ রাজনৈতিক নেতাকর্মীরাও পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের সুফলকে নিজেদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার সুফলা করে তোলার কাজে সফলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। সেই অর্থে এই আন্দোলন শুধু রাষ্ট্রভাষার দাবিকেই প্রতিষ্ঠা করেনি, সেকালের অনেক তরুণ নেতার রাজনৈতিক পরিস্ফূটন ও বিকাশে বিপুলভাবে সহায়তা করে সম্ভব করে তুলেছিল।

’৪৭-এর পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে ভাষা আন্দোলন ছিল এককভাবে সবচাইতে প্রভাব বিস্তারকারী ইস্যু। অতএব এই আন্দোলনে দূরে থাক আর যুক্ত থাক, সব রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরকেই এর প্রতি ভক্তি আর সহমর্মিতা প্রকাশ ও প্রদর্শন করে যেতে হয়েছে। ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের লক্ষ্য বাস্তবায়নের ইচ্ছা-অঙ্গীকার ব্যক্ত করতে হয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের মতো ’৭২ সালেও ভাষা শহিদদের স্বপ্ন ও আত্মত্যাগকে বাস্তবে রূপায়িত করার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

যুদ্ধজয়ী স্বাধীন রাষ্ট্রে সূচনাতে যে জাতীয় ঐক্যের প্রবল সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা ক্রমেই অদৃশ্য ও বিলীন হয়ে গেল।

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে।[১৬]

দু'দিন পর ১০ জানুয়ারি সকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দেয়া বিমানে তিনি নামেন দিল্লিতে। সেই অবিশ্বাস্য সকাল। পালাম বিমানবন্দর। আটটা বেজে দশ মিনিট। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রুপালি 'কমেট' বিমান। ধীরে ধীরে এসে সশব্দে সুস্থির। তার শব্দহীন কর্ণভেদী নীরবতা। সিঁড়ি লাগল। খুলে গেল দ্বার। দাঁড়িয়ে সহাস্যে, সুদর্শন, দীর্ঘকায়, ঋজু, নবীন দেশের রাষ্ট্রপতি। অকস্মাৎ এক নির্বাক জনতার ভাষাহীন জোয়ারের মুখোমুখি। সুউচ্চ কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন তিনি আবেগের বাঁধভাঙা দু'টি শব্দঃ জয় বাংলা! করতালি, উল্লাস, আলিঙ্গন, তারপর আবেগের অশ্রুতে এক মোহময় দৃশ্য।

সেই দিন বিমানবন্দরে হাজারো গণ্যমান্য মানুষের ভিড়েও জ্বলজ্বলে স্মৃতি হয়ে আছে গাঢ় ধূসর বর্ণের গলাবন্ধ স্যুট আর কালো ওভারকোট পরিহিত নবীন দেশের এই রাষ্ট্রপ্রধানের ছবি। শীতের হিমেল হাওয়ায় অসংখ্য সম্ভাষণ আর আলিঙ্গনে তাঁর ঘন কালো চুল কিছুটা অবিন্যস্ত। স্বাধীন বাংলাদেশের অভিজ্ঞতায় এই প্রথমবারের মতো দিল্লির আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হলো আমাদের রাষ্ট্রপতির সম্মানে একুশবার তোপধ্বনি। কুচকাওয়াজ পরিদর্শন। তারপর ব্রাসব্যান্ডে 'আমার সোনার বাংলা' আর 'জনগণ মন', দু'টি দেশকে উপহার দেয়া বাংলার এক অমর কবির দু'টি গানের সুমধুর সুর।

বিমানবন্দরে তাঁর আনুষ্ঠানিক ভাষণে তিনি ভারত এবং ভারতবাসীকে ধন্যবাদ জানালেন। 'আমার এই যাত্রা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় আপনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, করেছেন বীরোচিত আত্মত্যাগ।' তিনি স্মরণ করলেন তাঁর দেশবাসীকে। 'আমার মানুষের কাছ থেকে যখন আমাকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো, তারা কেঁদেছিল; আমি যখন কারাগারে, তারা চালিয়েছিল সংগ্রাম। আর আজ আমি যখন ফিরছি, তারা বিজয়ী।' তিনি বললেন, 'এই যাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিত্ব থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায়। নয় মাসের ব্যবধানের সেই সময়টুকুতেই আমার মানুষ শতাব্দী অতিক্রম করেছে। এই বিজয়কে শান্তি, প্রগতি আর উন্নতির পথে চালিত করতে আমি ফিরছি। এই সান্ত্বনায় ফিরছি যে, অবশেষে অসত্যের ওপর সত্যের, উন্মাদনার ওপর মঙ্গলের হয়েছে জয়।' বক্তৃতার সময়ে শেখ মুজিবের অশ্রুসিক্ত চোখ। সেই অশ্রুতে মিশে ছিল ভালোবাসা, গর্ব আর আনন্দ।[১৭]

দিল্লিতে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য হাজার-হাজার মানুষ তীব্র শীত উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ক্যান্টনমেন্ট প্যারেড গ্রাউন্ডের রাস্তায় অপেক্ষা করছিল। কিন্তু অনির্ধারিত পথে শেখ মুজিবের শোভাযাত্রা রাষ্ট্রপতি ভবনে

পৌঁছানোর কারণে অনেকেই তাঁকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন।[১৮]

সেই ভবনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। নয়াদিল্লিতে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ভাষণ দেন। তিনি প্রথমে ইংরেজিতে বলতে শুরু করলেও শ্রোতাদের দাবিতে ভাষণ শেষ করেন বাংলায়। তিনি বলেন, বাঙলার দুঃখ মোচনে ভারতের সাহায্য ও সহযোগিতা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।[১৮]

শেখ মুজিবকে নিয়ে প্লেন দিল্লি ছাড়লো। প্লেনে সহযাত্রী ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ, সপরিবারে কামাল হোসেন, ইন্স্যুরেন্স জগতে সুপরিচিত গোলাম মওলা, সাংবাদিক আতাউস সামাদ আর ফারুক চৌধুরী।[১৯]

'৭১-এ যুদ্ধকালীন পুরো নয় মাস টিক্কা-নিয়াজী-ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মোনায়েম খাঁর সাথে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার দালাল হিসেবে ড. কামাল হোসেনের নামটিও 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে ঘৃণাভরে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে এম আর আখতার মুকুল তার 'চরমপত্রে'র ভাষায় 'পাকিস্তানি জামাই কামাইল্লা'কে নিয়ে তিনটি 'চরমপত্র' পাঠ করেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও এম আর আখতার মুকুলের ভাগ্যে কোনো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার বা সম্মান জোটেনি।[২০]

'চরমপত্র' নামের সেই জনপ্রিয় কথিকা লেখক ও এর নাটকীয় পঠনের পাঠক এম আর আখতার মুকুল যে পরবর্তী সময়ে তাদেরই বঙ্গবন্ধু অর্থাৎ শেখ মুজিবের ধমক খেয়েছিলেন, তা তাদের আরেক প্রত্যক্ষদর্শী বন্ধু আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী তার এক লেখায় ফাঁস করে দিয়ে বলেছিলেন, 'মুকুল, তুই আর কোনো দিনই ফুটলি না-রে'।[২১]

ড. কামাল হোসেনকে শেখ মুজিবের সাথে নিয়ে আসার ঘটনা অনেকের মনেই প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। অনেকেই বলেছেন, 'শেখ মুজিবের পাশে ড. কামালকে কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছিল।'[২২]

প্লেনে শেখ মুজিবের বেশির ভাগ সময়ই কেটেছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের সঙ্গে একান্ত আলাপ-আলোচনায়।

> দেশের মানচিত্রসংবলিত জাতীয় পতাকা– বদলাই কী করে? শেখ মুজিবের জিজ্ঞাসা।
>
> অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এই ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক পদক্ষেপ হয়তো নিয়েছেন। ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে তার নাকি এ ব্যাপারে

> আলাপ-আলোচনা হয়েছে– উত্তরে বলা হলো।
>
> জাতীয় সঙ্গীত? সুন্দর, কিন্তু জনপ্রিয় এই সঙ্গীতের সুরটি যে রক্ত টগবগানো নয়? কিন্তু তবু তা মেনে নিতে হবে। লাখো শহিদের রক্তস্মৃতি জড়ানো এই গান– শেখ মুজিব বলেন। জাতীয় সঙ্গীত তিনি মেনে নিয়েছিলেন কিছুটা দ্বিধা নিয়েই।[১৯]

বিমানে শেখ মুজিবের সহযাত্রী বিবিসি'র সংবাদদাতা আতাউস সামাদ জানান, ঢাকা এয়ারপোর্টের আকাশে বিমানের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অসংখ্য মানুষ দেখে শেখ মুজিব কেঁদে ফেলে বললেন:[২৩]

> এত মানুষ এসেছে আমাকে দেখতে, এরা আমাকে এত ভালবাসে, কিন্তু আমি এদের খাওয়াবো কি করে?
>
> এ কথা কেন বলছেন? আতাউস সামাদ প্রশ্ন করেন।
>
> পাকিস্তানিরা সব খাদ্যগুদাম পুড়িয়ে দিয়েছে, দেশে তো খাবার নেই।
>
> এ কথা কীভাবে জানলেন? আমরা তো বাজারে চাল দেখে এসেছি।
>
> আমাকে যে ঢাকা থেকে লন্ডনে ফোন করে জানালো! শেখ মুজিব বিস্মিতভাবে বললেন।

দেশের নেতা দেশে ফেরার আগেই তাকে ভয় দেখানো হয়েছে যে, সদ্যস্বাধীন দেশ ও জাতি ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছে, কাজেই সাহায্য চাইতে হবে বহির্বিশ্বের কাছে। বস্তুতঃপক্ষে সরকারিভাবে আন্তর্জাতিক দরবারে সাহায্য চাইবার বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছিলেন। এই সাহায্য চাইবার নীতি ও ধরন নিয়ে উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের মাঝে বিভ্রান্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি।[২৩]

দিল্লি হয়ে শেখ মুজিব বাংলাদেশে ফিরছেন। এদিকে টিভি ও বেতারে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ (পরবর্তীকালে বিএনপি সরকারের মন্ত্রী) শেখ মুজিবের আগমন বার্তা ও সেই সাথে যথেচ্ছ গুণগান প্রচার করতে গিয়ে এমন সব তথ্য পরিবেশন করে যাচ্ছিলেন যার সাথে সত্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তিনি একপর্যায়ে কীভাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে ঢাকার রাজপথ রক্তে রঞ্জিত হচ্ছিল তারও ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অথচ শেখ মুজিব ওই সময় ভিন্ন মামলায় বন্দি হিসেবে ফরিদপুর কারাগারে।[২৪]

ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! আজ আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবকে যে 'ভাষা সংগ্রামী' বলেও দাবি করে, তার সূচনা হয়েছিল পরবর্তীকালে প্রভাবশালী

চিত্র-কথন:

প্রবাসী সরকার স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরার পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিমান বন্দরে কেবিনেটের মন্ত্রীদের উদ্দ্যেশে ভাষণ দিচ্ছেন।

ফটো: *সংগৃহীত*

রাজনৈতিক দল বিএনপি'র একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা মওদুদ আহমদের কণ্ঠেই।

তিনি ঢাকায় পৌঁছেন অপরাহ্নে।[২৫] শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তেজগাঁও বিমানবন্দরে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে অভ্যর্থনা দেয়ার জন্য তাজউদ্দীন সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছিল। মন্ত্রিসভার সবাই উপস্থিত ছিলেন। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত সব সেক্টর কমান্ডারকে এক সারিতে গ্যাংওয়েতে দাঁড় করানো হয়েছিল।[২৬]

অভ্যর্থনার মুহূর্তটি ছিল খুবই ভাবাবেগপূর্ণ। সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানকে দেখার জন্য, তাঁর সাথে করমর্দনের জন্য। ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খলই ছিল। প্লেন গ্যাংওয়েতে এসে থামার পর দরোজা খুলে দিলে শেখ মুজিবকে সরাসরি দেখামাত্র লক্ষ লোক জয়বাংলা! ধ্বনি দেয়।

ঠিক সেই মুহূর্তে আকস্মিকভাবে দুই ছাত্রনেতা খসরু ও মন্টু এবং শেখ মুজিবের এক দেহরক্ষী খাকি পোশাকে কোমরে পিস্তল বহন করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শেখ মুজিবকে আলিঙ্গন করে। এক্ষেত্রে সেদিন রাষ্ট্রীয় প্রটোকল রক্ষা করা হয়নি। দাপট ছিল ছাত্র নেতৃবৃন্দেরই। এ ঘটনা অশোভন এবং অমর্যাদাকর ছিল। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের মর্যাদাও ক্ষুণ্ন করা হয়েছিল।

সেদিনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণেও এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। নবীন রাষ্ট্রে রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ও স্বল্পশিক্ষিত এই ছাত্রনেতাদের প্রভাব যে অটুট থাকবে তার আভাস পাওয়া গেল।[২৬]

আনন্দে আত্মহারা লাখো মানুষ বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত তাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়। লাখো মানুষের ঢল চারিদিকে। প্রাণপ্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য সবাই ব্যাকুল। আবেগ-উদ্বেল জনতার ভেতর দিয়ে খোলা ট্রাকে মহানায়ক রেসকোর্সের ময়দানের দিকে যাত্রা করেন। অপ্রয়োজনীয়ভাবে খোলা ট্রাকে উদ্যত অস্ত্র হাতে তাকে 'পাহারা' দেয়ার বাহাদুরি নিচ্ছিলেন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের একটি শহুরে গ্রুপ। এর মধ্যে দু'জনের একজন ছিলেন রুপালি পর্দার নায়ক খসরু, অন্যজন মঞ্চের নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, যারা ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে নাটক আর সিনেমার পর্দাকেই অধিক আকর্ষণীয় বলে মনে করেছিলেন।

জনতার ভিড় ঠেলে সেদিন ধীর গতিতে ট্রাকটি রেসকোর্সে পৌঁছতে সময় নিয়েছিল আড়াই ঘণ্টা। মানে আজকের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে থেকে শাহ্‌বাগ মোড় পর্যন্ত সেদিন যেতে এত দীর্ঘ সময় লেগেছিল। মহাজ্যামের শহরে বসবাসকারী আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছে এটা অস্বাভাবিক মনে না–ও হতে পারে। এই সময়ের মধ্যেই ট্রাকে পাশে দাঁড়ানো আনন্দে উদ্বেল অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবো।'[২৭]

শেখ মুজিবকে বহনকারী ট্রাকটি উৎফুল্ল জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন সেই ট্রাকের সামনে ছিল সামরিক পোশাকপরা একদল লোক, যাদের হাতে ছিল দু'টি ছবি। একটি ছবি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর, আরেকটি ছিল ইন্দিরা গান্ধী এবং শেখ মুজিবের যৌথ ছবি; যেখানে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল মুণ্ডক উপনিষদের মন্ত্র, যা ভারতের রাষ্ট্রীয় নীতিবাক্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে: "সত্যমেব জয়তে", তার মানে– সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

বিকাল পাঁচটায় রেসকোর্স ময়দানে লাখো মানুষের সামনে ভাষণ দেন তিনি। সেদিনকার রেসকোর্স ময়দান ছিল লোকে-লোকারণ্য। কুয়াশা না কাটতেই জনস্রোত বয়ে আসছিল দূর-দূরান্ত থেকে, তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে একনজর দেখার জন্য। মাঠের উত্তরে মেয়েদের গেট দিয়ে প্রবেশ করছিলেন এক সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকরা বৃদ্ধাকে ঢুকতে বাধা দিলো। বৃদ্ধা তার মলিন ব্লাউজের ভেতর থেকে সযত্নে রাখা এক টুকরো শুকিয়ে যাওয়া রক্তমাখা কাপড় বের করে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'লৌ (রক্ত) আনছি লৌ (রক্ত), আর (আমার) লৌ (রক্ত) নিয়া আসছি, সেক সাবেরে দিমু।' বৃদ্ধার নাম করিমুন্নেছা, তার দুই ছেলে– আরাফাত আর কালাচান। দু'জনই ছিল আদমজী পাটকলের শ্রমিক। পাকিস্তানি বাহিনী তার এই দুই সন্তানকেই গুলি করে হত্যা করে। তার দুই প্রিয় সন্তানের বক্ষ বিদীর্ণ করে বাংলার শ্যামল মাটির ওপর দিয়ে যখন রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছিল তখন শেখ মুজিবের আহ্বানের কথা মনে হয়েছিল এই বৃদ্ধার– 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো, ইনশাআল্লাহ্‌।'

করিমুন্নেছা জানতেন, একদিন শেখ মুজিব স্বাধীন দেশে ফিরে আসবেন। তিনি পুত্রশোক ভুলে তার সন্তানের রক্তমাখা এই কাপড় সযত্নে তুলে রেখেছিলেন আত্মত্যাগের অকাট্য প্রমাণ প্রাণাধিক প্রিয় নেতার হাতে তুলে দেবার জন্য। আজ সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। করিমুন্নেছা পুত্রের 'লৌ' (রক্ত) দিয়ে অর্ঘ্য তুলে দেবেন তার প্রিয় নেতার হাতে।

করিমুন্নেছা অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কোন সুমায় আইবো। তারে দেখলে আমার সব দুক শেষ অইবো।'[২৮] শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন কোটি-কোটি বঞ্চিত মানুষের স্বপ্নের নেতা, যার অলৌকিক স্পর্শে তাদের সব দুঃখের অবসান হবে বলে তারা বিশ্বাস করেছিল।

রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভাস্থলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনার জন্য সকাল থেকেই মানুষের ঢল নেমেছিল। নতুন রাষ্ট্রের আনকোরা, অনভিজ্ঞ মন্ত্রীরা মঞ্চে উঠলেন। শেখ মুজিবের সাথে ড. কামাল হোসেনও মঞ্চে উঠলেন। কামাল হোসেন মঞ্চে উঠে দাঁড়ালে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদ জানায়। সে সময় শেখ মুজিব শেখ আব্দুল আজিজ, যিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং পরে মুজিব সরকারের তথ্য, কৃষি ও যোগাযোগ মন্ত্রী ছিলেন, তাকে বললেন–

> কামাল সম্পর্কে জনতাকে কি বলবো?
>
> তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই বলো, বললেন আব্দুল আজিজ। উল্লেখ্য, শেখ আব্দুল আজিজ শেখ মুজিবকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করতেন।
>
> ড. কামাল হোসেন আমার সাথে জেলে ছিল– এটা বলবো?
>
> তা-ই বলো। শেখ আব্দুল আজিজ ছোট করে উত্তর দিলেন।

শেখ মুজিব উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত জনতাকে বললেন–

> আপনারা গোলমাল করবেন না– কামাল হোসেন আমার সাথেই জেলে ছিল।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় কামাল হোসেন মুক্ত অবস্থায় পাকিস্তানেই অবস্থান করছিলেন।[২৯] এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দীন আহমেদ লিখেছেন, '... ঢাকায় যেদিন মুজিব ফিরে এলেন তার প্রথম কর্তব্যকাজ মনে হলো ড. কামাল হোসেনকে বাংলাদেশের বিরোধিতার অভিযোগ ও মুক্তিবাহিনীর সন্দেহ থেকে মুক্ত করা– যা তিনি প্রথম দিনকার জনসভায় বিচক্ষণতার সঙ্গেই করতে সক্ষম হয়েছিলেন।'[৩০]

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১৭ মিনিট জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। সেদিন জনতার উদ্দেশে শেখ মুজিব ঘোষণা দেন, 'রক্ত দিয়ে হলেও আমি বাঙালি জাতির এই ভালোবাসার ঋণ শোধ করে যাবো।'

মার্কসবাদে, মাওবাদে লাথি মার মুজিববাদ কায়েম কর
জয় মুজিববাদ

চিত্র-কথন: মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বনাম কায়েমি গোষ্ঠী

মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের তরুণ সমাজ, বিশেষত উচ্চশিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি কিংবা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি করেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে সত্যিকারের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ছাত্রসমাজের একাংশ সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনায় শামিল হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এই শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী তরুণরা স্বদেশ পুনর্গঠন এবং রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে তাদের সেই চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার বাস্তব ও প্রায়োগিক প্রতিফলন দেখতে চাইলো।

বিশ্বজোড়া তখন সমাজতন্ত্রের জয়-জয়কার! এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা এবং সমগ্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে তখন কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতবাদ-মতাদর্শের ঢল বয়ে চলেছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য এবং পশ্চাদ্‌পদ গণমানুষের প্রগতির পথে ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রতি হৃদয় কাঁপানো ভালোবাসাপূর্ণ আবেগ তৈরি করেছিল প্রায় সারা দুনিয়ায়। নব্য স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশেও তার ঢেউ এসে লেগেছিল।

১৯৫০-এর দশকে শুরু হয়ে '৬০-এর দশকে এসে তদানীন্তন পূর্ব বাঙলা কিংবা পূর্ব পাকিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের উদ্যোগে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ব্যাপক প্রচার-পরিচিতির বদৌলতে এদেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী তরুণ-তরুণীরা এই রাজনৈতিক ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

এরও বহু আগে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ওই শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালে প্রধানত দুইজন মহাপুরুষ সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন শিরাজী এবং কাজী নজরুল ইসলাম, তাঁদের জীবনব্যাপী সাধনা-সংগ্রাম ও প্রচারণায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের, বিশেষত অবহেলিত ও পিছিয়েপড়া মানুষকে প্রগতির মহাযাত্রায় বৈষম্যহীনভাবে শামিল করার লক্ষ্যে তরুণ ও যুবসমাজকে প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। যুদ্ধজয়ী তরুণ ও যুবসমাজ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছিল, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই তাদেরকে মুক্তির সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আর সে জন্য তাদের নানামুখী তৎপরতা, প্রয়াস-প্রচেষ্টা কিছু কম ছিল না।

কিন্তু ক্ষমতাসীন মহল শুরুতেই তাদের শত প্রতিশ্রুতি আর মন ভোলানো অঙ্গীকার জলাঞ্জলি দিয়ে কায়েমি স্বার্থবাদী চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করলো রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে। দুনিয়াজোড়া হতভাগ্য আর পিছিয়ে থাকা মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিল যে দুই মহাপুরুষের চিন্তাধারা– সেই কার্ল্ মার্ক্স্ আর মাও সেতুং-এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদ ও মতাদর্শের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে নেতিবাচক উক্তি ও প্রচারণা চালাতো শাসকদলের ছাত্র সংগঠন।

শাসকগোষ্ঠী তখন রাষ্ট্রক্ষমতাকে চিরস্থায়ীভাবে দখলে রাখার স্বপ্নে বিভোর– হাজির করেছিল 'মুজিববাদ' নামের অন্তঃসারশূন্য, তাৎপর্যহীন শ্লোগান; যার কোনো ওজনদার কিংবা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তারা জাতির সামনে পেশ করতে পারেনি।

অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে ছাত্র সংগঠন 'মুজিববাদ'-এর নামে কায়েমি গোষ্ঠীর গণবিরোধী ভয়ঙ্কর তৎপরতার পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল মানুষকে। তারা 'মুজিববাদ'কে পুঁজিবাদের নতুন রূপ বা সংস্করণ হিসেবেও উপস্থাপন করেছিল। রাজধানী ঢাকাতে দেয়াল-লিখনীতে ফুটে ওঠে সেই সব রাজনৈতিক আন্দোলন-তৎপরতার চিত্র।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালুকদার/দৃক
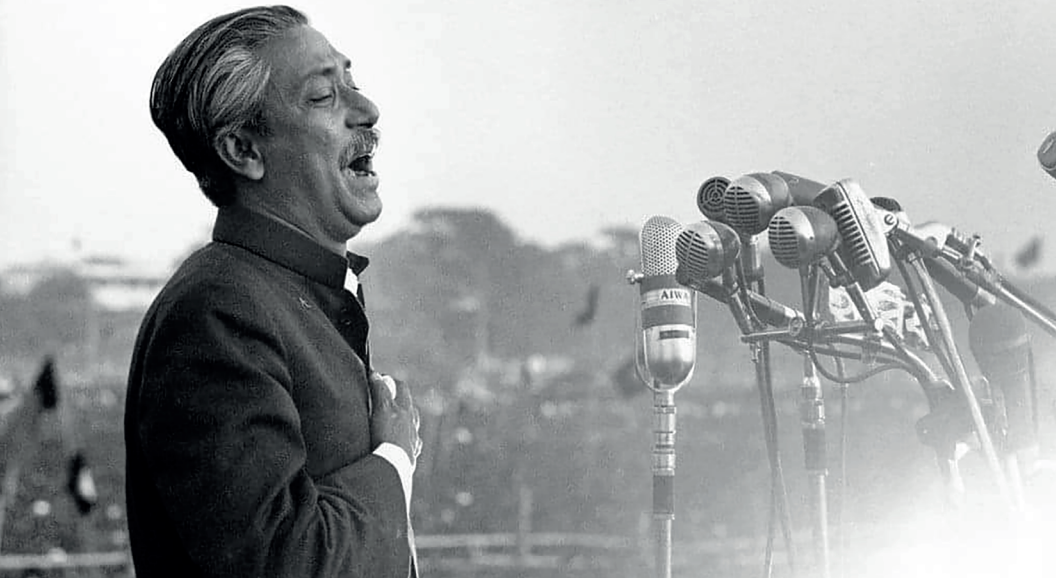
চিত্র-কথন:

ফটোগ্রাফার মেরিলিন সিলভারস্টোনের তোলা ছবি। জানুয়ারি ১০, ১৯৭২ এ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব রমনা রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভাষণ দেন। ভাষণের এক পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত বাঙালি গণহত্যার কথা উল্লেখ করতে যেয়ে বুকে হাত দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেন। ব্রিটিশ ফটোগ্রাফার মেরিলিন ঠিক সে সময়ের দৃশ্য ধারণ করে নেন। [৪১]

ফটো: ফিটোগ্রাফার মেরিলিন সিলভারস্টোন

কাঁদতে কাঁদতে তিনি সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করেন। দেশ গড়ার কাজে 'উদ্বুদ্ধ করেন' সবাইকে। দেশে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে দেশ শাসনের জন্য যে নেতার প্রয়োজন ছিল সেই শূন্যস্থান তিনি পূরণ করলেন দেশে ফিরে। তার জন্যেই সমগ্র জাতি প্রতীক্ষা করে ছিল।

রেসকোর্সের জনসভায় তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েন। ভাষণে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে–

"সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও, তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন

চিত্র-কথন:

১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালের সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান, সঙ্গে আছেন জাতীয় চার নেতা সহ অন্যান্যরাও

ফটো: রশীদ তালুকদার

করেছি। তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আজ ৭ কোটি বাঙালি যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে। হে বিশ্বকবি, তুমি আজ জীবিত থাকলে বাঙালির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে।'

ভাষণের একপর্যায়ে বলেন, 'আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। বলেছিলাম, আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান, মুসলমান একবার মরে, দুইবার মরে না। আমি বলেছিলাম, আমার মৃত্যু যদি এসে থাকে আমি হাসতে হাসতে যাবো। আমার বাঙালি জাতিকে অপমান করে যাবো না। তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইবো না এবং যাবার সময় বলে যাবো, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, বাঙালি আমার জাতি, বাংলা আমার ভাষা, বাংলার মাটি আমার স্থান।'

শেখ মুজিব রেসকোর্স ময়দানে সেদিন বলেছিলেন, 'এই বাংলাদেশে হবে

THE BANGLADESH
Sk. Mujib
is being
freed

চিত্র-কথন:

১৯৭২ সালের ৫ বা ৭ জানুয়ারি একটি খবরের কাগজে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর দেখতেছেন বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কোলে কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল।

ফটো: সংগৃহীত

সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা, এই বাংলাদেশে হবে গণতন্ত্র, এই বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।' শেখ মুজিবকে ফিরে পাওয়ার উন্মাদনায় সেদিন কারো মাথায় আসেনি, ধর্মনিরপেক্ষ– এই রাষ্ট্রীয় নীতির কথা কেউ এর আগে শোনেনি। তিনি বলেছিলেন, 'আজ আমার কারো বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নেই। একটা মানুষকেও তোমরা কিছু বলো না। অন্যায় যে করেছে তাকে সাজা দেবো। আইনশৃঙ্খলা তোমাদের হাতে নিও না।'

এই বক্তৃতায় তিনি অবাঙালিদের উদ্দেশ করে বলেন, 'যারা বাংলা জানে না, তোমাদের বলছি, তোমরা আজ থেকে বাঙালি হয়ে যাও।' যে বাঙালি জাতিবাদী আন্দোলনের ফল হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বলে দাবি করা হয়, সেই 'বাঙালি' বলতে শেখ মুজিব ঠিক কী বোঝাতে চাইতেন– বাংলাদেশের সীমান্ত বেষ্টনীতে সীমিত জনগোষ্ঠী ও খুবই সংকীর্ণ জাত্যাভিমানী বাঙালি গোষ্ঠী?[৩১]

অবশ্য এর পাশাপাশি তিনি দৃঢ়কণ্ঠে এক অজানা-অজ্ঞাত-কল্পিত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'তাদের নির্মূল করবেন, নিঃশেষ করবেন'। এমন ভীতিকর ভাষাও ব্যবহার করেন।[৩২]

সেদিন ঢাকা শহরে মুজিব অনুসারীরা একটা নতুন শ্লোগান দেয়– 'বিশ্বে এলো নতুন বাদ, মুজিববাদ-মুজিববাদ'।[৩৩] শেখ মুজিবের অতি উৎসাহী অনুসারীরা 'মুজিববাদ' কী জিনিস তা স্পষ্ট করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কয়েকদিন পরে সাংবাদিকেরা বাংলাদেশে শেখ মুজিবের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তাকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করেন, 'মুজিববাদ' কী? তিনি স্মিতহাস্যে প্রশ্নকারী সাংবাদিকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন: আমি এখন বলতে পারবো না।[৩৪]

শেখ মুজিবুর রহমান নিজে পরবর্তী সময়ে 'মুজিববাদ'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন বটে, তবে মুজিববাদ কী জিনিস তা তিনি মোটেই পরিষ্কার করতে পারেননি। 'মুজিববাদ' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: যদি 'মুজিববাদ'কে একটি আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তা ব্যাখ্যা করা উচিত দার্শনিকদের। তবে আমি 'মুজিববাদ' বলতে নিজে কী বুঝেছি সেটা বলতে পারি।

প্রথমত, আমি বিশ্বাস করি– গণতন্ত্রে, জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার বিজয়ে, চিন্তায়, স্বাধীনতায়, কথা বলার অধিকারে, যা কিছু মানবজীবনকে মহীয়ান করে তোলে।

গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি আমি এটাও মনে করি, গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য সমাজে যে শর্ত উপস্থিত থাকবে, তা হচ্ছে সমাজকে শোষণ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এই কারণেই গণতন্ত্রের পাশাপাশি আমি সমাজতন্ত্রের কথা বলি।

আমি এটাও মনে করি, বাংলাদেশে যতগুলো ধর্মের লোক আছে তাদের সমান অধিকার থাকা উচিত। আমি এটাকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলি। অর্থাৎ নিজের বিশ্বাসকে লালন করার অধিকার।

পরিশেষে জনগণকে বাংলার সমগ্র পরিবেশ থেকে, বাঙালি সংস্কৃতি, ভাষা ও লোকসংস্কৃতি থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করতে হবে। এই উদ্দীপনার জন্য বাঙালিরা সোনার বাংলা গড়ার স্বার্থে একসঙ্গে কাজে সামিল হবে। আমি এটাকেই জাতীয়তাবাদ বলে বুঝি।"[৩৫]

শেখ মুজিবের আগমন উপলক্ষে পরের দিন ছিল সরকারি ছুটি। সেদিন তাজউদ্দীনের সঙ্গে তার সংক্ষিপ্ত আলাপ হয় সরকার গঠন সম্পর্কে। তাজউদ্দীন নিজ থেকেই শেখ মুজিবকে জানান, তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে চলেছে, দেশে কী কী ঘটেছে, মানুষের মনোজগতে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, কী কী প্রত্যাশা আর স্বপ্ন জন্ম নিয়েছে, এসব বিষয়ে কিছু জরুরি কথা বলতে চান। দুর্ভাগ্য, সেই সব কথা বলার সুযোগ তাজউদ্দীনের আর কখনো আসেনি।[৩৬] তিনিও তাজউদ্দীনের কাছে একবারও জানতে চাননি, নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে চলেছিল। জানতে চাননি প্রবাসী সরকারের কথা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার কথা।[৩৭]

শেখ মুজিবের প্রথম সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৪ জানুয়ারি। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশে

বসবাসকারী সকলকেই 'বাঙালি' বলে অভিহিত করে বলেন, অবাঙালিদের অবশ্যই 'বাঙালি' হতে হবে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোনো বিশেষ চুক্তি হবে কি-না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমাদের বন্ধুত্বের চুক্তিটি আমাদের হৃদয়েই নিহিত আছে'। এখানেই ঘোষণা দেন, তিনি আর আওয়ামী লীগের সভাপতি থাকবেন না, যদিও এই প্রতিশ্রুতি তিনি পরে আর রক্ষা করেননি।[৩৮]

শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেশে ফিরলে ওরিয়ানা ফালাচি আবার ঢাকায় আসেন। এর মধ্যেই আউটার স্টেডিয়ামে কাদের সিদ্দিকীর বেয়োনেট চার্জ করে কয়েকজনকে হত্যার সংবাদ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে ছাপিয়েছেন ওরিয়ানা। পরপর দু'দিন শেখ মুজিবের সাক্ষাৎকার নেন তিনি। সাক্ষাৎকারসহ ওরিয়ানার কয়েক পাতার দীর্ঘ প্রতিবেদন ছাপা হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ ইতালীয় পত্রিকা 'ল ইউরোপিও'তে।

ফালাচি শেখ মুজিবকে তুলনা করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইতালির গণধিকৃত স্বৈরাচারী শাসক মুসোলিনির সঙ্গে। তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, অহংকারী বলেছেন, এমনকি উন্মাদ পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেননি। ২৬ মার্চ তিনি নিহত না হয়ে গ্রেপ্তার কেন হলেন– তার ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে ওরিয়ানা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর হয়তো কোন গোপন আঁতাত ছিল। ওরিয়ানার প্রতিবেদন পড়ে মনে হয়, শেখ মুজিব অত্যন্ত অসহিষ্ণু, ক্ষমতাদর্পী ও বদ্‌মেজাজের মানুষ ছিলেন। শেখ মুজিবের এক ভাগ্নে শমসের ওয়াদুদকে সাক্ষী দাঁড় করিয়ে ওরিয়ানা বলেছেন, 'ক্ষমতার লোভে লোকটা পাগল হয়ে গেছে'।

ওরিয়ানা লিখেছেন, এই রিপোর্টের কারণে 'মুক্তিবাহিনী'র ক্রোধ এড়িয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বিমানে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পাঁচজন অস্ট্রেলীয় ও দু'জন ভারতীয় তাকে সাহায্য করেছিল।[৩৯]

পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত মুজিবের আরেকটি সাক্ষাৎকারে ওরিয়ানা শেখ মুজিবকে উদ্ধত ও তার দেখা সবচেয়ে মূঢ় মানুষ হিসেবে তুলে ধরেছেন।[৪০]

সূত্র:

১. মূলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০

২. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৬১

৩. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ ,জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২-৩

৪. বাংলাদেশ অবজারভার; ৩ জানুয়ারি, ১৯৭২

৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২৯

৬. বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-১৯৭৫; হালিম দাদ খান, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা: ২৭

৭. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি, মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৬২-৬৩

৮. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, অনূদিতঃ জগলুল আলম, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৪

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৫

১০. সিরাজুর রহমানের ভিডিও সাক্ষাৎকারটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন–

১১. দৈনিক বাংলা; ৯ জানুয়ারি ১৯৭২

১২. ইত্তেফাক; রবিবার, ২৪ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ৯ জানুয়ারি ১৯৭২

১৩. বঙ্গবন্ধু মুক্ত : ৮ জানুয়ারি সবার চোখ ছিল লন্ডনে; উদিসা ইসলাম, বাংলা ট্রিবিউন, ৮ জানুয়ারি ২০২০

১৪. The David Frost Show, WNEW-TV, New York on January 18, 1972

১৫. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৬৭

১৬. জীবনের বালুকাবেলায়; ফারুক চৌধুরী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৯৭

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৯৮

১৮. ইত্তেফাক; মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

১৯. জীবনের বালুকাবেলায়; ফারুক চৌধুরী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ২০২

২০. রাজনীতি, হত্যা ও বিভ্রান্ত জাতি; রইসউদ্দিন আরিফ, পাঠক সমাবেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃষ্ঠা: ১৩১-১৩২

২১. মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাস; সাংবাদিক গোলাম মহিউদ্দিন, ঝিনুক প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৪১-৪২

২২. মুক্তিযুদ্ধের দিন দিনান্ত; ড. সা'দত হুসাইন (সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব), মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১১৮

২৩. 'বাংলাদেশ : দুই দশকের রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় সাংবাদিক আতাউস সামাদ; ২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ এবং Bangladesh : Past two decades and the current decade; Qazi Khaliquzzaman Ahmad (Editor); Bangladesh Unnayan Parishad (BUP) - June, 1994; P. 456-458

২৪. সাবেক প্রধানমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের সাক্ষাৎকার, ভাষা আন্দোলন : সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন; মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭; পৃষ্ঠা ১৪৩

২৫. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৮০

২৬. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : একজন সেক্টর কমান্ডারের স্মৃতিকথা; কর্নেল (অব.) কাজী নুরুজ্জামান, অবসর প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৯

২৭. তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা; শারমিন আহমেদ, ঐতিহ্য প্রকাশনী, ডিসেম্বর ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১০৪

২৮. দৈনিক বাংলা, মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

২৯. রাজনীতির সেকাল ও একাল; শেখ আবদুল আজিজ (আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং মুজিব সরকারের তথ্য, কৃষি ও যোগাযোগ মন্ত্রী), দি স্কাই পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২৮৫

৩০. স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর; কামরুদ্দীন আহমদ (প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত), ধ্রুপদ সাহিত্যাঙ্গন, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১৫১

৩১. ইত্তেফাক; মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

৩২. অবরুদ্ধ নয়মাস; আতাউর রহমান খান, নওরোজ কিতাবিস্তান, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ৮০

৩৩. পূর্বদেশ; মঙ্গলবার, ২৬ পৌষ ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ, ১১ জানুয়ারি ১৯৭২

৩৪. বাংলাদেশ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার, শেখ মুজিবুর রহমান; সম্পাদনা: আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী, ১৭ মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৬১৬

৩৫. Mujib as quoted in Mohammed M Khan and Habib M Zafarullah eds, Politics and Bureaucracy in New Nation: Bangladesh (Dhaka: Centre for Public administration, ১৯৮০, ৮৬-৮৭ হতে ইংরেজি থেকে অনূদিত

৩৬. মুলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, মার্চ ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১৫-২১৬

৩৭. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৮১

৩৮. বাংলাদেশ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বিবৃতি, বাণী, নির্দেশ ও সাক্ষাৎকার, শেখ মুজিবুর রহমান; সম্পাদনা: আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক প্রমুখ, বঙ্গবন্ধু ললিতকলা একাডেমী, ১৭ মার্চ ২০১৭, পৃষ্ঠা: ৬১৬-৬২২

৩৯. বঙ্গবন্ধু ও ওরিয়ানা ফালাচি; হাসান ফেরদৌস, প্রথম আলো, ২৩ মার্চ ২০১২। ওরিয়ানা ফালাচির নেয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকারটির লিংক নিচে দেয়া হলো: https://www.somewhereinblog.net/blog/mahbubmoreblog/28791687

৪০. Oriana Fallaci: The Rolling Stone Interview; How to uncloth an emperor: A talk with the greatest political interviewer of modern times. -Jonathan Cott. To view this Interview Scan the QR Code:

৪১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের অপ্রকাশিত লোগোহীন রঙিন ফুটেজের ভিডিওটি দেখতে নিচের কিওআর কোডটি স্ক্যান করুন:

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রণাঙ্গন থেকে ফেরা মুক্তিযোদ্ধারা

আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মাঠের সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেননি। অথচ তারাই 'স্বাধীনতার বীরপুরুষ'।[১]

যুদ্ধ করেছে কৃষক-শ্রমিকের সন্তান, কিছু মধ্যবিত্ত যুবক এবং ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সৈনিকরা।[১]

মুক্তিযুদ্ধ শেষ, মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। তারা কেউ হারিয়েছে স্বজন, কারো কারো বসতভিটা ভস্মীভূত, সহযোদ্ধারা কেউ শহিদ, কেউবা পঙ্গু। কেউ গিয়েছিল কলেজের বই-খাতা ফেলে, কেউ গিয়েছিল তার জমিজমা, কৃষিকাজ ফেলে, শ্রমিক গিয়েছিল কারখানার কাজ ফেলে, উদ্দীপ্ত যুবক গিয়েছিল তার জীবন-জীবিকার চিন্তা ভুলে। এখন দেশ স্বাধীন, হাতে অস্ত্র। কী করবে তারা? ফিরে যাবে আগের কাজে? এই মুক্তিযোদ্ধাদের কীভাবে নতুন দেশ গড়ার কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়।

চিত্র-কথন:

ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশিরা বিজয়ের পর দেশে ফিরছে। ছবিটি বেনাপোল সীমান্তের পেট্রাপোল সীমান্ত থেকে তোলা।

ফটো: অমিয় তরফদার, পশ্চিমবঙ্গের আলোকচিত্রী/সংগৃহীত

তাজউদ্দীন আহমদ চেয়েছিলেন 'মুক্তিবাহিনী'র সবাইকে 'ন্যাশনাল মিলিশিয়া'তে অন্তর্ভুক্ত করবেন। অবলুপ্ত ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স্ বা ইপিআরের সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী। তাদের দু'টি মুখ্য দায়িত্ব হবে সীমান্ত পাহারা দেয়া এবং অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ বাহিনীকে সহায়তা করা। ইপিআরের বেশির ভাগ সদস্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বীরবিক্রমে লড়াই করেছেন।[১]

মিলিশিয়া গঠনের যে পরিকল্পনা তাজউদ্দীনের মাথায় ছিল, তা একেবারে ভিন্ন। তিনি ভেবেছিলেন, তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত সকল মুক্তিযোদ্ধা সারা দেশের নির্দিষ্ট ক্যাম্পে এসে নিজেদের নিবন্ধনশেষে অস্ত্র জমা দেবেন। পরে সেই অস্ত্র পুনর্বণ্টন করা হবে। এই মিলিশিয়াদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেয়া হবে। বিশাল আকারের সেনাবাহিনী গড়ে না তুলে সেনাবাহিনীকে 'মিলিশিয়া বাহিনী'র সঙ্গে সমন্বিত করে দেয়া হবে।[২]

চিত্র-কথন:

বিজয়ের প্রাক্কালে রণাঙ্গন থেকে ফেরা মুক্তিযোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরে এভাবেই কেঁদে ফেলেন অবরুদ্ধ ঢাকার বাসিন্দারা। দেশের কৃষক-শ্রমিকের সন্তান, কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক এবং ইপিআর ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা মাঠের সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেননি। সশস্ত্র সংগ্রামের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও তারাই 'স্বাধীনতার বীরপুরুষ' হিসেবে নিজেদের মহিমা প্রচার করেন।

ফটো: সংগৃহীত

১৯৭২-এর ২ জানুয়ারি তাজউদ্দীন আহমদকে চেয়ারম্যান করে ১১ সদস্যের একটি 'জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ড' গঠন করা হয়। মওলানা ভাসানী, মণি সিংহ এবং মোজাফ্ফর আহমেদ সেই বোর্ডের সদস্য ছিলেন।[৩] সরকার মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের কাজও শুরু করে। ১০-১৫ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে এই বাহিনীতে নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের সেনাবাহিনীতে নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু জেনারেল ওসমানী এই সব মুক্তিযোদ্ধাকে দুর্বল প্রশিক্ষণের কারণে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করেন। ছাত্র-মুক্তিযোদ্ধাদের বৃহৎ অংশ আবার পড়াশোনায় ফিরে যায়।[৪]

নিয়মিত বাহিনীর বাইরে 'মুক্তিবাহিনী' হিসেবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল ৮৪ হাজার জনকে; 'মুজিববাহিনী'র সদস্য সংখ্যা ছিল আরো ১০ হাজার। ছাত্র

চিত্র-কথন: স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠানসর্বস্ব অস্ত্র সমর্পণ করছে ন্যাপ সিপিবি ও ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনীর কমান্ড্যার ন্যাপ নেতা পঙ্কজ ভট্টাচার্য। শেখ মুজিবের পাশে দাড়িয়ে আছেন কমরেড ফরহাদ।

'৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর '৭২-এর প্রথমদিকে ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিযোদ্ধাদের 'অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান'-এর আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সেদিন এই অনুষ্ঠানসর্বস্ব সমর্পিত অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন অল্প কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেদিনের অস্ত্র সমর্পণকারী মুক্তিযোদ্ধাসহ সারা দেশে বৃহদাংশ মুক্তিযোদ্ধা এবং আদৌ মুক্তিযোদ্ধা নয়, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একেবারেই সম্পর্কবিহীন অস্ত্রধারী 'মুক্তিযোদ্ধা' নামধারী তরুণ-যুবকরা তাদের

হাতে এক থেকে একাধিক কিংবা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাগুলি জমা করে রেখেছিল। দলীয় ও গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা পারিবারিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব এবং আধিপত্য আর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দীর্ঘস্থায়ী ভয়ঙ্কর তৎপরতা ও তাণ্ডবলীলায় সে সব আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাগুলির অপব্যবহার হয়েছিল।

স্বাধীন দেশে মুজিব সরকার এই লোক দেখানো সমর্পিত যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করে কতটা তৃপ্তি আর স্বস্তিবোধ করেছিল তার চেয়ে বড় কথা, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী এবং তাদের আশীর্বাদপুষ্ট লোকজন তাদের হাতে-ভাণ্ডারে মজুত সেই সব যুদ্ধাস্ত্রে গড়ে তুলেছিল বহুসংখ্যক 'প্রাইভেট বাহিনী'। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের *পট পরিবর্তনের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত এসব 'প্রাইভেট বাহিনী'র* তৎপরতা অব্যাহত *ছিল।*

সেই সাথে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি এবং বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তিবিশেষের হাতেও ছিল এসব যুদ্ধাস্ত্র। আর ছিল তাদের অপ্রতিহত তৎপরতা।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালকুদার/দৃক

ইউনিয়ন, ন্যাপ, সিপিবির ট্রেনিং নেয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিল ১৯ হাজার।[৫] এদের প্রায় সবাইকে অস্ত্র দেয়া হয়েছিল। ভারতীয় বাহিনীর সূত্র অনুসারে, নিয়মিত বাহিনী বাদেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় দেড় লাখ হাতিয়ার দেয়া হয়েছিল, যদিও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয়ই থাকে।[৬]

প্রশিক্ষণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বাছাইয়ের শর্তকে, যেমন শারীরিক যোগ্যতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংগ্রামী স্পৃহাকে শিথিলভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনীতির সুবিধার জন্য আওয়ামী লীগের নেতারা নিজ এলাকার ছেলেদের মুক্তিবাহিনীতে ঢোকানোর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাতেন। এই কারণেই মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে এদের বড় অংশই লড়াই থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকে। তারা দুঃখজনকভাবে ব্যক্তিগত রেষারেষি নিষ্পত্তিতে, এমনকি সরাসরি লুটতরাজে অংশগ্রহণ করে।[৭]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর দায়িত্বে পরিচালিত মুক্তিবাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল চার সপ্তাহ। এই স্বল্প সময়ে মাত্র হাল্কা অস্ত্র ও বিস্ফোরক ব্যবহার শেখানো সম্ভব হতো। সামরিক প্রশিক্ষণ মে মাসের শেষদিকে আরম্ভ হয়।[৮] বাছাই করা যুবকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়। দেরাদুনে সিগন্যাল এবং আসাম ও নাগাল্যান্ডে কমান্ডো ট্রেনিং দেয়া হয়। নৌ ও বিমান সৈনিকদের জন্যও প্রশিক্ষণের পৃথক ব্যবস্থা ছিল।[৯] এ প্রসঙ্গে সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিক-উল-ইসলাম লিখেছেন, 'আমাদের সব প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল গুণগত নয়, সংখ্যাগত দিক দিয়ে কি করে আরো বেশি লোক গড়ে তোলা যায়। প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সামগ্রীর সরবরাহ এবং ট্রেনিংয়ের জন্য আমাদেরকে পুরোপুরি ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভর করতে হতো।'[১০]

দেশের কৃষক-শ্রমিকের সন্তান, কিছু মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবক এবং ইপিআর ও ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেও আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা মাঠের সক্রিয় যুদ্ধে অংশ নেননি। সশস্ত্র সংগ্রামের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকলেও তারাই 'স্বাধীনতার বীরপুরুষ' হিসেবে নিজেদের মহিমা প্রচার করেন।[১১]

শেখ মুজিব দেশে ফিরেই মিলিশিয়া বাহিনীর জন্য তাজউদ্দীন যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে পরিবর্তন আনেন। তিনি অস্ত্র পুনর্বণ্টন না করে প্রথমেই

তাদের নিরস্ত্র করার পরিকল্পনা নেন। ১৭ জানুয়ারি তিনি ১০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা অফিসারের কাছে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন, এই ঘোষিত দশ দিন পরে কারো কাছে অস্ত্র পাওয়া গেলে তা বেআইনি অস্ত্র বলে বিবেচিত হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতা, আগ্রহ আর মেধা অনুযায়ী তাদের প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং দেশের উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক অন্যান্য সংস্থায় চাকরি দেয়া হবে। মুক্তিযোদ্ধারা সন্দেহ করতে থাকে যে, চাকরি ও প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে সরকার তাদের অস্ত্রশস্ত্র হাত করতে চাইছে এবং এই অস্ত্রশস্ত্র হারালে মুক্তিযোদ্ধারা 'ক্ষমতাহীন' হয়ে যাবে।[১২] মুক্তিযোদ্ধাদের এই আশঙ্কা স্বাভাবিক ছিল। কারণ ২৫ ডিসেম্বর তাজউদ্দীন ঘোষণা দিয়েছিলেন, মুক্তিবাহিনীকে নিরস্ত্র করার প্রশ্নই আসে না। কয়েক দিন বাদেই সম্পূর্ণ উল্টো এক নির্দেশ সংশ্লিষ্ট সকলকে বিভ্রান্ত আর সন্দেহপ্রবণ করে তোলাই স্বাভাবিক ছিল।[১৩]

এ কারণেই মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ্যেই অস্ত্র সমর্পণের বিরোধিতা করতে থাকে। ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় এক প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্ত্র সমর্পণের আয়োজন করা হয়। কিন্তু প্রকাশ্যেই মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগ সদস্যই অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করে। খুব সামান্য অস্ত্র জমা পড়ে। আর যে সব অস্ত্র জমা পড়ে তার একটা বড় অংশ ছিল নষ্ট, অচল কিংবা ব্যবহারের অনুপযুক্ত।[১৪] অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠানে আবদুল কাদের সিদ্দিকী বলেন, 'যে নেতার আদেশে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলাম, সে নেতার হাতেই তা ফিরিয়ে দিলাম।' মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শেখ মুজিব বলেন, 'আমি তোমাদের তিন বছর কিছু দিতে পারবো না। আরো তিন বছর যুদ্ধ চললে তোমরা যুদ্ধ করতে না?' উত্তরঃ করতাম-করতাম।

মুজিব বললেনঃ তাহলে মনে করো যুদ্ধ চলছে, তিন বছর যুদ্ধ চলবে। সেই যুদ্ধ দেশ গড়ার যুদ্ধ। অস্ত্র হবে লাঙ্গল আর কোদাল।[১৫]

১৯৭২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'মুক্তিবাহিনী' ও ২৭ ফেব্রুয়ারি 'মুজিববাহিনী'সহ সকল বাহিনী বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধারা সাকুল্যে যা পেয়েছিলেন তা হচ্ছে– সরকারি ও আধা সরকারি চাকরিতে কোটা ও প্রমোশন, কিছু প্রশ্নবিদ্ধ সামরিক খেতাব আর একটি ফাউন্ডেশন বা কল্যাণ ট্রাস্ট। এভাবে তাদের পরিচিতি এবং যে আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল এবং তাদের মনে জাতি গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল তা সমাহিত হয়ে যায়।[১৬]

একটা অদ্ভুত বিষয় হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা কারো জানা ছিল না। চাকরিতে কোটা ও প্রমোশনের যেহেতু সুযোগ ছিল, তাই এক সময় পথে-ঘাটে

'মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট' বিক্রি হতে থাকলো। অসংখ্য 'ভুয়া সার্টিফিকেট'ও ইস্যু করা হলো।[১৭]

এদিকে অস্ত্র সমর্পণের পরিকল্পনা ঠিকমতো বাস্তবায়ন হলো না। এমনকি শেখ মুজিবের নিজের দলের লোকজনই অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। তারা যুক্তি দেখান, 'প্রতিপক্ষ' অস্ত্র সমর্পণ করার আগে নিজেদের অস্ত্র সমর্পণ করাটা নিরাপদ নয়। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হতাশ হয়ে সমাজবিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়েন। কেউ কেউ ডাকাতি, ছিনতাইয়ে, কেউ কেউ সম্পত্তি আত্মসাৎ, খুন, হাইজ্যাক, অপহরণে লিপ্ত হয়ে পড়েন। পুলিশ ফাঁড়ি ও বাজার লুট, গাড়ি হাইজ্যাক, যুবতী নারী অপহরণ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।[১৮]

সূত্র:

১. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১

২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৫৪

৩. বাংলাদেশ অবজারভার; ৩ জানুয়ারি ১৯৭২

৪. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১৫-১৬

৫. সময়ের কণ্ঠস্বর; অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, আলোঘর, আগস্ট ২০১৭, পৃষ্ঠা: ১৫

৬. মূলধারা '৭১; মঈদুল হাসান, ইউপিএল, ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১৯৫

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২১

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০

৯. Pakistan's Crisis in Leadership; F.M. Khan, page: 96

১০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র; দশম খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে হাক্কানী পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা: ৬-৭

১১. বাংলাদেশের রাজনীতির হিসাব নিকাশ; বদরুদ্দিন উমর, আফসার ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা: ৪৭-৪৮

১২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৬

১৩. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৩০

১৪. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, ইউপিএল, পৃষ্ঠা: ৫৭

১৫. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৩১

১৬. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৫৭

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১০৯

১৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বীরাঙ্গনা

> মুক্তিযুদ্ধের মতো ঘটনাও সমাজের চিন্তা কাঠামোতে পরিবর্তন আনতে পারেনি। নারীর অবদানকে অস্বীকার করা হয়েছে।
>
> 'যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে ধর্ষিত নারীদের আলাদা শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এটা ন্যায্য ব্যবস্থা হয়নি।[১]
>
> এই নারীদের 'বীরাঙ্গনা' বলে যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে শেখ মুজিবের অমানবিক ও অনৈতিক মনোভাব 'বীরাঙ্গনা'দের সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থানকেই ফুটিয়ে তুলেছিল।

সারা দেশে পাকসেনাদের ঘাঁটি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অসংখ্য ধর্ষিত ও বন্দি নারীকে। পাক মিলিটারি তাদেরকে দেশের নানা জায়গা থেকে তুলে এনেছিল। নয় মাসের অবর্ণনীয় অত্যাচারের চিহ্ন সবার শরীরে। কেউ কেউ গর্ভবতী। সবাইকেই সাধ্যমতো চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। কারো কারো গর্ভপাত করানো হয়েছে। যে সব নারীর গর্ভপাত করা যায়নি, সে সব নারীর সন্তান প্রসব করানো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এগিয়ে এসেছে। কিছু কিছু যুদ্ধশিশুকে তারা নিয়ে যাচ্ছেন তাদের দেশে দত্তক হিসেবে। এই নারীরা তাদের স্বজনদের কাছে ফিরতে উন্মুখ।

সরকার এই নির্যাতিত নারীদের নাম দিয়েছে 'বীরাঙ্গনা'। যদিও 'বীরাঙ্গনা' ও 'ধর্ষিতা' শব্দদ্বয় কোনোভাবেই সমার্থক নয়। এই দুই শব্দের মধ্যে রয়েছে মৌলিক তফাৎ। 'বীরাঙ্গনা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বীরযোদ্ধা অর্থাৎ অসম সাহসী নারী। ধর্ষিতা শব্দের অর্থ পাশবিক নির্যাতন বা যৌন নির্যাতনের শিকার অর্থাৎ শারীরিক ক্ষতির সাথে সম্মানহানী ঘটেছে যে নারীর।[১]

১৯৭২ সালের এক বিষণ্ন প্রহরে ঢাকার বীরাঙ্গনা পুনর্বাসন কেন্দ্রে একজন বীরাঙ্গনার বাবা তার মেয়েকে দেখতে এসেছেন। গত এক বছরে আমূল বদলে গেছে অনেক কিছুই; বাবা আরো বুড়ো হয়েছেন।

মেয়ে উদ্গত কান্না রুখ্তে রুখ্তে কোনোমতে দৌড়ে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরলো, বাবাও দুই হাতে শক্ত করে তার কন্যাকে জড়িয়ে ধরলেন, অঝোরে কাঁদছেন দু'জনেই। কিছুদিন আগে এভাবেই একদিন বীরাঙ্গনারাও শেখ মুজিবকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেদিন তারা কেঁদেছিলেন। তাঁদের চোখের জলে শেখ মুজিবের বুক ভিজে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন:

> তোরা আমার মা, জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করেছিস। তোরা শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা। আমি আছি, তোদের চিন্তা কী?

শেখ মুজিবের প্রশস্ত বুকে অশ্রুপাত করে বীরাঙ্গনারা অন্তত সান্ত্বনা পেয়েছিল। আজ এক বীরাঙ্গনা কাঁদতে কাঁদতে তার নিজের বাবার বুকে আশ্রয় খুঁজছে। অথচ বাবার বুকে সেই উত্তাপ নেই। কান্না থামিয়ে মুখ তুলে বীরাঙ্গনা জানতে চাইলো:

> বাবা, এখনই কি তোমার সঙ্গে আমি যাবো? অফিসে বলতে হবে।

বাবা একটু থেমে ইতস্তত করে বললেন:

> না মা, আজ তোকে আমি নিতে পারবো না। বাড়িঘর মেরামত হচ্ছে। তোর মাও দেশে ফিরে এসেছে। তোর ছোটবোন বাড়ি আসবে জামাইকে নিয়ে। ওরা চলে গেলে, আমি তোকে নিয়ে যাবো।

আস্তে করে বাবার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলো এই বীরাঙ্গনা। বুকফাটা কান্না চেপে প্রিয়তম বাবার মুখপানে চেয়ে বললো:

> ঠিক আছে বাবা, তুমি আর কষ্ট করে এসো না।

বাবা 'না! না!' বলে আম্‌তা-আম্‌তা করতে লাগলেন। বীরাঙ্গনার হাতে একটি ফলের ঠোঙ্গা ধরিয়ে দিলেন বাবা। ওটা স্পর্শ করতে মন চায়নি বীরাঙ্গনার।

কিন্তু তা ফেলে দিয়ে নিজের বাবাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলো না সে।

কয়েক মাস পর সেই বাবা আবারও এসেছেন, কিন্তু তাকে নেবার কথা বলেননি। কলকাতা থেকে আনা শাড়ি নিয়ে তার দাদা এসেছেন, এমনকি তার প্রেমিকও এসে দেখে গেছে। কেউ-ই তাকে ফিরিয়ে নেবার কথা বলেনি। তবে বীরাঙ্গনার দাদা অবশ্য একটা কথা বলে গেছেন, যা তার বাবা সম্ভবত মুখ ফুটে বলতে পারেনি। দাদা বললোঃ

> আমরা যে যখন পারবো তোর সঙ্গে দেখা করে যাবো। তুই কিন্তু হুট্ করে আবার বাড়ি গিয়ে উঠিস না।

বীরাঙ্গনার মুখের পেশিগুলো ক্রমশ শক্ত হয়ে আসছিল। দাদা সেদিকে এক নজর তাকিয়ে চট করে বললোঃ

> তাছাড়া আমাদের ঠিকানায় চিঠিপত্র লিখবারও দরকার নেই। তুই তো ভালোই আছিস। আমিও চাকরি পেয়েছি, সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ পেয়েছি, তা দিয়ে বাড়িঘরও মেরামত হয়েছে। দু'টি ঘরও তোলা হয়েছে।[২]

এটাই ছিল প্রায় সব বীরাঙ্গনার গল্প। সরকারি সাহায্যের টাকায় তাদের প্রিয়তম পরিবার বাড়ি বানায়, কিন্তু সেই বাড়িতেই তাদের স্থান হয় না। বীরাঙ্গনাদের ত্যাগ, বেদনা, অপমান আর তাদের প্রতি কালেক্টিভ ডিনায়াল বা সমষ্টিগত অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যানের গল্পগুলো স্বাধীন বাংলাদেশ আড়ালেই রাখতে চেয়েছে সব সময়।

দুই

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গোড়া থেকে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য ছাত্রী তাদের সতীর্থ ছাত্রদের সাথে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে নিজেদের যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করার জন্য আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। নারীদের সৃষ্ট তহবিল ব্যবহৃত হয়েছে শরণার্থীদের জন্য, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা এবং যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে। তারা সশরীরে গেরিলা যুদ্ধে বোমা, অস্ত্র ও রসদ পৌঁছে দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের, কেউ কেউ গান গেয়ে উজ্জীবিত করেছেন শরণার্থী শিবিরের আর্ত মানুষ আর মাঠে যোদ্ধাদের। মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি জাতীয় সংগ্রামে সম্পৃক্ততা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে তাদের গৌরবোজ্জ্বল

ভূমিকা রয়েছে অনুচ্চারিত।[৩]

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাতের বেলা পাক মিলিটারি ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আল্-বদররা গ্রামের নারীদের উপর চড়াও হতো।[৪] ত্রাস সৃষ্টির অংশ হিসেবে তাদের পরিবারের সদস্যদের সামনেই নারীদের ধর্ষণ করা হতো।[৫] এছাড়াও ৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সী নারীদের অপহরণ করে বিশেষভাবে নির্মিত শিবিরে নিয়ে যাওয়া হতো, যেখানে তারা বার বার লাঞ্ছিত হতেন। ক্যাম্পে বন্দি অনেককেই হত্যা করা হয় অথবা তারা নিজেরাই আত্মহত্যা করে;[৬,৭] কিছু নারী তাদের নিজেদের চুল ব্যবহার করে আত্মহত্যা করায় সৈন্যরা বন্দী নারীদের চুল কেটে দেয়।[৮] যারা অপহৃত হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর হাতে আটক ছিল এ ধরনের ৫৬৩ জন নারী সম্পর্কে 'টাইম ম্যাগাজিন'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়:

'যখন সেনাবাহিনী তাদেরকে মুক্তি দেয়া শুরু করে, তখন এদের সকলেই তিন থেকে পাঁচ মাসের গর্ভবতী ছিল।'[৯]

পাকিস্তান সরকার নির্যাতন সম্পর্কিত প্রতিবেদন এই অঞ্চলের বাইরে পাঠাতে বাধাদানের চেষ্টা করে। তবুও গণমাধ্যমে নৃশংসতার সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ্যে তা পৌঁছে যায় এবং তা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক আন্তর্জাতিক জনসমর্থন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।[১০]

কিছু নারীকে জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়।[১১] পাকিস্তান সরকারের হিসাব মতে, যেখানে ধর্ষণের শিকার নারীর সংখ্যা শতাধিক[১২] সেখানে অন্যান্য হিসাব মতে, এই সংখ্যা আনুমানিক ২,০০,০০০[১৩] থেকে ৪,০০,০০০[১৪]। তবে এই সংখ্যাটি সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত নারীর। কারণ, শেখ মুজিব সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় দু' পর্যায়ে দু'টি হিসাব প্রস্তুত করে এবং সেই হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ৩০০ জন বীরাঙ্গনার সন্ধান পায়। এদের অধিকাংশ ছিল স্কুলছাত্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট দুই লাখ ঊনষাট হাজার দুই শ' পঞ্চান্ন জন ক্ষতিগ্রস্ত নারীর সন্ধান মেলে, যার মধ্যে ৮.৩ শতাংশ অর্থাৎ ২১,৫১৯ জন নারী ছিলেন ধর্ষিতা।[১৫]

এই ধর্ষিতা অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশ পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে 'জাতীয় নারী পুনর্বাসন সংস্থা' গঠনের পর।"[১৫]

জেনিক এ্যারিন্স লিখেছেন যে, কোনো একটি জাতিগত গোষ্ঠীকে নির্মূল
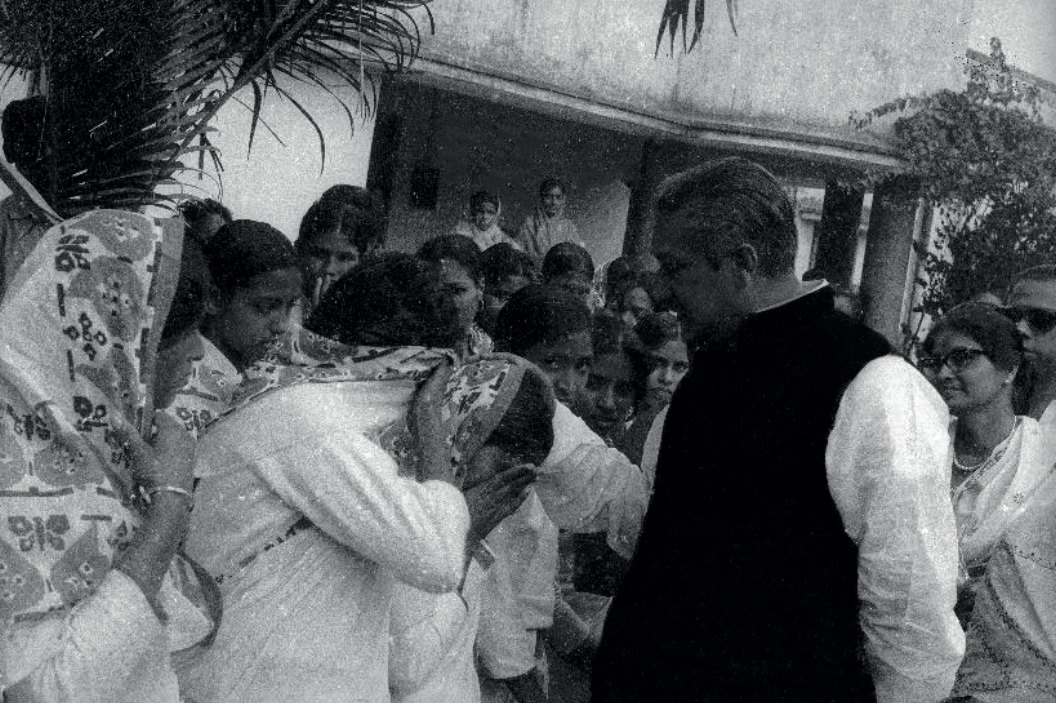
চিত্র-কথন: মুক্তিযুদ্ধ ও নারীর মর্যাদা

মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় এবং প্রায়-বিপ্লবী এক ঘটনাও আমাদের এই পশ্চাদ্পদ সমাজের চিন্তা কাঠামোতে খুব একটা পরিবর্তন আনতে পরেনি। বিশেষ করে নারীর অবস্থান, মর্যাদা আর সম্মান প্রশ্নে মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সমাজের চিন্তা-চেতনার কাঠামোতে কোনো রকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পুরুষশাসিত সমাজ নারীর প্রতি যে হীন-দীন দৃষ্টিভঙ্গি লালন করে আসছিল, তা থেকে উত্তরণের তাগিত বোধ করেননি সমাজপতিরা।

মুক্তিযুদ্ধে দখলদার পাক সেনাদের জবরদস্তির কাছে আমাদের হাজার হাজার নারীকে তার সতীত্ব-সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়েছিল। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, যুদ্ধশেষে প্রাণে বেঁচে যাওয়া এই সব নারীকে ঘরে তুলে নিতে চাননি স্বজনরা– তাদের বাবা-ভাই, কাকা-দাদারা। ভাবতে অবাক লাগে! এরা কি পাক হানাদার বাহিনীর চাইতে কিছু কম করলো?

সমাজের দ্বারাই রাষ্ট্রের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য গঠিত ও নির্দেশিত হয়ে থাকে। তাই সেদিন রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের অভিভাবক-কর্ণধাররাও ভয়ঙ্কর নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার এই নারীদের সহায়তায় যথার্থভাবে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। সরকার প্রধান শেখ মুজিব এদের দু'-একটি আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে কারো কারো মাথায় হাত রেখে সান্ত্বনা আর আশ্বাস-বাণী শুনিয়ে এসেছেন। কিন্তু সে সব আশ্বাস কোনো কাজে আসেনি, পরবর্তী কয়েক দশকের ইতিহাস তা-ই জানিয়ে গেছে।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালকুদার/দৃক

করার জন্য একটি ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টা হিসেবে অসংখ্য নারী ধর্ষিত হয়; হত্যা করা হয় এবং যৌনাঙ্গের মধ্যে বেয়নেট দ্বারা আঘাত করা হয়।[১৬] কানাডীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অ্যাডাম জোন্‌স বলেছেন যে, এই গণধর্ষণের অন্যতম কারণ ছিল বাঙালি নারীদের 'অসম্মান' করার মাধ্যমে বাঙালি সমাজের মনস্তাত্ত্বিক পতন ঘটানো। সেজন্য কিছু নারীকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ধর্ষণ করা হয়।[১৭] পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি পুরুষদেরও ধর্ষণ করেছিল। পুরুষরা যখন কোনো একটি তল্লাশিকেন্দ্র পার হতো, তখন তাদেরকে খৎনা করানো হয়েছিল কি-না তা প্রমাণ করতে নির্দেশ দেয়া হতো এবং এখানেই এ ধরনের ঘটনাগুলো সাধারণত ঘটতো।[১৮] 'ইন্টারন্যাশনাল কমিশন ফর জাস্টিস' মন্তব্য করেছে যে, পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত নৃশংসতা ছিল একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী দ্বারা স্বেচ্ছায় গৃহীত নীতির একটি অংশ।[১৯] লেখক মুল্‌ক রাজ আনন্দ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সম্পর্কে বলেছেন, 'ধর্ষণগুলো ছিল পদ্ধতিগত এবং ব্যাপক; এগুলো সচেতনভাবে গৃহীত সমরনীতির অংশ। 'পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা পরিকল্পিত একটি 'নতুন জাতি' তৈরি করতে অথবা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপলব্ধিকে, প্রেরণাকে হালকা করে দিতে' এসব করা হয়েছিল।[২০]

১৯৭১ সালে বীরাঙ্গনাদের শরীর স্পর্শ করেছিল নরপশুরা। সতীত্ব নাশ করে এদের 'পাপী' বানানো হয়েছে এবং পরিণত করেছে ঘৃণার পাত্রীতে। স্বাধীন দেশের সমাজে ধর্ষিত নারীদের ঠাঁই হয়নি। স্বাধীন দেশে এদের চিনতে চায়নি সহযোদ্ধা পুরুষ। দেখায়নি এক ফোঁটা সহানুভূতি, গড়েনি কোনো সম্পর্ক। সামাজিক নিরাপত্তা আর আশ্রয়ের অভাবে নাজুক অবস্থায় পড়েন নারীরা। পিতা, ভাই বা পরিবার কেউ এগিয়ে এসে তাদের গ্রহণ করেননি। সহযোদ্ধা হিসেবে যে সব মুক্তিযোদ্ধার সাথে নারীরা কাজ করেছেন এবং কাজ করতে গিয়ে ধর্ষিত হয়েছেন, সে সব পুরুষ যোদ্ধারা কেউ এক ফোঁটা সহানুভূতি দেখাননি বা পাশে এসে দাঁড়াননি।[১] সকলে মনে-প্রাণে চেয়েছেন ধর্ষিত নারীর নির্বাসন।[১৫]

স্বাধীনতার পরে বীরাঙ্গনাদের শারীরিক-মানসিক ক্ষতিকে দেখা হয়েছে ভিন্নতর দৃষ্টিতে। ঘৃণা, বৈষম্য, উপেক্ষা, অবহেলা আর পুরুষতন্ত্রের রথের চাকায় পিষ্ট-বিস্মৃত, নির্মমতায় নির্বাসিত সহযোদ্ধা নারীদের বিশাল একটি অংশ। যুদ্ধরত জাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও তারা চিহ্নিত হয়েছেন নির্যাতিতা বা

চিত্র-কথন: মুক্তিযুদ্ধ ও নারীর মর্যাদা

১৯৭২ সালের জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানীর ইসলামপুরের মাদার তেরেসার মিশনারিস অফ চ্যারিটির ২১ জন শিশুর বিরল ছবি। এর মধ্যে পনেরো জনকে দত্তক নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং রেভা ফ্রেড ক্যাপুচিনো এবং বনি ক্যাপুচিনোর নেতৃত্বে একটি দলের মাধ্যমে কানাডা পৌঁছেছিলেন। নীচে, ১৯৭২ সালের ২১ শে জুলাই দ্য মন্ট্রিয়াল স্টারে প্রকাশিত একটি ছবিতে বাংলাদেশ থেকে সেখানে একজন যুদ্ধের সন্তানের আগমন দেখানো হয়েছে।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালকুদার/দৃক

ধর্ষিতা হিসেবে, পঙ্গু হিসেবে নয়। যুদ্ধে সব সময়ই নারীর ওপর প্রথম আঘাত আসে। শারীরিক, পাশবিক ও জৈবিক নির্যাতনের নির্মম শিকার হন তারা। ১৯৭১ সালে তার ব্যাত্যয় ঘটেনি। নির্যাতিত নারীদের ট্রাজেডি এদেশের পুরুষ মানুষের হৃদয় ছোঁয়নি। সামাজিক ও পারিবারিক অঙ্গুলি হেলনে এসব নারীরা পরিণত হয়েছেন উদ্বাস্তুতে। কাছের মানুষ, পাশের মানুষ, সামাজিক মানুষের চেহারা বদলে যাওয়াতে চেনা জীবনে তারা আর কোনো দিন ফিরতে পারেননি। সমাজের কূটকৌশল তাদের ফিরতে দেয়নি।[৩] মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় ঘটনাও সমাজের চিন্তা কাঠামোতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের সমাজ, সমাজপতি এবং চিরচেনা
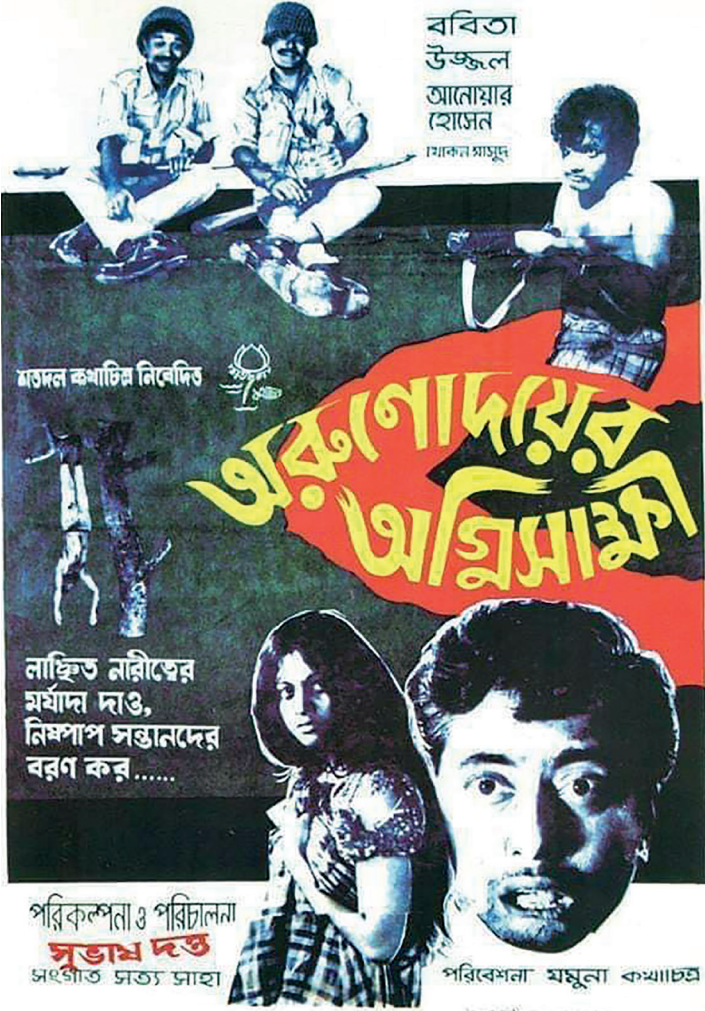
চিত্র-কথন:

শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষিতা নারীদের সন্তানদের 'দূষিত রক্ত' বলে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়ার মনোভাব ব্যক্ত করলে সমাজে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছিলো। মুক্তিযুদ্ধের উপরেও সেই সময়ে মুক্তি পাওয়া সিনেমার পোষ্টারের ট্যাগ লাইনে লেখা, 'লাঞ্ছিত নারীদের মর্যাদা দাও। নিষ্পাপ সন্তানদের গ্রহণ কর'। এই আহ্বান যে শেখ মুজিবকে উদ্দেশ্য করেই তা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়।

ফটো: *সংগৃহীত*

মানুষ তাদের সকল অবদানকে অস্বীকার করেছে। পিতা, ভাই, পরিবার, স্বামী, প্রতিবেশী সকলে একবাক্যে অস্বীকার করেছে তাদের ফিরিয়ে নিতে। নির্যাতিতা অনেক নারী আত্মহত্যা করে। হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেকে মৃত্যুবরণ করে। সমাজ, পরিবার, আত্মীয়-স্বজনদের লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটি অংশ স্বেচ্ছায় চলে যায় পাক সেনাদের সঙ্গী হয়ে, ভবিষ্যত পরিণতির কথা জেনেও। কেউ-বা নাম লেখান পতিতাপল্লীতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্যাতিতারা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরিচয় সংকটে পড়েন। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, শঙ্কা, আশ্রয়হীনতা, নিরাপত্তা, অন্ন-বস্ত্র, চিকিৎসা ও মর্যাদা– সব মিলিয়ে তারা নিদারুণ হতাশার ঘূর্ণিচক্রে পড়েন।[১]

নারী সমাজের এক বিশাল অংশকে রক্ষা করতে না পারার লজ্জা, গ্লানি ও বেদনাহত মনোভাব থেকে মুজিব সরকার ধর্ষিত নারীদের সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন। বীরাঙ্গনা শব্দের অর্থ, ধারণা ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না রেখে তিনি এসব নারীদের সম্মান জানাতে 'বীরাঙ্গনা' খেতাবে ভূষিত করেন। শেখ মুজিব চেয়েছিলেন এই শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে হতভাগ্য নারীদের গৌরবান্বিত করতে। কিন্তু প্রচলিত মূল্যবোধ নারীর প্রতি প্রযোজ্য এই শব্দটি গ্রহণ করেনি। পুরনো সামাজিক, সংস্কৃতিক মূল্যবোধের কারণে মূলধারা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্যাতিত নারীরা পরিণত হন প্রান্তিক নারীতে। 'যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের আলাদা শ্রেণিবিদ্ধ করে দেয়া হয়। এই আলাদা করে দেয়াতে মূলধারা থেকে হারিয়ে যান অনেক সম্ভাবনাময় নারী।[১]

ধর্ষিত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন– 'বীরাঙ্গনাদের নিদারুণ এক নির্বাসনের দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করে সমাজে শ্রদ্ধায় ও স্বগৃহে সমাদরে পুনর্বাসিত করতে হবে।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'নির্যাতিতা নারীদের আমি আমার মা-বোন এবং কন্যার দৃষ্টিতে দেখি। তাদের অমর্যাদা করা হয়েছে, কারণ তারা বাংলাদেশকে ভালোবাসতো।' তিনি নির্যাতিতা নারীদের মধ্য থেকে জীবনসঙ্গিনী বেছে নিয়ে বাংলাদেশকে গর্বিত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।[১৫]

নির্যাতিতা নারীদের ক্ষেত্রে 'বীরাঙ্গনা' শব্দের ব্যবহার সরকারি পর্যায় থেকে শুরু হওয়ার পর এদের সামাজিক ঠাঁই নিশ্চিত করার জন্য গঠিত হয় 'জাতীয় পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং নারী পুনর্বাসন সংস্থা' (১৯৭২)।[১৫]

১৯৭৪ সালে নির্যাতিত নারীদের পক্ষে একটি আইনও পাস হয়।[১৫]

চিত্র-কথন:

পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধর্ষিত কিশোরী বীরঙ্গনা আর কোলে যুদ্ধশিশু।
মাদার তেরেসা এই বীরঙ্গনা আর যুদ্ধশিশুকে আশ্রয় দেন।

ফটো: *সংগৃহীত*

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক বাধার জন্য ধর্ষিত নারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার প্রথম থেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সামাজিকভাবে ধর্ষিত নারী হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে চাননি বলে অনেক ধর্ষিত নারী বোর্ডের তালিকাভুক্ত হননি। যুদ্ধকালীন সময়ে মধ্যবিত্তের চেয়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির নারীরা ধর্ষিতা হয়েছিলেন বেশি। মধ্যবিত্ত অনেকেই দেশান্তরি হয়েছেন। নিম্নবিত্তরা সমাজের ভয়ে নিজেকে অপ্রকাশিত রাখতে চেয়েছেন। তারা বোর্ডের সাথে কোনো রকমের সহযোগিতা করেননি। তাছাড়া নির্যাতিতাদের বিয়ে করা বা বিয়ে দেবার মতো কোনো মানসিকতা বাংলাদেশের কোনো ধর্মের লোকদের মধ্যে দেখা যায়নি। ধর্ষিতাদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে কোনো ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সামাজিকভাবে কোনো মানুষের সহযোগিতা মিলেনি। রাষ্ট্রীয় খেতাব পাওয়া সত্ত্বেও নির্যাতিত নারীরা নিজ গৃহে যথোচিত মর্যাদা পাননি। এদের বিয়ে করার ব্যাপারে তরুণ সমাজের চিত্ত নিঃশঙ্ক ছিল না।[১৫]

এত বছর পরে আজ একটা প্রশ্ন তোলা যায়– কেন এই সকল ধর্ষিত তরুণী ও কিশোরীদের তখন সেনাবাহিনী, বিডিআর ও পুলিশে নিয়োগ দেয়া হলো না? এই সকল সুশৃঙ্খল বাহিনীতে সহজেই এদের নিয়োগ দেয়া যেত। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শারীরিকভাবে নির্যাতিতা এই সকল নারীদের প্রতি তৎকালীন সমাজ প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতা, মমতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পুরোপরি ব্যর্থ হয়েছিল।

নির্যাতিতাদের নির্যাতন কাহিনী গোপন রেখে তাদের সংসার এবং সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টি জরুরি ছিল অনেকের কাছেই। সাবধানতা বা সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল ধর্ষণের ঘটনা লুকিয়ে রাখতে। পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মীরা 'বীরাঙ্গনা' অনুসন্ধান করার কাজে নেমে বুঝেছিলেন, অনুদার রক্ষণশীল ও সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের বৈরিতা ধর্ষিত নারীদের পরিবার ও সংসারে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কত বড় বাধা।

ধর্ষিতাদের পুনর্বাসনের কাজ জটিল এবং কঠিন– এই সত্যটি তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, প্রকৃত ঘটনা ও তথ্য প্রকাশিত হলে ধর্ষিতাদের স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসন যখন প্রায় অসম্ভব, তখন তড়িঘড়ি করে 'বীরাঙ্গনা' সংক্রান্ত সব তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণাদি নষ্ট করে ফেলা হয়। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন যে একটি মানবাধিকারবিরোধী কাজ, সে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো মহল সেদিন সোচ্চার প্রতিবাদ জানায়নি। যুদ্ধের সময় সংঘটিত ধর্ষণ ও নির্যাতন যে যুদ্ধের একটি কৌশল তা নিয়ে কোনো রকম চিন্তা-ভাবনা হয়নি বা কারো মনেও

আসেনি।[২১]

তথ্য ও প্রমাণপত্রের অভাবে যুদ্ধাপরাধীদের এত বড় জঘন্য অপরাধের বিচার চাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। নারী পুনর্বাসন সংস্থার প্রধান কাজ ছিল 'বীরাঙ্গনা'দের অনুসন্ধান এবং সংস্থার অধীনে তাদের চিকিৎসা, অন্তঃসত্ত্বাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও তাদের হোমে রাখা। নারী পুনর্বাসন সংস্থা নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হবার পর এই সংস্থার প্রথম কাজ ছিল নির্যাতিতাদের ধর্ষণজাত সন্তান সংগ্রহ, লালনপালন ও বিদেশে দত্তক প্রদান। এই কাজের জন্য গঠিত হয় 'আন্তর্জাতিক শিশুকল্যাণ ইউনিয়ন'। এই ইউনিয়নের তৎপরতার কারণে বেশকিছু যুদ্ধশিশুকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় দত্তক হিসেবে পাঠানো সম্ভব হয়।

ড. নীলিমা ইব্রাহিম স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের কাছে গিয়ে জানতে চান, যুদ্ধশিশুদের ব্যাপারে তিনি কি ভাবছেন? শেখ মুজিব নীলিমা ইব্রাহিমকে বলেন, 'ওইসব দূষিত রক্ত আমি বাংলার মাটিতে রাখতে চাই না। ওদের বিদেশে পাঠিয়ে দাও'।[২২]

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ধর্ষিত নারীদের 'মা' আর 'বীরাঙ্গনা' বলে সম্বোধন করে যুদ্ধশিশুদের বিষয়ে শেখ মুজিবের এমন অমানবিক, অনৈতিক ও অসংবেদনশীল মন্তব্যের মধ্যে যে বৈপরিত্য সেটাই 'বীরাঙ্গনা'দের সম্পর্কে সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান ও মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলে।

এজন্যই নির্যাতিতাদের একাংশকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, আগ্রহী অভিবাকদের সাথে যোগাযোগ করে নিকটজনের কাছে হস্তান্তর ইত্যাদি কাজ হাতে নিলেও পরোপুরি সফল হয়নি। আশির দশকে প্রকল্পের বিলোপ ঘটায় নারী পুনর্বাসনের কাজের ইতি ঘটে।[২৩]

সূত্র:

১. নারী ও বাংলাদেশ; ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ ও উপমা দাশগুপ্ত, সূচীপত্র, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৮

২. আমি বীরাঙ্গনা বলছি; নীলিমা ইব্রাহিম, জাগৃতি প্রকাশনী, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৮, ষষ্ঠ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৪-২৫

৩. নারী ও বাংলাদেশ; ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ ও উপমা দাশগুপ্ত, সূচীপত্র, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৭

৪. Thomas, Dorothy Q.; Reagan E. Ralph (1998). "Rape in War: The case of Bosnia". Sabrina P. Ramet. Gender Politics in the Western Balkans: Women and Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States. Pennsylvania State University. ISBN: 978-0-271-01802-7

৫. Thomas, Dorothy Q; Regan E. Ralph (1994). "Rape in War: Challenging the Tradition of Impunity". SAIS Review. Johns Hopkins University Press. 14 (1): 82-99. doi:10.1353/sais. 1994.0019

৬. Jahan, Rounaq (2004). 'The Bangladesh Genocide'. Samuel Totten, Teaching About Genocide: Issues, Approaches, and Resources. Information Age. ISBN: 978-1-59311-074-1

৭. Brownmiller, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. Ballantine. ISBN: 0-449-90820-8

৮. D'Costa, Bina (December 2008). "Victory's silence". Himal Magazine.

৯. Coggin, Dan (1971). "East Pakistan: Even the Skies Weep". Time. 98: 157

১০. Dixit, Jyotindra Nath (2002). India-Pakistan in War and Peace. Routledge. ISBN: 978-0-415-30472-6.

১১. Brownmiller, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. Ballantine. ISBN: 0-449-90820-8

১২. Rahman, Hamoodur (2007). Hamoodur Rahman Commission of Inquiry into the 1971 India-Pakistan War, Supplementary Report. Arc Manor. ISBN: 978-1-60450-020-2

১৩. Saikia, Yasmin (2011). "War as history, humanity in violence: Women, men and memories of 1971, East Pakistan/Bangladesh". Elizabeth D. Heineman. Sexual Violence in Conflict Zones: From the Ancient World to the Era of Human Rights. University of Pennsylvania Press. Page: 152-170, ISBN: 978-0-8122-4318-5

১৪. Riedel, Bruce O. (2011). Deadly Embrace: Pakistan, America, and the Future of the Global Jihad. Brookings Institution. ISBN: 978-0-8157-0557-4

১৫. নারী ও বাংলাদেশ; ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ ও উপমা দাশগুপ্ত, সূচীপত্র, ২০১০, পৃষ্ঠা: ২৯

১৬. Arens, Jenneke (2010). "Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh". Samuel Totten, Robert K. Hitchcock. Genocide of

Indigenous Peoples. Transaction. Page- 117–142; ISBN: 978-1-4128-1495-9

১৭. Jones, Adam (2010). Genocide: A Comprehensive Introduction. Taylor & Francis. ISBN: 978-0-415-48618-7

১৮. Mookherjee, Nayanika (2012). "Mass rape and the inscription of gendered and racial domination during the Bangladesh War of 1971". Raphaelle Branche, Fabrice Virgili. Rape in Wartime Palgrave Macmillan. ISBN: 978-0-230-36399-1

১৯. Linton, Suzannah (2010). "Completing the Circle: Accountability for the Crimes of the 1971 Bangladesh War of Liberation". Criminal Law Forum Springer. 21 (2): 191–311 doi: 10.1007/s10609-010-9119-8

২০. Brownmiller, Susan (1975). Against Our Will: Men, Women and Rape. Ballantine. ISBN: 0-449-90820-8

২১. নারী ও বাংলাদেশ; ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ ও উপমা দাশগুপ্ত, সূচীপত্র, ২০১০, পৃষ্ঠা: ৩০

২২. আমি বীরাঙ্গনা বলছি; নীলিমা ইব্রাহিম; প্রথম অখণ্ড প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৯৮, ষষ্ঠ প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩, জাগৃতি প্রকাশনী, পৃষ্ঠা: ২২

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

জহির রায়হানের অন্তর্ধান

> ‘মিরপুরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে গভীর ষড়যন্ত্র মনে করার কোনো কারণ ছিল না। আমি যতদূর জানি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যা অনেক রথী-মহারথীর জন্যই বিপজ্জনক ছিল, সে জন্য তাকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল।’[১]

এক

দক্ষিণ কোলকাতার ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ি। আধখোলা সবুজ গেটটা পেরিয়ে বোগেনভিলিয়ার সারির পাশে বাঁ দিকে তৃতীয় দরজা দিয়ে কার্পেট মোড়া চওড়া কাঠের সিঁড়ি উঠে গিয়েছে দোতলায়। পাশাপাশি চলেছে আর একটা সাবেক আমলের লিফট। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বাঁ দিকে সাদা দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাঁ দিকের বন্ধ দরজাতে এক সন্ধ্যায় বেজে উঠলো কলিং বেল। সাদা পাঞ্জাবি আর আলিগড়ি পায়জামা পরা দীর্ঘকায় সুপুরুষ শিস দিতে দিতে দরজা খুললেন- সত্যজিৎ রায়। ভিতরে ঢুকলেন শাহরিয়ার কবির।

জহিরের ব্যাপারটা কিছু জেনেছো? সত্যজিত রায় জিজ্ঞেস করেন শাহরিয়ার কবিরকে।

তাকে সরিয়ে দেয়ার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করে যা বুঝতে পেরেছি তাতে বলা যায়, ৩০ জানুয়ারি দুর্ঘটনায় তিনি হয়তো মারা যাননি। তারপরও দীর্ঘদিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। শাহরিয়ার কবির উত্তর দেন।

স্ট্রেঞ্জ! এর পেছনে কারণ কী?

সেটাই ষড়যন্ত্রের মূল সূত্র বলে ধরছি। মিরপুরে দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে গভীর ষড়যন্ত্র মনে করার কোনো কারণ ছিল না। আমি যতদূর জানি, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি এমন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন যা অনেক রথী-মহারথীর জন্যই বিপজ্জনক ছিল। সে জন্য তাকে সরিয়ে ফেলার প্রয়োজন ছিল।[১]

এই কথোপকথনের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ১৯৭২ সালের ৩০ জুন ঠিক যেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের 'অস্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান' হচ্ছে। সেইদিন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জহির রায়হান, যিনি ছিলেন একজন সফল সাংবাদিক, লেখক ও চলচিত্র নির্মাতা, তিনি অগ্রজ শহীদুল্লাহ কায়সারকে মিরপুরে খুঁজতে গিয়ে নিজেও নিখোঁজ হন। শাহরিয়ার কবির সেদিন জহির রায়হানের সঙ্গে মিরপুর গিয়েছিলেন।

জহির রায়হানের প্রকৃত নাম ছিল মোহাম্মদ জহির উল্লাহ। তিনি চীনা ধারার বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক আমতলা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে ১০ জন প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হন জহির রায়হান ছিলেন তাদের একজন। ১৯৭০ সালে তার তৈরি 'জীবন থেকে নেয়া' সিনেমাটিতে তৎকালীন বাঙালির স্বাধীনতা আন্দোলনকে রূপকের মাধ্যমে তুলে ধরার ফলে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের মনোজগৎকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। এই সিনেমাতেই রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি চিত্রায়িত হয়েছিল, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি প্রবাসী সরকারের আর্থিক সহায়তায় 'স্টপ জেনোসাইড' নামে একটা বিখ্যাত ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরি করার ক্ষেত্রে 'স্টপ জেনোসাইড' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে

চিত্র-কথন:

বেহুলা সিনেমার স্যুটিং এ জহির রায়হান। ১৯৭২ সালের ৩০ জানুয়ারি তার মৃত্যুদিন হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সেদিন তিনি রহস্যময় ফোন কলটি বিশ্বাস না করে যদি ঘরে থেকে যেতেন, তাহলে হয়ত বাঙালির এই কিংবদন্তিকে এত অল্প বয়সে হারাতো না। আমরা হয়ত আরো অনেক কালজয়ী উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র পেতাম।

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

এখন পর্যন্ত নির্মিত ছবিগুলোর মধ্যে শৈল্পিক ও গুণগত সাফল্যের দিক থেকে এই চলচ্চিত্রটিকে শীর্ষে স্থান দেয়া হয়ে থাকে।

১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে জহির রায়হান ঘোষণা দেন- 'বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নীলনক্‌শা উদ্‌ঘাটনসহ মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অনেক গোপন ঘটনার নথিপত্র, প্রামাণ্য দলিল তার কাছে আছে, যা প্রকাশ করলে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই নেয়া অনেক নেতার কু-কীর্তি ফাঁস হয়ে পড়বে। আগামী ৩০ জানুয়ারি সন্ধ্যায় এই প্রেসক্লাবে ফিল্ম-শো প্রমাণ করে দেবে কার কী চরিত্র ছিল'।

এর আগে একটি অজ্ঞাত টেলিফোনে জহির রায়হানকে বলা হয়েছিল আজমীর শরিফে যেতে এবং সেখান থেকে তিনি জানতে পারবেন শহীদুল্লাহ কায়সার কোথায় আছেন। জহির রায়হান দেরি না করে সপরিবারে চলে গেলেন আজমীর শরিফ। সেখান থেকে ফিরে এলেন খুবই খুশি মনে। কে একজন বলে

দিয়েছেন, শহীদুল্লাহ কায়সার বেঁচে আছেন। কোথায় আছেন তা তাকে ফোনে জানিয়ে দেয়া হবে। সেই কথামতো একদিন ফোনও এলো।[২]

১৯৭২ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবাদ সম্মেলনের কয়েকদিন পর ৩০ জানুয়ারি (যেদিন সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবে তার ঘোষিত ফিল্ম-শো হওয়ার কথা ছিল) রোববার সকালে রফিক নামের এক লোকের কাছ থেকে টেলিফোন আসে জহির রায়হানের কায়েতটুলির বাসায়। রফিক ছিলেন জহিরের পূর্বপরিচিত, যিনি ইউসিসে চাকরি করতেন। প্রথমে ফোন ধরেছিলেন জহির রায়হানের ছোট বোন ডাক্তার সুরাইয়া। তার কাছে জহিরকে খোঁজা হচ্ছিল। তাকে ডেকে ফোন ধরিয়ে দেয় সুরাইয়া। টেলিফোনে জহিরকে বলা হয়েছিল, আপনার 'বড়দা' মিরপুর ১২ নম্বরে বন্দি আছেন। যদি 'বড়দা'কে বাঁচাতে চান তাহলে এক্ষুণি মিরপুর চলে যান। একমাত্র আপনি গেলেই তাকে বাঁচাতে পারবেন।

টেলিফোন পেয়ে জহির রায়হান দু'টো গাড়ি নিয়ে মিরপুরে রওয়ানা দেন। তার সঙ্গে ছিলেন ছোট ভাই জাকারিয়া হাবিব, চাচাতো ভাই শাহরিয়ার কবির, জহির রায়হানের শ্যালক বাবুল (সুচন্দার ভাই), আব্দুল হক (পান্না কায়সারের ভাই), নিজাম ও পারভেজ। মিরপুর ২ নম্বর সেকশনে পৌঁছার পর সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে সামনে এগোতে বারণ করে।[৩] সেনাবাহিনী তখন ১২ নম্বর সেকশনে রেইড করার জন্য যাচ্ছিল। তারা কোনো সিভিলিয়ান সঙ্গে রাখতে চায়নি। অনেক অনুরোধের পর জাহির রায়হানকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়েছিল।[৩] জহির রায়হানকে থাকতে বলে অন্যদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়। শাহরিয়ার কবির অন্যদের সঙ্গে করে বাড়ি ফিরে আসেন।[৩]

আনুমানিক সাড়ে ১১টার দিকে বিহারিরা আশেপাশের বাড়িঘর থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ও হ্যান্ডগ্রেনেড নিয়ে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ওপর হামলা চালায়। এই অতর্কিত হামলায় ৪২ জন নিহত হন। ওই দিন বিকালে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সেনাবাহিনী মিরপুরে ১২ নম্বর সেকশনে আক্রমণ চালায়। পরদিন সকালে পুরো একটা ব্যাটালিয়ন ১২ নম্বর সেকশনে প্রবেশ করে। কিন্তু কোনো পুরুষ মানুষকে খুঁজে পায়নি। রাতেই সবাই পালিয়ে গিয়েছিল। নিহতদের মাত্র ৩-৪ জন ব্যতীত আর কারো লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি মিরপুর পুরো জনশূন্য করার পরও। খুব সম্ভব ৩০ জানুয়ারি রাতেই সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। রাতের অন্ধকারে বিহারিদের সরিয়ে ফেলা সেই লাশগুলোর সঙ্গে 'বড়দা'কে খুঁজতে গিয়ে হারিয়ে যান আমাদের জহির রায়হান। তার মরদেহও কোথাও পাওয়া যায়নি।

জহির রায়হানের বাসায় পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আবু সাইদ চৌধুরী বলেছিলেন, 'স্বাধীন দেশে এমন একজন ব্যক্তিকে হারালাম, যাকে এখন আমাদের বেশি প্রয়োজন। যা ঘটলো তা আমাদের সকলের ব্যর্থতা।' পত্র-পত্রিকায় জহির রায়হানের হারিয়ে যাওয়ার খবর বের হতে লাগল। অনেকগুলো নতুন সিনেমা বানানোর কথা ছিল তার। ভাষা আন্দোলন নিয়েও একটা সিনেমা বানানোর কথা ছিল। নামও দিয়েছিলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি'।[৪]

ঘটনার দিন জহির রায়হান তার যে গাড়িটা রেখে সেনাবাহিনীর সঙ্গে ভাইয়ের খোঁজে গিয়েছিলেন সে গাড়িটি পরদিন সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানের কাছে পাওয়া যায়। এর তালা ছিল ভাঙা। জহির রায়হানের রহস্যজনক নিখোঁজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ডায়েরি, নোটবুক, কাগজপত্রের ফাইল এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় চিত্রায়িত অব্যবহৃত মূল্যবান ফিল্ম ফুটেজসমূহ হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটির সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য।[৫]

এভাবেই জহির চিরতরে হারিয়ে যান। জহির রায়হান নিখোঁজ হওয়ার মাস দেড়েক পর শহীদুল্লাহ কায়সার ও জহির রায়হানের বোন নাফিসা কবির, শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, জহিরের স্ত্রী সুচন্দাসহ ১৯৭১ সালে নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের অনেকে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাদের সবাইকে বঙ্গভবনের গেটে অপেক্ষমাণ রাখেন। এক সময় শেখ মুজিবুর রহমান গেটের সামনে এসে বিক্ষোভ ও দেখা করার কারণ জানতে চাইলে তার সঙ্গে নাফিসা কবিরের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

শেখ মুজিব বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ করে বলেন: অনেকে তো দালালি করে মরেছে।

নাফিসা কবির উত্তর দেন, বুদ্ধিজীবীরা কেউ দালালি করে মরেনি। দালালি যারা করেছে তারা এখনো বেঁচে আছে। সে দালালদের বিচারের দাবি জানাতে এসেছি।[৬] পরে একদিন 'বড়দি' অর্থাৎ জহির রায়হানের বড় বোন নাফিসা কবিরকে ডেকে নিয়ে শেখ মুজিব বললেন: জহিরের নিখোঁজ নিয়ে এ রকম চিৎকার করলে তুমিও নিখোঁজ হয়ে যাবে![৭]

জহির সম্পর্কে বলতে গিয়ে,জহির রায়হানের স্ত্রী সুচন্দার ছোট বোন নায়িকা

ববিতা উল্লেখ করেছেন, ভারত থেকে ফিরে আসার পর একবার এক মিটিংয়ে উনি বলেছিলেন "যুদ্ধের নয়মাস আমি কলকাতায় ছিলাম। আমি দেখেছি সেখানে কে কি করেছে। কে দেশের জন্য করেছে, আর কে নিজের আখের গুছিয়েছে। আমার কাছে সব রেকর্ড আছে। আমি সব ফাঁস করে দেব। এটাই জহির রায়হানের জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যই জহিরকে ফাঁদে ফেলে মিরপুর নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরিকল্পনামাফিক তাকে সরিয়ে দেয়া হয় পৃথিবী থেকে।[৮]

প্রখ্যাত বামপন্থি সাংবাদিক নির্মল সেন লিখেছিলেন–

'সাম্প্রতিককালে জহির রায়হান নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে নতুন তথ্য শোনা গেছে। বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানি হানাদার বা অবাঙালিরা নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশই জহির রায়হানকে খুন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের এ অংশটির লক্ষ্য ছিল– বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থি বুদ্ধিজীবীসহ সামগ্রিকভাবে বামপন্থি শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়া। এরা নাকি বামপন্থি বুদ্ধিজীবীদের হত্যার একটা তালিকা প্রণয়ন করেছিল। এদের ধারণা এ তালিকাটি জহির রায়হানের হাতে পড়েছিল। জহির রায়হানও জানতো তার জীবন নিরাপদ নয়। তবুও সে ছিল ভাইয়ের শোকে মূহ্যমান। তাই শহীদুল্লাহ কায়সারের নাম শুনেই সে ছুটে গিয়েছিল মিরপুরে। তারপর আর ফিরে আসেনি। এ মহলই তাকে ডেকে নিয়ে খুন করেছে।

তাহলে কোনটি সত্য? জহির রায়হানকে কারা গুম করেছে? পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, আল্-বদর, আল্-শাম্স্ না রাজাকার? নাকি মুক্তিবাহিনীর একটি অংশ? স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, মুক্তিবাহিনীর এ অংশটি 'মুজিববাহিনী'।

১৯৭১ সালে প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের অজান্তে গড়ে ওঠা 'মুজিববাহিনী' সম্পর্কে অনেক পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে। বিভিন্ন মহল থেকে বারবার বলা হয়েছে, এ বাহিনী গড়ে উঠেছিল ভারতের সামরিক বাহিনীর জেনারেল উবান-এর নেতৃত্বে। এ বাহিনী মিজোরামে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিজোদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। এদের দায়িত্ব ছিল রাজাকার, শান্তি কমিটি ও বাংলাদেশের বামপন্থিদের শেষ করে ফেলা। 'মুজিববাহিনী' সম্পর্কে এ কথাগুলো বারবার লেখা হয়েছে এবং হচ্ছে। কোনো মহল থেকেই এ বক্তব্যের প্রতিবাদ আসেনি। অথচ দেশে 'মুজিববাহিনী'র অনেক নেতা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে ছিলেন এবং আছেন। তারা এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করেননি, করছেন না। তাদের নীরবতা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করছে এবং জহির রায়হানের নিখোঁজ হবার ব্যাপারেও 'মুজিববাহিনী'কেই দায়ী বলে ধরে

নেয়া হচ্ছে।'[৯]

তবে সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবী করা বেঙ্গল রেজিমেন্টের মুক্তিযোদ্ধা নায়েক আমির হোসেন বলেন, বেলা এগারোটার দিকে তিনি ঢং ঢং পাগলা ঘণ্টির শব্দ শুনতে পান। আচমকা গুলি ছুটে আসতে থাকে চারপাশ থেকে। বাম দিকে তাকিয়ে দেখেন পুলিশ সদস্য এবং সেনা সদস্যরা লুটিয়ে পড়েছে। দ্রুত কাভার নেওয়ার জন্য আমির একটি ইটের স্তূপের পেছনে গাছের আড়ালে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তিনি দেখেন কিছুক্ষণ আগে পুলিশের পাশাপাশি জহির রায়হান দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন, তিনি বুকে হাত চেপে ধরে পাশে একটি দেওয়ালের গায়ে পড়ে গেলেন। তার কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এরপর কিছুক্ষণের মধ্যেই দক্ষিণ দিক দিয়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সিভিল পোশাকে শতাধিক বিহারি ও সাদা পোশাকের পাকিস্তানি সেনারা দক্ষিণ দিক থেকে ড্যাগার, কিরিচ নিয়ে আল্লাহু আকবর স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে আসলো এবং পড়ে থাকা শত নিহতদের কোপাতে শুরু করল। উর্দুতে তারা চিৎকার করে বলছিল, 'কাউকেই ছাড়া হবে না'। তারপর তারা টেনেহিঁচড়ে পানির ট্যাংকের পশ্চিম দিকে নিয়ে যেতে থাকে আহত নিহতদের দেহগুলো। এ সময় পড়ে থাকা জহির রায়হানকে ৬-৭ জন বিহারী হাত-ঘাড়-কোমর ধরে টেনে নিয়ে যায় পানির ট্যাংকের পশ্চিম দিকে"।[১০]

কিন্তু মিরপুর এই যুদ্ধের পরপরই মুক্ত হলেও, অন্যান্যদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেলেও, জহির রায়হানের মৃতদেহ কখনোই খুঁজে পাওয়া যায়নি

সূত্র:

১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১ মে ১৯৯২

২. দৈনিক লাল সবুজ; সাংবাদিক হারুনুর রশীদ খান, ৩০ জানুয়ারি ১৯৯৩

৩. মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে; পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ১৬৮

৪. জহির রায়হান : নিখোঁজ ও অপেক্ষার হাজার বছর; সহুল আহমেদ, বিডিনিউজ২৪, ২০ আগস্ট ২০১৬

৫. দৈনিক সংগ্রাম; ২৮ ডিসেম্বর ২০০২

৬. মুক্তিযুদ্ধ : আগে ও পরে; পান্না কায়সার, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ১৬৮

৭. সরকার সাহাবুদ্দিন আহমদ, রাহুর কবলে বাংলাদেশ সংস্কৃতি, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ১০৮, আসলাম সানী রচিত "শত শহীদ বুদ্ধিজীবী"

৮. 'আনন্দ ভুবন' এর ১৬ মার্চ, '১৯৯৭ সংখ্যায় 'কুলায় কালস্রোত' বিভাগে শিরোনাম 'পুরানো সেই দিনের কথা'

৯. আমার জবানবন্দি; নির্মল সেন, ইত্যাদি গ্রন্থ, ফেব্রুয়ারি ২০১২, পৃষ্ঠা: ৪০৬

১০। 'নিখোঁজ নন, গুলিতে নিহত হয়েছিলেন জহির রায়হান' দৈনিক ভোরের কাগজ, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন: সাংবাদিক জুলফিকার আলী মানিক

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভিত্তিহীন তথ্য, উপাত্তহীন অমীমাংসিত 'সত্য'

ত্রিশ লাখ মত্যুর দাবি বিশ্ব মিডিয়া যাচাই-বাছাই ছাড়াই প্রচার করেছে।
–উইলিয়াম ড্রুমন্ড্, 'দ্য গার্ডিয়ান'[৪]

'৭৩-এর এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে লেখা চিঠিতে শেখ মুজিব গণহত্যায় 'লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে' মর্মে উল্লেখ করেছিলেন; 'ত্রিশ লাখ' সংখ্যা দাবি করেননি।[৮]

মুক্তিযুদ্ধে 'ত্রিশ লাখ শহিদ হয়েছে'– এই দাবি বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পারে ৩ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভ্দা'তে প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধে। দু'দিন পর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজাদি'তে 'প্রাভ্দা'র এই সংবাদ নিবন্ধটি বাংলায় ছাপা হয়। রুশ ভাষায় 'প্রাভ্দা'র নিবন্ধটির শিরোনাম ছিল– 'তারা এটা লুকাতে পারেনি'। সেই নিবন্ধে এক লাইনে লেখা ছিল– 'সংবাদপত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে ত্রিশ লাখের বেশি মানুষ নিহত, আহত, পঙ্গু ও গ্রেপ্তার হয়েছিল।' 'প্রাভ্দা'র নিবন্ধেও কিন্তু নিহতের সংখ্যা 'ত্রিশ লাখ'

চিত্র-কথন:

একাত্তরের গণহত্যা নিয়ে বাংলাদেশে যত আবেগ আছে তত তথ্য উপাত্ত নেই। মুক্তিযুদ্ধের গণহত্যার কোনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি নেই। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জাতিসংঘ এবং নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) যাওয়ার সুযোগ আছে। তবে এই দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরতে বাংলাদেশকে যথেষ্ট প্রামাণ্য দলিল উপস্থাপন করতে হবে। সেই দলিল বাংলাদেশের কোনো সরকার মুক্তিযুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই তৈরি করতে পারেনি।

ফটো ক্রেডিট: আমানুল হক/ দৃক

বলা হয়নি। ত্রিশ লাখ নিহত হওয়ার দাবিটি কোনো শক্ত তথ্যের ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে ছিল না। 'ত্রিশ লাখে'র দাবিকে শেখ মুজিব নিজে সমর্থন করায় এবং এর পক্ষে জোরালোভাবে অবস্থান নেয়ায় ১৯৭১-এর গণহত্যা নিয়ে কোনো তথ্যানুসন্ধান অসম্ভব হয়ে ওঠে। দাবিকৃত সংখ্যার কোনো বিশ্বাসযোগ্য উপাত্ত না থাকায় ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের গণহত্যা দুঃখজনকভাবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায়নি।[১]

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত 'স্বাধীন বাংলা বেতার' থেকে প্রচারিত তথ্যে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা তিন লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছিল।[২]

আন্তর্জাতিক মহলেও মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যার দাবি নিয়ে নানা প্রশ্ন শুরু হয়। প্রখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক উইলিয়াম জে ড্রুমন্ড্ *'লস্ এঞ্জেল্স্ টাইম্স্'*-এ লেখেন– 'বাংলাদেশে আমার অসংখ্য সফরের অভিজ্ঞতায় এবং গ্রামের জনগণের সাথে আলাপের ভিত্তিতে আমি বলতে পারি, ত্রিশ লাখ হত্যার দাবি এত বিপুলভাবে বাড়িয়ে বলা যে, তা অসম্ভব হতে বাধ্য।' উইলিয়াম ড্রুমন্ডের এই রিপোর্ট ১৯৭২-এর ৬ জুন 'গার্ডিয়ান'-এও প্রকাশিত হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দুই সপ্তাহের মাথায় শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য ১২ সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল আবদুর রহিম কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ২৯ জানুয়ারি এই কমিটি গঠন সংক্রান্ত গেজেট নোটিফিকেশন হয়। ৩০ এপ্রিল এই কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবার সময় বেঁধে দেয়া হয়।[৩]

হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ জমা দেয়ার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে মোট ২০০০ মৃত্যুর অভিযোগ জমা হয়।[৪]

এই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কখনো আলোর মুখ দেখেনি। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এই তদন্ত কমিটি ৫৬,৭৪৩ জনের মৃত্যুর হিসাব করেছিল এবং এই হিসাব পূর্বে ঘোষিত 'ত্রিশ লাখ'-এর চাইতে অস্বাভাবিক কম হওয়ায় এই রিপোর্টে উল্লিখিত সংখ্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেননি।[৫]

তখন থেকেই মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি

অমীমাংসিত বিষয় হিসেবেই থেকে যায়।

২৮ এপ্রিল ১৯৭৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে লেখা একখানি চিঠি দিয়ে বিশেষ দূত হিসেবে এম আর সিদ্দিকীকে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। সেই চিঠিতে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে তিনি গণহত্যায় 'আমার দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে' মর্মে উল্লেখ করেন। কিন্তু 'ত্রিশ লাখ' হত্যার দাবি করেননি।[৮]

মিলিশিয়া গঠন নিয়ে পিলখানা, ইপিআর-এ ব্যাপক গোলাগুলি

৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় সারা দেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পিলখানায় আসা। উদ্দেশ্য ছিল, ইপিআর এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করা; যেই মিলিশিয়া বাহিনীর প্রধান কার্যালয় হবে পিলখানাতেই। মিলিশিয়ার পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পান সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এএনএম নূরুজ্জামান। ইপিআরের বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে অংশ নিলেও কিছু জেসিও ও এনসিও পাকিস্তানি বাহিনীর অধীনে কাজ করে। ইপিআরের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীর অনুগত অ-মুক্তিযোদ্ধা ইপিআর সদস্যদের নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলতে থাকে। এই প্রশ্নগুলো ফয়সালার জন্য একটা স্ক্রিনিং কমিটি গঠন করা হয়।

এদিকে ওই জেসিও এবং এনসিওদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে নূরুজ্জামান পিলখানায় গেলে ইপিআর সদস্যদের একটা অংশ তার উপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তারা নুরুজ্জামানকে কিল-ঘুষি মারতে থাকে।[৬] ব্যারাকে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধারা এই খবর পেয়ে নুরুজ্জামানকে উদ্ধারের জন্য অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসে। ইপিআরের হামলাকারী সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। প্রায় আধা ঘণ্টা ধরে ব্যাপক গুলিবিনিময় চলে। মুক্তিযোদ্ধারা নূরজ্জামানকে হামলাকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করে।[৭]

নূরুজ্জামানের আক্রান্ত হবার খবর দ্রুত ওসমানীর কাছে পৌঁছে যায়। এমনকি শেখ মুজিবের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছতে সময় লাগেনি। না লাগারই কথা! পিলখানায় আধা ঘণ্টা ধরে গোলাগুলি হলে সারা শহরে খবর রটে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ওসমানী সংঘাত ঠেকানোর জন্য সেখানে গেলেও পিলখানায় ঢুকতে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শেখ মুজিবুর রহমান

প্রিয় ভাই/বোন,

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আপনার সুযোগ্য পুত্র/পিতা/স্বামী/মা/স্ত্রী আত্মোৎসর্গ করেছেন। আপনাকে আমি গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আপনার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও রইল আমার প্রাণঢালা সহানুভূতি।

এমন নিঃস্বার্থ মহান দেশপ্রেমিকের পিতা/পুত্র/স্বামী/মা/স্ত্রী হওয়ার গৌরব লাভ করে সত্যি আপনি ধন্য হয়েছেন।

'প্রধান মন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল' থেকে আপনার পরিবারের সাহায্যার্থে আপনার সংশ্লিষ্ট মহকুমা প্রশাসকের নিকট..........টাকার চেক প্রেরিত হ'ল। চেক নম্বর..........।

আমার প্রাণভরা ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিন।

চিত্র-কথন:

মুক্তিযুদ্ধের পরে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সকল নিহত ও শহীদের পরিবারে এমন একটা চিঠি দিয়েছিলো স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। সরকারি দপ্তরে সেইসময়ে সকল নিহত ও শহীদদের নাম জমা নেয়া হয়েছিলো। সেই জমা নেয়া নামের ভিত্তিতেই এই চিঠিগুলো ইস্যু করা হয়েছিলো।

ফটো: সংগৃহীত
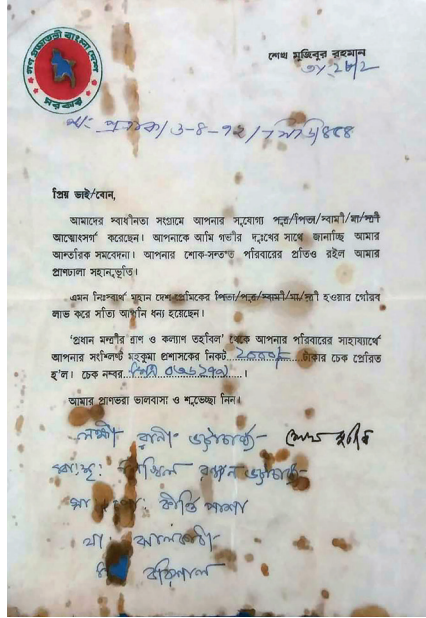
পারেননি বা ঢোকার সাহস পাননি। কালবিলম্ব না করে শেখ মুজিব নিজেই চলে আসেন পিলখানায়। গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। পিলখানার এই ঘটনার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সীমান্ত রক্ষার জন্য 'বিডিআর' এবং অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে আলাদা বাহিনী তৈরি করা হবে।

এই আলাদা বাহিনীই পরে 'রক্ষীবাহিনী' হিসেবে সংগঠিত হয় এবং হত্যা-অত্যাচার-নির্যাতন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভয়ঙ্কর ইতিহাস তৈরি করে। আর সেই ইতিহাস দুর্ভাগ্যজনকভাবে চাপা পড়ে যায়।

সূত্র:

১. The Case for UN Recognition of Bangladesh Genocide; Shihab Sarkar, Published: 16 March 2017, Financial expres

২. Yahya Mirza, Interview with Mr. Abdul Muhaimin, The Tarokalok, 1 March, 1990; and Jauhuri, ত্রিশ লাখের তেলেসমাতি (The Riddle of Thirty Lakh), আশা প্রকাশনী, 435 Elephant Road, Dhaka-1217, 1994 , page: 48.

৩. প্রাগুক্ত; Jauhuri, ibid , page: 65

৪. The Missing Millions; William Drummond, The Guardian, London, 6 June 1972

৫. Behind The Myth of Three Million; Dr. M. Abdul MuÕmin Chowdhury, Al-Hilal Publishers Ltd. London , 1996, page: 29

৬. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১-২২

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩

৮. নিক্সনকে বঙ্গবন্ধুর বাংলায় চিঠি; প্রথম আলো, শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্ব পদক

> ‘যুদ্ধক্ষেত্রের ঐক্য ও মুক্তির আদর্শ স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসকদের জন্য বিপদের বার্তাবহ ছিল। সেজন্য পদক-খেতাব আর সুযোগ-সুবিধা দিয়ে যোদ্ধাদের আদর্শচ্যুত করা দরকার ছিল’।[৪]

যুদ্ধ চলাকালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিকভাবে সাহসিকতার পদকে ভূষিত করে। তবে সে সময় কোনো মেডেল বা সনদ ছিল না। শুধু চিঠির মাধ্যমে পদক প্রাপ্তির কথা জানানো হতো। ১৯৭২ সালের প্রথমদিকে সেক্টর ও ফোর্স অধিনায়কদের তাদের অধীনস্ত অফিসার, সৈনিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতার বিষয়ে লিখিত আকারে প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য বলা হয়। যুদ্ধের সময়ও এই রকমের কিছু কিছু প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছিল। স্বাধীনতার পর পর ঢাকায় মিন্টো রোডে জেনারেল ওসমানীর বাড়িতে কয়েকজন সেক্টর কমান্ডার মিলে সাহসিকতার পদকের তালিকা তৈরি করেন।

জেনারেল ওসমানীর স্বাক্ষরে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ মুজিবের অনুমোদনের পর সে তালিকা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই তালিকায় পদকপ্রাপ্তদের নাম দেখে মুক্তিযোদ্ধারা হতাশ হন।

তাদের মধ্যে অনেকেরই যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর কোনো সুযোগ ছিল না। অনেকে সম্মুখ যুদ্ধও করেননি। সব সেক্টর কমান্ডার যে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তার কোনো লিখিত প্রমাণ বা প্রতিবেদন ছিল না। নিয়মিত বাহিনীর কমান্ডাররা, যারা সম্মুখ সমরে নয় মাস যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, তাদের অনেককেই উপযুক্ত স্বীকৃতি দেয়া হয়নি।[১] তাছাড়া সরাসরি বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন না এমন কিছু ব্যক্তিকেও সাহসিকতার পদক দেয়া হয়। এমন অনেকে সাহসিকতার পদক পান যারা মাঠের যুদ্ধের বদলে পরিকল্পনা, প্রশাসন, প্রচার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন।[২]

এ নিয়ে শেখ মুজিবের কাছে অভিযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধা মেজর মইনুল হোসেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পদক তালিকা রহিত করার আদেশ দেন। এ রহিতাদেশ পরের দিনই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হয়। কিন্তু কয়েক দিন পর ওই রহিতাদেশ বাতিল করে আগের পদকগুলোই বহাল রাখা হয়। ফলে বিতর্কিত পদকপ্রাপ্তদের পদকগুলোও বহাল থেকে যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য পদক দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিদেরও, যারা যুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেননি।[২]

এই অভিমানে চার নম্বর সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মাহবুব রব সাদী '৭২-এ তাকে প্রদত্ত 'বীরপ্রতীক' খেতাব বর্জন করেন। মাহবুব সাদী বলেছিলেন: 'আমি নিজে অন্তত তিনজনের কথা জানি যাদের 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দেয়া হয়নি।' ১৯৯৪ সালে পুনরায় তাকে পদক গ্রহণের আহ্বান জানালে তখনো তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন: মুক্তিযুদ্ধে যারা বিভিন্ন পদক পেয়েছেন তাদের বীরত্ব ও অবদানকে খাটো করি না। কিন্তু অন্য যারা যথাযথ বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং অবদান রেখেও যথাযথ মূল্যায়ন পাননি, তাঁদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখাতেই আমি এ খেতাব ও পদক বর্জন করেছি।[৩]

মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ হলেও সর্বোচ্চ খেতাব 'বীরশ্রেষ্ঠ' একজন বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাকেও দেয়া হয়নি বলে এখনো অনেকে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন। যদিও অনেক বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা অনন্য বীরত্বের নিদর্শন রেখে মুক্তিযুদ্ধে শহিদী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধির মতো 'বীরউত্তম', 'বীরবিক্রম' ও 'বীরপ্রতীক' খেতাবের ক্ষেত্রেও যুদ্ধে অংশ নেয়া সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরাই প্রাধান্য পেয়েছেন।

৭ নং সেক্টরের কমান্ডার লে. কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানকেও 'বীরউত্তম' খেতাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটি তিনি ব্যবহার করেননি। খেতাব বিতরণের ভেতরে যে রাজনীতিটি ছিল সেটাকে তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। এবং সেটির বিরুদ্ধে তার একটি নীরব প্রতিবাদ ছিল। তিনি বলেছিলেন, খেতাবের রাজনীতিটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার, তাদেরকে অহংকারী করে তোলার, বিশেষ ধরনের সুযোগ-সুবিধা দাবির ব্যাপারেও লোভী বানিয়ে ফেলার। অথচ মুক্তিযুদ্ধের মূল বৈশিষ্ট্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তির উৎসই ছিল– নির্লোভ মানুষদের ঐক্য। যুদ্ধক্ষেত্রে যে ঐক্য তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রের কর্তারা চাননি সেটি অটুট থাকুক। কারণ, তা'তে তাদের জন্য বিপদের আশঙ্কা ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো তাদেরও নীতি ছিল: বিভক্ত করো এবং শাসন করো (ডিভাইড অ্যান্ড রুল)। মুক্তিযোদ্ধারা পুরস্কারের লোভে যুদ্ধে যাননি। তাদের সামনে একটা স্বপ্ন ছিল, সেটা হলো, দেশের সব মানুষের জন্য মুক্তি ছিনিয়ে আনা। ওই স্বপ্নটি বাস্তবায়িত হতে দেয়া হবে না, এই সিদ্ধান্ত নিয়েই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাদেরকে এমনকি অবৈধ দখলদারিত্বের ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছিল। নজর ছিল তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার দিকে। এ অনেকটা ঘুষ দেয়ার মতো: দিচ্ছি– নাও, অসন্তোষকে প্রশ্রয় দিও না। রাষ্ট্রের পুঁজিবাদী শাসকেরা মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শবাদকে ওই যোদ্ধাদের অস্ত্র ব্যবহারের অভিজ্ঞতার চেয়ে অধিক বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করতেন। কর্নেল জামান তার সহযোদ্ধাদেরকে আদর্শচ্যুতকরণের এই কারসাজিটা টের পেয়েছিলেন।[৪]

১৯৭৩-এর ১৫ ডিসেম্বর সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী যে পদকগুলো দেয়া হয়, তার মধ্যে সাতজন পেলেন মরণোত্তর 'বীরশ্রেষ্ঠ', আটষট্টিজন 'বীরউত্তম', এক শ' পঁচাত্তর জন 'বীরবিক্রম' আর চার শ' ছাব্বিশ জন পেলেন 'বীরপ্রতীক'।

তদুপরি আশা করা গিয়েছিল পদকগুলো দেয়া হবে আনুষ্ঠানিকভাবে। স্বাধীন পতাকার নিচে বীরের মিছিল আন্দোলিত করবে গোটা দেশ ও জাতিকে। হাত ধরে বর্তমানকে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে। কিন্তু সেদিন সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। গোটা জাতিকে শুধু ঘোষণায় বন্দি করে পদকপ্রাপ্ত বা উত্তরাধিকারীদের জানিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেদিন দেয়া হয়নি কোনো পদক। আনুষ্ঠানিকভাবে বীরদের প্রিয়জনদের কাছে কেউ বহন করেনি জাতীয় মর্যাদার সংবাদ। কেননা, ভয় ছিল– রণক্ষেত্রের সত্যিকার যোদ্ধা-বীরদের জয়গান ম্লান করে দেবে 'বীর' সেজে বসা প্রতারকদের স্ব-আরোপিত সম্মানকে। রাজনৈতিক

আততায়ী, যারা সেদিন রণক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে থিয়েটার রোডে বসে নিজের ওপর নিজেই চাপিয়ে দিয়েছিলেন ‘সেনাপতি’র মর্যাদা, সেদিন তাদের স্বার্থেই প্রয়োজন ছিল বাস্তব বীরত্বগাথাকে শুধু ঘোষণায় বন্দি করা।[৫]

সূত্রঃ

১. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স; ফেব্রুয়ারি ২০০০; পৃষ্ঠাঃ ৫০

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৫১

৩. এনটিভি অনলাইন, মুক্তিযুদ্ধের খেতাব ও জনযুদ্ধের সংকট; ০৮ মে ২০১৭

৪. নির্বাচিত রচনা; কাজী নূরুজ্জামান, সংহতি প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৫

৫. বীরশ্রেষ্ঠ; জাহানারা ইমাম, গণ প্রকাশনী, ফাল্গুন, ১৩৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৩

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দালাল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ আর বিচার

> 'যুদ্ধবন্দিদের বিচার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, ভারতও উৎসাহী নয়'।[১২]

৯১ নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগের অফিসে দলীয় কর্মীদের সভা চলছে। প্রধান বক্তা স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক তখন এখানেই অফিস নিয়েছিলেন। চারদিন আগেই তিনি পাকিস্তানের কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরেছেন। এর মধ্যে তিনি প্রধাণমন্ত্রী হিসেবে শপথও নিয়ে ফেলেছেন। স্বাধীন দেশ পাওয়ার আনন্দে আর প্রিয় নেতাকে কাছে পেয়ে টগবগ করে ফুটছে আওয়ামী লীগের কর্মীরা। তিনি বক্তব্য শুরু করলেন, এক পর্যায়ে তাঁর বক্তব্যে দলীয় কর্মীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পথ

পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'দালালদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে'।[৩]

দুদিন আগে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরেও তিনি গণহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না বলে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: রোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আমরা শুনেছি। তবু বাংলার মানুষ এত নিচে নামবে না, বরং যা মানবিক তাই করবে। তবে অপরাধীদের আইনানুযায়ী অবশ্যই বিচার হবে।[২]

একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য অনেকেই উত্তেজিত হয়ে ছিল। এমনকি দালালদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায় থেকেও ঘন ঘন দাবি উত্থাপিত হতে থাকে। সে কারণেই শেখ মুজিব প্রতিশোধ গ্রহণের পথ থেকে সরে আসার জন্য দলীয় কর্মীদের নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলেন।[৪]

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট ও সরকারের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সদস্য ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধকালীন হত্যাযজ্ঞকে নজীরবিহীন বর্বরতা বলে উল্লেখ করে এর বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পাওয়ার অধিকার হারিয়েছে বলেও তারা মত প্রকাশ করেন।

তবে অবাক-বিস্ময় হচ্ছে, স্বাধীনতাবিরোধী বলে কুখ্যাত খুনি-দালালদের জনরোষ থেকে বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ১৬ ডিসেম্বর থেকেই প্রচেষ্টা চালানো শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল থেকে কুখ্যাত খুনি এবং দালালদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায় জেলখানা। কুখ্যাত দালালদের কাছ থেকে সে সময় আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে ১১ হাজার লিখিত আবেদন পড়েছিল, তাদেরকে জেলখানায় সরিয়ে নেয়ার জন্য। এদের বিচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার কালক্ষেপণ নীতি গ্রহণ করে।[১]

দেশে ফিরে আসার চার দিনের মাথায় আওয়ামী লীগ অফিসে তিনি দলীয় কর্মীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পথ পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'দালালদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে'।[৩]

২৬ এপ্রিল তিনি ভারতের *'স্টেট্স্‌ম্যান'* পত্রিকার সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন: যারা গণহত্যা করেছে তাদের রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যৎ

বংশধর এবং বিশ্বসমাজ আমাদের ক্ষমা করবে না।[৫]

বিভিন্ন মহল থেকে দালালদের বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত আদালতের দাবি ছিল। কিন্তু সেই দাবিকে উপেক্ষা করে ২৪ জানুয়ারি জারি করা হয় 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২'। এই আইনবলে যে সমস্ত কারণে ব্যক্তিবিশেষকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হলো– হানাদার বাহিনীকে সহায়তা-সমর্থন, বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা পাক হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে তাদের অবৈধ অবস্থান সুদৃঢ়করণে সহায়তা করতে দেশের ভেতরে বা বাইরে অপপ্রচার চালানো কিংবা হানাদার বাহিনীর কোনো প্রতিনিধিদলে প্রতিনিধিত্ব করা বা উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ।[৬]

দালালদের বিচারের জন্য এই আইনে দুই বছরের জেল থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী আসামির ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করার অধিকার থাকলেও ফরিয়াদীকে ট্রাইব্যুনালের বিচার্য অপরাধের জন্য অন্য কোনো আদালতে বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

অদ্ভুতভাবে এই আইনে বলা হয়েছিল, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) যদি কোনো 'অপরাধ'কে অপরাধ না বলেন, তবে অন্য কারো কথা বিশ্বাস করা হবে না, অন্য কারো অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে, অন্য কোনো আদালতেও মামলা দায়ের করা যাবে না। উল্লেখ্য, ওসিকে তুষ্ট করার মতো দালালদের আত্মীয়-স্বজনের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল। থানার ওসিকে তুষ্ট করেই স্বচ্ছল দালালেরা বিচার থেকে মুক্তি পেয়ে যায়।

কিছুটা অসুবিধা এবং ভুল হবার সম্ভাবনা থাকলেও একটু উদ্যোগী হলে কারা কারা হানাদার বাহিনীর সক্রিয় সমর্থক ছিল, তখন তা বের করা সম্ভব ছিল। দুর্ভাগ্যবশত, এ ব্যাপারটি খুব পরিচ্ছন্নভাবে করা সম্ভব হয়নি এবং গুজব ও ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হয়েছেন অনেকেই। অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই সমস্যাটি নির্ভুলভাবে মোকাবিলা করা হয়নি এবং মিথ্যা অভিযোগের শিকার কাউকে কাউকে হতে হয়েছে।[৭]

২৮ মার্চ দালাল আইনে বিচারের জন্য সারা দেশে সমস্ত জেলায় মোট ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে দালাল আইনের

বিচারকাজ শুরু হয়।

ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে মামলার ট্রায়াল শুরু করেছিলেন, সেই মামলায় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সাক্ষী ছিলেন করাচির 'ডন' পত্রিকার ঢাকার প্রতিনিধি মাহবুবুল আলম। শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হয়ে মাহবুবুল আলমকে প্রেস সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন।

'৭১ সালে ঢাকার এপিপি অফিসের জেনারেল ম্যানেজার আবুল হাশিম ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের জনসংযোগ অফিসার। সিএসপি রফিকুল্লাহ ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি।

কুখ্যাত খুনি জেনারেল টিক্কা খানের পিএস অনু ইসলাম চাকরি পান গণভবনে। মোনায়েম খানের এডিসি ব্রিগেডিয়ার মশরুলকে শেখ মুজিব নিজের এডিসি পদে নিয়োগ দেন।

পাকিস্তান আমলে তাজউদ্দীন আহমদের ওপর নজরদারির জন্য একটি টিম ছিল '৩০৩' নামে। ওই ৩০৩ টিমের সদস্য সিএসপি মতিউল ইসলামকে বসানো হয়েছিল অর্থসচিব পদে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা ধ্বংসলীলার সময় ঢাকা সিটির পুলিশের এসপি হিসেবে পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছেন ই এ চৌধুরী। স্বাধীনতার পর তিনি প্রমোশন পেয়ে ডিআইজি হন এবং গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

আগরতলা মামলার মিথ্যা সাক্ষী তৈরি করেছিলেন পুলিশ অফিসার এ বি এস সফদর। স্বাধীনতার পর তিনি কিছুদিন জেলে ছিলেন। বিশেষ তদবিরে মুক্তি পেয়ে তিনি হয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর গোয়েন্দা প্রধান।

লে. কর্নেল এ কে এম রহমান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সরবরাহ বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় কর্নেল রহমানের অবদান ছিল অনেক। তখন তিনি পাকিস্তান আর্মির সামরিক আদালত ১-এর বিচারক ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার বাহিনীর উপ-প্রধান ছিলেন লে. কর্নেল ফিরোজ সালাহ্উদ্দিন, যিনি রাজাকার বাহিনীর চীফ রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে নিযুক্ত হলেন রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব পদে।

শেখ মুজিব সরকারের সেনাপুলিশের প্রধান হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন হাকিম। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তান আর্মির ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের ট্রানজিট ক্যাপ্টেন হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সরাসরি অপারেশন পরিচালনা করেন। আখাউড়া, তেলিয়াপাড়া এলাকার অনেক মুক্তিযোদ্ধা তার অপারেশনে শহিদ হয়েছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মির গোলাবারুদ সরবরাহের দায়িত্বে থাকা পাকিস্তান আর্মির অর্ডিন্যান্স কোরের অফিসার লে. মোদাব্বের ও লে. ফরিদ স্বাধীন বাংলাদেশের পুলিশ বিভাগে উচ্চপদ লাভ করেন।

এয়ার কমোডর আমিনুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর ঢাকার প্রধান ছিলেন। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব সরকারের প্রশাসনে তিনি হলেন সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান।[৮]

হানাদার বাহিনীর বহু সক্রিয় দালালও গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পেল। অন্যদিকে বহু নির্দোষ ব্যক্তিকেও ক্ষমতাসীনদের ব্যক্তিগত রোষানলে পড়ে সর্বস্ব হারাতে হয়েছিল। এমনকি যে কোর্টে দালালির অভিযোগে রাজাকার, আল্-বদরদের বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদান করা হতো সে কোর্টের হাকিম নিয়োজিত হয়েছিলেন রাজাকার সর্দার।[৯]

৩০ নভেম্বর ১৯৭৩-এ তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৪ শ' ৭১ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮ শ' ৪৮ জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। এরমধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭ শ' ৫২ জন, বাকি ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। প্রথম মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় মাত্র একজন রাজাকারকে। সেই রাজাকারের নাম চিকন আলী।[১০] পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টে আপিল করে চিকন আলী ৮ বছর ৪ মাস জেল খেটে মুক্তিলাভ করে।[১১] ১৯৭৫ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত দালাল আইনে ৭৫২ জনের সাজা হয়। তাদের মধ্যে ১৫, মতান্তরে ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল।[১২]

এই দালাল আইনে রাষ্ট্রের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল, তার অপব্যবহার করে বহু আওয়ামী লীগ কর্মী বেপরোয়াভাবে অত্যাচার-নির্যাতন ও ব্ল্যাকমেলে মেতে ওঠেন। তারাই এই আইন নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন

বিধায় অনেক সত্যিকারের দালাল ঘুষ কিংবা ব্যক্তিগত পরিচয়ের বদৌলতে আইনের নাগাল এড়িয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। এদের একটি বিশেষ অংশ আওয়ামী লীগ কর্মীদের সহায়তায় গা-ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। ফলে এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে অসন্তোষ এবং সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে।

তবে দালালদের বিচার যে সহজ হবে না, তা ড. আনিসুজ্জামানের সাথে তাজউদ্দীন আহমদের আলাপে বোঝা যায়। যুদ্ধাপরাধীদের শাস্তি প্রসঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদ তাকে বলেন: চেষ্টার ত্রুটি হবে না, তবে কাজটি সহজও হবে না। তিনি বলেন: মার্কিনিদের চাপ আছে। তারা পাকিস্তানকে চাপ দিচ্ছে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে, ভারতকে চাপ দিচ্ছে যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়ে উপমহাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে। এছাড়া যুদ্ধবন্দিদের বিচার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইচ্ছুক নয়, ভারতও উৎসাহী নয়। এ অবস্থায় কার জোরে আপনি বিচার করবেন? আর মূল অপরাধীদের বিচার না করতে পারলে তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিচারের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য।[১৩]

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন, জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের সমাধান না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ব্যস্ত হয়েছেন। মনে হচ্ছে, এটাই যেন সরকারের সবচেয়ে প্রধান কর্তব্য। তিনি জাতির জন্য জরুরি সেই মুহূর্তে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৭১ সালের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাকবাহিনীকে সমর্থন দান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অনেকে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।[১৪]

দালালদের কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করে রাজনৈতিক নেতারা খুব সহজেই ঘুষ ও দুর্নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে এই পরিস্থিতি এমন এক স্তর পর্যন্ত উপনীত হয় যে, ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদেরও এই পরিস্থিতির খপ্পরে ফেলে হয়রানি-প্রতারণা করা হয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, 'হিন্দু ভারতের'

উস্কানীতেই এ সমস্ত কাজ চালানো হচ্ছে।[১৫]

২০১৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুরনো নথি পর্যালোচনা করে প্রথম ধাপে ১০ হাজার ৭৮৯ জন রাজাকারের তালিকা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অবমুক্ত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেন, 'যারা ৭১ সালে রাজাকার, আল্‌-বদর, আল্‌-শাম্‌স্‌ বা স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যেসব পুরনো নথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংরক্ষিত ছিল, সেটুকু প্রকাশ করা হয়েছে।'[১৬]

এই তালিকায় বিস্ময়করভাবে মুক্তিযুদ্ধে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের লক্ষ্যে গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি গোলাম আরিফ টিপুর নাম প্রকাশিত হয়। বরিশালের বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল– বাসদ নেতা ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তীর বাবা ও ঠাকুরমার (বাবার মা) নাম রাজাকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী বলেন, একদিকে তার বাবা অ্যাডভোকেট তপন কুমার চক্রবর্ত্তীর নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকার গেজেটে ৪১১৩ পৃষ্ঠায় ১১২ নম্বরে রয়েছে; অন্যদিকে নতুন প্রকাশ করা রাজাকার তালিকাতেও নাম উঠেছে তার। মনীষার ঠাকুরদা (বাবার বাবা) অ্যাডভোকেট সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তীর নামও রয়েছে মুক্তিযোদ্ধা তালিকায়। কিন্তু সুধীর কুমারের স্ত্রী অর্থাৎ মনীষার ঠাকুরমা (বাবার মা) উষা রানী চক্রবর্ত্তীর নাম স্থান পেয়েছে রাজাকার তালিকায়।[১৭]

'এই তালিকায় রাজনৈতিক পরিচয়ে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে ৫২ জনকে। যদিও এই তালিকায় কিছু খ্যাতনামা জামায়াতে ইসলামী নেতার নামের পাশে দলীয় পরিচয় দেয়া ছিল না।'[১৮]

সূত্র:

১. পূর্বদেশ; ১৫ জানুয়ারি ১৯৭২

২. দৈনিক বাংলা; ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

৩. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৬১

৪. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়; মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ড. আহমদ শরীফ, কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১৭

৫. দৈনিক বাংলা; ৩০ এপ্রিল ১৯৭২

৬. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৬১-৬২

৭. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ১০৯

৮. মুজিবের রক্ত লাল; এম আর আখতার মুকুল, অনন্যা প্রকাশনী, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২২-১২৩

৯. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩৩

১০. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়; মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ড. আহমদ শরীফ, কাজী নুরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির প্রমুখ সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ১৮-২০

১১. বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-১৯৭৫; হালিম দাদ খান, আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৭৩

১২. দালাল আইন ও এর আওতায় সাজা; কালের কণ্ঠ, ১৬ ডিসেম্বর ২০১০

১৩. মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

১৪. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭০-৭১

১৫. প্রগুক্ত, পৃষ্ঠা: ৭২

১৬. প্রথম আলো; ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯

১৭. ডয়েচে ভেলে; ১৬ ডিসেম্বর ২০১৯

১৮. তালিকাটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন:

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

> ‘সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার এ আসনে বসলে তোমাকেও তা-ই করতে হতো’।[২]

স্বাধীনতার পরে এ উজ্জ্বল বিকেলে শেখ মুজিবের কার্যালয়ে সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। নানা বিষয়ের সাথে কথা উঠলো দালালদের বিচার এবং ক্ষমা নিয়ে। আবদুল গাফফার চৌধুরী দাবী নিয়েই শেখ মুজিবকে বলেন, অন্তত দালালদের ‘পালের গোদাদের’ ছেড়ে দেয়া উচিত হবেনা। আবদুল গাফফার চৌধুরীর এই আবেদন শুনে শেখ মুজিব হেসে বললেন—

‘না, তা হয় না। সকলকেই ছেড়ে দিতে হবে। আমার এ আসনে বসলে তোমাকেও তা-ই করতে হতো। আমি তো চেয়েছিলাম, ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যকে ছেড়ে দিয়ে অন্তত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী অফিসারের বিচার করতে।

তাও পেরেছি কি? আমি একটা ছোট অনুন্নত দেশের নেতা। চারিদিকে উন্নত ও বড় শক্তির চাপ। ইচ্ছা থাকলেই কি আর সব কাজ করা যায়?'[২]

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকায় লুইস এম সাইমন্স লেখেন:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মুজিবকে এই মর্মে উপদেশ দিয়েছে যে, ৭৩ হাজার সামরিক ও ২০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তির বিচার হলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো নীতিভ্রষ্ট পাকিস্তানি জনগোষ্ঠী নিয়ে মহা সমস্যায় পড়ে যাবেন এবং এটি উপমহাদেশের শান্তি আলোচনাকে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করবে।[৩]

সেই বছর ৩০ নভেম্বর একটি আকস্মিক সরকারি ঘোষণায় যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই এবং দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন, এমন সকল আটক ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্বেকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি, জনসভায় ক্রন্দন, বিশ্বমানবসমাজ ও ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকার ভীতি প্রকাশ করে দেয়া বক্তব্য, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি বিস্মৃত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নির্দেশ দেন,

যেন এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত দালালকে ছেড়ে দেয়া হয়, যাতে তারা দেশের তৃতীয় বিজয় দিবস পালনের উৎসবে শরিক হতে পারে। তিনি এই দালালদের দেশগড়ার কাজে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।[১] সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর দালাল আইনে আটক ৩৭ হাজারের অধিক ব্যক্তির ভেতর প্রায় ২৬ হাজার ছাড়া পায়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় বলা হয়– নরহত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরকের সাহায্যে ঘরবাড়ি ধ্বংস অথবা জলযান ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ক্ষমা প্রযোজ্য হবে না। যদি অপরাধী অনুপস্থিত থাকে, সে ক্ষেত্রে সে সব অভিযুক্তদের সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন করতে হবে ও তাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রেই তারা সাধারণ ক্ষমার জন্য যোগ্য বিবেচিত হতে পারে, যদি তাদের বিরুদ্ধে উপরে উল্লিখিত অপরাধের অভিযোগ না থাকে।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও ১১ হাজারের বেশি ব্যক্তি যুদ্ধাপরাধের দায়ে কারাগারে আটক ছিল এবং তাদের বিচার কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯৭৫-এর ৩১ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট আবু সা'দাত মোহাম্মদ সায়েম সামরিক অধ্যাদেশ জারি করে দালাল আইন বাতিল করেন। থেমে যায় যুদ্ধাপরাধের বিচার কার্যক্রম। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই

মালেক মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ও শান্তি কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং 'বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্তকারী দালাল'সহ মূল স্বাধীনতা বিরোধীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

২৬ মার্চ, ১৯৭৫, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত এক ভাষণে অত্যন্ত ব্যথিত কণ্ঠে মুজিব বলেন, আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবো। আমি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমি তাদের বিচার করিনি। আমি তাদের ক্ষমা করেছি। কেননা আমি এশিয়া এবং বিশ্বের বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম।[৩]

এভাবেই মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী উন্মাদদের আবার স্বজন হারানো জনতার মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও সরকারি গেজেটে আত্মগোপনকারী দালালদের নাম, ঠিকানাসহ আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ, অন্যথায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুঁশিয়ারি জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা সমন প্রকাশিত হতে থাকে, কারণ ইতোমধ্যেই তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।[৪]

একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের কেন ক্ষমা করা হলো, এ নিয়ে আওয়ামী মহল ও বিরোধী মহলের ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। আওয়ামী লীগের আবেগাক্রান্তরা মনে করেন, দালালদের ক্ষমা করা ছিল 'বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা', দালালদের পুনর্বাসনের জন্য তাঁকে কোনোভাবেই দায়ী করা যাবে না। অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদীদের বক্তব্য– পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের উদ্ধার করার জন্য দালালদের ক্ষমা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। বিরোধী পক্ষ অবশ্য এ যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, আটকেপড়া বাঙালিদের মুক্তির জন্য ৯৬ হাজার যুদ্ধবন্দি যথেষ্ট ছিল। বিরোধীপক্ষের কেউ এভাবেও মূল্যায়ন করেছেন– '........ আওয়ামী লীগের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যদি সাম্প্রদায়িক, ভারত ও সোভিয়েতবিরোধী ও মার্কিনপন্থি শক্তিসমূহের প্রভাব বৃদ্ধি না হতো, তাহলে এই ক্ষমা প্রদর্শন করা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সম্ভব হতো না। এই পরিবর্তন যদি না ঘটতো, তাহলে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭২ সালের প্রথমে যাদেরকে বাংলাদেশের 'জাতশত্রু' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই জাতশত্রুদেরকে দেশ গড়ার কাজে আহ্বান জানানো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতো না।'[৪]

এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের মাতা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানরা ক্ষুব্ধ হন।[৪] স্বাধীনতাযুদ্ধে শহিদ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা লেখিকা জাহানারা ইমাম বলেছেন, গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যায় যাদের ভূমিকা

চিত্র-কথন: মুজিব ও প্রতিবাদী নারীসমাজ

পাকবাহিনীর দালাল এবং বুদ্ধিজীবী হত্যায় জড়িতদের বিচারের দাবি নিয়ে সে সময়ের নারীসমাজের বিশিষ্টজনসহ অনেকে এসেছিলেন পরম ভরসাস্থল প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে। কিন্তু সেদিনের প্রিয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তাদের সেই প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি করা দূরে থাক, উল্টো এসব দাবি তুলে যেন আন্দোলন জমিয়ে তোলার চেষ্টা করা না হয়, সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

স্বাধীন দেশে প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হানের নিখোঁজ হওয়ার সুরাহা করার দাবি তুলেছিলেন জহিরের বড় বোন। প্রধানমন্ত্রী মুজিব তাকে একদিন ডেকে নিয়ে বলেছিলেন: এ ব্যাপারে বেশি হইচই করলে তুমি নিজেও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারো।

তবে সবার আগে সমবেত নারীদের বঙ্গভবনের গেটে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বহুক্ষণ। এবং মুজিব এসে প্রথমেই তাদের বলেছিলেন, 'এরকম হইচই করার মানে কী?'

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালুকদার/দৃক

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর পরই তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার জন্য তা হয়নি। তৎকালীন সরকারের সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক একটি ভুল।[৫]

প্রখ্যাত সাংবাদিক শহিদ শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন, বর্তমানে রাজাকার, আল্-বদরদের যে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তা শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমারই ফল। ওই ক্ষমা ছিল বিচার-বুদ্ধিহীন। আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোনো নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন।[৫]

দেশ স্বাধীন হবার একদিন আগে, ১৫ ডিসেম্বর আল্-বদর, রাজাকাররা এক পরিবারের তিন সহোদরকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর, যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দিনে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তিন ভাইয়ের লাশ পাওয়া যায়। এই তিন ভাই হচ্ছেন– শহিদ বদিউজ্জামান বদি, শহিদ শাহজাহান ও শহিদ করিমুজ্জামান ওরফে মল্লুক জাহান।[৫]

শহিদ বদি পরিবারের মুখপাত্র হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলেন, রাষ্ট্র প্রধান যে কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা লাখ লাখ স্বাধীনতাকামী লোককে হত্যা করেছিল, তাদের ক্ষমা করে দেয়া ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। ছিল একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, শুধু ক্ষমা নয়, ওই সরকার শহিদ পরিবারগুলোর প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করেনি।[৫] শহিদ বদির পুত্র তুরান বলে যে, আমার পিতার হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ায় আমি স্তব্ধ।[৫]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক শহিদ ডাঃ মর্তুজার স্ত্রী মিসেস মর্তুজা বলেন, যাদের প্রাণ গেছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই বুঝতে পেরেছেন শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমার মর্মান্তিক মর্ম।[৬]

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের অমর সুরকার শহিদ আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বলেন, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা কোনোভাবেই উচিত হয়নি। সেদিন সাধারণ ক্ষমা না করা হলে, অন্তত আমার স্বামীকে হত্যা করে কোথায় 'দাফন' করা হয়েছিল তা জানতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার ফলে আমার স্বামীর বধ্যভূমির ঠিকানাও পাইনি।[৬]

শহিদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্ত্রী মনোয়ারা চৌধুরী বলেন, ঘাতকদের সাধারণ ক্ষমা করা হবে, তা আমরা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু সরকার সাধারণ ক্ষমা করে দিলো। আমরা ভেবেছিলাম, শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে ঘাতকদের বিচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। শেখ মুজিব তো ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের চিনতেন। সে চেনা-জানাটুকুও কাজে লাগলো না।[৬]

স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে নিহত জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী সামরিক অফিসারের কেন বিচার করা হলো না? শেখ মুজিব তো বহুবার বললেন, যুদ্ধাপরাধী অফিসারদের বিচার করবেন। কিন্তু পারলেন না। আবার তিনি এ দেশীয় ঘাতকদেরও ক্ষমা করে দিলেন। সেদিন অন্তত দু'-একজন ঘাতকেরও যদি সাজা হতো, তাহলে অনেক শহিদ পরিবারই শান্তি পেতো।[৬]

শহিদ অধ্যাপক সিরাজুল হকের স্ত্রী বেগম সুরাইয়া খানম বলেন, ঘাতকদের আমরা তো ক্ষমা করিনি। ক্ষমা করেছে সরকার। আমরা ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু তা পাইনি। এত বছর পরে বিচার চাইবোই-বা কার কাছে?[৭]

এদেশের সংবাদপত্র জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং দৈনিক ইত্তেফাকের 'মঞ্চে-নেপথ্যে' কলামের লেখক সিরাজউদ্দিন হোসেনের পুত্র শাহীন রেজা নূর বলেন, শুধু সাধারণ ক্ষমা নয়, এর আগে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছিল। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সুকৌশলে রেহাই দেয়া হয়। অথচ যাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রমাণ ছিল না, তাদেরকে জেলে ঢোকানো হয়। এছাড়া যারা হত্যার মূল পরিকল্পনা করেছিল, তারাও অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সকল দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যান। এ রকম প্রহসনমূলক বিচারের পর আবার আসলো সাধারণ ক্ষমা।[৭]

শাহীন রেজা বলেন, এ ধরনের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এর সাথে একমাত্র তুলনা হয় জার্মান একনায়ক হিটলারের 'কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের'। অথচ তৎকালীন সরকার জঘন্য হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিলেন। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছিল। আর এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছিল।[৭]

শহিদ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকির বৃদ্ধ পিতা শেখ মোহাম্মদ আবদুল বারী বলেন, শহিদদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে আওয়ামী লীগ সরকার '৭১-এর ঘাতকদের ক্ষমা করে দিলো। এই ক্ষমা ছিল এক অদ্ভুত খেয়ালীপনা।

পৃথিবীতে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। খুনিদের ক্ষমা করে দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, তা মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় যে, যারা হত্যা করে, তাদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। আর এই বিচার না হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে।[৭]

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর রহমান দালালদের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে মহানুভবতা দেখাতে পেরেছেন শ্রেণিস্বার্থ অভিন্ন বলে।[৪]

সূত্র:

১. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়; ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ২১

২. বাংলাদেশের রাজনীতি ১৯৭২-১৯৭৫; হালিম দাদ খান, আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃষ্ঠা: ৯৪

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৯৫

৪. একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়; ড. আহমদ শরীফ, কাজী নূরুজ্জামান, শাহরিয়ার কবির, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২, পৃষ্ঠা: ২২

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধান প্রণয়ন:
এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে প্রণীত সংবিধান

> ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে পাঁচ দফা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তবেই 'গণপরিষদ' নির্বাচন হয়েছিল। সেই পাকিস্তানের 'গণপরিষদ' দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন।[৪]

> 'গণপরিষদ' সদস্যের শতকরা নব্বইজনই স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন না। তারা ভারতে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা অসামাজিক কাজে জড়িত থেকে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময় রাজনৈতিকভাবে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করেছেন।[৬]

> মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক আইন-ই বহাল রাখা হলো। রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্র অপরিবর্তিত থাকলো।[২]

> নামে সংসদীয় পদ্ধতির সংবিধান ও সরকারব্যবস্থা হলেও প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্র ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল; এটা সংসদীয় ব্যবস্থার পরিপন্থি।

> ১৯৬২ সালে যেমন আইয়ুব খানকে সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল, ঠিক একই রকম ক্ষমতা দেয়া হলো শেখ মুজিবকে, স্বাধীন রাষ্ট্রে।

> এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান ছিলেন ড. কামাল হোসেন।[১২]

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার শপথ নেবে চুয়াডাঙ্গার মুক্তাঞ্চলে। তারিখ ঠিক হলো ১৪ এপ্রিল। খবরটি পৌঁছে গেল পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। ঠিক আগের দিন ১৩ এপ্রিল বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে পাকিস্তানি বাহিনী চুয়াডাঙ্গা দখল করে নিলো।

সবাই চিন্তিত– কোথায় শপথ অনুষ্ঠান করা যায়! এমন জায়গায় করতে হবে, যা হবে বাংলাদেশের ভূমিতে। কিন্তু যেখানে খুব সহজেই পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে দখল করতে পারবে না; সমস্যা হলে নিরাপদ জায়গায় ফিরেও আসা যাবে। মানচিত্র দেখে সবাই মিলে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আমবাগানকে শপথের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করলো। ভারতের সীমান্ত থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ছিল এই আমবাগান। পলাশীর আমবাগানে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হয়েছিলেন। আর ঠিক এমনই এক আমবাগানে বাংলাদেশ নামে নতুন এক আধুনিক রিপাবলিকের প্রথম সরকার শপথ নেবে– এই কল্পনা হয়তো সকলকেই আপ্লুত করেছিল।

বৈদ্যনাথতলায় পাঠ করার জন্য ঘোষণাপত্র তৈরি করা হলো। অনেক খেটেখুটে ঘোষণাপত্রটা তৈরি করলেন ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, সেটা দেখে দিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। ঘোষণাপত্রটা কোনো একজন অভিজ্ঞ আইনজ্ঞকে দেখানোর দরকার ছিল। আমীর-উল-ইসলাম ঘোষণাপত্র নিয়ে দেখা করতে গেলেন কলকাতা হাইকোর্টের ডাকসাইটে আইনজীবী সুব্রত রায় চৌধুরীর কাছে। নিরাপত্তার কারণে সুব্রত রায় চৌধুরীর কাছে নিজের আসল নাম জানাননি আমীর-উল-ইসলাম।

নিজেকে রহমত আলী পরিচয় দিয়ে বালিগঞ্জে সুব্রত রায় চৌধুরীর অভিজাত বাড়িতে গেলেন আমীর-উল-ইসলাম। নিতান্ত একজন যুবককে এমন গুরুত্বপূর্ণ দলিল নিয়ে আলোচনা করতে আসতে দেখে হয়তো সুব্রত রায় চৌধুরী অবাকই হয়েছিলেন। ঘোষণাপত্রটা হাতে নিয়ে পড়লেন সুব্রত রায় চৌধুরী। পড়তে পড়তেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জিজ্ঞেস করলেন, কে লিখেছে এটা? আমীর-উল-ইসলাম কুণ্ঠিতভাবে জবাব দিলেন–আমিই লিখেছি। সুব্রত রায় চৌধুরী আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, অসাধারণ কাজ হয়েছে। এটার দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলনও পাল্টানোর দরকার নেই। তিনি বললেন, বাংলাদেশের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা যে আইনানুগ অধিকার, সেটা যে মানবাধিকার, এই ঘোষণাপত্রে তা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। সুব্রত রায় চৌধুরী এই ঘোষণাপত্র দেখে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, এই ঘোষণাপত্রের ওপর ভিত্তি করে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ওপরে *'জেনেসিস অব বাংলাদেশ'* নামে এক কালজয়ী বই লিখে ফেলেন।

শপথ অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি চেক করতে গিয়ে দেখা গেল, জেনারেল ওসমানীর সামরিক পোশাক নেই। অথচ তার সামরিক পোশাকেই শপথ অনুষ্ঠানে থাকতে হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছেও জেনারেল ওসমানীর শরীরের

চিত্র-কথন:

১০ আগস্ট ১৯৭১ প্রবাসী সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের একটি টিভি সাক্ষাৎকার বিশ্ব প্রচার মাধ্যমে প্রচার হয়। সেখানে তাকে বাংলাদেশের ডেপুটি লিডার উল্লেখ করা হয়। সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের বিচার প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বলেন শেখ মুজিব বিপ্লবের মাধ্যমে নেতা হননি তিনি ইয়াহিয়ার অধীনেই নির্বাচন করে নেতা হয়েছেন। তিনি বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভোটে নির্বাচিত নেতা। তার জীবন নাশের হুমকি দেয়ার সাহস কারো নেই। যদি কিছু ঘটে তবে তা বিশ্ব নেতাদের আহত করবে। তখন বিশ্ব নেতারাই তার জীবন রক্ষায় ভূমিকা নিবে। এ বিষয়ে যখন প্রয়োজন হবে তখন তারাই প্রয়োজনীয় এবং কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। ভিডিওটি দেখতে নিচের কিউআরকোডটি স্ক্যান করুন:

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

মাপে কোনো সামরিক পোশাক পাওয়া গেল না। অগত্যা খাকি কাপড় কিনে জরুরিভিত্তিতে পোশাক বানানোর অর্ডার দেয়া হলো।

১৬ এপ্রিল কলকাতা প্রেসক্লাবে সবাইকে জানানো হয়েছিল পরদিন ভোরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের একটা বিশেষ বার্তা দেয়া হবে। যারা এই বার্তা নিতে চান, তারা যেন কাকডাকা ভোরে কলকাতা প্রেসক্লাবে চলে আসেন।

এদিকে আওয়ামী লীগের এমপিএ, এমএনএ ও নেতাদের খবর দেয়া হয়, তারা যেন খুব সকালে সিনহা রোডে চলে আসেন। ১০০টা গাড়ি তৈরি রাখা হলো; সারা রাত আয়োজকদের চোখে উত্তেজনায় ঘুম নেই। সকাল হতেই কলকাতা প্রেসক্লাব আর সিনহা রোডে জড়ো হওয়া আওয়ামী লীগের নেতা আর সাংবাদিকদের জানানো হলো, আজকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ অনুষ্ঠান হবে বাংলাদেশের মাটিতে। সকলেই উত্তেজিত এই অভূতপূর্ব খবর শোনার পর।

উত্তেজনা আর আনন্দে ভাসতে ভাসতে ১৭ এপ্রিল বেলা এগারোটার মধ্যেই সবাই বৈদ্যনাথতলায় পৌঁছে গেলেন। চারিদিক লোকে-লোকারণ্য। নেতাদের 'গার্ড অব অনার' দেয়া হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করলেন: আমরা ঘোষণা করলাম কেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বৈধ এবং যুদ্ধে জিতে আমরা কেমন রাষ্ট্র গঠন করবো।[১]

দুই

মুজিবনগর সরকার স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ঘোষণা করে– সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার বা ইনসাফ। যুদ্ধে জিতে এই তিন নীতি বাস্তবায়নের জন্য সেদিন অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যরা শপথ গ্রহণ করেন। অথচ যুদ্ধশেষে ১৯৭২-এ সংবিধান রচনার সময় মূলমন্ত্র লিখিত হয়– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আর সেই থেকে শুরু সেক্যুলার (!) এবং ধর্মপ্রাণ মানুষের পারস্পরিক সন্দেহ ও বিরোধ– বিভেদ আর অনৈক্যের যাত্রা।

সংবিধান প্রণয়নের স্বীকৃত পদ্ধতি হলো সরাসরি জনগণের ভোটের মাধ্যমে শুধু সংবিধান প্রণয়নের জন্যই একটি সংবিধান সভার নির্বাচন। পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণপরিষদ গঠিত হয়েছিল বটে; তবে সেই গণপরিষদের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন। শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনের আগে বার বার বলেছিলেন যে, ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতেই নতুন সংবিধান রচিত হবে।

১৯৭১ সালের নয় মাসের সর্বাত্মক প্রতিরোধ সংগ্রামে লাখ লাখ মানুষের জীবনদান, উদ্বাস্তু ও বিপন্ন হয়ে পড়া, অবর্ণনীয় অমানবিক অবস্থার মধ্যে

বসবাস, বর্বর নির্যাতন, স্বজন হারানোর বেদনা, প্রতিরোধের স্পর্ধিত সাহস, সবকিছু মিলিয়ে মানুষের চেতনার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্তন এত দ্রুতগতিতে এবং ব্যাপকভাবে ঘটে যে, যুদ্ধের আগের মানুষ আর যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধপরবর্তী মানুষের মধ্যে চেতনাগতভাবে পরিবর্তিত এক নতুন মানুষের উন্মেষ ঘটে। পাকিস্তানের নাগরিক যারা ছিলেন পরাধীন, স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবেই তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে।[২]

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্যদের দিয়েই নতুন সংবিধান প্রণয়নের কাজ শুরু করে। বাহাত্তর সালেই ভাসানী ন্যাপ প্রথম জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অধীনে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের নির্বাচনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ম্যান্ডেট নিয়ে বিজয়ী ব্যক্তিদের দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে।[৩]

মওলানা ভাসানী বলেছিলেন– 'জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ৫ দফা শর্ত মেনে এই সদস্যরা নির্বাচনে গিয়েছিলেন। সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদ তথা গণপরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল, তৎসহ নির্বাচিত হয়েছিল প্রাদেশিক পরিষদ। পাকিস্তান কায়েম থাকাকালে এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই দুই সময়ের ব্যবধান মাত্র নয় মাস হলেও রাজনৈতিক সচেতনতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের দিক থেকে জনগণ অনেক এগিয়ে গেছে।'[৪]

মওলানা ভাসানী ন্যাপের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় বলেন, 'বর্তমান গণপরিষদে ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়া সরকারের আইনগত কাঠামোর অধীনে নির্বাচিত সদস্যগণ ৬ দফা দাবি আদায়ের জন্য জনগণের ম্যান্ডেট পেয়েছিল। সুতরাং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিত সংগ্রামে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় তাদের কোনো অধিকার নেই।'[৫]

এছাড়া ন্যাপের মোজাফ্ফর আহমদ বাহাত্তরের ২১ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সর্বদলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। ওই সংবাদ সম্মেলনে তিনি গুরুতর প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। তিনি বলেন– 'আরেকটি সাধারণ নির্বাচন না করে দেশের জন্য কোনো স্থায়ী সংবিধান গ্রহণ করা যেতে পারে না। কারণ, স্বাধীনতা যুদ্ধকালে দেশে একটা গুণগত পরিবর্তন সাধন হয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের মতামত যাচাই ও বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে অপর একটি নির্বাচন করা অপরিহার্য।'[২]

এমনকি ছাত্রলীগের দুই প্রভাবশালী নেতা আ স ম আবদুর রব ও শাহজাহান সিরাজ নৈতিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, পরিষদ সদস্যের শতকরা ৯০ জনই যেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না থেকে আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিয়ে এবং নানা ধরনের অসামাজিক কাজে লিপ্ত থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সম্পূর্ণ সময়টুকু ভারতে রাজনৈতিকভাবে নির্লিপ্ত জীবনযাপন করেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার সে সব গণপরিষদ সদস্যের আদৌ আছে বলে দেশবাসী মনে করেন না। তারা আরো একটি গুরুতর প্রশ্ন তুলে বলেন, '৫০ জনের অধিক পক্ষত্যাগী, দুর্নীতির দায়ে বহিষ্কৃত ও অনুপস্থিত গণপরিষদ সদস্যের অবর্তমানে অর্থাৎ, বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি লোকের প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই গণপরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এরকম একটি অসম্পূর্ণ সংসদ সংবিধান প্রণয়নের অধিকার রাখে কি-না।'[৬]

যদিও সদ্য দায়িত্বগ্রহণকারী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উল্লিখিত শূন্য আসনে শিগগিরই উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু এই উপনির্বাচনগুলো কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারির যে বৈঠকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার থেকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার' প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। ওই বৈঠকে তিনি জানান, 'সংবিধান পরিষদ'কে আইন প্রণয়ন কিংবা মন্ত্রিসভার কাজকর্ম তদারকির কোনো ক্ষমতাই দেয়া হবে না। শেখ মুজিবুর রহমানের দেবতুল্য জনপ্রিয়তার মুখে কেউ এর প্রতিবাদ করতে সাহস করেননি; কেবল ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম 'অনভিজ্ঞতাহেতু' আপত্তি প্রকাশ করেন এবং মুজিবকে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, অস্থায়ী সংবিধান আদেশে খসড়া প্রণয়নের আগেই নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা অবশ্যই আহ্বান করা উচিত। আর আইন পরিষদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা না দেয়াটাও চরম অগণতান্ত্রিক হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান তাকে তিরস্কার করে থামিয়ে দেন এই বলে যে, 'তুমি একজন অনভিজ্ঞ যুবক, তুমি রাষ্ট্র এবং প্রশাসন সম্পর্কে কী এমন জ্ঞান রাখো?'[৭]

'আমীর-উল-ইসলাম ওই বৈঠকে নিজেকে 'স্টুপিড' হিসেবে আবিষ্কার করলেন।
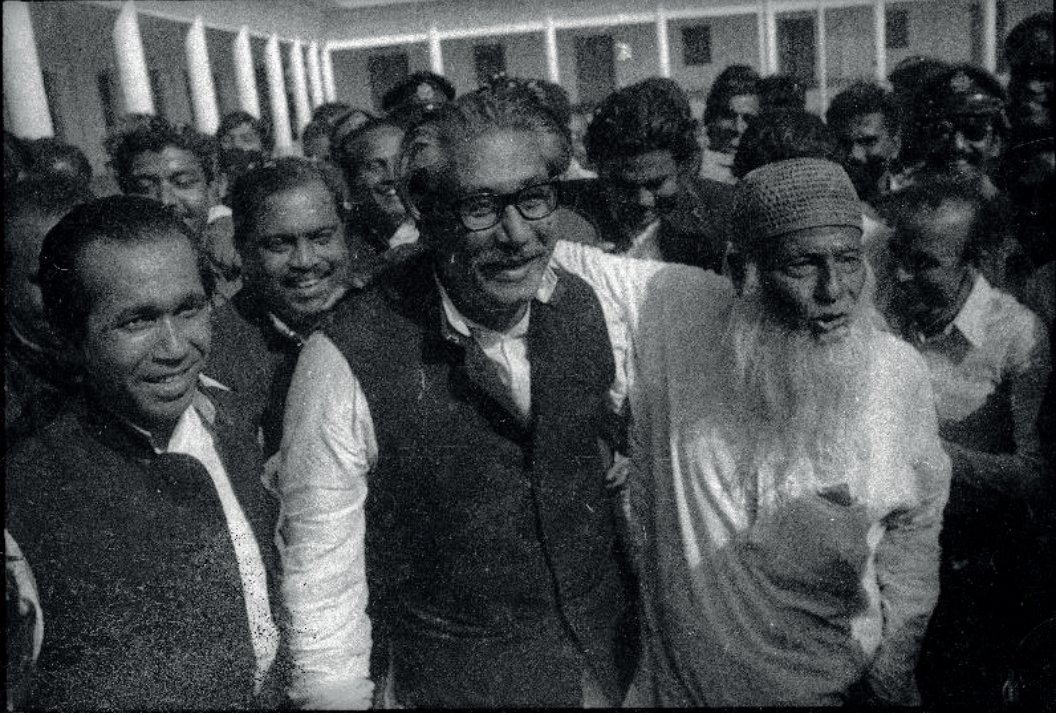
চিত্র-কথন: ভাসানী-মুজিব; সন্তোষ

পিতা-পুত্রের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ বাঙলা আর বাঙালির দুই নেতা– মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান। স্থানটি সম্ভবত টাঙ্গাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানী প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরই প্রাথমিক পর্বের অবকাঠামো পরিদর্শনে এসেছিলেন সেদিনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব, যাকে ভাসানী পুত্রবৎ জ্ঞান করতেন। কাছে পেলেই পুত্রস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরতেন– গণমানুষের স্বার্থে, তাদের দুর্দশা লাঘবে সদা তৎপর থাকতে, নিজেকে উৎসর্গ করতে প্রেরণা জোগাতেন।

কিন্তু রাজনীতির হীন স্বার্থচেতনা অকৃত্রিম স্নেহ-মমতার সেই মহামূল্য বন্ধনকেও মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। মওলানা ভাসানী মুজিবের স্বার্থের অনুকূলে ত্যাগী ঋষি-দরবেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বহুবার। কিন্তু ভাসানীর গণমুখী নীতির কারণে ক্ষুব্ধ মুজিব নিজের গণবিরোধী নীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে এই সন্তোষেই তাঁকে গৃহবন্দি করে রেখেছেন।

সারাজীবন ভাসানীর রাজনৈতিক সহায়তা-সমর্থনে ক্রমশ রাজনীতির উচ্চতর এবং অগ্রবর্তী কাতারে সমাসীন মুজিব তাঁর রাষ্ট্রক্ষমতা আঁকড়ে থাকার প্রশ্নে পিতৃতুল্য ভাসানীর কোনো সদুপদেশ আর মহৎ পরামর্শ আমলে নেননি। আর তার মূল্যও তাঁকে দিতে হয়েছিল অত্যন্ত চড়া দামে।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালকুদার/দৃক

'অভিজ্ঞ' ব্যক্তিরা কেউ তার সমর্থনে কিছু বলার সাহস পেলেন না।'[৭]

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান প্রস্তাব আকারে সংসদে উত্থাপন করা হলে মোজাফফর ন্যাপের সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত খসড়া শাসনতন্ত্র নিয়ে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগের সকল গুরুত্বপূর্ণ নেতাও ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানের ওপর জনরায় নেয়ার জন্য গণভোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যে সব ধারার নিন্দা আওয়ামী লীগ '৫৬ সালে করেছিল, হুবহু সেগুলোই তারা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে প্রবিষ্ট করিয়েছে। '৬২ সালের শাসনতন্ত্র তৈরি করা হয়েছিল আইয়ুব খানকে সামনে রেখে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে প্রধানমন্ত্রীকে সেই একই রকম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।[২]

স্বতন্ত্র সদস্য মানবেন্দ্র লারমা বলেন, 'শাসনতন্ত্র বিলের প্রতিটি ধারাই প্রমাণ দেয় যে, এক হাতে জনগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে, আবার অন্য হাতে সে অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতি দাবি করে তিনি বলেন, আমি সেই নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসত্তার একজন। .... আমরা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু আমাদের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের। খসড়া সংবিধানে আমাদের জাতিসত্তার কথা নেই।'[২]

পার্লামেন্টারি পার্টির সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে সদস্যপদ বাতিলের আদেশটিও খসড়া সংবিধানের একটি অনুচ্ছেদ হিসেবে সংযোজিত হয়। এই অনুচ্ছেদের কারণে গণপরিষদের কোনো সদস্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারেন না। দলের মতের বাইরে কথা বলার কোনো অধিকার সংসদ সদস্যদের ছিল না। এই ধারাটি গণপরিষদকে কার্যত আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি পার্টির সঙ্গে একাকার করে ফেলেছিল।[৮]

১৯৬৯ সালে জাতীয় পরিষদে যখন আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধনী বিল পেশ করেন তখন আওয়ামী লীগ থেকে একই বৈশিষ্ট্যের একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।[৯] শাসকশ্রেণি যে রাষ্ট্রের মৌলিক সবগুলো প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে অবিশ্বাস করে সংবিধানের এই ধারা তারই ইঙ্গিত দেয়।[১০]

চার

প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক কী জনগণ?

সংবিধান পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছে– 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ'। কিন্তু বিষয়টি এখানে শেষ হয়নি। বাক্যটি একটি সেমিকোলন চিহ্ন দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'এই ক্ষমতা কেবল সংবিধানের অধীনে ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে'। এখানে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে আসে, তা হলো সংবিধান জনগণের এ ক্ষমতা কাদের, কীভাবে প্রয়োগের দায়িত্ব দিয়েছে? অর্থাৎ প্রয়োগের মালিক প্রধানমন্ত্রী। সংবিধান উচ্চকণ্ঠে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিকানা জনগণের বলে ঘোষণা করলেও তা ভোগ করার সকল ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। জনগণকে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে ভোটদানের অধিকার ছাড়া তার ক্ষমতা প্রয়োগের অন্য কোনো বিধান এই সংবিধানের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ হলেও আখেরে জনগণ দাস হয়ে যায়।

রাষ্ট্রপতির ভূমিকা কী?

সংবিধানের রাষ্ট্রপতিবিষয়ক অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, 'কেবল প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তার অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শ দান করিয়াছেন কি না এবং করিয়া থাকিলে কী পরামর্শ দান করিয়াছেন, কোনো আদালত সেই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের তদন্ত করিতে পারিবে না।' অর্থাৎ সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে যে সকল ক্ষমতা দিয়েছে বলে প্রাথমিক পাঠে মনে হয়, তার কোনোটাই তার নেই, সবই তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করতে বাধ্য। বিচারপতি বা নির্বাচন কমিশনের নিয়োগ, অর্থাৎ সকল সাংবিধানিক পদে নিয়োগ দান, যেকোনো দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির দণ্ড মওকুফ, কোনো কিছুই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত করার ক্ষমতা সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দেয়নি।

সংবিধান সাধারণভাবে পাঠ করলে মনে হতে পারে, রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারপতি ও এটর্নি জেনারেল নিয়োগ করার অধিকারী কিংবা তিনি নির্বাচন কমিশন, মহাহিসাবনিরীক্ষক বা সরকারি কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা ও নিয়োগের ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আগের

অনুচ্ছেদ মনে রাখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ দৃশ্যত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ক্রীড়নক বৈ কিছুই নন।

সংবিধান তাকে দিয়েছে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতা। তবে অনুচ্ছেদে এটাও বলা হয়েছে, যে এমপি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবে, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষমতাও তার নয়, এটি হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োগকৃত ক্ষমতার বাইরে সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী করেছে। মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী নিয়োগ ও নিয়োগের অবসান ঘটানোর এখতিয়ারও সংবিধান প্রধানমন্ত্রীকেই দিয়েছে। মন্ত্রিসভাকে যদিও যৌথভাবে সংসদের কাছে দায়বদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সংবিধানে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তিনি যদি উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন অথবা সংসদে দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে সংসদে তার আসন শূন্য হবে। উল্টো সংসদকে দলের কাছে জিম্মি করে দিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী যদি দলীয় প্রধান হন তবে সংবিধান তার কাছে যে ক্ষমতা অর্পণ করেছে তা পুরাকালের সম্রাটদের জন্যও ঈর্ষণীয়।

সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রীকে ইমপিচ কী করা যায়?

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে তাহলে তদন্ত করবে কে? এটাও কি রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে? প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে, তাহলে সেটা তদন্ত করবার অধিকারীই-বা কে? তিনি কেমন করে সেটা করবেন? প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় বিষয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করবেন, ঠিক আছে; কিন্তু অবহিত হয়ে থাকাই কি যথেষ্ট? যদি প্রধানমন্ত্রীর কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড বা পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক নির্ণয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিংবা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হয়, তাহলে তার বিচার কে করবে? এই বিচারের সুযোগ আমাদের সংবিধানে নেই। এভাবেই সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির জন্য বা দেশদ্রোহিতার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে দায়ী, দোষী সাব্যস্ত ও বিচার করবার সাংবিধানিক সুযোগ সংবিধানে নেই।

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ইমপিচ বা অভিশংসন করা যায়। আর আমাদের এমন সংবিধান, যাতে প্রধানমন্ত্রীকে ইমপিচ করা দূরে থাক, সাংবিধানিকভাবে তার কাছে জবাবদিহিতা চাইবার ও আদায়

করবার কোনো সুযোগ নেই, ব্যবস্থাও নেই।[১১]

রাষ্ট্র তার ঘোষিত নীতির উল্টো কোন নীতি বাস্তবায়ন করতে পারে কী?

সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের একটি অংশ রাজনৈতিক এবং অপরটি অর্থনৈতিক। রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তার বাস্তবায়ন আদালতের এখতিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন নাও তোলা হয়, আর রাষ্ট্র যদি তার ঘোষিত নীতির বিপরীতে কোনো নীতি বাস্তবায়নে ব্যাপৃত হয়, তবে তা আদালতে গিয়ে বন্ধ করা যাবে না।

সংসদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আইন প্রণয়নে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। সংসদকে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধানের সবকিছুই পরিবর্তন বা রহিতকরণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। হোক তা মূলনীতি, হোক তা মৌলিক অধিকার, হোক তা অন্য কিছু। রাষ্ট্রের মূলনীতি বাস্তবে প্রয়োগ না করে এর সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চললেও তা কোনোভাবেই সংবিধান লঙ্ঘন হয় না এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা বন্ধ করার কোনো বৈধ বা সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে যা খুশী তাই করা যায়?

পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই সংবিধান সংশোধন করা যাবে। জনগণের অভিপ্রায়ের প্রকাশ যদি হয় সংবিধান, তার স্বাধীনতা রক্ষার সনদ যদি হয় সংবিধান, তাহলে জনগণের ঊর্ধ্বে কারো অবস্থান হতে পারে না। সুতরাং জনগণ তার জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায় হিসেবে যা ঠিক করবেন, সেটা সংশোধনের এখতিয়ার কোনোভাবেই আইনসভার কাছে থাকতে পারে না। জনগণের অনুমোদন ছাড়া সংবিধান সংশোধন হতে পারে না।

আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের যিনি রচয়িতা সেই টমাস্ জেফার্সন্ পরিষ্কার করে বলেছিলেন, সংবিধান সংশোধন করার এখতিয়ার সিনেটের হাতে থাকতে পারে না। আইনসভার সদস্যরা নিজেরাই এই সংবিধানের, অর্থাৎ জনগণের অভিপ্রায়ের আইনি সনদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সুতরাং তারা নিজেরা যদি সংবিধান সংশোধন করতে যান তাহলে তাদের নিজেদের ক্ষমতা

ও কর্তৃত্বের যা উৎস তাকেই অস্বীকার করা হয়, নিজেদেরকেও অস্বীকার করা হয়। সুতরাং সাধারণ সিনেটের কাছে সংবিধান সংশোধনের এখতিয়ার থাকতে পারে না। সংবিধান সংশোধন করতে হলে আবশ্যিকভাবে নতুন করে জনগণের অনুমোদন নিতে হবে।

সে কারণেই সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একদলীয় শাসনব্যবস্থা 'বাকশাল' কায়েম করাটা ছিল সংবিধান-বিরোধী পদক্ষেপ এবং সংবিধানের ঘোরতর লঙ্ঘন। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদে এমপিগণ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে জনগণের মতামতের তোয়াক্কা না করেই সেদিন সংবিধানের অপরিহার্য মৌলিক শর্ত ও নৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছিলেন।[১১]

রাষ্ট্র কীভাবে, কার কাছ থেকে, কত টাকা আদায় করে কার জন্য, কত টাকা খরচ করবে তা নির্ধারণের জন্য যে বিল আনা হয় তাকে 'অর্থবিল' বলা হয়। সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার কোনো বিলকে অর্থবিল হিসেবে সার্টিফিকেট দেয়ার পর এ বিষয় চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং এ সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না; রাষ্ট্রের অর্থ যেকোনোভাবে খরচ করলে, আত্মসাৎ করলে, লুণ্ঠন করলেও। জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্ন তোলার এতটুকু অবকাশও সেখানে নেই।

সংবিধানের একাদশ ভাগে অর্থাৎ একেবারে শেষদিকে একটি প্রায় অনুল্লেখ্য অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, তবে অনুরূপ আইন এই সংবিধানের অধীনে প্রণীত আইনের দ্বারা সংশোধিত বা রহিত হইতে পারিবে।'

অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে যে সব আইন, বিধি-বিধান জারি ছিল– তা ছিল ব্রিটিশদের পরিত্যক্ত– তাই দুই দুইবার স্বাধীনতার পরও দাঁড়ি-কমাসমেত বাংলাদেশে জারি করা হলো।

সংবিধানে যেখানে মৌলিক অধিকারসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে সে অধিকারসমূহকে 'আইনানুযায়ী' বা 'আইনের বিধান সাপেক্ষে' বা 'জনস্বার্থে প্রচলিত আইনের বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কীভাবে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে তার একটি উদাহরণ এখানে দেয়া যেতে পারে। সংবিধানে বলা হয়েছে- 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে

কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।’

তার অর্থ দাঁড়ায়– আইনের মাধ্যম ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত করা যাবে না। অর্থাৎ আইন নির্ধারিত পদ্ধতিতে তা করা যাবে। এজন্যই পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত বিচারবহির্ভূত হত্যা, যা ‘ক্রস্‌ফায়ার’ নামে কুখ্যাত, তার মতো বর্বর ব্যবস্থাটিও সংবিধানসম্মত হয়ে যায়। কারণ, দেখানো যায় ‘ক্রস্‌ফায়ার’ও আইনসম্মত।

১৮৯৮ সালের ব্রিটিশ প্রবর্তিত ফৌজদারি কার্যবিধি বা সংবিধানসম্মত আইনের ধারা অনুযায়ী বিচারে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে, এমন অভিযোগে অভিযুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্র ছাড়া পুলিশ কাউকে হত্যা করতে পারবে না। এমন কোনো ঘটনা ঘটলে একটি প্রশাসনিক তদন্তে গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটিকে ‘আত্মরক্ষামূলক’ বলে মনে করলেই হত্যাকাণ্ডটি আইনসম্মত হয়ে যায়। সেই জন্য পুলিশের বা র‍্যাবের গুলিতে নিহত প্রত্যেককে ‘সন্ত্রাসী’ ও ‘খুনের মামলার আসামি’ হতে হয়।[২]

সংবিধানে বলা আছে ‘বাংলাদেশের নাগরিকগণ ‘বাঙালি’ বলিয়া পরিচিত হইবেন’। এই বাক্য দিয়ে সংবিধানে ‘বাঙালি’ ছাড়া অন্যান্য জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হলো। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের যে ‘বাঙালি’ ছাড়াও অন্যান্য জাতিসত্তার অংশগ্রহণ ছিল, জীবনদান ছিল তা-ও ভুলে যাওয়া হলো।

রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি অংশে বলা আছে, ‘ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত একক সত্তাবিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করিয়া জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করিয়াছেন সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হইবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।’

জাতির সংজ্ঞা ও রাষ্ট্রের মূলনীতির মধ্যে কোথাও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তার প্রশ্নটি অনুপস্থিত। শুধু অনুপস্থিত-ই নয়, বরং প্রবল ‘বাঙালি’ অহমিকা এবং উগ্রতাকে সাংবিধানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং নাগরিক অধিকারটুকু হরণ করে নেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। যারা ভাষাগত ও সংস্কৃতিগতভাবে বাঙালি নন, সংবিধান অনুযায়ী তারা বাংলাদেশের নাগরিকই থাকেন না।

আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম নীতি হচ্ছে অন্য জাতিগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় পরিচয় এবং নাগরিক অধিকার স্বীকার করা। এই প্রবল জাত্যাভিমান এবং বাঙালি-সাম্প্রদায়িকতা কেবল এই অনুচ্ছেদেই সীমাবদ্ধ নেই। একদিকে সংবিধানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, অন্যদিকে অন্য ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠীর যে অন্তত মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকারের কোনো স্বীকৃতি নেই। মুক্তিযুদ্ধে ভাষাগত ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে এদেশের জনগণ জীবন-মরণ সংগ্রাম করলো, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সেই একই ভাষাগত ও জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনা শুরু করলো নব্য শাসকগোষ্ঠী এবং এর হাতিয়ার হলো তাদের রচিত সংবিধান।

রাষ্ট্রিয় কোনো চুক্তি, হোক তা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক, তা সম্পাদনের পূর্বে বা পরে জনগণের কোনো মতামত গ্রহণের জন্য কোনোভাবেই জনগণের কাছে বা তার প্রতিনিধির কাছে উপস্থাপনের কোনো ব্যবস্থা রাখেনি। সে জন্য '৭২-এর সংবিধান অনুযায়ী তেল-গ্যাস-কয়লা রপ্তানি, অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো প্রকার চুক্তি, হোক তা ট্রানজিট বা করিডোর, কোনো কিছুর জন্যই চুক্তির আগে বা পরে তা দেশবাসীর সঙ্গে আলোচনার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা নেই। সকল গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিই সম্পাদিত হয় জনগণকে অন্ধকারে রেখে। এমনকি সংসদেও সেই চুক্তি নিয়ে আলোচনার কোন বাধ্যবাধকতা সরকারের নেই।

যে নির্বাচনী এলাকা থেকে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত, সেই নির্বাচকরা যদি মনে করেন তাকে আর তাদের প্রতিনিধি রাখবেন না, তাহলে ওই জনগণের হাত-পা বাঁধা, কিছুই করার নেই তাদের। অর্থাৎ, প্রতিনিধি প্রত্যাহার করার কোনো সুযোগও সংবিধানে নেই।

মুক্তিযুদ্ধের মতো এমন একটা মহৎ গণযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেই দেশের উদ্ভব সেই মুক্তিযুদ্ধের ছাপই ৭২ এর সংবিধানে নেই।[২]

'৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানের বর্ণবাদী, অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী চরিত্রের প্রশ্ন তুলে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার একমাত্র প্রতিনিধি ও সংসদে সরকারবিরোধী স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে যে মানুষটি সংগ্রাম করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। সংসদে সংবিধান বিলের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংসদে তিনি

চিত্র-কথন:

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ (এএইচএম) কামারুজ্জামান, জাতীয় নেতা ও বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গঠিত অস্থায়ী সরকারে তিনি ছিলেন, স্বরাষ্ট্র, কৃষি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মম হত্যার শিকার হওয়া জাতীয় চার নেতার তিনি একজন। ১৯৭৫ এ 'অমানুষ' ছায়াছবির মহরত অনুষ্ঠানে তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী এএইচএম কামারুজ্জামান, ছবির অভিনেতা নায়ক রাজ রাজ্জাক ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

বলেছিলেন, '....বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের সে সব জাতির কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এই খসড়া সংবিধানে নেই। বিভিন্ন জাতিসত্তার কথা যে এখানে স্বীকৃত হয়নি সে কথা আমি না বলে পারছি না।....পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপজাতীয় এলাকা। এই এলাকার সে সব ইতিহাসের কথা, আইনের কথা এই সংবিধানে নেই।....'[২]

'মাননীয় স্পিকার সাহেব, এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আজকে আমি আপনার মাধ্যমে একজন সরল মানুষের অভিব্যক্তি প্রকাশ করছি। আমাদের এলাকাটা

একটি উপজাতি এলাকা। এখানে বিভিন্ন জাতি বসবাস করে। এখানে চাকমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, সিয়াং এবং চাক এই রূপ ছোট ছোট দশটি উপজাতি বাস করে। এই মানুষের কথা আমি বলছি। এই উপজাতি মানুষদের কথা ব্রিটিশ সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী গভর্নমেন্ট আমাদের অধিকার ১৯৫৮ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে স্বীকার করে নিয়েছিল। জানি না আজকে যে গণতন্ত্র হতে যাচ্ছে, সমাজতন্ত্র হতে যাচ্ছে, তখন কেন আপনারা আমাদের কথা ভুলে যাচ্ছেন।'[২]

সংখ্যালঘু জাতির এই প্রতিনিধির আকুতিতে সেদিন কর্ণপাত করা হয়নি, বরং নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার অন্য সকল জাতিসত্তার মানুষকে 'বাঙালি' হয়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সংখ্যালঘু জাতিসত্তার ওপর এই জাতিগত নিপীড়ন আর অপমানের ফলাফল আমরা পরবর্তী সময়ে লক্ষ্য করি অধিকার আদায়ের জন্য পাহাড়ি জনগণের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার ভেতর দিয়ে।

তৎকালীন ন্যাপ (মো.) নেতা ও পরে আওয়ামী লীগ নেতা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। তিনি তার বাকি সব দাবি ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, অন্তত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হোক। সেটুকুও করা হয়নি ওই 'সমাজতান্ত্রিক' সংবিধানে।

বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য গৃহীত দলিলটি নজিরবিহীন অগণতান্ত্রিক, অবৈধ ও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে রচিত ও গৃহীত হলো। এই সংবিধানে নানা ধরনের চটকদার শব্দমালা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে তা অসার, প্রতারণামূলক, স্ববিরোধিতায় ভরপুর। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ দীর্ঘ সংগ্রামের এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আকাঙ্ক্ষার কোনো প্রতিফলন ঘটেনি এতে। বরং নতুন সংবিধানে সেই ঔপনিবেশিক আইনসমূহ বহাল রাখা হয়েছে। ফলে এই সংবিধান একটি স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করলো না। দেশের নাম বাংলাদেশ হলেও আইন বহাল থাকলো ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের। কার্যত রাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক চরিত্রই অপরিবর্তিত থাকলো।[২]

ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪ সদস্যের সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয়। বাহাত্তরের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উপস্থাপন করা হয়। এরপর ১৫৩টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই বিলটি নিয়ে তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনা চলে এবং ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর নতুন দেশের জন্য প্রণীত সংবিধানটি গৃহীত হয়।[১২]

কমিটির বৈঠকে ডা. কামাল হোসেনের ইংরেজি ভাষ্য এবং অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের অনুবাদ গণপরিষদের সচিবালয়ের মারফত বিজি প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে উপস্থাপিত হতো। বৈঠকে অনেক সদস্যের উপস্থিতির হার অনেক কম ছিল। মন্ত্রীদের মধ্যে খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও এইচএম কামারুজ্জামান খুব কমই আসতেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ আসতেন মাঝে মাঝে। তাজউদ্দীন যেদিন আসতেন, সেদিন আলোচনায় যোগ দিতেন সাগ্রহে। কোনো কমিটিতেই সব সদস্য অংশ নেন না, এটিও তার ব্যতিক্রম ছিল না।[১৩]

মওলানা ভাসানী অভিযোগ করেন, শাসনতন্ত্রের খসড়া হবার পর জনগণের কাছে প্রকাশের আগে দিল্লি পাঠানো হয়েছে। ১৯৭২-এর জুন মাসে আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন শাসনতন্ত্রের খসড়া বগলদাবা করে বিলাতে যাবার নাম করে দিল্লিতে যান।[১৪]

সুনিপুণ হস্তলিখিত সংবিধানে শেখ মুজিব সই করলেন ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।[১৫]

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর নতুন সংবিধান কার্যকরী হয়। তবে ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল নতুন সংসদের সভা অনুষ্ঠিত হবার আগ পর্যন্ত ২১০টি নির্বাহী আইন প্রণয়ন করা হয় কোনোরকম আলোচনা বা জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার সঙ্গে পরামর্শ বা বৈঠক ছাড়াই। এভাবে নতুন সংসদের অধিবেশন বসার আগে রাষ্ট্র কার্যত 'রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ'বলে পরিচালিত হয়।

১৯৭৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৯ মাস অতিক্রান্ত হবার পর সংবিধানের ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদ সংশোধনীর জন্য দ্বিতীয় সংশোধনী বিল পাস করা হয় এবং জরুরি আইনের বিধানসংবলিত একটি নতুন অংশ সংবিধানে সংযোজিত হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদের অনুকরণে ৩৩ নম্বর অনুচ্ছেদের বিকল্প হিসেবে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত আইন সংযোজন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে যেখানে আটকাদেশের মেয়াদ তিন থেকে ছয় মাসে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল; সেখানে বাংলাদেশের সংবিধানে উপদেষ্টা বোর্ড প্রয়োজন মনে করলে এই আটকাদেশের মেয়াদ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বহাল রাখার সুযোগ করে দেয়া হয়।[১৬]

সর্বকালে আওয়ামী লীগের লোকেরা এই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে যে, একটি 'বিপ্লবী প্রক্রিয়া'র মধ্যে দিয়ে তাদের সরকারের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সংবিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল

একেবারেই ভিন্ন। আওয়ামী লীগ কখনোই বিপ্লবী দল ছিল না। কোনো বিশেষ বিপ্লবী প্রেরণা নিয়ে কখনোই তারা উদ্দীপিত, সংগঠিত ও অগ্রসর হয়নি। সে কারণেই সংবিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে তারা যে স্ববিরোধিতার আশ্রয় নিয়েছিল তা দ্রুতই উন্মোচিত হয়ে যায়।[১৭] এই সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব পেটিবুর্জোয়া শ্রেণি পালন করেছিল, তাদের শ্রেণিগত দুর্বলতা আর অস্থিরতা দিয়েই সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হয়েছিল।

সূত্র:

১. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি; ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম, কাগজ প্রকাশনা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠা: ৪১-৪৪

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৭২ এর মূল সংবিধান); বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী ও সংবিধান বিতর্ক, বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতি প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১০; মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আকাঙ্খা এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রতিষ্ঠার লড়াই একটি গণসংহতি পত্রিকা প্রকাশনা; '৭২ এর সংবিধান অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা সহায়ক কয়েকটি নোটের খসড়া, এ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম, অপ্রকাশিত; সংবিধান ও গণতন্ত্র, ফরহাদ মজহার, আগামী প্রকাশনী, ২০১৪; এই রেফারেন্স থেকে সংকলিত তথ্য নিয়ে আলী মাহফুজের লেখা ব্লগটি পড়তে নিচের এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন:

৩. 'সংবিধান প্রণয়ন করবে কারা'; সাপ্তাহিক 'হককথা', ১৭ মার্চ ১৯৭২

৪. 'গণপরিষদের আইনী ভিত্তি কোথায়'; সাপ্তাহিক 'হককথা', ১৪ জুলাই ১৯৭২

৫. দৈনিক ইত্তেফাক; ২০ অক্টোবর ১৯৭২

৬. দৈনিক গণকণ্ঠ; ৭ অক্টোবর ১৯৭২

৭. Making The Constitution of Bangladesh; Md. Abdul Halim, The CCB Foundation Book Centre, Page: 27

৮. বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী ও সংবিধান বিতর্ক; বদরুদ্দীন উমর, সংস্কৃতি, অক্টোবর ২০১০

৯. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৪২

১০. A Constitution for Perpetual Emergency; বদরুদ্দীন উমর, ২৯ অক্টোবর ১৯৭২

১১. সংবিধান ও গণতন্ত্র; ফরহাদ মজহার, আগামী প্রকাশনী; ২০১৪; পৃষ্ঠা: ৬৯-৭১

১২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১১৮

১৩. বিপুলা পৃথিবী; আনিসুজ্জামান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠা: ৩৩

১৪. আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ ওয়াদাভঙ্গের এক নজির; মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

১৫. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩৫

১৬. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৩৪

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৬৩

সপ্তম অধ্যায়

শেখ মুজিবের প্রশাসন

‘দেশ তো তাজউদ্দীনরাই চালাবে। আমি দেশ চালানোর দায়িত্ব নিতে চাই না। তোরা স্মৃতিসৌধের পাশে আমার জন্য একটি বাড়ির জায়গা দেখিস, যেখানে বসে আমি স্মৃতিসৌধকে প্রাণভরে দেখতে পারি।’ [১]

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বেপরোয়া লুটপাট আর সম্পদ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলেন।[৭]

‘মন্ত্রীদের দুর্নীতি’র বিষয়ে অবগত ছিলেন, কিন্তু ‘দুর্দিনের সঙ্গী’দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন মুজিব।[২৪]

প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ‘গণভবনে’ই স্বাধীন দেশের প্রশাসন পরিচালিত হতে শুরু করে। ‘গণভবনে’ দলীয় লোকজন ও আবেদন-নিবেদনকারীরা দলে দলে ভিড় জমাতো। তাদের কেউ কেউ শেখ মুজিবকে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিত ও পা ধরে সালাম করতো। এমনকি কেউ কেউ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে উচ্চৈঃস্বরে কান্নায় ভেঙে পড়তো। শেখ মুজিবও তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সজলচোখে একাত্ম হয়ে যেতেন।[২]

এই আবেদন-নিবেদনকারীদের প্রত্যেককেই তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতেন– ঠিক আছে যা, আমি ব্যাপারটি দেখছি। কিন্তু ওই দেখা তাঁর খুব কমই হয়ে উঠতো।[২] স্বভাবগতভাবে তিনি অত্যন্ত উদার আর দয়ালু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী। শীর্ষ প্রশাসক এবং জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু– এই আপাত বিপরীত দুই মেরুকে একত্রে মিলাতে গিয়েই অনিবার্যভাবে বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হতে থাকলেন।[২]

আওয়ামী লীগের তরুণ অংশের মধ্যে একটা ধারণা ছিল, শেখ মুজিব স্বাধীন দেশে ফিরে সরকারের কোনো পদ গ্রহণ করবেন না। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতো নেপথ্যে থেকে জাতীয় অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।[৩]

পরামর্শকদের বক্তব্য ছিল এ রকম– প্রধানমন্ত্রীর উচিত তার নীতি ও কর্মসূচির প্রতি দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন আদায়ের জন্য তার সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করা এবং জোরালো প্রচেষ্টা চালানো। তিনিই স্বাধীনতা পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলকে এক নতুন জীবন দিতে পারতেন এবং দলের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন। দেশ যে অনিশ্চয়তা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল তাকে মোকাবিলা করার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তিনি ছাড়া এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন ছিল না। জাতি গঠনের এই কাজ করতে গেলে একমাত্র কিছু নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে সরকারের দৈনন্দিন কাজে তার সরাসরি অংশগ্রহণের ব্যাপারটি অনেক কমিয়ে ফেলতে হতো। প্রশাসনের প্রতিদিনের কাজ চালিয়ে নেয়ার দায়িত্ব তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের মতো তার যোগ্য সহকর্মী এবং অন্য সিনিয়র নেতাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারতেন।[৪]

অথচ তিনি তরুণদের প্রত্যাশাকে উপেক্ষা করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন। রাষ্ট্রপতির পদটি নিছক আনুষ্ঠানিক হলেও সেই পদের জন্য তিনি বাছাই করলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নামে অতিশয় ভদ্র এবং খুবই অনুগত একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিকে। বিচারপতি চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের আন্তর্জাতিক মুখপাত্র হিসেবে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেন।[২]

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শেখ মুজিবের নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলেও তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না। যে তাজউদ্দীন কাণ্ডারির মতো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন, তার কাছেও জানতে চাননি সেই সময়টায় কী কী ঘটেছিল, যুদ্ধ কীভাবে হয়েছিল। কাকতালীয়ভাবে দেখা যায়, স্বাধীন বাংলাদেশের এই 'প্রাণপুরুষ' অতীতেও এই ভূখণ্ডে পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ কোনো আন্দোলনেই

চিত্র-কথন:

১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই শেখ মুজিবের জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামালের বিয়ে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও বরেণ্য এথ্‌লেটিক সুলতানা আহমেদ খুকীর। এই বিয়েতে নবদম্পতি অনেক উপহারের পাশাপাশি একটি সোনার মুকুট ও একটি সোনার নৌকা পায়। সোনার মুকুট পরা সুলতানা আহমেদ ওরফে সুলতানা কামালের এই ছবিটা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। মাত্র একমাস দাম্পত্য জীবনের পরে হাতে মেহেদীর দাগ না শুকাতেই সুলতানা কামাল পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

ফটো: সংগৃহীত

সময়মতো সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না, অর্থাৎ উপস্থিত থাকতে পারেননি। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন ভিন্ন মামলায় ফরিদপুরে কারারুদ্ধ। ’৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের সময়ও ছিলেন কারাবন্দি। ’৭১-এ ছিলেন পাকিস্তানে অন্তরীণ।[৫]

এই অনুপস্থিতির কারণে মাঠের রাজনৈতিক বাস্তবতা আর মানুষের প্রত্যাশা বুঝে ওঠার ক্ষেত্রে একটা ব্যবহারিক সমস্যা দেখা দেয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ১৯৭২ সালের মার্চ মাস শেষ হয়ে এসেছে। ঢাকায় এক জমজমাট গুজব ছড়িয়ে পড়েছে– অতিরিক্ত কাজের চাপে মুজিব অসুস্থ। তাই স্বাস্থ্যগত আর প্রশাসনিক প্রয়োজনে মুজিব পুনরায় তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করছেন।[৬]

তাজউদ্দীনকে এ বিষয়ে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলে তিনি পরিষ্কারভাবে জানালেন যে, ‘কেউ আমার গলা কাটার চেষ্টা করছে।’

এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের প্রতিক্রিয়াও তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বললেন, ‘তারা কি

মনে করে যে, আমি সরকার পরিচালনায় অক্ষম?'

সুস্পষ্টভাবেই স্বার্থান্বেষী মহলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এ গুজব প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জন করেছিল। শোনা যায়, এ থেকেই তাজউদ্দীনকে মুজিব সন্দেহের চোখে দেখতেন এবং তাকে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করেন।[৬]

মুক্তিযুদ্ধের পরে পুরো প্রশাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছিল। আওয়ামী লীগের এমসিএ-নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা বেপরোয়া লুটপাট আর সম্পদ সংগ্রহের প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। শেখ মুজিব কখনো কঠোর, কখনো নরম হয়ে এই দুঃসহ অবস্থা মোকাবিলার চেষ্টা করলেন। প্রথমেই তিনি কঠোর হয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৭২ সালের ৬ এপ্রিল দুর্নীতি ও দেশবিরোধী তৎপরতার কারণে তাঁর দলের ১৬ জন সাংসদকে তিনি দল থেকে বহিষ্কার করেন। ৯ এপ্রিল ৭ জন এবং ২২ সেপ্টেম্বর আরো ১৯ জন সাংসদকে তিনি বহিষ্কার করেন।[৭]

স্বাধীনতার সুফল ভোগের দাবি নিয়ে এলেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। তাদের ভাব এমন যে, তারা যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসেছেন; সুতরাং বিজিতদের সবকিছুতেই তাদের অগ্রাধিকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যারা আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা সবাই নিজেদের পছন্দমতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা অনুরূপ পদ বেছে নিলেন। ঠিক তেমনিভাবে শুধু ভারত ঘুরে এসেছেন সেই অধিকারে দু'টো-তিনটে পদ টপকে একেকজন উপরে উঠে বসলেন। 'শত্রুসম্পত্তি' এই বাহানা দিয়ে গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, টেলিভিশন, দরজা, জানালা লুট করা হলো। যারা এই দুষ্কর্ম করলেন তাদের অনেকেই বেশ পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। গোটা দেশ নিঃশব্দে দু'টি শিবিরে ভাগ হয়ে গেল।[৮]

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়। এ সময় মওলানা ভাসানী ছাড়া দেশে দৃশ্যত কোনো বিরোধীপক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। এছাড়া ছিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফ্‌ফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) নামে অন্য দু'টি রাজনৈতিক দল। ন্যাপ (মো) এবং সিপিবি সরকারকে সমর্থন করছিল। সরকারের কাছে এই তিনটি দল ছিল 'দেশপ্রেমিক'।[৯]

আইন না মানার যে সংস্কৃতি চালু হয়, তা প্রশাসনের উচ্চপর্যায়কেও আক্রান্ত করে। একবার কমলাপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত রেলের যাত্রীদের টিকিট চেক করে শতাধিক টিকিটবিহীন যাত্রীকে চিহ্নিত ও আটক করা হয়। অবাক হওয়ার মতো কাণ্ড, টিকিটবিহীন যাত্রীদের মধ্যে একজন ছিলেন পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল, তাও আবার সপরিবারে।[১০]

প্রশাসনের উচ্চ স্তরে পছন্দমাফিক নিয়োগ শুরু হয়। এ সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশনও পছন্দমাফিক গড়ে তোলা হয়। ১৯৭২ সালের মে মাসে প্রথম পিএসসি গড়ে তোলার সময় যাকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, সেই ড. এ কিউ এম বজলুল করিম ছিলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক![১১] গুরুত্বপূর্ণ এই পদটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষককে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় ছিল, তিনি ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমেদের শিক্ষক।

এদিকে আওয়ামী লীগের নেতারা সশস্ত্র প্রহরীসহ ঘোরাফেরা করতেন। যাকে-তাকে হত্যার হুমকি দিতেন, মারধর করতেন। সেই সময়ের চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন খুব গর্বভরেই লিখেছেন, কীভাবে সচিবালয়ে একজন সচিবকে হত্যার ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করেছিলেন, সেই কাহিনী। তিনি সেই সচিবের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে লিখেছেন–'সে পাগলের মতো একবার শিক্ষামন্ত্রীর ও একবার আমার পায়ে পড়তে লাগল। বারবার একই কথা বলল, স্যার এবারের মতো ছেড়ে দেন। আমি আর কোনোদিন আপনাদের কথার অবাধ্য হবো না।'[১২] উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের বাধ্য করার এই তরিকা ব্যাপকভাবে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠলো।

আরেক ঘটনায় তিনি রোড্স্ অ্যান্ড হাইওয়েজের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে তিন তলা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করেছিলেন![১৩]

চিফ ইঞ্জিনিয়ার উপায়ান্তর না দেখে শেখ মুজিবের কাছে এর সুরাহার জন্য যান এবং এই অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক আচরণের প্রতিকার চান। উল্টো শেখ মুজিব তাকে বলেন, 'মোয়াজ্জেম না হয়ে আমি হলে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে নিচে ফেলে দিতাম। আপনি কোন সাহসে চিফ হুইফের কথা অমান্য করেন! যান, যেভাবে বলেছে, সেভাবে কাজ করুন।'[১৪]

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফাইল পাঠিয়ে দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্ত্রীরা নিজে সিদ্ধান্ত নেয়া থেকে বিরত থাকতেন।[১৫] কোনো সিদ্ধান্ত পরে ভুল প্রমাণিত হলে প্রধানমন্ত্রী বিরক্ত হবেন–এই আশঙ্কায় অথবা নিজেদের যোগ্যতার প্রতি আস্থার
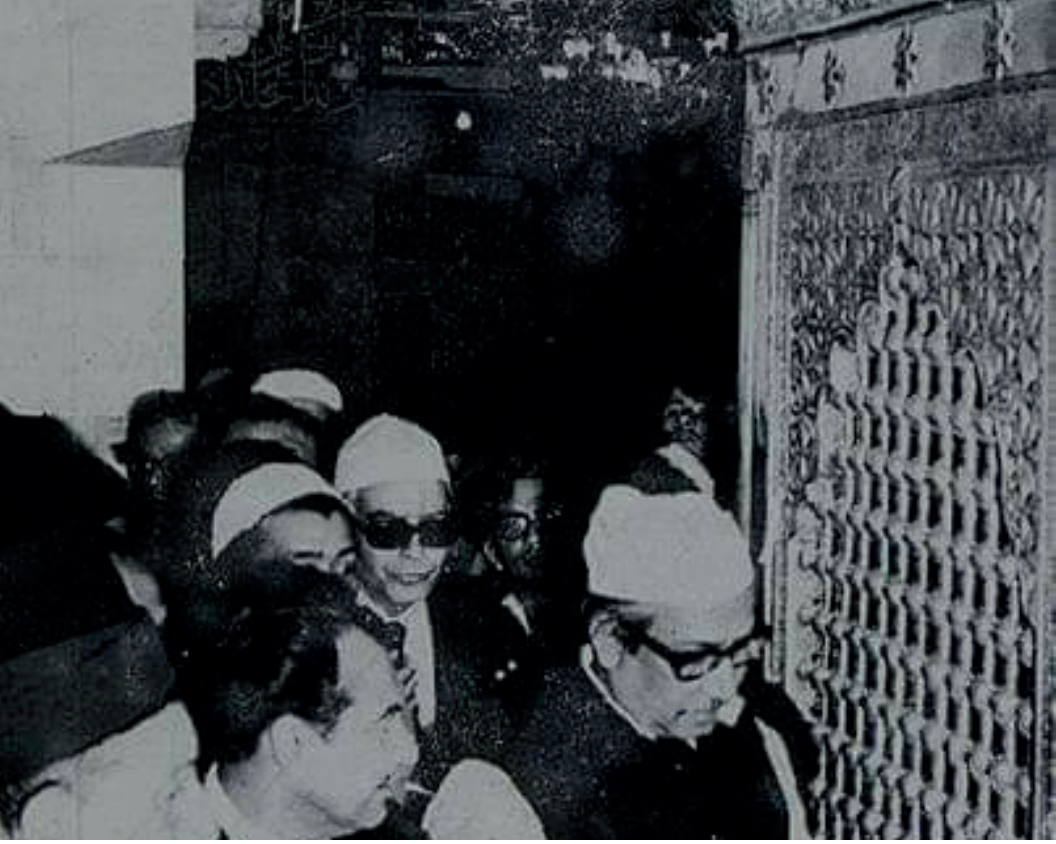
চিত্র-কথন:

১৯৭৪ সালে ইরাক সফরকালে বড় পীর আঃ কাদের জিলানী'র মাজারে জিয়ারত করেন শেখ মুজিবুর রহমান। আওয়ামী লীগ দাবী করে শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্বপুরুষেরা ইরাক থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং এই বংশের পূর্বপুরুষ শেখ বোরহানুদ্দিন দুইশ' বছর আগে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে বাংলায় এসে টুঙ্গিপাড়ায় আবাস গেড়েছিলেন।

ফটো: সংগৃহীত

অভাবের কারণে তারা এই ঝুঁকি নিতে চাইতেন না।[১৬]

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময় সরকার সাড়ে তিন শ' উচ্চতর প্রারম্ভিক পদে (সিভিল সার্ভিস) মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে নিয়োগের উদ্যোগ নেয়। বলা হয়েছিল, এজন্য পরীক্ষা নেয়া হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ কোনো পরীক্ষা নেয়া হয়নি। নেয়া হয়েছিল একটি তড়িঘড়ি মৌখিক পরীক্ষা।

মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থীদের মধ্যে থেকে অফিসারদের এ নিয়োগ অবশ্য সাড়ে তিন শ'তে সীমিত থাকেনি। বরং প্রায় দেড় হাজার অনুরূপ প্রার্থীকে প্রশাসন,

পুলিশ, নবগঠিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (আইএমএস) ইত্যাদিতে নিয়োগ দেয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সের ক্ষেত্রে অভাবিত শিথিলতার কারণে এ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত অসম প্রকৃতির প্রার্থীদের নিয়োগ লাভের সুযোগ ঘটে। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ বছর বয়সী গ্র্যাজুয়েটগণ সুযোগ পেতেন। এরূপ প্রার্থী আবার স্নাতক পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণির ডিগ্রির অধিকারী হয়ে থাকলে তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তার প্রথম শ্রেণি থাকতে হতো। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত হলে তো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু এসব নিয়ম উল্লিখিত নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একেবারেই উপেক্ষিত হয়। সর্বোচ্চ ৩৫ বছর বয়সী প্রার্থীকে এই নিয়োগে সুযোগ দেয়া হয়। সেই সাথে, গ্র্যাজুয়েট হলেই হলো, শ্রেণি বা বিভাগের বিষয়ে মাথা ঘামানো হলো না। ফলে এ প্রক্রিয়ায় এমনও অফিসার সিভিল সার্ভিসে পাওয়া গেল যারা এসএসসি, এইচএসসি ও স্নাতক– এই তিনটি পরীক্ষাতেই বসেছেন এবং এগুলোর প্রত্যেকটিতে তৃতীয় বিভাগ বা শ্রেণির সার্টিফিকেট অর্জন করতে পেরেছেন। ব্রিটিশ আমলের তো প্রশ্নই ওঠে না, পাকিস্তান আমলেও এ ধরনের প্রশাসনিক কর্মধারা ছিল অচিন্তনীয়।

এমন সব ব্যবস্থা সূচিত করার মাধ্যমে মেধার গুরুত্ব অস্বীকারই করা হয়েছে। সময়ে সময়ে মেধার গুরুত্ব উচ্চকিত করার স্বল্পপ্রাণ দু'-একটি চেষ্টা ছাড়া এ দেশের প্রশাসনকে অতি-সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে ফেলার অন্তহীন প্রচেষ্টার সূচনা ছিল স্বাধীনতার পর সম্পাদিত ওই অতি-যত্নের অতি-তাৎক্ষণিক নিয়োগকাণ্ড।[১৭]

খন্দকার মোশতাক এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। আবার স্বাধীন দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রীদের হাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বভার ন্যাস্ত না হওয়ায় সাধারণভাবে মন্ত্রীরা 'কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়' করা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।[১৫]

শেখ মুজিবের প্রবণতা ছিল সচিবদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করা। সচিবদের সরাসরি নির্দেশনা দিয়ে তিনি দ্রুত ফলাফল ও কাজের অগ্রগতি প্রত্যাশা করতেন। এসব কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মন্ত্রীরা নিজেদের অনেকটা দায়িত্ববিহীন ও জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত বলে মনে করতেন। ক্রমান্বয়ে মন্ত্রীরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব দায়-দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ছেড়ে দিয়ে তার ইশারা-ইঙ্গিতের দিকে চেয়ে বসে থাকতেন।[১৬]

শেখ মুজিবের সাথে প্রশাসনিক বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে

ARY 17, 1972

TIME

TIME

ngladesh: From Jail to Power

Sheik
Mujibur
Rahman

চিত্র-কথন:

স্বাধীনতার পরে সারা পৃথিবীর আগ্রহ ছিলো বাংলাদেশ নিয়ে। শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরে টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে শুধুই শেখ মুজিব আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাই প্রচ্ছদ কাহিনী। তবে কিছুদিনের মধ্যেই নানা কারণে এই আন্তর্জাতিক উচ্ছাসে ভাটা পড়তে থাকে।

ফটো: সংগৃহীত

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জে. অরোরা বলেন, 'পরবর্তী সময়ে আমি যখন তার সঙ্গে (মুজিব) আরো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পেলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, তিনি প্রশাসনিক বিষয়ে যত না দক্ষ, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে, তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে তিনি তার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ ছিলেন। তিনি কথা বলে লোকজনকে নাচাতে পারতেন। কিন্তু প্রশাসন চালানোর ব্যাপারে তিনি তেমন দক্ষ ছিলেন না।'[১৮]

সম্পদের অভাবনীয় স্বল্পতা এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কারণে ১৯৭৪ সালের প্রথম তিন মাসে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অতি দ্রুত এবং মারাত্মক অবনতি ঘটে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিও অর্থনীতিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। সরকার সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।[১৯]

১৯৭৩ সালের ১০ জুন দৈনিক পত্রিকায় একটি ভয়াবহ খবর ছাপা হয়। গাইবান্ধা শহর থেকে দশ মাইল দূরবর্তী মহিমাগঞ্জ এলাকা থেকে আগত পাঁচ শতাধিক অর্ধ-উলঙ্গ নারী মিছিল সহকারে শহরের প্রধান প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণের পর মহকুমা প্রশাসকের বাসভবন ঘেরাও করে কাপড়ের দাবি জানায়। এই একই প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, সদর থানার তুলসীঘাট এলাকায় জনৈকা শাশুড়ি বস্ত্রাভাবে জামাইয়ের সামনে ঘর থেকে বেরুতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন। এমনই হয়েছিল বস্ত্র সংকটে জর্জরিত বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের চিত্র।[২০]

শেখ মুজিব যখন যুগোশ্লাভিয়া সফরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি আমলাতন্ত্রের ভূমিকা নিয়ে প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রকে একটি ভিন্ন আর্থ-সামাজিক দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হলে একজন নেতাকে কী সমস্যায় পড়তে হয়, এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। পুরনো ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনাসমৃদ্ধ কর্মকর্তাদের

দিয়ে এই কাজটি যুগোশ্লাভিয়ায় কীভাবে হয়েছে, এটা জানতে শেখ মুজিব বিশেষ উদগ্রীব ছিলেন।[২১] এ ব্যাপারে শেখ মুজিবকে টিটো জানিয়েছিলেন, আমলাদের অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ও মতবাদের ধারণায় অংশীদার হতে হবে এবং তাদের অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি অনুগত থাকতে হবে।[২১] টিটো গর্ব করে শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় এসে যা দেখেছেন তাতে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, ওই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ভুল ছিল না।[২২]

সেই সময় সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে লোকজন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করেন, এমন কথাবার্তা লোকমুখে প্রচলিত ছিল।[২২]

পরিকল্পনা কমিশনের উপ-প্রধান নুরুল ইসলাম শেখ কামালকে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠিয়ে দিতে শেখ মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এতে সে এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকতে এবং নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রস্তুতি নিতে পারবে। শেখ মুজিব তার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত হলেন; তবে এ ব্যাপারে তিনি তাঁর আর্থিক অক্ষমতার কথাও জানালেন। দাতা সংস্থা ও বিদেশি বেসরকারি দাতাদের সঙ্গে সম্পর্কের সুবাদে নুরুল ইসলাম বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে তাদের নিয়মিত সাহায্য কর্মসূচির বাইরে কোনো বৃত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি না, তা আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি? তিনি উত্তর দিলেন, এ প্রস্তাব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কামাল এমনিতে মেধাবী ছাত্র নয়, তার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করলে সেটা ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা স্বজনপ্রীতি বলে গণ্য হবে।[২৩]

শেখ মুজিব তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ও বাজারে যে সব 'গুজব' ছিল সে ব্যাপারে অবগত ছিলেন।[২৪] কিন্তু রাজনীতির জটিল ও বিপদ্‌সংকুল সময়ে যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, সে সব সহকর্মীর বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ব্যবস্থা নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।[২৪]

তিন

দেশের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির এত নিদারুণ অবনতি ঘটেছিল যে, নানা রকম নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন এবং 'রক্ষীবাহিনী'র মাধ্যমে নির্যাতন চালিয়েও তার দুর্দমনীয় গতি রোধ করে অবস্থা অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব

চিত্র-কথন:

১৯৭২ সাল কিছু শিশু কিশোর খিলগাঁও থেকে পায়ে হেঁটে কোন পূর্ব যোগাযোগ ছাড়া হাজির হন পুরনো গণভবনে, সেখানেই তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উদ্দেশ্য - তাঁরা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সাথে দেখা করবেন এবং তাঁর হাতে কিছু অর্থ তুলে দেবেন দেশের কাজের জন্য। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে তখন শিশু কিশোরেরাও দেশের জন্য কাজ করতে উদগ্রীব। তাঁরা এই অর্থ সংগ্রহ করতে চলচ্চিত্র সংগ্রহ করে তার প্রদর্শনী করেছেন, টিকেট বিক্রি করেছেন ঘরে ঘরে, খরচ কমিয়ে যতটা সম্ভব তহবিল তৈরি করেছেন। এই শিশু কিশোর দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দশম শ্রেণীর এক উদ্যমী কিশোর (ছবিতে চশমা পরিহিত)। সেই কিশোর দলনেতা হলেন বর্তমান সময়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। স্বাধীনতার পরে ছাত্র যুবক শিশু কিশোর সবাই নতুন দেশ গড়ার উদ্দিপনায় টগবগ করে ফুটছিলো।

কৃতজ্ঞতা: ফিরোজ আহমেদের ফেইসবুক পাতা। ক্যাপশন আমির হোসেনের লেখা।

হয়নি। এ সময় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতগুলো অব্যাহত লোকসানের শিকার হতে থাকে এবং শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শিল্প-কারখানাগুলোতে চলতে থাকে বিশৃঙ্খলার সর্বগ্রাসী রাজত্ব। দেশের খাদ্যোৎপাদন তখনও ছিল চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তদুপরি ’৭৪-এর সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ জনগণের মনোবল নষ্ট করে দেয়। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের জের হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে থাকেন। এতে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে এবং জনমনে সরকারবিরোধী অসন্তোষও ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে।[২৫]

এদিকে মোটামুটিভাবে একটি জোট নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখার ব্যাপারে শেখ মুজিবের চেষ্টা সোভিয়েত ইউনিয়নকে হতাশ করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের

কাছে এটা মনে হয়েছে যে, বাংলাদেশ ধীরে ধীরে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।[২৬]

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক জোরদারে ও বড় মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে ইসলামি দুনিয়ায় বাংলাদেশের কার্যকর ভূমিকার জন্য শেখ মুজিব উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এর পেছনে শুধু বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অবস্থানকে জোরদার করার উদ্দেশ্যই কাজ করেনি বরং ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে জনগণের মধ্যে যে ভীতি-শঙ্কা কাজ করছিল, সেটা দূর করাও ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই নীতির কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও ছিল। বাংলাদেশের এ ধরনের উদ্যোগ ভারতের জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।[২৭]

অনেক সময় শেখ মুজিবের নিজের নির্দেশনাও অনুসৃত হতো না। এই ধরনের ঘটনা তাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করতো। সেই সময়ের এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বর্ণনায় এমন একটা ঘটনা জানা যায়। মুজিব কিছুদিন আগে দেয়া তাঁর নির্দেশ পালিত না হবার কারণে ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তিনি তাঁর সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ডেকে ঘটনার কারণ জানতে চাইলেন। ওই কর্মকর্তা তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবার পর তিনি বললেন, এই সব অফিসাররা হাফপ্যান্ট পরা এবং ক্যান্টনমেন্টের ইংরেজি বলা চালাক-চতুর ক্যাপ্টেনদের হুকুম খুব তৎপরতার সঙ্গে পালন করে। রাজনীতিকরা সাধারণ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, সাধারণ বাংলায় কথা বলে, কেউ কেউ পান চিবায়। তাই তাদের কথা শুনতে বা আদেশ পালন করতে তারা উৎসাহী হয় না। আমাদের জায়গায় ক্যাপ্টেনরা এলে তারা খুশি হয়।[২৭]

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর তা পরিচালনার জন্য এমন একদল নির্বাহীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, যাদের 'সমাজতন্ত্র' সম্পর্কে ধারণা এবং আগ্রহ কোনোটাই ছিল না। এতে দু'-তিন দশকে গড়ে ওঠা এ জনপদের শিল্পভিত, যার মধ্যে ছিল অন্য অনেক কিছুর পাশাপাশি ৭০টি পাটকল, ১৭টি চিনিকল, ৭২টি বস্ত্রকল, ৩টি কাগজকল এমনকি তেল শোধনাগারও, লোকসানে লোকসানে জাতীয় বোঝায় পরিণত হয় এবং সরাসরি তাতে লাভবান হয় কয়েকটি দেশ। মুজিব এক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল পরামর্শের শিকার হন পরিকল্পনা কমিশনের তরফ থেকে। স্বাভাবিকভাবে তাকেই এসবের অব্যবস্থাপনাজনিত দুর্নামের রাজনৈতিক দায়ভার বইতে হলেও ব্যক্তিগত পর্যায়ে তার অসহায়ত্ব ফুটে ওঠে নিম্নোক্ত উক্তিতে:

'...... যাকে যেখানে বসাই সে-ই চুরি করে। অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত ছেলেদের

বেছে বেছে নানা কল-কারখানায় প্রশাসক বানালাম, দু'দিন যেতে না যেতে তারাও চুরি করতে শুরু করলো। যাকে পাই তাকেই বলি– 'আমি সৎ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছি।'[২৮]

ছোট-বড় সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক, প্রশাসক এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে ঢালাওভাবে দলীয় নেতা-কর্মীদের অথবা রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত লোকদের নিয়োগ করা হয়।

বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়োগ করা হতে থাকে। অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা এবং কারিগরি জ্ঞানবিহীন দলীয় নেতা-কর্মী অথবা প্রতিষ্ঠানের অধঃস্তন কর্মচারীদের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানি ব্যবসায়ী অথবা তাদের বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত বহুসংখ্যক পাটকল, বস্ত্রকল এবং আরো শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠান কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ম্যানেজারের করায়ত্ত হয়। গোলযোগ, দুর্নীতি, লুট হয়ে দাঁড়ায় এর অনিবার্য ফল।

সংঘবদ্ধ চোরাচালানীদের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দামি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, উৎপাদন দ্রুত নেমে আসে নিচের দিকে, যেকোনো সুবিধাজনক মূল্যে এই সম্পত্তি বিক্রি বা বিনিময় করা হতে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ বা তার নামে ব্যাংকে রক্ষিত টাকা হিসাববিহীনভাবে চলে আসে ব্যক্তিবিশেষের হাতে। ফলে অচিরেই এ ধরনের অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেগুলো বন্ধ বা বিক্রি করে দেয়া হয়।

এটা ছিল এমনই একটি ক্ষেত্র, যেখানে মন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা, 'ষোড়শ বাহিনী'র সদস্য যা-ই হোন না কেন, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ছিটেফোঁটাও ছিল কি-না সন্দেহ; তাদের আত্মীয়-স্বজন, সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের কথা তো বলাই বাহুল্য।[২৯]

১৯৭২ সালে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতনের সিলিং কমিয়ে দেয়া হলে এ ব্যাপারে তারা তেমন কোনো অসন্তোষ বা ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। এটা বলা মুশকিল যে, এই ঘটনা তাদের চিন্তাবিহীন আদেশ পালন, নাকি আত্মত্যাগ ছিল।[৩০]

এদিকে শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠজনরা প্রভূত সম্পদের মালিক হয়ে যান। বিনিয়োগবিহীন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বে শেখ কামাল বেশ এগিয়ে ছিলেন। মুজিবের ছোট ভাই বহুসংখ্যক বার্জ ও অন্যান্য নৌযানের মাধ্যমে প্রভূত অর্থের অধিকারী হয়ে গেলেন।[৩১]

শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মণি ১৯৭০ সালে ২৭৫ টাকা বেতনে সাংবাদিক হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। কিন্তু '৭২ সালের মধ্যেই তিনি মতিঝিলে 'বাংলার বাণী ভবন'সহ অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়েছিলেন। যুবলীগের প্রধান হিসেবে তার রাজনৈতিক ক্ষমতাও তুঙ্গে উঠেছিল। আরেক ভাগ্নে শেখ শহীদুল ইসলাম মাত্র ২৫ বছর বয়সে আওয়ামী ছাত্রলীগের প্রধান হিসেবে বাকশালের মন্ত্রী পর্যায়ের ১৫ জনের মধ্যে একজন মনোনীত হন।

শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি আবদুর রব সেরনিয়াবাত নিজে 'দুর্নীতিমুক্ত বলে সুনাম অর্জন' করলেও, মন্ত্রী হওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক ছিলেন না। তিনিও মন্ত্রী হয়েছিলেন। অন্য এক ভগ্নিপতি সৈয়দ হোসেন '৭১ সালে সেকশন অফিসার হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে কাজ করছিলেন। '৭২ সালে দেশে ফিরে তিন বছরের মধ্যে অতিরিক্ত সচিব হয়েছিলেন। একমাত্র ভাই শেখ নাসের শেখ মুজিবের নাম ভাঙিয়ে তিন-চার বছরের মধ্যে বিরাট ধনী হয়েছিলেন।[৩২]

শুধু সরকারদলীয় লোকেরাই নয়, শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামালও দুর্বিনীত আচরণ করতেন। ঢাকার মাঠে আবাহনী'র সঙ্গে অন্য একটি টিমের খেলা চলছে। আবাহনী জিতবে। এগিয়েও আছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইউসুফ আলী, চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন ও শেখ কামাল একসঙ্গে বসে বাদাম খাচ্ছিলেন এবং খেলা দেখছিলেন। মধ্যমাঠে আবাহনীর এক খেলোয়াড় ফাউল করলো। রেফারি ননী বসাক, পাকিস্তানের খ্যাতনামা চিত্রনায়িকা শবনমের বাবা, খেলা পরিচালনা করছিলেন। আবাহনীর বিপক্ষে ফাউল দিলেন। কিকও হয়ে গেল। এই ফাউল ধরা ঠিক, না বেঠিক বলা যাবে না। কিন্তু খেলার তাতে কোনো লাভ-ক্ষতি হলো না। শেখ কামাল গর্জে উঠলেন: দেখলেন, ব্যাটা কীভাবে অন্যায় ফাউল দিলো!

সবাই চুপ করেই রইলো। খেলা শেষ হলো। মন্ত্রী ও শেখ মুজিবের পুত্রকে দেখে মাঠ থেকে তাদের দিকেই ননী বসাক উঠে এলেন। তিনি হাসিমুখে সবার সাথে হাত মিলাতে এগিয়ে এলেন।

কথা নেই, বার্তা নেই, শেখ কামাল ননী বসাককে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে ফেলে দিলেন। তার মুখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো। শেখ কামাল রাগত স্বরে তখন
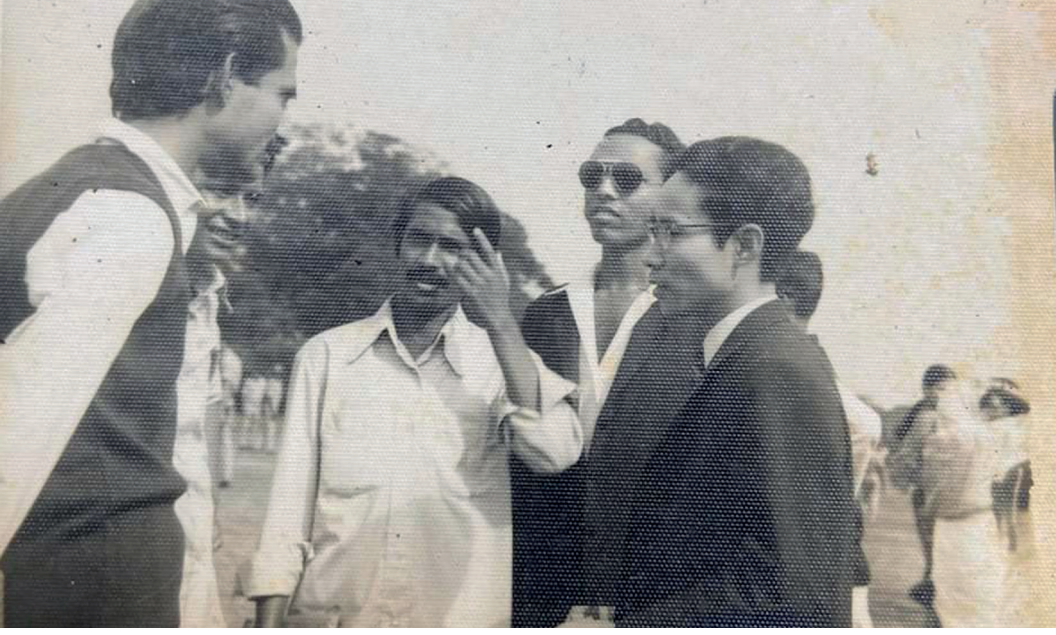
চিত্র-কথন:

১৯৭৩ সালের ১১ নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ জাতীয় সম্মেলনে শেখ মণি ও ভিয়েতনামের এক প্রতিনিধি। এই সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

ফটো ক্রেডিট: গোলাম রহমানের ফেইসবুক পোস্ট থেকে সংগৃহীত, সাবেক চিফ ইনফরমেশন কমিশনার, বাংলাদেশ সরকার।

চিৎকার করে বলছেন– 'ব্যাটা সব সময় এমনই করে, আবাহনীর বিরুদ্ধে বাঁশি বাজায়। তাকে আজ উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।'[৩৩]

শেখ মণিও তার অপছন্দের কর্মকর্তাদের শায়েস্তা করার জন্য শেখ মুজিবকে দিয়ে তাদের চাকরিচ্যুত করতেন। একদিন চিফ হুইপ শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেনের উপস্থিতিতে শেখ মণি হন্তদন্ত হয়ে শেখ মুজিবের লিভিং রুমে প্রবেশ করলেন। শেখ মুজিব তখন পোশাক পরছিলেন। বললেন: মামা, কয়েকজন অফিসার বেশি বেড়ে গেছে, তাদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন।

তিনি কোনো প্রশ্ন না করে বা কিছু জানতে না চেয়ে নির্বিকারচিত্তে বললেন, নামগুলো আমার অফিসে পাঠিয়ে দিস। কারা বেড়ে গেল, কি তাদের অপরাধ, মণির সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা কী– কোনো প্রশ্নই তিনি করলেন না! পরদিন সকালে খবরের কাগজে এলো কয়েকজনের চাকরি নেই। পিও নাইন-এ তাদেরকে বরখাস্ত করা হয়েছে। শিল্পোন্নয়ন সংস্থার অর্থ পরিচালক,

চিত্র-কথন: বঙ্গভবনে অনুষ্ঠান

বঙ্গভবনে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে উৎফুল্লভাবে কুশল বিনিময় করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান। ছবিতে সামনের সারিতে অন্যদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে খোকা রায়কে। মুজিব হাত মেলাচ্ছেন বামপন্থি রাজনীতিক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমের সঙ্গে। পাশেই হাত মেলাবার জন্য হাত বাড়িয়ে প্রস্তুত ও উন্মুখ হয়ে আছেন শেখ মুজিবেরই ভাগ্নে ছাত্রলীগ নেতা শেখ শহীদুল ইসলাম। বামপন্থি এবং আরো নানাপন্থি এই সব অনুগ্রহভাজন সুহৃদ আর স্বজনরাও কি তাঁকে চূড়ান্ত পতনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাননি?

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালকুদার/দৃক

বিক্রমপুরের কাজী রোমান উদ্দীন সাহেবেরও চাকরি নেই। জানা গেল, মণি কোনো অন্যায় অনুরোধ করলে তিনি তা অস্বীকার করায় আরো কয়েকজনের সঙ্গে তারও এই শাস্তি হলো। তদন্ত হলো না। অপরাধের কার্যকরণ কিছুই বিশ্লেষণ করা হলো না। অফিসারদের অতীতের রেকর্ড পরীক্ষা করা হলো না–এমনকি তাদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ বা কারণ দর্শানোর সময়ও দেয়া হলো না।[৩৪]

শেখ ফজলুল হক মণি একটি শ্লোগান জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন, 'মুজিবের শাসন চাই, আইনের শাসন নয়'। তিনি 'বাংলার বাণী'তে লেখেন:[৩৫]

বাংলাদেশের মানুষ মুজিবের শাসন চায়, 'আইনের শাসন' নয়। পক্ষান্তরে আমীর, ওমরাহ, নায়েব, মোসাহেব, আমলা, পেয়াদার দল, যাদেরকে আমরা সাবেকি আমলের সেক্রেটারিয়েটের দালানবাড়ির সাথে ফার্নিচার, ব্যভিচারের মতোই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, তারা বায়না ধরেছেন 'আইনের শাসন' দাও। পক্ষ দু'টো। এক পক্ষ আমাদের সাথে বরাবর ছিল। তারা জনতা–

চিত্র-কথন:

কর্ণফুলী নদীর মোহনায় ডুবিয়ে দেয়া পাকিস্তানি জাহাজ। এই জাহাজ আর ডুবো মাইন অপসারণের জন্যই সোভিয়েত নৌ বাহিনী চট্টগ্রামে আসে।

ফটো: সংগৃহীত

চিত্র-কথন: বা থেকে প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এ ফমিন ও বাংলাদেশের যোগাযোগমন্ত্রী মনসুর আলী চট্টগ্রামে সারিবদ্ধ সোভিয়েত নাবিকদের সাথে।

১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ শেখ মুজিবুর রহমান সোভিয়েত সরকারের কাছে সহযোগিতা চেয়ে বার্তা পাঠান এবং মার্চ ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব মস্কো সফর করেন। এই সফরের প্রাক্কালে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশদ্বারে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় মাইন অপসারণ ও ডুবে যাওয়া জাহাজ অপসারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগিতা চান।

সোভিয়েত সরকার অনুরোধে সাড়া দিয়ে ১৯৭২ সালের ২ এপ্রিল প্রথম সোভিয়েত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠায়। বন্দরের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৪০টিরও বেশি জাহাজ ডুবেছিল। ১৮টি জেটির মধ্যে ১২টিই ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত।

২ এপ্রিল ১৯৭২ থেকে একটানা ২৪ জুন ১৯৭৪ পর্যন্ত চলে সোভিয়েত নৌবাহিনীর এই অভিযান।

বাংলাদেশে আসা ৮০০ সোভিয়েত নৌসেনার মধ্যে একজন ছাড়া সকলেই তাদের দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরে গিয়েছেন। ১৩ জুলাই ১৯৭৩ সালে দায়িত্বরত অবস্থায় বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেন ইউরি ভিকটরভিচ রেডকিন। তার মরদেহ সমাহিত করা হয় বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, পতেঙ্গায়; যা বর্তমানে রেডকিন পয়েন্ট নামে পরিচিত।

ফটো: সংগৃহীত

কামার, কুমার, তাঁতী, মজদুর, কৃষক। অন্য পক্ষ 'মুক্তি'র ভয়ে ভিরমি খেয়ে 'লাশঘরে' গিয়ে ঢুকেছে। বিপ্লবের পরে আমরা তাদেরকে মালঘরে এনে বসিয়েছি।

বাংলাদেশ 'আইনের শাসন' মেনে চলবে কি-না, প্রথম দলের সেজন্যে মাথা ব্যাথা নেই। কারণ, তারা কোনোদিন 'আইন' মেনে এগোয়নি। মুজিবকে মেনে চলেছিল। আন্দোলনে, সংগ্রামে, দুঃসহ-দুর্দিনে, আকাশে, বাতাসে, পানিতে, ইথারে জনজাগরণের প্লাবন ঘটিয়ে তারা আইনের কেতাব পুড়িয়ে দিয়েছিল। জনতার এই তূর্যধ্বনির দুন্দুভি নিনাদ বাংলার হাট-বাজার, নগর-বন্দর, পথে-মাঠে কাঁপুনি ধরালেও আইনমানা লোকগুলোর কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙেনি অনেক দিন। '৭১-এর মার্চের অসহযোগে তারা অফিসে যায়নি এই কারণে যে, জনতার প্লাবন পেরিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। ইসলামাবাদের হ্যারিকেনের তেল তখন ফুরিয়ে এসেছে। মুজিবের নির্দেশে বাংলাদেশে মশাল জ্বলছে। অর্থাৎ

চিত্র-কথন:

সোভিয়েত ইউনিয়নে মাইন অপসারণকারী জাহাজকে চট্টগ্রাম থেকে বিদায় জানাচ্ছে বাংলাদেশি জনগন। তারা এসেছিলেন পাকিস্তান বাহিনীর পুতে রাখা মাইন পরিষ্কার করতে। সেই কাজ শেষ হওয়ার পর ১৯৭৪ এ জাহাজে করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফিরে যাওয়ার সময়ের ছবি।

ফটো: বাংলাদেশ ওল্ড ফটো আর্কাইভ

চিত্র-কথন:

১৯৭৩ সালের ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন সরকার প্রগতিশীল কৃষক আন্দোলনের (বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম.এল) রাজশাহী জেলার তানোর থানার ৪৪ বিপ্লবী শহীদ নেতাকর্মীকে নির্মমভাবে নির্যাতনে হত্যা করে রক্ষী বাহিনী।

তানোরের কৃষকদের নিয়ে তারা আওয়ামী দুঃশাসন ও মজুতদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলো। আর এই প্রতিবাদের জের ধরেই হতভাগ্য ৪৪ বিপ্লবী শহীদ নেতাকর্মীকে হত্যা করে রাতের আঁধারেই থানার গোল্লাপাড়া বাজারে গণকবর দেয়া হয়েছিল। যখন তাদের গনকবর দেয়া হয় তখন হতভাগ্যদের অনেকেই জীবিত ছিলো।

রাতের আঁধারে যাদের গণকবর দেয়া হয়েছিল, তারা হলেন এরাদ আলী, এমদাদুল হক মন্টু মাস্টার, হজরত আলী, মহির উদ্দিন, আবদুল মজিদ, খোকা মন্ডল, মনিরুজ্জামান, কমরেড আবদুল জব্বার মাস্টার, কমরেড ওয়েজ কামালসহ ৪৪ বীর বিপ্লবী নেতাকর্মী।

পরে ওই শহীদদেও স্মৃতি অমর করে রাখতে তানোর থানার গোল্লাপাড়া বাজারের

গোডাউনের পাশে প্রগতিশীল কৃষক আন্দোলনের (বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল এম এল) উদ্যোগে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

ফটো: সংগৃহীত

প্রাণের টানে যতটা নয়, প্রাণ ভয়ে তার চাইতে অনেকটা তারা মুজিবের নির্দেশ তখন মেনে চলেছিল।

লক্ষ্যণীয় যে, মার্চ মাসের বাংলাদেশ শাসিত হয়েছিল আইনের শাসনের বন্ধন মেনে নয়, মুজিবের নির্দেশ মেনে।

বাংলাদেশ পাকিস্তানি বনেদি আইন মানবে অতিবড় শাস্ত্রজ্ঞও বিপ্লবের পরে এটা আশা করেনি। রাজনীতি শাস্ত্রের গুণাগুণ বিচারে তর্কালংকার অধ্যাপকদের তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈলের কুটিল বিতর্কের মারপ্যাঁচের মধ্যে না ঢুকেই জনসাধারণ মুজিবকে ভোট দিয়েছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল, মুজিব যেটা বলছেন সেটা কল্যাণের। পণ্ডিতের নথিপত্রে যেটা লেখা রয়েছে সেটা বিতর্কের। আর বিতর্কের ঔরসেই জন্ম দ্বন্দ্বের। দ্বন্দ্ব থেকে কলহের সূত্রপাত, অনৈক্যেরও। মুজিব সব বিতর্ক, দ্বন্দ্ব, কলহের ঊর্ধ্বে। বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রতীক তিনি। তাই মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে রেখে যেদিন স্বাধীনতা এলো, সেদিন জনতা রব তুললো, স্বাধীনতা পেয়েছি ভালো কথা, এখন ওই স্বাধীনতার নবজাত শাবকটাকে বাঁচাবার জন্যে মুজিবকে চাই। তাদের দৃষ্টিতে মুজিববিহীন স্বাধীনতা হলো কূলহীন দরিয়ার মাল্লাহীন তরীর মতোই।

আজ স্বাধীনতা এনেছি, মুজিবকেও পেয়েছি। বরাভয় কাটিয়ে উঠে নির্ভয়ে আছি। নির্দ্বিধায় বলেছি, মুজিবই আমাদের শাসন করুন। কিন্তু ঐ মুজিবের শাসনকে উড়িয়ে দিয়ে 'আইনের শাসন' কায়েম করবার কথাটা উঠতেই বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠছে। মনে সন্দেহের দোলা লাগছে।[৩৫]

চার

তখন প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারী লোকজনের হাতেই দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের জীবননাশ হচ্ছিল। ব্যাংক ও বাজারে চালানো হচ্ছিল লুটতরাজ। পুলিশ স্টেশনগুলোতে চলছিল হামলার ঘটনা। কিন্তু দলের

অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দুর্বলতার কারণেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না।[৩৬]

ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী ও সময়ান্তরে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হলেও তাদের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, বহুক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আইনে আরোপিত শাস্তি কার্যকর করা যায়নি। প্রায়ই দেখা গেছে যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুরোধেই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হয়েছে এবং রক্ষীবাহিনী সব সময়ই দলীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।[৩৭]

অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনা ও রক্ষীবাহিনী মোতায়নের ব্যবস্থা আওয়ামী লীগারদের কখনোই স্পর্শ করেনি এবং তা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির কেশাগ্র স্পর্শ করেছে বলেও শোনা যায়নি। বরং দেখা গেছে, রাজনৈতিক আশীর্বাদবিহীন, নিরপরাধ, দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের ওপরই এই ব্যবস্থা বার বার খড়গহস্ত হয়েছে।[৩৭]

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং গণনৈতিকতার এমন অধঃপতন ঘটে যে, ১৯৭৩-এর ২১ ফেব্রুয়ারির মধ্যরাতে যখন সকলে শহীদ মিনারে সমবেত হয়ে ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন তখন উচ্ছৃঙ্খল তরুণেরা মহিলাদের ওপর বারবার হামলা চালায়। দু'জন তরুণীকে শহীদ মিনারের পাদদেশ থেকে হাইজ্যাক করে ধর্ষণ করার পর অর্ধচেতন অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।

সেদিন ছুটি থাকায় ২৩ ফেব্রুয়ারিতে *ইত্তেফাকে* প্রথম পৃষ্ঠায় যে রিপোর্ট হয় তাতে লেখা ছিল–

'একুশে ফেব্রুয়ারি, '৭৩ সাল। যে শ্রদ্ধা, যে পূত-পবিত্র অনুভূতি, মন লইয়া রাজধানীর আবালবৃদ্ধবণিতা শহীদ মিনারে সেই দিন সমবেত হইয়াছিল, এক শ্রেণীর উচ্ছৃংখল তরুণের জঘন্য কার্যকলাপ শুধু সেই মনকে ভারাক্রান্তই করে নাই, শহীদ মিনারের পবিত্র বেদীকে, অমর একুশের পুণ্যময় স্মৃতি দিবসকে মসিলিপ্ত করিয়াছে। মেয়েদের ওপর বারবার হামলা হইয়াছে, অনেক মহিলার নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও ইজ্জত বিনষ্ট হইয়াছে, দুইটি তরুণীকে শহীদ মিনারের পাদদেশ হইতে 'হাইজ্যাক' করিয়া লাঞ্ছিত করার পর অর্ধচেতন অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে বার বার সকলের মনকে নাড়া দিয়াছে একটিমাত্র প্রশ্ন– আইন-শৃংখলা, সভ্যতা, শালীনতা যেখানে একশ্রেণীর তরুণের মুষ্টির মধ্যে, যেখানে শহীদ মিনারের পবিত্র

পাদপীঠে স্মৃতি তর্পণের পরিবর্তে নোংরামি চলে সেখানে শহীদ দিবস পালনের সার্থকতা কোথায়। এই দিবসের পবিত্রতাকে এক শ্রেণীর পশুর, কুরুচিসম্পন্ন তরুণের অনলে নিক্ষিপ্ত হইতে দিয়া মহান একুশকে অপমানিত করার মধ্যে কি যৌক্তিকতা থাকিতে পারে।[৩৮]

সেই ঘটনার কোনো তদন্ত হয়নি। কারণ, যারা এটা ঘটিয়েছিল সেই তরুণদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বললে জিভ কেটে নেয়ার হুমকি দেয়া হলো।

সে সময়ের সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা' ১৯৭৩ সালের আলোচিত চরিত্র হিসেবে 'আততায়ী'কে নির্বাচন করে। তারা এই আততায়ী নিয়ে লিখেছিল– 'আততায়ী এমনই এক চরিত্র যে, তা আমাদের সকলের চেনা; চলমান জীবনে যাকে আমরা লালন করছি অথচ খুঁজে বের করতে পারি না।' ১৯৭৩ সালের ৫ জুলাই সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন– গোটা দেশে গুপ্ত হত্যার শিকার ২০৩৫ জন। গত ছয় মাসে ৬০টি থানায় হামলা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থানাগুলো লুট হয়েছে। এর সঙ্গে ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে ৪৯ লাখ টাকা।[৩৯]

শেখ মুজিব অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক তদ্‌বির কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের প্রভাবে অপরাধীর জন্য পর্যাপ্ত শাস্তি বিধান সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমনকি চোরাচালান রোধ ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী তলব করেও সহসাই নিজ দলের নেতাদের চাপে তিনি তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৪০]

শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির সঙ্গে সিপিবি'র ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং মামার ওপর ভাগ্নের প্রভাব ছিল অপরিসীম। শেখ মুজিব যেহেতু রাজনৈতিক চিন্তাধারার চেয়েও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন, সেহেতু শেখ মণির ওপর সিপিবি'র আস্থা ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিপূর্বে সিপিবি তাজউদ্দীনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এলেও পরবর্তীকালে তাদের দৃষ্টি শেখ মণির ওপরই গভীরতরভাবে নিবদ্ধ হয়।[৪০] সাময়িক কিছু মান-অভিমান, তিক্ততা, বাদানুবাদ এবং কোন্দল ছাড়া ন্যাপ (মো) ও সিপিবি আওয়ামী লীগের পক্ষ কখনো ত্যাগ করেনি।[৪১]

সেই সময় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এ ফমিন পরিকল্পনা কমিশনে এসে বলেছিলেন; 'শেখ মুজিব খুবই দয়ালু ও দুর্বল, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দুর্বলতায় ভোগেন।' তার মতে, শেখ মণিই ছিলেন সেই ব্যক্তি যার নেতৃত্বের গুণ যেমন আছে, তেমন আছে কঠোর ও দ্বিধাহীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। তাদের পরামর্শ ছিল, শেখ মণিকে রাষ্ট্রের দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।[৪২]

মুজিবের ভাগ্নে শেখ মণি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডকে চিঠি লিখেছিলেন যে, তার মামা মুজিব তাকে হত্যা করতে চান। তবে ঠিক কী কারণে শেখ মণির এই মৃত্যুভয় শুরু হয়েছিল, সেটা অবশ্য জানা যায়নি।[৪৩]

স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যেই দেশবাসীর উত্তুঙ্গ আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভাটা পড়তে থাকে। স্বাধীনতা তাদের মনে যে প্রাচুর্যের জায়গা তৈরি করেছিল তা মিথ্যা হয়ে যায়। ১৯৭৫-এর এপ্রিলে ভিয়েতনাম যুদ্ধ শেষ হবার পরে আনন্দমিছিল হচ্ছে ঢাকায়। পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন রিক্‌শাওয়ালা জানতে চাইছে আরোহীর কাছে–'কী হইছে ভিয়েতনামে?'

: 'ভিয়েতনাম স্বাধীন হয়েছে।'

: 'স্বাধীন হইছে?– তাইলে সারছে।'[৪৪]

১৯৭৩-১৯৭৫-এর মধ্যে শেখ মণি অন্তত তিন বার মস্কো সফর করেন। তিনি দ্রুত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকছিলেন। এই ঝোঁক আরো বৃদ্ধি পায় তাজউদ্দীনের বিদায়ের পর। মস্কো সফরকালে শেখ মণিকে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়। ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহও দেখানো হয়।[৪৫]

সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের চিন্তা ও মূল্যায়ন এবং শেখ মণির সঙ্গে সিপিবি'র বিশেষ সম্পর্ক একই সুতায় বাঁধা ছিল বলে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

শেখ মণি সহিংস রাজনীতির পক্ষে ছিলেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে তিনি রাজনীতিতে সহিংসতায় বিশ্বাসী। তবে তিনি এটাও বলেছিলেন, 'সেই ভায়োলেন্সের ভিত্তি হবে গণতান্ত্রিকতা'। 'গণতান্ত্রিক সহিংসতার' অর্থ কী হতে পারে তা তিনি কখনো খুলে বলেননি।[৪৬]

কেবিনেট মিটিং-এ শেখ মুজিব আসতেন সবার শেষে, নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট পর। একদিন কেবিনেট মিটিং-এ শেখ মুজিব ঢুকলেন, কাঁধের চাদরটি টেবিলের উপর রেখে ছড়ার সুরে বললেন, 'রইলো তোমার ঘর-বাড়ি/শেখ মুজিবুর চললো বাড়ি।'

একটা হাল্‌কা রসের সঞ্চার হলো কেবিনেট রুমে। অনেকে মনে করলেন এটা রহস্যের পূর্বাভাস।

একটু পরে শেখ মুজিব বললেন: দেশে যে বিশৃঙ্খলা চলছে– আর পারা যায় না! আমি আর পারবো না। আপনারা যে পারেন, ভার নেন, চালান দেশ। সমস্ত সভাকক্ষে একটা থমথমে ভাব। সিনিয়র মন্ত্রীরা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, কামারুজ্জামান, মনসুর আলী– সবাই নীরব। একে অন্যের দিকে জিজ্ঞাসু নয়নে তাকাচ্ছেন। ড. মফিজ চৌধুরী, যিনি মুজিব সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রী ছিলেন, বললেন–

'স্যার, আপনি এভাবে হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারেন না। আপনাকে আপনার ডেপুটি তৈরি করে নিতে হবে। তার হাতে ভার দিয়ে তবে যেতে পারেন। এ সময় তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদের দিকে হাত প্রসারিত করে যেন সম্ভাব্য ব্যক্তিদের দেখিয়ে দিলেন ।

সিনিয়র মন্ত্রীরা কেউ মুখ খুলছেন না। সবাই নীরব। এরপর ড. মফিজের কথা সমর্থন করে কথা বললেন মনোরঞ্জন ধর– তখনকার আইনমন্ত্রী। তিনি উত্থাপিত বক্তব্যের সমর্থনে বেশ কয়েক মিনিট বক্তৃতা দিলেন। তারপর কথা বললেন জেনারেল ওসমানী। তিনিও শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়ার বিপক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেয়ার কোনো ফর্মাল প্রস্তাব এটি ছিল না। তার ছড়াকাটা ও পরবর্তী কথার উপর নির্ভর করেই এই সমস্ত কথাবার্তা হলো। ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকলো। কেবিনেটের সভা নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হলো।

মিটিংশেষে ঘর থেকে বেরুচ্ছেন ড. মফিজ, পাশে তাজউদ্দীন আহমদ। তিনি ড. মফিজের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছেন।

> 'কী ভাই, হাসছেন কেন? কিছু ভুলটুল বললাম নাকি?' ড. মফিজ জিজ্ঞেস করলেন।
>
> তাজউদ্দীন বললেন, 'ভাই, আপনি বিশ্বাস করেন উনি ছেড়ে দেবেন? অযথা তর্ক!'[৪৭]

ছয়

১৯৭৪ সালে টাঙ্গাইল শহর থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে কালিহাতী থানার রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম দু'টি পুলিশ মাটিতে মিশিয়ে দেয়। গ্রামবাসীর মতে, ডাকাত ও দুস্কৃতকারীদের গ্রামবাসী ধাওয়া ও পিটুনি দিলে একজন নিহত হয়। সেই নিহত ব্যক্তিকে একজন পুলিশ সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর প্রতিশোধ নিতেই পুলিশ এই গ্রামগুলোতে হামলা চালায়। ঘরবাড়ি ভস্মীভূত ও লুটপাট এবং নারী-পুরুষ ও বৃদ্ধ-যুবা নির্বিশেষে গ্রামবাসীকে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে পুলিশ। টাঙ্গাইলের এই কাহিনী সরকারি কাগজে গুরুত্বসহ ছাপা হয়নি, বেতারে-টেলিভিশনে চাপা দেয়া হয়েছিল।

ঘটনার এক সপ্তাহ পর আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী এই দুই গ্রামে যান। ফিরে এসে তিনি 'দৈনিক জনপদ'-এ উপ-সম্পাদকীয়তে লেখেন:

"... আমরা প্রথমে ঢুকলাম কুকরাইল গ্রামে। একনজর দেখেই মনে হলো, একটা বন্য হাতি যেন সারা গ্রামটাকে লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। আর বন্য হাতির সেই তাণ্ডব থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশু, নারী এবং অবুঝ জীবজন্তুও নয়। একটার পর একটা আগুনে পোড়া বাড়ি। টিনগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। চাল, ডাল, কলাই, তিসি, তাঁতের সুতা, সুতার রঙ ভস্মীভূত। যে বাড়িগুলো আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছে, তা নির্মমভাবে লুণ্ঠিত। মেয়েদের শরীর থেকে পর্যন্ত সোনা আর রূপার গয়না ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। গরু পুড়েছে, হাঁস-মুরগি-ছাগল পুড়ে ছাই হয়েছে; তার কঙ্কাল চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। যারা সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাদের সম্বিত এখনো ফেরেনি। আমাদের দেখে একদল সর্বহারা নর-নারী সমস্বরে কেঁদে উঠলো। লজ্জা ভুলে মায়ের বয়সী কয়েকজন মহিলা এসে আমার পা জড়িয়ে ধরলো। তাদের কারো কারো দেহে নির্মম প্রহারের চিহ্ন। তাদের কান্নায় আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে, জানি না মানুষের গদি কেঁপে ওঠে কি-না।

কার কথা লিখবো? শ'য়ে শ'য়ে পরিবার সর্বস্বান্ত হয়েছে। অসংখ্য বাড়িঘর, দোকান, তাঁত ভস্মীভূত হয়েছে। এমন হয়েছে যে, বহু পরিবারের আজ মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। একমুঠো খাবার সংগ্রহের সংস্থান নেই। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তি এতটা মাথাচাঁড়া দিতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। অত্যাচারীরা গ্রামবাসীর ওপর অত্যাচার চালিয়ে, তাদের সর্বস্ব লুট করে সন্তুষ্ট হয়নি, গ্রাম দু'টোর প্রত্যেকটি ইঁদারায়, প্রত্যেকটি পুকুরে পেট্রোল আর কেরোসিন ছিটিয়ে পানীয়জল পানের অনুপযুক্ত করে রেখে এসেছে। চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে– সারা গায়ে মারের দাগ, এক বদনা পানি ইদারা থেকে তুলে এনে আমাকে দিলো। বললো– 'একটু মুখে দিয়ে দেখুন।' মুখে দিতে হলো না, নাকের

কাছে নিতেই দেখি, কেরোসিনের উৎকট গন্ধ। দগ্ধ, লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত গ্রামটিতে কান্নায় ভেঙেপড়া নারী-পুরুষের পাশ কাটিয়ে হাঁটছিলাম আর ভাবছিলাম তিন বছর আগের কথা।

... আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। কিন্তু কুকরাইলের সাত সন্তানের মা আছিয়া খাতুন, বৃদ্ধা করিমুন্নেসা আর আবদুল হালিমের মেয়ে সাহেরা খাতুনকে দেখে আমার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। অত্যাচারীরা একেবারে পশু না হলে মেয়েমানুষের গায়ে এমনভাবে হাত তুলতে পারে না। করিমুন্নেসার মাথা ফাটানো। সাহেরা খাতুন যুবতী। তার সর্বাঙ্গে রোলারের প্রহার এবং নখরাঘাতের চিহ্ন। আছিয়া খাতুনের পিঠ ফুলে ঢোল হয়ে আছে। মনোয়ারা নামে এক মেয়ের অবস্থা দেখে আমি রাগে-ক্ষোভে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

...কুকরাইল গ্রামে এমন একজন মানুষ নেই, যার বাড়ি লুট হয়নি। ডাক্তার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিনের বাড়িতে ঢুকে তার সব দুর্মূল্য ডাক্তারি যন্ত্রপাতি পর্যন্ত নষ্ট করা হয়েছে। ঘরের খাট-পালঙ্ক, লেপ-তোষকে আগুন দেয়া হয়েছে। ব্লাডপ্রেসার মাপার একটা আনকোরা নতুন যন্ত্র দেখি ভেঙে বারান্দায় ফেলে রাখা হয়েছে। পাশের বাড়ি থেকে লুট করা হয়েছে রেডিও। পুরনো আমলের একটা গ্রামোফোন যন্ত্র আছড়ে ভেঙে ফেলা হয়েছে। দু'হাতে লুটপাট করা হয়েছে রামপুর ও কুকরাইল গ্রাম। লুটেরারা গরুর গাড়ি বোঝাই করে লাখ লাখ টাকার লুটের মাল নিয়ে গেছে। যা নিতে পারেনি, তা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেছে। রামপুরের ইদ্রিস মিয়া যথেষ্ট মান্যগণ্য লোক। তার বাড়িতে টিনের ঘর চৌদ্দটি। তাঁত ৩৫টি। গোলায় ৩৫ মণ ধান। ঢেঁকিতে ছেঁটে তোলা হয়েছে ১৫ মণ চাল। তাছাড়া সরিষা, কলাই ছিল। ঘরে ছিল তাঁতের কাপড়ের কয়েক শ' পাউন্ড রঙ। যার প্রতি পাউন্ডের দাম দেড় হাজার টাকা। ইদ্রিস আলী কিছু লেখাপড়া জানেন। তাই শখ করে তার তাঁতশিল্পের নাম করেছেন 'দেশবন্ধু হ্যান্ডলুম'। এই হ্যান্ডলুমের ৩৫টি তাঁতই এখন বিধ্বস্ত।

... যে দু'একটা বেঁচে গেছে তার সূতা ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে। ১৪টি বড় টিনের ঘরই ভস্মীভূত। ৩৫ মণ ধান, ১৫ মণ চাল, সরিষা-কলাই, কয়েক শ' পাউন্ড রঙ সব শেষ। রামপুরের আজিজুর রহমানের অবস্থা আরো শোচনীয়। ৩২ বছরের যুবক। গ্রামের সবচেয়ে বড় তাঁতী। ৮০ হাজার টাকার তাঁতের কাপড় ও সূতা ছিল তার ঘরে। সব লুণ্ঠিত। তার ও তার ভাইয়ের যুবতী বৌয়ের পরনের কাপড় ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই।

আজিজুর রহমানের বিধ্বস্ত ঘর থেকে যখন বেরুচ্ছি, তখন শুনি মেয়েকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন। উঠানে না নামতেই পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লেন

একটি মেয়ে। নাম সখীনা। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছেন। একটি তাঁত চালিয়ে কোনরকমে দিন চালান। সেই তাঁতটি ধ্বংস করা হয়েছে। সখীনার এখন জিজ্ঞাসা– তিনি কীভাবে দিন গুজরান করবেন?

এই প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

... আমরা সবাই ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবু কুকরাইল থেকে রামপুর গ্রামে গিয়ে উঠলাম। সেই একই ইতিহাস, একই ধ্বংসের স্বাক্ষর। যে গৃহস্থের ছ'টি গরু গোয়ালে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে, তার বুকে পুত্রশোকের মতো ব্যথা। আমাদের দেখে সে হাহাকার করে উঠল। বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে ছ'টি গরুর দগ্ধ কঙ্কাল।

হাঁটতে হাঁটতে একটা ব্যাপার বিস্ময়কর মনে হচ্ছিল। বাংলাদেশের গ্রাম, কিন্তু কোনো বাড়িতে হাঁস-মুরগীর সাড়া-শব্দ নেই। বৃদ্ধ করিম মিয়াকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, কিছু পুড়ে মরেছে। কিছু লুটেরারা নিয়ে গেছে। দু'শ থেকে আড়াই শ' ছাগল ওরা লুট করেছে।

কী লুট করেনি ওরা? রামপুর হাটের বৃদ্ধ হাজী আব্দুস সবুর মিয়া। এ বছরই হজ করে দেশে ফিরেছেন। হাটে তার কাপড়ের দোকান। বেশি রাখেন কাফনের কাপড়। ত্রিশ হাজার টাকার কাপড় ছিল তার দোকানে। সব লুট। দোকানটাও ভেঙে দেয়া হয়েছে। নিজের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হাজী সাহেব শিশুর মতো অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি জানি, এই কান্না বৃথা যাবে না। বাংলার দুঃখী মানুষের এই কান্না থেকে আবার একদিন বাষ্প হবে, মেঘ হবে। ঝড়ের অশনি সংকেতও দেখা দিতে পারে আজকের শান্ত নীলাকাশে।

... রামপুর-কুকরাইল গ্রামে মোট ক্ষতির পরিমাণ কোটি টাকারও বেশি হবে। কিন্তু দু'জন ছেলেমানুষ ম্যাজিস্ট্রেট তা যদি চার-পাঁচ লাখ টাকা দেখায় আমি বিস্মিত হবো না।

... রামপুর-কুকরাইলে এতবড় ধ্বংসযজ্ঞের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা আইজি কি একবার গ্রাম দু'টোতে যেতে পারতেন না? এ গ্রামের মানুষরা তো বিদেশি নয়, এ দেশের মানুষ। আমাদেরই বাবা-মা, ভাই-বোন। এদের কাছে বাঙালি পুলিশের হয়ে ক্ষমা চাইতে, দুঃখ প্রকাশ করতে লজ্জা কী? এদের ক্ষতিপূরণের

সামান্য ব্যবস্থা করতেই-বা কার্পণ্য কেন? এ দু'টো ব্যবস্থা করলেই তো সব ল্যাঠা চুকে যায়। তা না করে বিদেশি শাসকদের মতো প্রভুসুলভ মনোভাব ও অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং সেই সঙ্গে 'আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি' ধরনের আচার-আচরণ কেন?

... যদি তদন্তে দেখা যেত, ডাকাত ও দুষ্কৃতিকারী আসলে পুলিশের মধ্যে রয়েছে, তাহলে তাদের সাজা দিতে হতো। আর যদি দেখা যেত, কয়েকজন গ্রামবাসীর হঠকারিতার ফলে একজন পুলিশকে কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ দিতে হয়েছে, তাহলে দোষী গ্রামবাসী কয়েকজনের বিচার ও শাস্তি দেয়া চলতো। তা না করে পুলিশের দু'দুটো গ্রাম ধ্বংস করা এবং নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়া অমার্জনীয় অপরাধ। এটা একটা জঘন্য নজির। এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অশুভ ও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। [৪৮]

'নিউজ উইক' পত্রিকায় ১৯৭৪ সালের ১৫ জুন বাংলাদেশ সরকারের চণ্ডনীতি এবং অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় শেখ মুজিবের সামগ্রিক ব্যর্থতা সম্পর্কে টনী ক্লিন্টন রচিত 'চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে' শিরোনামে একটি সংবাদ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সংবাদ নিবন্ধের ছত্রে ছত্রে এক ভয়ানক ভবিষ্যতের আশঙ্কা ফুটে উঠেছিল। সেই নিবন্ধের কিছু উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠকের জন্য তুলে ধরছি:

"... 'রক্ষীবাহিনী' নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী দেশটিতে আরেকবার নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে।

এই আড়াই বছর আগে বাংলাদেশ সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ ছিল। পাকিস্তানিদের নৃশংস গণহত্যা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন সবেমাত্র স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত কিন্তু বিজয়ী বাংলাদেশের বিরাট ভবিষ্যৎ নিয়ে তখন সকল মহলে প্রচুর আশাবাদ।

কিন্তু আজ এদেশে সুখ এক অবলুপ্ত আবেগ মাত্র। রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী স্বাধীন দেশে নির্যাতন এবং হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। বিদেশি সাংবাদিকদের কাছে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আজো পাকিস্তানি আমলের মতোই এদেশের মানুষ ভয়ে কেঁপে ওঠে। বাংলাদেশ এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ মাত্র এটুকুই যে, জনগণ এখন আগের চাইতেও

দরিদ্র হয়ে পড়েছে এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের বদলে স্বজাতির দ্বারা লাঞ্ছিত-নিপীড়িত হচ্ছে।

যেকোনো ধরনের সমালোচনা স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য যদিও-বা সরকারি মহল থেকে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে, তথাপি সর্বত্র বিপদ সংকেত দেখা যাচ্ছে। অর্থনীতিতে অচলাবস্থা নেমে এসেছে এবং কেবল ১৫০ কোটি ডলারের বিদেশি সাহায্যই ব্যাপক অনাহার থেকে জনগণকে বাঁচিয়ে রাখছে।

ধান-পাটের উৎপাদন যুদ্ধপূর্বকালীন মাত্রার অনেক নিচে নেমে গেছে, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার শূন্য এবং মুদ্রাস্ফীতি শতকরা ৪০ ভাগ ছাড়িয়ে গেছে।

পাকিস্তান আমলে যে শ্রমিক দিনে ৩ টাকা পেতো, এখন তার রোজগার ৮ টাকা। কিন্তু সে আমলের ৩ টাকা মূল্যের খাবার কিনতে এখন তার প্রয়োজন ২০ টাকার।

এহেন ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্য যে ব্যক্তিকে সরাসরি দোষারোপ করতে হয়, তিনি হলেন বাংলাদেশের জনক– নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

কিছুসংখ্যক চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের অবস্থা এমন হয়েছে যে, নিজের ভুল-ভ্রান্তিগুলো পর্যন্ত জানতে পারা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, এ চাটুকারের দল কেবল সেই সংবাদগুলোই তার কানে তোলে, যে সংবাদগুলো তিনি নিজে উদ্যোগী হয়ে জানতে ও শুনতে চান। শুধু বৈদেশিক নীতি ছাড়া শেখ মুজিবের নেতৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

এমন একটি সরকারের তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে যোগ্যতাহীন আমলা আর যতসব বদ্‌মাশ এবং অল্প কিছু ভালো কিন্তু অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর দল।

ঘরোয়া অসন্তোষ দমনে মুজিব এমন এক ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছেন যাকে বলা যায়: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনের সুপরিকল্পিত কর্মসূচি। রক্ষীবাহিনী মুজিববিরোধীদের দমন করার কাজে 'প্রাইভেট বাহিনী' হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এ বাহিনীকে মানুষ ভীতি ও ত্রাসের চোখে দেখতে শুরু করেছে।

সম্প্রতি এক মন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাওকারী মিছিলের ওপর রক্ষীবাহিনীর মেশিনগান উত্থিত হয় এবং ঠাণ্ডা মাথায় এরা মিছিলের ১৯ জনকে হত্যা করে। নাগরিক অধিকার এবং আইনি সহায়তা কমিটির ১৬০ জন সদস্য গত সপ্তাহে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রক্ষীবাহিনীর নিন্দা করেছেন। সর্বস্তরের জনগণের রাজনৈতিক

ও সামাজিক জীবনে সরকার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে বলে কমিটি অভিযোগ করে।

এতদিন মুজিবের বৈদেশিক নীতি যেটুকু সফল হয়েছিল ইদানীং তাতেও মন্দা নেমেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ভুট্টো দু'সপ্তাহ আগে ঢাকায় এলে তার সাথে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে কোনো ফলোদয় হয়নি। যুদ্ধে বাংলাদেশের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হলে ভুট্টো সরাসরি নাকচ করে দেন।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে– বাংলাদেশ মনে করে, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে সারা দুনিয়ার একটা গরজ আছে; এ মন্তব্য জনৈক বিদেশি কূটনীতিকের। এই কূটনীতিক বলেছেন: বাংলাদেশ মনে করে, যুদ্ধের সময় যেহেতু বিশ্ব জনমত তাদের পক্ষে থেকেছে অতএব সব সময়ই সেরকমটি থাকতে হবে।

বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে দুনিয়ার গরজ পড়েছে কি পড়েনি, সেটা অন্য কথা। তবে ভবিষ্যতে দেশটির জন্য অত্যন্ত কঠিন সময় অপেক্ষা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সাহায্যদাতা দেশগুলো নিজেরাই মূল্যবৃদ্ধির চাপে অস্থির। ফলে ক্রমাগতহারে সাহায্যদানের বিষয়ে তারা অনীহা প্রকাশ করে চলেছে।'[৪৯]

১৯৭৩ সাল। কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন ন্যাপ নেতা মশিউর রহমান যাদু মিয়া। কয়েকদিন পর রাজধানীর এক থানার ওসি'র সাথে দেখা করতে গেলেন। ওসি তার বন্ধু। যাদু মিয়া ওসি সাহেবকে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'কেমন আছি বলে লাভ নেই। তার চেয়ে একটি ঘটনা বলি, তা থেকেই বুঝে নিতে পারবেন কেমন আছি আমরা।'

ওসি সাহেব বললেন: একদিন একজন লম্বা চুলওয়ালা রংবাজকে (তখন সন্ত্রাসীদের 'রংবাজ' বলা হতো) রিভল্‌ভারসহ ধরে আনলাম। তাকে এনে আমার রুমে চেয়ারে বসিয়ে চা খাওয়ালাম। তারপর বললাম, 'বাবা, তোমার মাথার চুল এত সুন্দর আর লম্বা। আমাকে ওখান থেকে দু'গাছি চুল দেবে?' ছেলেটি একটু অবাক হলেও মাথা থেকে দু'টি চুল তুলে আমাকে দিলো। আমি চুল দু'টিকে একটি খামে ভরে পকেটে রাখলাম। তারপর বললাম, 'এবার বলো তোমার কোনো মুরুব্বী আছেন কি-না, থাকলে ফোন করো।' সে একজন নেতাকে ফোন করলো। সেই আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে বললেন, 'ও আমার

লোক, ওকে ছেড়ে দিন।' আমি ছেলেটিকে বললাম, 'যাও বাবা, তোমাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করো না।'

ছেলেটি উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসে বললো, 'ওসি সাহেব আপনি এতো ভালো মানুষ, আমাকে এতো খাতির-যত্ন করলেন, কিন্তু আমার মাথার দু'টি চুল আপনি কেন রাখলেন বুঝলাম না।' ওসি সাহেব বললেন, 'দেখো বাবা, গতকালও তোমার মতো একজনকে ধরে এনেছিলাম। কিছুক্ষণ পর একটি টেলিফোন পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। যাবার সময় সে আমাকে বলে গেলো, খুবতো ধইরা আনলি; আমার একগাছি চুলও তো রাখতে পারলি না। তা বাবা তুমিও যাতে ওই কথা বলতে না পারো, সেই জন্যই দু'গাছি চুল রেখে দিলাম।'[৫০]

নয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে মুজিবনগর সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ৭৫ কোটি টাকার কোন হদিস পাওয়া গেল না। মুক্তিযুদ্ধের নামে আদায় করা সেই অর্থের কোন হিসাব কেউ-ই দিতে পারলো না। এই অর্থ কিভাবে ব্যয় হলো, কে ব্যয় করলো, আর যদি ব্যয় না-ই হয়ে থাকে তবে কোথায় গেল- এই প্রশ্নগুলো উঠতে শুরু করে।

শেখ মুজিব নিজেও কখনো কখনো রাষ্ট্রিয় আর্থিক বিষয়ে রাষ্ট্রনায়োকোচিত আচরণ করতে ব্যর্থ হন। লজ্জাজনকভাবে সেসব ঘটনা বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের কাছেও প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

ভারত থেকে স্বাধীনতার পর ঢাকায় এসেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী প্রশাসনের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি. এন. হাকসার। হাকসার ছিলেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ভারতের প্রধান আমলা। ঢাকায় এসে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। আলোচনাকালে সামনে আসে মুজিবনগর সরকারের কিছু টাকার প্রসঙ্গ যা তখন ভারতীয় ব্যাংকে গচ্ছিত ছিল।

পি এন হাকসার শেখ মুজিবকে বলেন,

> 'ভারত সরকার এই টাকাটা ফেরত দিতে চায় কিন্তু কীভাবে আমরা ফেরত পাঠাব। ব্যাংক ড্রাফট করে পাঠাব, নাকি তোমরা জিনিসপত্র কিনবে- জিনিসপত্র কিনলে তার বিপরীতে আমরা ব্লক হিসাবে সেই

> টাকা দেব? তবে আমরা বিদেশী মুদ্রায় দিতে পারবো না, ভারতীয় মুদ্রায় দেব।

তখন শেখ মুজিব বললেন টাকাগুলো ট্রাকে করে পাঠিয়ে দিতে। বিস্মিত পি. এন. হাকসার শেখ মুজিবকে বললেন,

> ট্রাকে করে টাকা কীভাবে দেবো? আমাদের তো সরকারি হিসাব-পদ্ধতি আছে, ব্যাংকিং পদ্ধতি আছে।

তারপর শেখ মুজিব বলেছিলেন,

> সামনে আমার নির্বাচন, এই টাকা সে জন্যে আমার দরকার হবে।

পি. এন. হাকসার শেখ মুজিবের এই নীতিবহির্ভূত আচরণ ও অর্থলিপ্সায় ব্যথিত হয়ে ছিলেন। তিনি মিসেস গান্ধী ও তাঁর সহকর্মীদের এ কথা জানান। ১৯৭২ সালের জুন মাসে ভারতের তৎকালীন পরিকল্পনামন্ত্রী ডি. পি. ধর মঈদুল হাসানকে এই ঘটনার কথা জানান। পরে ১৯৮১ সালে খোদ পি. এন. হাকসারও এর সত্যতা স্বীকার করেন।[৫১]

দশ

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাসও অতিক্রান্ত হয়নি, অথচ বাহাত্তরের ২১ জুন সাপ্তাহিক 'হক কথা'র সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। বিস্ময়করভাবে এই গ্রেফতারের ছাব্বিশ দিন পর শেখ মুজিব বলেন, 'তার সরকার কোনো দিনই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে না।' এর মাস দেড়েক পর আগষ্ট মাসে আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা কোরবান আলী দৈনিক বাংলায় এক সাক্ষাৎকারে বললেন, 'সংবাদপত্রকে অবাধ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে না।' ঠিক তার পরের মাসের ৬ তারিখে গ্রেফতার হলেন 'সাপ্তাহিক মুখপত্র' ও 'স্পোকসম্যান' সম্পাদক ফয়জুর রহমান। পরদিন চট্টগ্রামে 'দেশবাংলা' পত্রিকার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়।

তিয়াত্তরের ১ জানুয়ারী ইউসিস অফিসের সামনে পুলিশ ছাত্র ইউনিয়নের দু'জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যার পর দৈনিক বাংলা টেলিগ্রাম বের করায় সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান ও সম্পাদক তোয়াব খান তাদের চাকরি হারান। পত্রিকার সাংবাদিক-কর্মচারীরা শেখ মুজিবের কাছে এর প্রতিকার দাবি করলে মুজিব বলেন, 'আমার কাগজে এসব কি লিখেছ? তোমাদের নীতি থাকে প্রেসক্লাবে ফলিও, নিজেদের ড্রইং রুমে ফলিও।

আমার কাগজে এসব চলবে না।'

'দৈনিক বাংলা'র দু'জনের চাকরি যাবার পর ৫ জানুয়ারী শেখ শহীদ বললেন, 'দৈনিক বাংলা' পত্রিকা থেকে দু'জন পাকিস্তানী দালালকে অপসারণ করা হয়েছে।' তিনি আরো বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর নামের আগে জাতির পিতা ও বঙ্গবন্ধু না লিখলে পত্রিকার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' এর ৯ দিন পর শেখ আবদুল আজিজ এই বলে মন্তব্য করলেন, 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর।'

এরপরের ইতিহাসও লাগাতার কলঙ্কের। তিয়াত্তরের ২৯ মার্চ গণকন্ঠের সাংবাদিকদেও জোর করে অফিস থেকে বের করে দেয়া হয়। ১৩ মে বন্ধ কওে দেয়া হয় 'দৈনিক স্বদেশ', নিজেরা অযোগ্য প্রশাসক সেজে এটি বন্ধ করেন। ১৮ জুন গ্রেফতার করা হয় 'নবযুগ' সম্পাদককে। ২৯ জুন সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে বলা হয়, 'সত্য বলা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা হুমকির মুখে সীমিত স্বাধীনতায় কাজ করছি।' ১২ আগস্ট 'দেশবাংলা' বন্ধ করে দেয়া হয়। ২৩ নভেম্বর 'সাপ্তাহিক ওয়েভ' পত্রিকাকে উচ্ছেদ করা হয় আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে। গ্রেফতার করা হয় সম্পাদককে।

গণকন্ঠসহ অন্যান্য পত্রিকার ওপর বার বার হামলার প্রতিবাদে '৭৪-এর ১৬ জানুয়ারি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলে, 'বিভিন্ন মহলের নিকট হতে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ঘোষিত-অঘোষিত নানা রকম হুমকি, প্রাণনাশ ও প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দেয়ার হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বলেই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।'

চুয়াত্তরের ১৭ মার্চ 'গণকন্ঠ' বন্ধ করে দেয়া হয়। গ্রেফতার করা হয় পত্রিকার সম্পাদক আল মাহমুদ ও আরো কয়েকজন সাংবাদিককে। পরে আবার চালু হলেও হামলা চলতে থাকে। ৩০ জুন পুলিশ গণকন্ঠের অফিসে ঢুকে পত্রিকার সাজানো ফর্মা ভেঙ্গে দিয়ে আসে। জুলাই মাসে 'প্রাচ্যবার্তা'র সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়। চট্টগ্রামের 'ইস্টার্ণ একজামিনার' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৬ ডিসেম্বর গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয় 'অভিমত' সম্পাদক আলী আশরাফের বিরুদ্ধে।[৫২]

সূত্র:

১. রক্ষীবাহিনীর অজানা অধ্যায়; কর্নেল (অব.) সরোয়ার হোসেন মোল্লা, প্রাক্তন সচিব ও রাষ্ট্রদূত, অন্বেষা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৩৮

২. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠাঃ ২৬

৩. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ৬৯

৪. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৯২

৫. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ১৮২

৬. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠাঃ ২৯

৭. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৭

৮. বিন্দু-বিসর্গ; ড. নীলিমা ইব্রাহিম; ফেব্রুয়ারি ১৯৯১, পৃষ্ঠাঃ ১৫১-১৫২

৯. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৮২

১০. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৪

১১. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২৪২

১২. বলেছি বলছি বলব; শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, অনন্যা প্রকাশ, ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৫৩

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৫৪

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৫৫

১৫. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৯২

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৯৩

১৭. সেই সিভিল সার্ভিস : সেইসব সিভিলিয়ান; ড. শেখ আব্দুর রশীদ, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ২০১১, পৃষ্ঠাঃ ৮৮-৯৩

১৮. তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা; শারমিন আহমদ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা ১৯৫

১৯. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৮৩

২০. বিচিত্রা; ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫ জুন ১৯৭৩

২১. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ৯৫

২২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৯৬

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১০১

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১০২

২৫. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৫

২৬. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ১০৭

২৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১০৮

২৮. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩২২

২৯. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৬

৩০. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ১০৯

৩১. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠাঃ ৩৪

৩২. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠাঃ ২১০

৩৩. বলেছি বলছি বলব; শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, অনন্যা প্রকাশ; সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ১৭৩

৩৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৯০-১৯১

৩৫. দূরবীণে দূরদর্শী; শেখ ফজলুল হক মণি, আগামী প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০১১, পৃষ্ঠাঃ ১৯-২১, ৬৯-৭৯, ১০১-১০২

৩৬. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ৩০২

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৯৭

৩৮. দৈনিক ইত্তেফাক; ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৩৯. বিচিত্রা; ২য় বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি ১৯৭৩

৪০. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ৩৬২

৪১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ২৯৬

৪২. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠাঃ ১০২-১০৩

৪৩. একাত্তরের অজানা দলিল; মার্কিন ন্যাশনাল আর্কাইভ্স্, মিজানুর রহমান খান, প্রথম আলো, ০৪ নভেম্বর ২০১৩

৪৪. বিপুলা পৃথিবী; আনিসুজ্জামান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ১৫৫

৪৫. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২২৪

৪৬. বিচিত্রা; ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৯ জুন ১৯৭৩

৪৭. মফিজ চৌধুরী রচনাবলী-১; মোহাম্মদ সা'দাত আলী, এশিয়া পাবলিকেশন্স, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠাঃ ৪৯৩

৪৮. বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর; সম্পাদনাঃ মুনিরউদ্দীন আহমদ, নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ ৪১-৪৫

৪৯. 'নিউজ উইক'; ১৫ জুলাই ১৯৭৪

৫০. স্বর্ণযুগের ইতিকথা; মহিউদ্দিন খান মোহন, শুভ প্রকাশন, মে ২০০৩, পৃষ্ঠাঃ ১৩

৫১. মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর : কথোপকথন- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩জন যোদ্ধার সাক্ষাৎকার; এ কে খন্দকার, মঈনুল হাসান, এস আর মীর্জা; প্রথমা প্রকাশন; ডিসেম্বর ২০১৬; পৃষ্ঠাঃ ১৪৩

৫২. আহমেদ মুস/ একান্ত সমকালের; ঝিঙেফুল, ফেব্রুয়ারী, ২০২৮; পৃষ্ঠাঃ ৭০-৭১

অষ্টম অধ্যায়

প্রতিরক্ষাবাহিনী

> কাপড়ের অভাব, উর্দি দেয়া সম্ভব হয়নি। সেনাবাহিনী প্রধান হিসাবে লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন জেনারেল ওসমানী ও শেখ মুজিবের প্রথম পছন্দ।[১১]

> সৈনিকরা যে দেশের মুক্তির জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যুদ্ধ করেছিলেন সে দেশে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খল শাসন ও হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি দেখে তারা বিরক্ত হয়েছিলেন।[১৮]

১৯৭৩-এর ২৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লাহোর থেকে বিমানে এলেন অনেক বাঙালি সামরিক অফিসার, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় বন্দি ছিলেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে নেমেই তারা দেশের মাটি চুম্বন করলেন। আলো-আঁধারিতে এই ভগ্ন-চূর্ণ তেজগাঁও বিমানবন্দরও তখন তাদের চোখে স্বর্গপুরীর মতো দেখাচ্ছিল। পাকিস্তান-ফেরত সেনা অফিসারদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে সেখানে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।[১]

পাকিস্তানে বন্দিদশায় প্রাণ হাতে নিয়ে, স্ত্রী-কন্যাদের ইজ্জতের ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে এই অফিসাররা বন্দিশালায় ছিলেন। কাঁটাতারের বেড়ার গেটে পাঞ্জাবি প্রহরী। ঘুমাতে পারতেন না কেউ-ই। সেটা ছিল এক জীবন্ত নরকবাস।[২]

পাকিস্তান থেকে ফেরত পাঠানো সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পদে কর্মরত বাঙালি অফিসার ও সৈনিকদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৩ হাজার। এই সকল অফিসার ও সৈনিককে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী তথা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে নিয়োগ দেয়া হলো কোনো রকম যাচাই-বাছাই ছাড়াই।[৩]

এই নিয়োগের পরেই প্রতিরক্ষা বাহিনীতে ফ্রিডম্ ফাইটার ও রিপ্যাট্রিয়েটেড নামে দু'টি শিবিরের সৃষ্টি হয়ে গেল[৪]– মুক্তিবাহিনী গ্রুপ এবং পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিকদের গ্রুপ। শেষোক্ত গ্রুপ বড় হলেও মুক্তিবাহিনী অফিসারদের ক্ষমতা ও দাপট ছিল অপ্রতিরোধ্য। ক্ষুদ্র হলেও প্রকৃতপক্ষে সামরিক বাহিনীর পরিবেশ ও মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মুক্তিবাহিনী অফিসাররাই।[৫]

মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপে তারা ছিলেন শ'খানেক অফিসার ও কয়েক হাজার সৈনিক। আর পাকিস্তান-ফেরত গ্রুপে ছিলেন তার তিনগুণ অফিসার ও সৈনিক। মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকদের অনেকেই ছিলেন অপ্রাপ্তবয়স্ক। কারণ, উপযুক্ত লোক না পেয়ে শরণার্থী শিবির ও অন্যান্য উৎস থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের নিয়মিত বাহিনীতে নিতে বাধ্য হন সেক্টর কমান্ডারগণ। তবে অপ্রাপ্তবয়স্কদের অনেকেই নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দিয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে আগ্রহী ছিল না।[৬] কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭২ সালেও সামরিক বাহিনীর যে কাঠামো ছিল, তাতে প্রয়োজন ছিল লক্ষাধিক সৈনিক এবং হাজার পাঁচেক অফিসার। যে বিষয়ে মুক্তিযোদ্ধা আর পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে মূল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা পাকিস্তান-ফেরতদের তুলনায় দু'বছরের সিনিয়রিটি পাবেন। তাদেরকে এই সিনিয়রিটি দেয়ায় প্রত্যাগতরা অপমানবোধ করেন।[৭]

পাকিস্তান-ফেরত অফিসাররা মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের দুই বছরের জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতিকে সহজে মেনে নিতে পারেননি। অথচ নিয়মানুযায়ী যারা পাকিস্তানে বন্দিশিবিরে স্থায়ী পদে না থেকে অস্থায়ী পদে ছিলেন তাদেরকে পূর্বতন স্থায়ী পদে অর্থাৎ এক র‍্যাঙ্ক নিচে নিয়োগ করার কথা, অস্থায়ী পদের বিপরীতে নয়। যেমন, যিনি পাকিস্তান বন্দিশিবিরে অস্থায়ী মেজর ছিলেন তাকে নিয়মানুযায়ী তার পূর্বতন স্থায়ী পদ অর্থাৎ ক্যাপ্টেন হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে

নিয়োগ দেয়ার কথা। নিয়ম থাকলেও পাকিস্তান-ফেরত অফিসারদের ক্ষেত্রে তা অনুসৃত হয়নি। উপরন্তু পাকিস্তান-ফেরত অফিসারদের মধ্যে অনেকেই দু'-তিন বছরের মধ্যে মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ তৎকালীন লে. কর্নেল এরশাদ (পরে রাষ্ট্রপতি) পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনটি পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল হন। শান্তিকালীন এরকম পদোন্নতি নজিরবিহীন।[৮]

মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাদের বিভক্তি ও ভাগাভাগি শুধু যে সামরিক বাহিনীতেই ছিল তা নয়, বেসামরিক কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যেও তা সমানভাবে প্রকট ছিল। যারা তখন সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি কিংবা করেননি, তাদের প্রতি মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞার ভাব তো ছিলই, তাদের দেশপ্রেম নিয়েও সন্দেহ করা হচ্ছিল।[৯]

স্বাধীনতার পরে কিছুদিনের মধ্যেই দু'জন মেজরকে মেজর জেনারেল এবং তিনজন মেজরকে ব্রিগেডিয়ার পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এই ঘটনা দু'টি বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী এবং নতুন রাষ্ট্রটির পরবর্তী ইতিহাসের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল।[১০]

সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন জেনারেল ওসমানী ও শেখ মুজিবের প্রথম পছন্দ। বর্ষীয়ান ও পেশাদার অফিসার হিসেবে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবেও যোগ্য প্রার্থী ছিলেন। জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ আর্মির তরুণ অফিসার হিসেবে তিনি বার্মা ফ্রন্টে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনারেল ওয়াসিউদ্দিনকে অন্যান্য বাঙালি অফিসারের মতো অবরুদ্ধ করা হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান থেকে ফেরত আসার পরই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হবেন। বিবিসি থেকেও এ সিদ্ধান্তের কথা প্রচার করা হয়েছিল।[১১]

কিন্তু জেনারেল ওয়াসিউদ্দিন যেহেতু পাকিস্তান ফেরত অফিসার, মুক্তিযোদ্ধা নন এবং 'অবাঙালি'; এই যুক্তিতে সেনা প্রধান হিসেবে তার সম্ভাব্য মনোনয়নের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগের তরুণ নেতারা শেখ মুজিবকে জোরের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেন। তরুণ নেতাদের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ দু'জনই কিছুসংখ্যক উচ্চাভিলাষী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের প্ররোচনায় অনেকটা জোরের সঙ্গে শেখ মুজিবকে এই সিদ্ধান্তটি নিতে বাধা দেন।[১২]

চিত্র-কথন:

সেনাবাহিনী শেখ মুজিবের উপরে খুশি ছিলনা। তারা নিজেদের বঞ্চিত বলে মনে করতো। ১৯৭৩-এর নির্বাচনে সৈনিকরা ৮০ শতাংশের বেশি ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেয়। এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সামনের সারির বীর সেনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব ছিলেন দেশ-জাতির জনক আর তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে মুজিবকে রাজনৈতিক সমর্থন দেবার জন্য তারা আর তৈরি ছিল না। সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

ফটো: সংগৃহীত

পরিশেষে সেনা প্রধান হিসেবে জেনারেল শফিউল্লাহকে মনোনীত করা হয়। আর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে উপ-সেনা প্রধান করা হয়। জেনারেল শফিউল্লাহ আর জেনারেল জিয়া একই ব্যাচের ক্যাডেট ছিলেন। কিন্তু সেনাবাহিনীর সিনিয়রিটি অনুসারে জেনারেল শফিউল্লাহর চেয়ে অধিকতর যোগ্য ও অগ্রবর্তী অবস্থানে ছিলেন জেনারেল জিয়া। তবে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতারা জিয়াকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করতেন। জেনারেল ওসমানীও জিয়াকে ভালো চোখে দেখতেন না। এমনকি একটা সময় জিয়াকে পূর্ব জার্মানিতে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে আর্মি থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল।[১৩]

শুধু অফিসারদের অসন্তোষ নয়, সৈনিকদের অবস্থাও ছিল ভয়াবহ। তাদের জুতা বা পোশাক পর্যন্ত ছিল না। পাকিস্তান প্রত্যাগত এক সিনিয়র অফিসার ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণরত খালি পা, লুঙ্গি ও গেঞ্জি অথবা হাফশার্ট পরা, রাইফেল হাতে নিয়মিত সৈনিক দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা জবাবে বলেছিলেন: এদের এখনো উর্দি দেয়া সম্ভব হয়নি, কাপড়ের অভাব।

সৈনিকদের কাপড় ও জুতা নেই। একই সময় কুর্মিটোলায় সেনা ছাউনিতে প্রত্যেক সিনিয়র অফিসারের অফিস কামরায় লেগেছিল এয়ারকন্ডিশনার, জানালায় দামি পর্দা, দেয়াল থেকে দেয়াল কার্পেটে মোড়া। পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর জেনারেলের নিচে কারো অফিসে এয়ারকন্ডিশনার ছিল না। অফিসগুলোও ছিল শত বছরের পুরনো। যেমন অন্ধকার, তেমনি ছোট।[১৪]

এই আক্ষেপ থেকেই ১৯৭৩-এর নির্বাচনে সৈনিকরা ৮০ শতাংশের বেশি ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে দেয়। এই সৈনিকদের অধিকাংশই ছিল স্বাধীনতাযুদ্ধের সামনের সারির বীর সেনা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব ছিলেন দেশ-জাতির জনক আর তাদের অনুপ্রেরণার উৎস। মাত্র ১৫ মাসের ব্যবধানে মুজিবকে রাজনৈতিক সমর্থন দেবার জন্য তারা আর তৈরি ছিল না।[১৫]

সৈন্যরা নিজেদের হতভাগ্য বলে মনে করতো। কারণ, তাদের খাবার নেই, কোনো প্রশাসন নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, ইউনিফর্ম নেই, গায়ের কোট নেই, পায়ে দেয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদেরকে কম্বল গায়ে দিয়ে ডিউটি করতে হয়। অনেক সিপাহি লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোনো ইউনিফর্ম নেই। তদুপরি, তাদের ওপর হয়রানি। এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যদের পেটাতো পুলিশ। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগত সরকারি আমলারা সেনাবাহিনীকে ঘৃণার চোখে দেখতো। একবার সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যকে মেরে ফেলা হলো। সেনা অফিসাররা শেখ মুজিবের কাছে গেলেন। শেখ মুজিব কথা দিয়েছিলেন তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি অভিযোগকারী সেনা কর্মকর্তাদের জানালেন যে, 'কোলাবরেটর' ছিল বলে তাদেরকে মেরে ফেলা হয়েছে।[১৬]

ঊর্ধ্বতন সেনা অফিসারদের ধারণা ছিল যে, শেখ মুজিব তাঁর দ্বিতীয় ছেলে শেখ জামালকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদের জন্য তৈরি করছেন। শেখ জামালকে আর্মিতে ঢুকিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য যুগোস্লাভ মিলিটারি একাডেমিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। জামাল ওখানকার পড়াশোনায় সম্ভবত কুলিয়ে উঠতে না পেরে শেখ মুজিবকে দারুণভাবে হতাশ করে ঢাকায় ফিরে আসে।

এরপর শেখ মুজিব তাকে বিলেতের বিখ্যাত স্যান্ড্হার্স্ট্ মিলিটারি একাডেমিতে পাঠাতে চাইলেন। তিনি তখন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল শফিউল্লাহকে টেলিফোনে বললেন, তিনি যেন জামালকে স্যান্ড্হার্স্ট্-এ ক্যাডেট হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। স্যান্ড্হার্স্টের ক্যাডেটদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়ম-কানুন পালন করে বাছাই করা হয়। আর সেখানে শেখ জামালের চেয়ে অনেক মেধাবী ও অধিকতর যোগ্য প্রার্থীও ছিল। ফলে ধারণা করা হয়েছিল যে, ব্রিটেনের প্রিমিয়ার মিলিটারি একাডেমি জামালকে হয়তো যোগ্য বলে বিবেচনা করবে না।

কিন্তু একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ বিবেচনা করে তারা ৬,০০০ পাউন্ড প্রশিক্ষণ ফিসহ বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে গ্রহণ করতে রাজি হলো। ওই টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অজ্ঞাতে বিশেষ আর্মি চ্যানেলে গোপনীয়ভাবে স্যান্ড্হার্স্টে পাঠানো হয়েছিল।[১৬]

আরেক দিকে, মাত্র চার বছর আগে ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও কী আশ্চর্য, প্রায় সব মুক্তিযোদ্ধা অফিসারই এরই মধ্যে ভারতকে নাক সিঁটকাতে শুরু করেন। জেনারেল শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, জিয়াউর রহমান এরা কেউ ভারতকে ভালো চোখে দেখতেন না। জেনারেল ওসমানী তো ইন্দিরা গান্ধীর নামই শুনতে পারতেন না। যুদ্ধের পর তাদের মাতব্বরি ও লুটপাট সবাইকে ক্ষেপিয়ে তোলে।[৭]

সেনা প্রধান হিসেবে জেনারেল শফিউল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় পঁচাত্তরের মে মাসে আরো তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপতি তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেন। এতে জিয়া খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং দেন-দরবার শুরু করে দেন। সে সময় একদলীয় বাকশাল সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব তাকে সোজা বলে দেন, 'তুমি চাইলে রিজাইন করতে পারো'।[১৭]

সেনাবাহিনীর কাছে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশিত তা হলো– শৃঙ্খলা এবং চেইন অব কমান্ড, যা ভঙ্গ করে তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। এটা দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবার, বিদ্রোহ করার এবং চেইন অব কমান্ড ভাঙার মানসিকতারও জন্ম দিয়েছিল। যে দেশের মুক্তির জন্য তারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে লড়াই করেছিলেন, সে দেশে দুর্নীতি, বিশৃঙ্খল শাসন এবং হালুয়া-রুটির ভাগাভাগি দেখে তারা বিরক্ত হয়েছিলেন। আর স্বাধীন দেশে তাদের ক্রমাগত অমর্যাদা আর অপমান দেখে গভীর হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন।[১৮]

সূত্র:

১. কাছে থেকে দেখা : ১৯৭৩-১৯৭৫; মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১১

২. প্রাগুক্ত: পৃষ্ঠা: ১২-১৩

৩. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ৫৬

৪. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ২৯

৫. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ, পিএসসি হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২০

৬. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ৫৩

৭. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১

৮. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ৫৭

৯. কাছে থেকে দেখা : ১৯৭৩-১৯৭৫; মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৭

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৪

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৮

১৩. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৬

১৪. কাছে থেকে দেখা : ১৯৭৩-১৯৭৫; মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৪

১৫. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩৮

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৯

১৭. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এমএ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২২

১৮. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৮৫

নবম অধ্যায়

বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের নেতারা যখন বিদেশে সাহায্যের জন্য হাত পাততে যেতেন তখন তাদের বিলাস-ব্যাসন অন্যান্য দেশের নেতাদের বিস্ময় উদ্রেক করতো।[১৩]

’৭৩ সালের শেষ নাগাদ হাজার কোটি টাকার ওপর বিদেশি সাহায্য পেয়েও প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।[১৪]

ক্ষমতাসীন দলের নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত তখন।[১৪]

‘বিদেশি সাহায্যসামগ্রী কালোবাজারে আর চোরাচালান হয়ে ভারতে চলে যায়।’[১৪]

১৯৭২ এর ফেব্রুয়ারী, দিল্লি-র লাল কেল্লায় তাজউদ্দিন এসেছেন লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখতে। প্রাসাদের অলিন্দের দুধারে দোকানের সারি। সামনে দেওয়ানে আম দেখা যায় যদিও লোহার শিকল দিয়ে ঘেরা। আরো হাটতে হাটতে একটি খোলা মাঠের কাছে গেলেন তাজউদ্দিন। হয়তো কোনো কালে এখানে বাগিচা ছিলো। এখন শুধুই ঘাস। তার এক পাশে খোলা আকাশের নিচে কয়েক সারি বেঞ্চ পাতা আছে। সবাই ওখানে বসছে তাজউউদ্দিনও গিয়ে বসলেন। সামনে দেওয়ানে খাস, মমতাজ মহল। এর পিছনেই যমুনা নদী।

পূর্নিমার চাঁদ তখন দেওয়ানে খাসের উপরে উঁকি দিচ্ছিলো, পাশেই সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৈরী মোতি মসজিদ। এখানেই খাস দরবার বসতো, ছিলো সেই ঐতিহাসিক ময়ূর সিংহাসন। ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারিত হতো এখান থেকেই। আজ তা এক ইটের খাঁচা ছাড়া আর কিছুই নয়। এক সময় অপেক্ষার পালা শেষ হলো, চারিদিকের সব আলো নিভে গেলো। মাঝ খানের মহল থেকে গমগম স্বরে ভেসে এলো ইংরেজীতে বর্ণণা; আমি মহাকাল। আমি সব সময়ের সাক্ষী। এই সেই লালকেল্লা, যেখানে সব সময় মানুষের কলরব, আরজি, বিচার, আর্তি, নুপুরের নিক্কন, সরাবের নহর বয়ে যেতো আজ সে শুধুই সময়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ এখানে আঁধার। কিন্তু এক সময় এখানে ছিলো মানুষের ঢল। ধারা-বর্ণনার সাথে সাথে দেওয়ানে খাস, মমতাজ মহল, কখনো মোতি মসজিদ বিভিন্ন রঙের আলোতে ঝলমল করে উঠছিলো। সেই সঙ্গে যমুনার জলের কুলকুল ধারার শব্দ, মিনা বাজারের মেয়েদের কাঁচভাঙ্গা হাসি,কলরব, বাইজীদের নুপুরের নিক্কন, গজলের সুর সময় যেন জীবন্ত হয়ে উঠলো। সবাই স্তব্ধ। ঘোড়ার খুঁরের শব্দ এতোটাই বাস্তব মনে হচ্ছিলো যে সবাই শিউরে উঠছিলো। এক ঘন্টার ইতিহাস বর্ণণা যখন শেষ হলো তখন খোলা আকাশের নিচে হিমে সবার মাথা জমে গেছে। সবার মনেই মুগ্ধতার, কষ্টের রেশ রয়ে গেলো।

ঘটনাচক্রে তাজউদ্দীন এর কাছেই বসে লাইট এন্ড সাউন্ড শো দেখলেন বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা। তারা দু'জনই বিশিষ্ট দর্শনার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসেছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন রীতিমাফিক ম্যাকনামারার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতেও রাজি হননি।[২]

এই সময়ের মধ্যেই ম্যাকনামারার এক দিনের জন্য ঢাকা সফরের আগ্রহের কথা শেখ মুজিবের কাছে তোলা হয় এবং তিনি তা অনুমোদন করেন। ম্যাকনামারা যখন দিল্লি থেকে ঢাকায় আসেন, তখনও তাজউদ্দীন আহমদের দিল্লি সফর শেষ হয়নি। যদিও দিনের দ্বিতীয় ভাগে ম্যাকনামারার সফরের মধ্যেই তাজউদ্দীন দেশে ফিরে আসেন।[২]

যদিও তখন বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্য নয়, তবু অদূর ভবিষ্যতে সদস্য হবে এমনটা নিশ্চিত ছিল। তাই তিনি এ দেশের নতুন নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ থেকে সেই সময় বাংলাদেশ সফরের ইচ্ছা পোষণ করেন।

উল্লেখ্য, স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে বিশ্বব্যাংক ঢাকায় তাদের স্থায়ী মিশন চালু রাখে এবং স্বাধীনতার পরও তা চালু ছিল। দিল্লিতে আসার পরে ম্যাকনামারা

জানতে পারেন, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ একই সময় দিল্লি সফর করছেন। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আলোচনা একটু এগিয়ে রাখার জন্য দিল্লিতেই ম্যাকনামারা সদ্যস্বাধীন নবীন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাজউদ্দীন আশ্চর্যজনকভাবে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে ম্যাকনামারার দেখা করার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[১]

ম্যাকনামারার সঙ্গে সেই সময়ের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামের পূর্ব-পরিচয় থাকার সূত্রে তাকে মধ্যাহ্নভোজের নিমন্ত্রণ জানান। নুরুল ইসলাম সাহেব সেই মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন কি-না সেজন্য তাজউদ্দীন আহমদের অনুমতি চাইতে যান। অর্থমন্ত্রী বলেন, ম্যাকনামারার এ সফর কূটনৈতিক সফরের আওতায় পড়ে না। এছাড়া বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের সদস্যও নয়। অতএব পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের বিশেষ ব্যবস্থার অধিকার ম্যাকনামারার নেই। অপরদিকে তার এই সফর ব্যক্তিগত সফরও নয়। তাই ব্যক্তিগত আপ্যায়নেরও কোনো প্রশ্ন আসে না। তাই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত নয়।[২]

অন্যদিকে শেখ মুজিব সাক্ষাৎ দিলেন ম্যাকনামারাকে। প্রধানমন্ত্রী তার স্বাভাবিক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, নম্রতা আর সৌজন্যমূলক আচরণ দিয়েই তাকে গ্রহণ করলেন।[৩]

শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাজউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে নুরুল ইসলাম ম্যাকনামারার সঙ্গে বৈঠক করেন। তারা বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়া ত্বরান্বিত করতে যে সকল প্রক্রিয়া ও কাগজপত্রের প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ব্যাপারে যে ধরনের সাহায্য দরকার বিশ্বব্যাংক তা করবে বলে রবার্ট ম্যাকনামারা আশ্বাস দেন।

পরবর্তী আলোচনার বিষয় ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের সাহায্য নিয়ে। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে প্রথম করণীয় কী– এ বিষয়ে ম্যাকনামারা প্রশ্ন তুললে তাজউদ্দীন কৃষির জন্য হালের বলদের কথা বলেন। তিনি বেশ ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে এই ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন যে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আগ্রাসনে মানুষ ঘর-বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তাদের হালের বলদ হয় মেরে ফেলা হয় কিংবা হারিয়ে যায়। গোয়াল ও দড়ি নষ্ট করার কথাও

তোলা হয়। অতএব টিনের গোয়ালঘর ও দড়িদড়ার প্রয়োজন।[৪]

একটি সদ্যস্বাধীন দেশের পুনর্গঠনে হালের বলদ, টিনের গোয়ালঘর আর বলদ বেঁধে রাখার জন্য দড়িদড়া যে অর্থমন্ত্রীর কাছে অগ্রাধিকার হতে পারে না এবং সেটা যে বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যানকে অপদস্থ করার জন্যই বলা হয়েছিল, সেটা ম্যাকনামারা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন।[৪]

অথচ মুক্তিযুদ্ধকালে এই ম্যাকনামারা বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।[১] হয়তো সে জন্যই যে দেশটি তাদের সদস্যই নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই নবীন দেশটি তিনি দেখতে এসেছিলেন।

বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে, বিশেষ করে অর্থনীতি বিষয়ে বোঝাপড়া তৈরি হতো সিপিবি ঘরানার বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা থেকে। তাদের ধারণা ছিল, বিদেশি বিনিয়োগ মানেই খারাপ একটা কিছু। এই বিদেশি বিনিয়োগ না নেয়াটাই ছিল প্রগতিশীলতা। এই চিন্তার প্রকাশ দেখা যায় বিশ্বব্যাংকের প্রধানের সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রীর অবাস্তব ও অসৌজন্যমূলক আচরণের ভেতর।

১৯৭২ সালের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর সদস্যপদের জন্য আবেদন জানায় এবং ১৯৭২-এর আগস্ট মাসে সদস্যপদ লাভ করে। সদস্যপদ নিয়ে আলোচনার সময় পাকিস্তান বৈদেশিক ঋণ ভাগাভাগি করে নেয়ার বিষয়টি উত্থাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও ফ্রান্স ছিল বৃহৎ দ্বিপক্ষীয় দাতা। তারা তাদের বক্তব্য ব্যাংকের প্রতিবেদনের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এ সময় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিল। তাই বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পাকিস্তান আমলের যে সব প্রকল্প চালু ছিল সেগুলো নতুন করে চালু করার আলোচনা শুরু করে। বাংলাদেশ এসব প্রকল্পের ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকল্প ঋণ অনুদানে পরিণত হয়। একই সময় এটি পরিষ্কার করে দেয়া হয় যে, বাংলাদেশ যে চলতি প্রকল্পের দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে তার অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের ঋণের দায় ভাগ করে নিতে প্রস্তুত।[৫]

কিন্তু বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে দাতারা সিদ্ধান্ত দেয় যে, ঋণের বোঝা পাকিস্তান একা বহন করবে না। কারণ, 'পাকিস্তান ভূখণ্ড ও জনগণ পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া ঋণের আয়ের এখন আর ভাগীদার হতে পারবে না। পাকিস্তান তার বৃহত্তর অর্থনীতির জন্য ঋণ গ্রহণ করেছিল, এখন সেটা তার অধীনে নেই।'[৬]

এর মধ্যে পাকিস্তান একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে
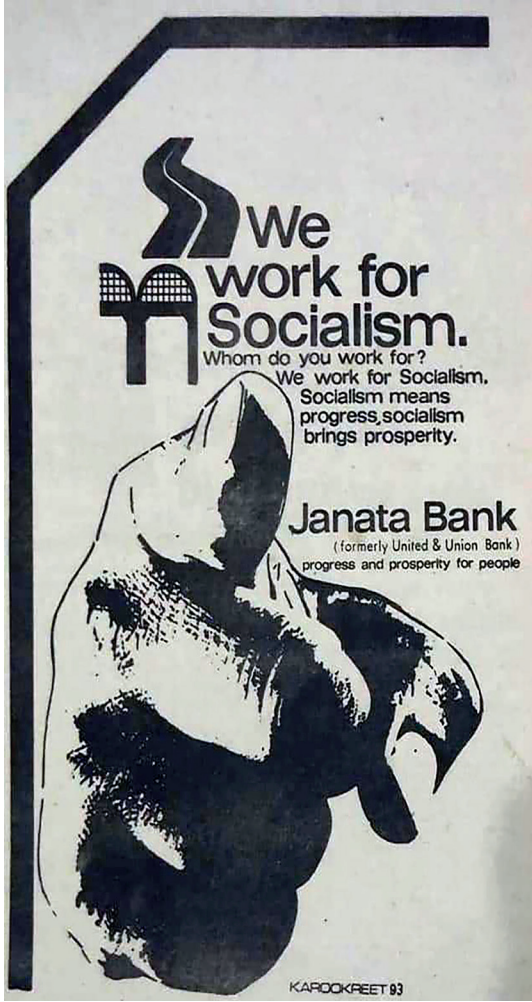
চিত্র-কথন: *পাকিস্তানের ইউনাইটেড এন্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ করে জনতা ব্যাংক নাম দেয়া হয়। জনতা ব্যাংকের বিজ্ঞাপনে ইংরেজিতে সদর্পে ঘোষণা করা হচ্ছে তারা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য কাজ করছে। সমাজতন্ত্র মানেই প্রগতি ও সমৃদ্ধি। একটা ব্যাংক কীভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করতে পারে, বা সমাজতন্ত্র মানেটাই বা কী সেবিষয়ে ব্যাংকের বড় কর্তাদেরও কোন ধারণা ছিলোনা। রাষ্ট্র গঠনের চাইতে সকলেই বড় বড় চটকদার শ্লোগান দেয়াতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো।*

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

ডিসেম্বর পর্যন্ত তার বৈদেশিক ঋণের ওপর যত দেনা (সুদ-আসলসহ) বাকি আছে, তা স্থগিত থাকবে।[৭]

যখনই দাতারা ভবিষ্যৎ অর্থ সাহায্য দেয়ার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তখনই শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের ঋণের অংশের দায়িত্ব নিতে হবে। বাংলাদেশ এমন শর্ত মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকৃতি জানায়। বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে ও পরামর্শে ঋণদাতারা এই নীতিতে অটল থাকে। বাংলাদেশের ওপর কঠোর চাপ সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঋণ প্রদান না করার আশঙ্কার কথা তোলে।[৭]

যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। সেই ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার জন্য বিপুল বিনিয়োগের প্রয়োজন ছিল। এক হিসাব অনুসারে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি তৎকালীন হিসাবে ২১-২৩ বিলিয়ন ডলার বলে ধারণা করা হয়। এর মধ্যে অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২০ বিলিয়ন ডলার এবং মানব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলার।[৮]

বাংলাদেশের জন্য অধিক অর্থনৈতিক সাহায্যের সংস্থান করতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সফর করেন। এই সময়ে যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া বাংলাদেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে সহায়তাদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে সাহায্য নেয়ার সরকারি নীতি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রশংসিত হয়েছে। 'দৈনিক বাংলা'র সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'সাহায্য আসলে দাসত্ব-শৃঙ্খলের নামান্তর। যে সাহায্য শুধু পরনির্ভরশীলতাই বাড়িয়ে তোলে, সে সাহায্য আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যে সাহায্য চাই, তা হবে শর্তহীন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গঠনের পক্ষে সহায়ক।' প্রায় একই রকম বক্তব্য পাওয়া যায় 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদকীয়তে। 'বিদেশি সাহায্যেও চরিত্র বিচার' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সাহায্য নেয়া আমাদের দেশের জন্য কল্যাণকর হবে না বলে মন্তব্য করা হয়। এতে আরো বলা হয়, স্বাধীনতার পরে এরা (সমাজতান্ত্রিক দেশ) হয়েছে আমাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সহায়ক। সুতরাং এদিক থেকে যে বিদেশি সাহায্যের ধারায় আমরা শরিক হয়েছি, সেটা আমাদের জাতীয় লক্ষ্যের অনুকূল।[৯]

বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ সাহায্যের বিষয়ে ঠিকমতো সাড়া পেল না। যদিও রাজনৈতিক সুসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রী

দেশগুলোর কাছেই বাংলাদেশ প্রথম আর্থিক সাহায্যের আবেদন করে। উপমহাদেশের বাইরে প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারিতে। পণ্য সাহায্যের বিশাল তালিকা সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে পণ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ ছোট অনুদান পায়। এই সফরে শেখ মুজিবের বড় অর্জন হলো চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিওনিদ ব্রেজ্‌নেভের প্রতিশ্রুতি লাভ।[১০]

স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে উপমহাদেশের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছে পাকিস্তানই ছিল বিশ্বস্ত বন্ধু। কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সেই পাকিস্তান স্বাভাবিক কারণেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। উপমহাদেশের পরিবর্তিত শক্তি সাম্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিপরীতে পাকিস্তান যেন আরো দুর্বল হয়ে না পড়ে, সেই বিষয়ে পশ্চিমা দেশগুলো সচেষ্ট ছিল। যে কারণে দাতাদেরও সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের বদলে ব্যাপক সহানুভূতি ছিল পাকিস্তানের প্রতি।[১১]

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে 'বন্ধু' রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য-সহযোগিতাও ছিল অনুল্লেখ্য। ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছরে বাংলাদেশকে ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ৩১১ মিলিয়ন ডলার। যার মধ্যে বাস্তবে ছাড় করা সম্ভব হয়েছিল ২৭৫ মিলিয়ন ডলার। এই ছাড়ের মধ্যে অনুদান ছিল মাত্র ৬৯ মিলিয়ন ডলার।

অন্যদিকে একই সময় যুক্তরাষ্ট্র ঋণ ও অনুদান সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয় ৭৬৩ মিলিয়ন ডলার। ছাড় করে ৬৮৮ মিলিয়ন ডলার।

একই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি ছিল ২০৭ মিলিয়ন ডলারের। পাওয়া গেছে ১১৯ মিলিয়ন ডলার এবং এর মধ্যে অনুদান ছিল মাত্র ৩০ মিলিয়ন ডলার।

লক্ষ্যণীয়, ভারত স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম পাঁচ বছর বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধু রাষ্ট্রের অবস্থানে থাকলেও এবং সে সময় বাংলাদেশের জন্য সব ধরনের সাহায্য-সহায়তা জরুরি হলেও ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশ যে ঋণ ও অনুদান সহায়তা পেয়েছে তা যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সহায়তার ৪০ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সেই সময়কার অন্যতম বিশ্বশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বাংলাদেশ যে সহায়তা
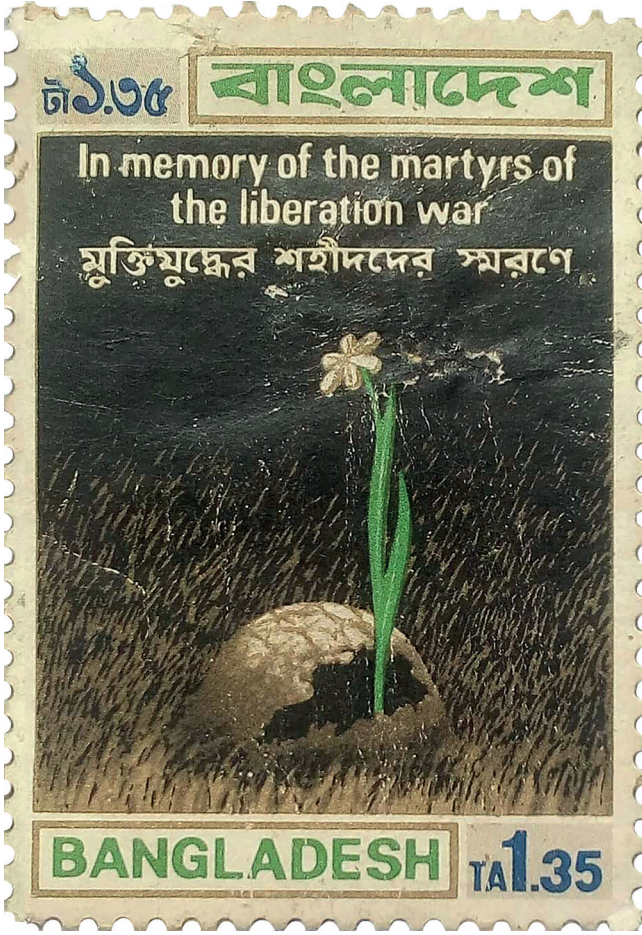
চিত্র-কথন:

১৬ *ডিসেম্বর* ***১৯৭২*** *বিজয়ের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে ছাপানো স্মারক ডাকটিকেট। স্বাধীন দেশে শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে সেই ত্যাগের সমাধিতে এক নতুন রিপাবলিকের ফুল ফুটবে সেটাই ছিলো সকলের আকাঙ্খা। সেই আকাঙ্খা দেশের সব ক্ষেত্রেই মুর্ত হয়ে উঠছিলো।*

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

পায়, তা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত সহায়তার ১৭ শতাংশ মাত্র।[১২]

সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের নেতারা যখন বিদেশে সাহায্যের জন্য হাত পাততে যেতেন, সেই সময় তাদের বিলাস-ব্যাসন অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক নেতাদের বিস্ময় উদ্রেক করতো। এ প্রসঙ্গে সিঙ্গাপুরের অবিসংবাদিত নেতা লি কুয়ান ইউ তার আত্মজীবনীতে ১৯৭৩ সালে অটোয়ায় কমনওয়েল্থ কনফারেন্সে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'তিনি তার বিশেষ ঠাটে নিজের প্লেনে চেপে এলেন। আমি যখন অটোয়াতে ল্যান্ড করলাম, তখন দেখলাম বাংলাদেশের মনোগ্রাম অঙ্কিত একটা বোয়িং-৭০৭ টারমাকে দাঁড়িয়ে আছে। আমি যখন ফেরত এলাম, দেখলাম সেই একই জায়গায় প্লেনটা দাঁড়িয়ে আছে। গত আট দিন ধরে প্লেনটা ঠায় এভাবেই কোনো কিছু আয় না করে অলস সময় কাটিয়ে দিলো। আমি যখন হোটেল ছাড়ছিলাম তখন দু'টো বিশাল ভ্যানে করে জিনিসপত্র বাংলাদেশের বিমানে তুলে দেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, শেখ মুজিব সেই কন্‌ফারেন্সে সবার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়ে বক্তব্য দিয়েছিলেন।'[১৩]

জার্মান সাংবাদিক কার্লোস বিড্‌ম্যান তার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ এক হাজার কোটি টাকার ওপর বিদেশি সাহায্য পেয়েছে। কোনো উন্নয়নশীল দেশ এত অল্প সময়ে এত অধিক বিদেশি সাহায্য পায়নি। তারপরও দেশের প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের জন্য তেমন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

দেশে বহু বেকার রয়েছে এবং এমন লোক রয়েছে যারা উপযুক্ততার চেয়ে নিচু মানের কাজ করছে। স্বাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন– এই প্রবাদ আর এদেশে কারো মনে দাগ কাটে না, এখানে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত।

বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ তৎপরতার এককালীন প্রধান টনি হ্যাগেন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন: শিশুখাদ্যের এক-সপ্তমাংশ ও প্রতি ১৩টির মধ্যে ১টি কম্বল উপযুক্তদের হাতে পৌঁছায় না। বেশির ভাগ জিনিস হয় কালোবাজারে চলে যায় অথবা চোরাচালান হয়ে ভারতে চলে যায়। পত্রপত্রিকায় এসব ব্যাপারে লেখালেখি হলেও অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয়নি। একবার বিমানে করে বন্যার্তদের জন্য গুঁড়ো দুধ এলো। যেদিন গুঁড়ো দুধগুলো ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছলো তার পরদিন রাজধানীর এক হোটেল ম্যানেজার দুধ কিনতে বাজারে লোক পাঠালো। বাজারে হরদম সদ্য আসা দুধ বিক্রি হচ্ছে।'[১৪]

১৯৭২-এর মার্চ মাসে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে প্রথম আলোচনা হয়েছিল। বাংলাদেশের রপ্তানি-গন্তব্যের পরিধি তখন খুব সীমিত। পাকিস্তানে তার বাজার অবলুপ্ত। বাংলাদেশ তাই খুব আশা করে ছিল যে, এই বাণিজ্য চুক্তি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে সহায়ক হবে।

আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশের কতিপয় প্রস্তাবকে ভারতীয় দল 'অসম্ভব এবং গ্রহণযোগ্য নয়' বলে প্রত্যাখ্যান করে। এর একটি ছিল পারস্পরিক শুল্ক সুবিধা এবং আরেকটি ছিল কোনো কোনো পণ্যের দাম নির্ধারণ সরবরাহ ও পরিবহনের খরচভিত্তিক করা।

বাংলাদেশে তখন জ্বালানি এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘর ও রাস্তা ইত্যাদি নির্মাণকাজে ইট তৈরিতে প্রচুর কয়লার প্রয়োজন ছিল। বাংলাদেশের আশা ছিল, নিকটবর্তী ভারতীয় কয়লা খনিসমৃদ্ধ অঞ্চল থেকে হয়তো স্বল্প পরিবহন খরচে আন্তর্জাতিক বাজারের চাইতে কম দামে কয়লা আমদানি করা যাবে। কিন্তু ভারত মোট দাম আন্তর্জাতিক মূল্যের নিচে নামাতে রাজি হলো না।

আরো কয়েকটি ব্যাপারে সুবিধা পাওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ আলোচনাতেও মতান্তর হলো। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে নেপালের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'ট্রানজিট সুবিধা' চাইতে গেলে সেই প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যান করা হয়।

অথচ এই সভাতেই বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে ভারতের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে যাবতীয় পণ্য পরিবহনের জন্য তারা 'ট্রানজিট' চুক্তির জন্য তখন চাপ সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ দল সেই আলোচনায় দৃঢ়ভাবেই তাদের মতামত ব্যক্ত করে। ভারত সম্ভবত তা পছন্দ করেনি। বাইরে শোনা গেল যে, এই আলোচনায় বাংলাদেশ পক্ষের প্রধান বাণিজ্যসচিব লুৎফর রহমানকে সরিয়ে দেয়া হবে। কিছু দিনের ভেতরেই ঝানু, নীতিনিষ্ঠ ও দেশপ্রেমী বাণিজ্যসচিব এম লুৎফর রহমান বদলি হয়ে গেলেন।[১৫]

সূত্র:

১. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ১২৭

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২৮

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২৯

৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৩০

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৬৪

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৬৫

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৬৬

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৭২

[এসএ চৌধুরী ও এসএ বাশার, 'দি এনডিওরিং সিগনিফিক্যান্স অব বাংলাদেশ'স্ ওয়ার অব ইনডিপেন্ডেন্স : অ্যান অ্যানালাইসিস অব ইকনোমিক কস্ট্স্ অ্যান্ড কন্সিকোয়েন্সেস্, ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটি, কানাডা (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি), ২০০১]

৯. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২০২

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০৫

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০৪

১২. Flow of External Resources, Economic Relations Division, MOF, GOB, Dhaka, 22 Jan. 2013, Page: 94, 109, 114.

১৩. Ring for the Butler - Ministers and civil servants in India cling to symbols of rank; By Sunanda k. Datta-Ray, Published 3.11.07

১৪. গণকণ্ঠ; ২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪

১৫. ভাবনায় বাংলাদেশ; ইনাম আহমেদ চৌধুরী, হাসি প্রকাশনী, মে ২০০৯, পৃষ্ঠা: ২১-২২

দশম অধ্যায়

স্বাধীন দেশের স্বীকৃতি, পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং ওআইসি সম্মেলন

ভুট্টো যা চেয়েছিলেন তা-ই পেয়েছেন। যুদ্ধবন্দিদের বিচার বাতিল করিয়েছেন এবং 'আটকেপড়া পাকিস্তানি'দের দায়ভারও তিনি নেননি।[২৫]

সমঝোতা স্থাপনের পর দেখা গেল, সমস্ত কৃতিত্বের ভাগ নিয়েছে ভারত, পাকিস্তান অর্জন করেছে ব্যাপক রাজনৈতিক বিজয়, আর বাংলাদেশ? বাহ্‌বা ছাড়া সে আর কিছুই পায়নি![২৪]

> 'আমরা পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়েছি, যার মধ্যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছিল।'[২২]

পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পর পাকিস্তান ও তার বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলো প্রচার করেছিল যে, বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে আছে এবং ভারত জোর করে বাংলাদেশ নামে পাকিস্তানের সেই অংশকে দখল করে রেখেছে। এই প্রচারণার পরোক্ষ প্রভাবে ও স্বাধীন বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের কারণে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশ বাংলাদেশকে স্বাধীনতার পর পরই স্বীকৃতি দেয়নি।[১]

চিত্র-কথন:

ওআইসি সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় শেখ মুজিব সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে ওআইসি সম্মেলনকালে তার প্রতি পাকিস্তান সরকার বিশেষ করে ভুট্টোর আতিথেয়তার কথা বলতে গিয়ে মুজিব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'জনগণের উচিত পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া। লাহোরে ওআইসি সম্মেলনে হাস্যোজ্জ্বল শেখ মুজিব।

ফটো: সংগৃহীত

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।[২]

বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ইউনেস্কো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ পেলেও জাতিসংঘের দ্বার তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত হয়নি।[২] জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার রুখতে চীন ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিল।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে সংসদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বিবৃতিতে বলেন, মোট ১১টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তার মানে, পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক দেশ তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।[৩]

স্বীকৃতি না দেয়া গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ছিল সৌদি আরব ও চীন। সোভিয়েত রাশিয়া ও সোভিয়েতপন্থি সকল দেশ, ভারত ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন-এর অধিকাংশ সদস্যের সক্রিয় সমর্থন লাভের পরেও পাশ্চাত্যের সাহায্যদাতা দেশসমূহ, আমেরিকার প্রভাব বলয়ের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ তখন পর্যন্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি।[২]

পাকিস্তানের প্রায় ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দি তখনো ভারতে আটক ছিল। এটাই জাতিসংঘ ও প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের স্বীকৃতি অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হয়।[২]

বাংলাদেশ সরকারও প্রথমদিকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিল। তাই যুদ্ধবন্দিদের বিচার করা হবে–এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময় তারা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার কোনো পরোয়া করতো না।[৪] এ কারণেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও ১৯৭২ সালের ৯ জুন শেখ মুজিবুর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[৪]

১৯৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারকালীন গোটা সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রতিটি জনসভায় পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার সমুচিত জবাব দেয়ার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।[৫]

অন্যদিকে, অর্ধভগ্ন, বিধ্বস্ত ও মনোবলহীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তখন জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে।[৪] তিনি তখন পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিসমূহকে

এই বলে বোঝাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন যে, পাকিস্তানি সৈন্যদের আটক রাখার কিংবা তাদের বিচার করার কোনো অধিকার ভারতের নেই। তার মতে, ভারত নিজেই ছিল আক্রমণকারী দেশ। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কেবল সার্বভৌম দেশের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের ওপর প্রদত্ত আদেশ পালন করেছিল।[৪]

পাকিস্তান তার সংবিধানে তখনো বাংলাদেশকে তার ভৌগোলিক সীমানাভুক্ত অংশ বলে দাবি করে আসছিল। আবার এদিকে বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানি সৈন্যদের বিচার করার জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বারবার ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আসছিল।[৫]

এদিকে, বন্দি পাকিস্তানি সেনাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্যও ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এক্ষেত্রে যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তানের ভূখণ্ড থেকে সৈন্যদের আটক করেছে ভারত। যেহেতু পাকবাহিনী ভারতের বুকে কোনো অপরাধ সংঘটন করেনি, তাই ভারতের তাদের বন্দি রাখার যুক্তি নেই।[৬]

সাধারণভাবে যুদ্ধের পরে যুযুধান পক্ষগুলো দ্রুতই একটা শান্তি চুক্তিতে উপনীত হয়–এটাই আধুনিক দুনিয়ার রীতি। নানা কূটনৈতিক তৎপরতার পরে ইন্দিরা গান্ধী ও জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭২ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত সিমলায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে অংশ নেন।[৭] বৈঠকে দু'দেশের মধ্যে স্থগিত যোগাযোগ পুনর্বহালসহ তাদের সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে শান্তিপূর্ণ পথ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনার সময় যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবন্দি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, তবুও জনমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সিমলা চুক্তি ছিল পাক যুদ্ধবন্দিদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে প্রথম পদক্ষেপ।[৭] বৈঠকশেষে যুদ্ধকালে ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাকিস্তানের ৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ফেরত নিয়ে ভুট্টো বেশ হৃষ্টচিত্তেই দেশে ফিরে আসেন।[৭]

সিমলা শীর্ষ বৈঠকের পর শেখ মুজিবের মনে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে, ভারত বাংলাদেশের বদলে পাকিস্তানের হাতে যুদ্ধবন্দিদের প্রত্যর্পণ করবে। তখন শেখ মুজিব বলেন, ভারত এ কাজ করতে পারে না। কারণ পাকিস্তানি

চিত্র-কথন: কেন হেন মিথ্যাচার করতে হয়েছিল মুজিবকে?

রাজনৈতিক আড্ডার মুখরোচক আলোচনায় 'পাকিস্তানের জামাই' হিসেবে অভিহিত ড. কামাল হোসেন। পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডি থেকে প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর দেয়া বিশেষ বিমানে লন্ডন, লন্ডন থেকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এড্ওয়ার্ড হিথের দেয়া বিশেষ বিমানে প্রথমে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি ও সেখান থেকে স্বদেশের মাটিতে– রাজধানী ঢাকায়, পুরো ভ্রমণপথে মুজিবের যাত্রাসঙ্গী ছিলেন কামাল হোসেন।

ঢাকার তেজগাঁও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দানের জনসভাস্থলে গিয়েও শেখ মুজিবের সঙ্গে একসাথে মঞ্চে উঠলে সমবেত জনতা উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা আরো প্রতিবাদী হয়ে উঠলে মুজিব তার পক্ষে সাফাই গাইলেন এই বলে যে, 'কামাল হোসেন আমার সঙ্গে পাকিস্তানের কারাগারে ছিল'– যেটা শতভাগ মিথ্যাচার।

কেন কামাল হোসেনের পক্ষ নিয়ে এহেন মিথ্যাচার করতে হয়েছিল সেদিনকার জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে? কেনই-বা জনগণের কাছে পাকিস্তানের দালাল হিসেবে ধিকৃত একজন আইনজীবীমাত্র ব্যক্তিকে যুদ্ধজয়ী সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারের 'অপরিহার্য' রাজনৈতিক সহযোগী-পার্শ্বচর হিসেবে বেছে নিতে হয়েছিল?

বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন দেশের যে সংবিধানের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ– অভিযোগ যে, এই সংবিধান সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীকে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী করে তুলেছে; পাকিস্তানের স্বৈরশাসক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে সামনে রেখে যেমন '৬২-এর সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল ঠিক তেমনি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে সামনে রেখে তৈরি করা হলো '৭২-এর সংবিধান– সেই সংবিধান প্রণয়নের প্রধান ব্যক্তিটিই ড. কামাল হোসেন।

'৭৩-এ এপ্রিলের শুরুতে ভারত সফরে গিয়েছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল হোসেন। ভারতের হাতে পাকিস্তানের হাজার হাজার যুদ্ধবন্দি এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু তার মতো ব্যক্তির পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সাথে ফলপ্রসূ

কিংবা অর্থবহ আলোচনা প্রত্যাশিত ছিল কি?

ভারতের শক্তিমান রাজনীতিক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নয়াদিল্লির লোকসভা ভবনে অত্যন্ত বিনয়ে ও সস্নেহে স্বাগত জানান তরুণ কামাল হোসেনকে। ব্যাস! ওই পর্যন্তই! এই চাইতে কিছু বেশি তাকে দিয়ে আশা করা সম্ভব ছিল কি?

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

দুষ্কৃতকারীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।[৫]

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের এই পারস্পরিক সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় এ দুই রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকা। বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধী ও মানবিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করার অনুমোদন প্রদান করে।[৮]

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি কেনেথ রাস্ক এবং সহকারী সেক্রেটারি জোসেফ সিস্‌কো ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৩ পাঁচ ঘণ্টার জন্য যাত্রাবিরতি করেন বাংলাদেশে। এ সময় তারা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে মার্কিন সরকারের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করেন। বলেন, '১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করতে গেলে তা এই অঞ্চলের পরিবেশ নষ্ট করবে।' আবার পাকিস্তান সরকার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যে, বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করলে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আটক বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক অফিসারের বিচার করবে ইসলামাবাদ।[৯]

প্রথমে বাংলাদেশ সরকার বলেছিল, তারা সকল যুদ্ধবন্দির বিচার করবে। পরে তারা বুঝতে পারলো, তা বাস্তবক্ষেত্রে করা সম্ভব নয়। তখন তারা বিচারযোগ্য যুদ্ধবন্দির সংখ্যা ১৫০০-তে স্থির করে, যা পরে আরো কমিয়ে ১৯৫-এ আনা হয়। একপর্যায়ে বাংলাদেশ বুঝে যায়, সীমিতসংখ্যক যুদ্ধবন্দি ছাড়া আর কারো বিচার করা সম্ভব হবে না। তখন বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য মানবিক সমস্যা সমাধানের দিকে নজর দেয়। এর মধ্যে ছিল দু'দেশের বেসমরিক নাগরিকদের বিনিময় এবং যুদ্ধবন্দিদের পরিবার ও গুরুতর আহতদের ফেরত দেয়ার প্রশ্ন।

'স্টেট্‌স্‌ম্যান', *'টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া'*, *'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'*-এর মতো প্রভাবশালী ভারতীয় দৈনিকগুলো যুদ্ধবন্দি প্রশ্নে ভারতের সরকারি অবস্থানের বিপরীতে অবস্থান নেয়। তাদের অভিযোগ হলো– পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে না দিয়ে এবং বাংলাদেশের দাবি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের আটক রেখে ইন্দিরা

সরকার অন্যায় করেছে। তাদের দাবি, বাংলাদেশ অখুশি হোক, তাতে কোনো ক্ষতি নেই; যুদ্ধবন্দিদের ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে অবিলম্বে সম্পর্ক ভালো করতে হবে। ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে পার্লামেন্ট সদস্য পিলু মোদী, বিরোধীদলের নেত্রী তারকেশ্বরী সিনহা, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত এই মত সমর্থন করেন।[১০]

আবার ভারত সরকারের একটি অংশ, যার অন্যতম ছিলেন ডিপি ধর, তিনি মনে করতেন যে, ভারতের স্বার্থে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যেন দ্রুত স্বাভাবিক না হয়, তার উদ্যোগ নেয়া উচিত।[১১]

প্রথম পর্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশ পক্ষ পূর্ব প্রস্তাবিত ৬০০০ জন যুদ্ধবন্দির পরিবারবর্গের সঙ্গে পাকিস্তানে আটকেপড়া ১০০০ জন বাংলাদেশি নারী ও শিশু বিনিময়ের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া প্রদানে বিরত থাকে। উপরন্তু তারা পাকিস্তানে আটকেপড়া বিপুলসংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে বিচার করার পাল্টা চাপ দেয়ার উদ্যোগ নেয়।[৫] বাংলাদেশের ওপর পাল্টা চাপ হিসেবে তারা পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালিদের বিচারের হুমকি দিতে থাকে। তাদের অনেককে বাড়িতে চড়াও হয়ে গ্রেপ্তার করে এবং বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্পে আটক রাখা হয়।[১২]

বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেছিলেন, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তিনি স্বীকৃতি প্রদান স্থগিত রাখবেন।[১৩] এর উত্তরে বাংলাদেশ সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতিরেকে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো সংলাপ সম্ভব নয়। পাকিস্তান নিজে যেমন বিরত ছিল স্বীকৃতি প্রদান থেকে, তেমনি জুলফিকার আলী ভুট্টো স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, কোনো রাষ্ট্র যদি তাড়াহুড়ো করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়, তাহলে পাকিস্তান স্বীকৃতিদানকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ায় সত্যি সত্যি পাকিস্তান কয়েকটি রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল। পাকিস্তানের এমন নীতির কারণে নবীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।[১৪]

পাকিস্তান ফৌজদারি অপরাধের দায়ে যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের দাবি কোনো অবস্থাতেই মেনে না নেয়ার কথা জানায়। পাকিস্তান সরকার যুক্তি প্রদর্শন করে যে, যেহেতু দায়েরকৃত অভিযোগ পাকিস্তানের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছে এবং পাকিস্তানি নাগরিকরা এই অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেহেতু আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত ধারাবলে কেবলমাত্র পাকিস্তানে গঠিত একটি যথাযোগ্য ট্রাইব্যুনাল এর বিচার করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যের হাতে এই কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়ার অর্থ হবে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের ওপরই আঘাত হানা। এতে অপরাধী ব্যক্তিদের বিচার করার জন্য পাকিস্তান সরকার যথাযথ বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনে প্রস্তুত রয়েছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।[১৫]

শুধু তা-ই নয়, বাংলাদেশের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে বলা হয়, ঢাকা যদি ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দির বিচারের উদ্যোগ নেয়, তাহলে তা শুধু শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশকেই দূষিত করে তুলবে না বরং পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক তৎপরতা, গুপ্তচরবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে আসছে, সে ধৈর্য বজায় রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।[১৫]

এদিকে, বাংলাদেশ এ সময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির বিচারের প্রত্যয় অব্যাহত রেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ জোগাড় করছিল। বাংলাদেশ বলেছিল, প্রতিহিংসার জন্য নয়, সুবিচারের স্বার্থেই বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দির বিচার হওয়া প্রয়োজন।[১৬] ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দি হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতার কাজও এগিয়ে নিচ্ছিল। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের বিচার করার জন্য একটি আইনও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য প্রণয়ন করা হয়। এ প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে এবং বাংলাদেশের কঠোর মনোভাব অনুধাবন করে ভুট্টো শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ইস্যুটি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে পেশ করেন এবং পাকিস্তানের স্বার্থে অতিসত্ত্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেন।[১৫]

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনী এনে যুদ্ধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের আটক, বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদানের কতিপয় ক্ষমতা সরকারের হাতে প্রদান করা হয়। এর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিল পেশ করা হয়।[১৫]

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের ২৪ থেকে ৩১ তারিখ প্রথমবারের মতো ইসলামাবাদে এবং চূড়ান্তভাবে দিল্লিতে আগস্ট মাসের ১৮ থেকে ২৮ তারিখে ভারত ও পাকিস্তান আলোচনায় মিলিত হয়। তাদের সম্পাদিত চুক্তির অধীনে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধবন্দি, পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি এবং বাংলাদেশে 'আটকেপড়া পাকিস্তানি'দের প্রত্যাবাসন যুগপৎভাবে শুরু করার সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নেয়া হয়। বাংলাদেশ এই চুক্তিতে কোনো পক্ষ না হলেও ভারতের মাধ্যমে তাকে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে স্বীকৃতি প্রদান করতে হয় এবং চুক্তিতে উল্লিখিত বেশ কয়েকটি দায় বাংলাদেশকে মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ চুক্তিতে স্বাক্ষরদাতা না হয়েও বাংলাদেশ ছিল চুক্তির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। চুক্তিতে বাংলাদেশে 'আটকেপড়া পাকিস্তানি'দের ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তান রাজি হয়নি। এতে বলা হয়, ভারত থেকে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি ও অন্যান্য অবাঙালিদের প্রত্যাবাসনের কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দি ফেরত নেয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসবে।[৮]

এ সময় পাকিস্তানে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন (ওআইসি) অনুষ্ঠানের কথা ছিল। সম্মেলনের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, বাংলাদেশকে এই সম্মেলনে নেয়া ও পাকিস্তানের সাথে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য কূটনৈতিক তৎপরতা ততই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর ভেতর ও বাইরে থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য নানাভাবে চাপ প্রয়োগ শুরু হয়।[১৭]

ঠিক এমন সময়ে প্যাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের' আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।[১৮]

এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার মন্ত্রিসভায় দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর, লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার এক প্রবীণ সদস্য তাঁকে দিল্লি হয়ে লাহোর যাবার পরামর্শ দেন। শেখ মুজিব এই পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তবে তিনি লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের সিদ্ধান্ত অবহিত করেন।[১৯]

আলজেরীয় রাষ্ট্রপতি হুয়ারি বুমেদিনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল শেখ মুজিবকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্য ঢাকায় আসেন। আলজেরীয় রাষ্ট্রপতির সেই বিমানই শেখ মুজিব ও তার প্রতিনিধিদলকে বহন করে ঐতিহাসিক অভিযানে লাহোর পৌঁছলে ভুট্টো শেখ মুজিবকে সেখানে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এই ঘটনা অসংখ্য ভারতবাসীর মনে বিরক্তি সৃষ্টি করলেও সে মুহূর্তে তাদের করার কিছুই ছিল না।[১৮]

ওআইসি সম্মেলন থেকে ফিরে এসে ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে ভারতের 'স্টেট্স্ম্যান' পত্রিকাকে শেখ মুজিব সাক্ষাৎকার দেন। সাক্ষাৎকারে ওআইসি সম্মেলনকালে তার প্রতি পাকিস্তান সরকার বিশেষ করে ভুট্টোর আতিথেয়তার কথা বলতে গিয়ে মুজিব আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'জনগণের উচিত পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়া।'

লাহোরে সম্মেলনকালে ভুট্টোকে শেখ মুজিব 'আমার পুরনো বন্ধু' বলে আলিঙ্গন করেন এবং তার গালে চুমু খান।[২০]

১৯৭৪-এর ৫-৯ এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার। এতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়ে থাকলে (আমার) সরকার তার নিন্দা জ্ঞাপন এবং গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে।' এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোও বলেন, 'মিটমাট ত্বরান্বিত করার জন্য অতীতের সমস্ত ভুল ক্ষমা করে দিন এবং ভুলে যান'।[১৮]

এই দুই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার সিদ্ধান্ত নেয় 'ক্ষমাশীলতার নিদর্শনস্বরূপ এই বিচার প্রক্রিয়ায় তারা আর অগ্রসর হবে না'। দেশে ফিরে ১১ এপ্রিল ১৯৭৪ সালে ড. কামাল হোসেন বলেন, 'বাংলাদেশে পাকিস্তান যে অপরাধ করেছে তা প্রতিষ্ঠা করা, পাকিস্তান কর্তৃক তার সব অপরাধকে স্বীকার করানো ও বাংলাদেশের বিচার অনুষ্ঠানের সামর্থ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রস্তাবিত যুদ্ধাপরাধী বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমান ক্ষেত্রেও পাকিস্তান তার অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় এই লক্ষ্য অর্জন করা গেছে।' ড. কামাল হোসেনের এই বক্তব্য পরদিন 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত হয়।[২১] এরপর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ১৯৫ জন যুদ্ধপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্তটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়।[১৮]

Headliners

3hutto Apologizes

"In the name of the last prophet, I say toba (sorry) to 'ou." With these words, **Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto** 'f Pakistan last week asked forgiveness from the Bengali ·eople for atrocities committed by the Pakistani Army uring the Bangladesh struggle for independence. Mr. Bhut-o arrived in Bangladesh to seek reconciliation between is country and its severed province.

Though he had been jeered by demonstrators as "Murderer Bhutto" earlier, he blamed the army's actions on the military regime his Government replaced. "Do not equate us with those who ruled over us and you," he said, in a speech that moved many to tears. "We share your grief and sorrow, condole with you and lament the losses."

The New York Times
Published: June 30, 1974

চিত্র-কথন: ভুট্টো ১৯৭১ এর বর্বরতার জন্য বাংলাদেশে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে পরদিন নিউইয়র্ক টাইমস তা পত্রিকার হেডলাইন করে।

ফটো ক্রেডিট: নিউইয়র্ক টাইমস

এর পরে ১৯৭৪ সালের ১ অক্টোবর ওয়াশিংটনে শেখ মুজিবের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সময়ে শেখ মুজিব ফোর্ডকে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানি বন্দিদের ছেড়ে দিয়েছি, যার মধ্যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছিল'।[২২]

এই স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধাপরাধীর ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সরকার সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ কিংবা মামলার নথিপত্র প্রস্তুতির ব্যাপারে তেমন তৎপর ছিল না। শেখ মুজিবুর

রহমান এ ব্যাপারে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হাকসারকে বলেছিলেন, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহে অসুবিধার কারণে তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে শক্তি ও সময় নষ্ট করতে চান না। হয়তো কোনো দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের কথা ভেবেই মুজিব এ ধরনের একটি বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নেয়ার পথে চালিত হয়েছিলেন। তিনি এমন কিছু করতে চাননি, যাতে পাকিস্তানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে বাধাপ্রাপ্ত হয়।[২৩]

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক বলয়ে নতুন পরিচিতি অর্জনের কথা বাদ দিলে আওয়ামী লীগ যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে তার প্রত্যয় বজায় রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়।[২৪]

ভুট্টো যা চেয়েছিলেন, অবশেষে তিনি তা-ই পেয়েছেন। সমস্ত যুদ্ধবন্দিকে তিনি ফেরত নিয়েছেন। ভারতের অসন্তুষ্টির মুখে বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে গেছেন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে। নিজের ইচ্ছানুযায়ী সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোনো আপস না করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করেছেন এবং সর্বশেষে বিচার বাতিলের সঙ্গে দরদাম করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সর্বোপরি, 'পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী অবাঙালি'দের দায়ভারও তিনি বহন করেননি।[২৫]

শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে সমঝোতা স্থাপনের পর দেখা গেল, সমস্ত কৃতিত্বের ভাগ নিয়েছে ভারত সরকার। পাকিস্তান অর্জন করেছে এক ব্যাপক রাজনৈতিক বিজয় এবং বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাহ্‌বা ছাড়া আর কিছুই পায়নি।[২৪]

পাঁচ

১৯৭৪ এর জুন। শেখ মুজিবের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো ঢাকায় এসেছেন। বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাবার পথে সবাইকে অবাক করে দিয়ে কিছু উল্লসিত মানুষ ভুট্টকে স্বাগত জানায়। জাতিয় স্মৃতি সৌধে ভুট্ট ফুল দিতে গেলে সেখানে কিছু মানুষ "খুনি ভুট্টো ফিরে যাও" শ্লোগান দিতে থাকে।

কিন্তু রাষ্ট্রিয়ভাবে ভুট্টোকে ঢাকায় উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়া হয়।

ভুট্টোর সম্মানে রাতে রাষ্ট্রিয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত আছেন স্বয়ং শেখ মুজিব ও মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্য। ভুট্টো ডিনারের আগে বক্তৃতা দিতে উঠলেন। শান্তভাবে বলতে শুরু করলেন। "আপনাদের

উপরে স্বার্থপর অবিবেচক সামরিক কর্তৃত্ব লজ্জাজনক দমনপীড়ন ও অকথ্য অপরাধ করেছে। আমি পাকিস্তানের জনগনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের জনগনের জন্য শুভেচ্ছা বয়ে এনেছি। আমাদের দয়া করে তাদের (ইয়াহিয়া খান) সাথে এক করে দেখবেন না, যারা শুধু আপনাদের নয় আমাদের উপরেও তখন শাসন করতো। আমরা আপনাদের বেদনা, কষ্টকে অন্তর দিয়ে অনুভব করি। আপনাদের ক্ষতির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাদের শেষ নবীর নাম নিয়ে আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত (তওবা করছি)।"

উপস্থিত বাংলাদেশের কর্তাব্যক্তিদের অনেকেই আবেগতাড়িত হয়ে চোখ মুছতে থাকেন। ভুট্টো তার রাষ্ট্রনায়কোচিত বক্তব্যে এভাবেই ১৯৭১ এর পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চায়। ভুট্টোর পরে শেখ মুজিব বক্তৃতা দিতে উঠে শেখ মুজিব ভুট্টোর সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, "আসুন আমরা অতীতের তিক্ততা এবং শত্রুতা ভুলে যাই এবং আমাদের জনগনের জন্য আশা ও সমৃদ্ধির নতুন অধ্যায় শুরু করি।"

সঙ্গত কারণেই ভারত ভুট্টোর এই সফরকে ভালোভাবে নেয়নি।[২৬]

সূত্র:

১. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৩৭

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫১

৩. বাংলাদেশ অবজারভার; ৮ জুলাই ১৯৭৩

৪. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৫২

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫৫

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫৩

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫৪

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৬৩

৯. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১০১

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১০৩

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০৩

১২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৫৮

১৩. বাংলাদেশ অবজারভার; ৬ জুলাই ১৯৭৩

১৪. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৯৯

১৫. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৬০

১৬. বাংলাদেশ অবজারভার; ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭৩

১৭. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৬৪

১৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৬৫

১৯. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১০৬

২০. বদরুদ্দীন ওমর, একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী বিচার প্রসঙ্গে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১০, ঢাকা, পৃষ্ঠা: ৩-৪

২১. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মাদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫।

২২. Ford Library, National Security Adviser, NSC Files, Memoranda of Conversations, Ford Administration, Box 6, October-December 1974. Secret; Nodis. Secretary of State ROGERS had recommended inviting Mujib the previous June, but Kissinger and Scowcroft delayed until after Pakistani President Zulfiqar Ali Bhutto's meeting with Nixon that September. (National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 591, Country Files, Middle East, Bangladesh, Volume 1) Prime Minister Mujibur Rahman and President Gerald Ford discussed U.S.-Bangladeshi relations.

২৩. মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২

২৪. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৬৬

২৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৬৭

২৬. দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস Bhutto Regrets 'Crimes' in Bangladesh By Kasturi Rangan Special to The New York Times, June 29, 1974; দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস BHUTTO TALKING WITH BANGLADESH, June 28, 1974

এগারো অধ্যায়

১৯৭৩-এর নির্বাচন: রক্তাক্ত বিজয় উদ্‌যাপন

> 'ইতিহাস শেখ সাহেবেরে স্টেট্‌স্‌ম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল, তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না'।[১]

জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে কথা বলার জন্য। সেই দিনের অভিজ্ঞতা ও মন্তব্য আহমদ ছফার সাথে আলাপচারিতায় তিনি বলেছিলেন, 'সেভেন্টি টু-তে একবার ইউনিভার্সিটির কাজে তার লগে দেখা করতে গেছিলাম। শেখ সাহেব জীবনে অনেক মানুষের সাথে মিশছেন তো, আদব-লেহাজ আছিল খুব ভালা। অনেক খাতির করলেন। কথায় কথায় আমি জিগাইলাম, আপনার হাতে তো অখন দেশ চালাইবার ভার, আপনে অপজিশনের কী করবেন? অপজিশন ছাড়া দেশ চালাইবেন কেমনে? জওহরলাল নেহেরু ক্ষমতায় বইস্যাই জয় প্রকাশ নারায়ণরে কইলেন, তোমরা অপজিশন পার্টি গইড়া

তোল। শেখ সাহেব কইলেন, আগামী ইলেক্‌শনে অপজিশন পার্টিগুলা ম্যাক্সিমাম পাঁচটার বেশি সিট পাইব না। আমি একটু আহত হইলাম। কইলাম, আপনে অপজিশনরে এক শ' সিট ছাইড়া দেবেন না? শেখ সাহেব হাসলেন। আমি চইল্যা আইলাম। ইতিহাস শেখ সাহেবেরে স্টেট্‌স্‌ম্যান অইবার একটা সুযোগ দিছিল। তিনি এইডা কামে লাগাইবার পারলেন না।'[১]

চিত্র-কথন:

মার্চ ৭ তারিখের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের হাস্যোজ্জ্বল জবাবে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ এর সংবাদ সম্মেলনে। এই ছবি থেকেই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ মুজিব বর্ষের লোগো বানায়।

ফটো: সংগৃহীত

চিত্র-কথন: সূচনাতেই মার খেল গণতন্ত্র

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার-স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দীর্ঘ গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন পাকিস্তানের 'লৌহমানব' গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী স্বৈরশাসক আইয়ুব খান। তবে দায়িত্ব দিয়ে গেলেন সামরিক সরকারের হাতে।

এই সামরিক সরকারের অধীনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখার লক্ষ্যে ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট নামক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেই আরো সব রাজনৈতিক দলের মতো '৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ।

সেই নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী আওয়ামী লীগের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছা থেকে নানা তালবাহানা শুরু করে; যার চূড়ান্ত পরিণতিতে ঘটে স্বাধীনতা যুদ্ধ– শতাব্দীর ওপারে যার সূচনা করেছিলেন শহিদ তিতুমীর– এবং এরই ফলশ্রুতিতে মাত্র চব্বিশ বছর আগে প্রধানত বাঙালিদেরই হাতে সৃষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র ভেঙে গিয়ে তৈরি হলো নতুন রাষ্ট্র– বাংলাদেশ।

কিন্তু সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে যে জনপ্রতিনিধিত্ব এবং জনপ্রতিনিধিদের পাওয়া গেল তারা তো সবাই পাকিস্তানের নীতিমালার অধীনে পাকিস্তান শাসন ও পরিচালনার জন্য ওয়াদাবদ্ধ! পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ! জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত এই সদস্যদের নিয়েই গঠন করা হলো 'গণপরিষদ'; প্রকৃতপক্ষে যা মোটেই কোনো ধরনের সংবিধান পরিষদ ছিল না এবং একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের সাধারণ বা প্রচলিত পার্লামেন্ট বা সংসদও হতে পারে না।

স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রধান অংশগ্রহণকারী অন্য রাজনৈতিক শক্তিগুলো 'জাতীয় সরকার' গঠনের জোর দাবি জানালেও তা উপেক্ষিত হয়। এবং সবচাইতে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক যে

কাজটি হলো তা হচ্ছে, সব রাজনৈতিক শক্তির শত বিরোধিতা সত্ত্বেও এই 'গণপরিষদ'কে দিয়েই স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করা হলো।

'৭০-এর নির্বাচনের কমবেশি ২৭ মাস পর এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিজয়ের প্রায় ১৫ মাস পর স্বাধীন রাষ্ট্রে '৭৩-এর ৭ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচন হলো। এবং এই প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই স্বাধীন দেশের মাটিতে সব রকম গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি পদদলিত, পদপিষ্ট করা হলো। পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার 'ন্যাশনাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট'-এর আওতায় '৭০-এর নির্বাচনে সম্পূর্ণ অবাধ, নিরপেক্ষ ও শতভাগ সুষ্ঠু রীতি-পদ্ধতি ও পরিবেশ বজায় রাখা হয়েছিল বলেই বিজয়লাভ সম্ভব হয়েছিল আওয়ামী লীগের পক্ষে।

অথচ গণতন্ত্রের নামধারী শেখ মুজিব এবং তাঁর আওয়ামী লীগ সব রকম অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি অকল্পনীয় মাত্রায় প্রয়োগ করে '৭৩-এর এই নির্বাচনে বিরোধী শক্তিকে সংসদের বাইরে ঠেলে ফেলে দিল। জনপ্রিয় ও শক্তিধর বিরোধী রাজনীতিকদের নিশ্চিত বিজয় কেড়ে নেয়া হলো। ভোট কারচুপি, ব্যালট ও ব্যালটবাক্স ছিনতাই, কেন্দ্র দখল, বিরোধীদলের এজেন্টদের বহিষ্কার ও হত্যা, ঢাকা থেকে হেলিকপ্টার পাঠিয়ে ব্যালটবাক্স এনে বিপরীত ফল ঘোষণার অচিন্ত্যপূর্ব উদাহরণ ও তার অনতিক্রম্য রেকর্ড সৃষ্টি করা হলো। নির্বাচনী প্রচারণায় রীতি-নীতি, আচরণবিধির বালাই নাই– রাষ্ট্রীয় সকল মাধ্যম ও সুযোগ-সুবিধা একচেটিয়া কাজে লাগালো শাসকদল। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থের ছড়াছড়ি, বেআইনি অস্ত্রের অপ্রতিহত তৎপরতা।

ছবিতে '৭৩-এর সেই নির্বাচনে রাজধানী ঢাকায় প্রচার অভিযানে শাসকদলীয় নেতা-কর্মী-সমর্থক পরিবেষ্টিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব– প্রচার-প্রচারণায় যিনি ছিলেন শতভাগ অবাধ। অথচ বিরোধীপক্ষের জনপ্রিয় ও বলিষ্ঠ রাজনীতিকদের জন্য তৈরি করেছিলেন এর ঠিক বিপরীত পরিবেশ। স্বাধীন রাষ্ট্রে সূচনাতেই প্রচণ্ড মার খেয়েছিল গণতন্ত্র– গণতান্ত্রিক রীতি ও মূল্যবোধ।

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

বিরোধীদলের গুরুত্ব স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শীর্ষ নেতারা রাজনৈতিকভাবে বিবেচনা করেননি। বিরোধীদলের কার্যকর উপস্থিতি ছাড়াই তারা আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্র নির্মাণ করতে পারবেন, এটাই ছিল তাদের পূর্বানুমান।

১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন দেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছাড়া ভাসানী ন্যাপ (৫.৩ শতাংশ ভোট) ও মুজাফফর ন্যাপ (৮.৩ শতাংশ ভোট); জাসদ (৬.৫ শতাংশ ভোট) ও সিপিবি অংশ নেয়। তবে দুই ন্যাপ ও জাসদ তাদের প্রচারণা দিয়ে ভোটারদের দৃশ্যমানভাবে আকৃষ্ট ও ভোটারদের আগ্রহের দল হয়ে উঠতে পারে। আসন তেমন না পেলেও, দুই ন্যাপ ও জাসদ সম্মিলিতভাবে ২০ শতাংশের বেশি ভোট পায়। সিপিবি পায় ১ শতাংশ ভোট।[২]

নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে আন্তরিক আলাপে বামপন্থি রাজনীতিক ও সাংবাদিক হায়দার আকবর খান রনো বলেছিলেন, 'এবার কিন্তু আপনি আগের মতো সব আসন পাবেন না।' তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'কত পাবো মনে করছিস?' হায়দার আকবর খান রনো বলেছিলেন, 'ত্রিশ থেকে পঞ্চাশটা সিট; আওয়ামী লীগ হারবে।' তিনি মুচকি হেসে বলেছিলেন, এটা হলে তিনি রাজনীতি ছেড়ে দিবেন। বিরোধীরা কত সিট পাবে বলে শেখ মুজিব মনে করেন– এই প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সেটা না বলাই ভালো। কারণ, সেটা জানলে বিরোধীরা নির্বাচনেই আসবে না।[৩]

ক্ষমতাসীন দল সরকারের প্রচার মাধ্যম ও যানবাহন– দু'টিই নির্বাচন উপলক্ষে নির্বিচারে ব্যবহার করে। দলীয় প্রচার ও সফরের জন্য তারা সরকারি গাড়ি, বিমান ও হেলিকপ্টার ইত্যাদি যথেচ্ছ ব্যবহার করছে বলে কোনো কোনো বিরোধীদলীয় নেতা ও কর্মী অভিযোগ উত্থাপন করেন।[৪] এই হেলিকপ্টারগুলো ছিল বিদেশ থেকে অনুদান হিসেবে ত্রাণ কাজের জন্য পাওয়া।

এমনকি সরকারি দলের নির্বাচনী প্রচারে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলের অর্থ ব্যয়ের অভিযোগ আসে। জাতীয়করণকৃত মিল-কারখানার তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করে সম্মেলন অনুষ্ঠানের নামে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার এবং মিল বন্ধ করে সাধারণ শ্রমিকদের ঢালাওভাবে আওয়ামী নির্বাচনী প্রচারণা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে।[৫]

ন্যাপের মোজাফ্ফর আহমেদ ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, সরকারি দলের সমর্থকরা প্রশাসনের সহায়তায় মনোনয়নপত্র দাখিলের দিনে বাধা প্রদান, ভীতি, সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সরকারি প্রশাসন ও রক্ষীবাহিনী ন্যাপ

এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে। সরকারি দল ভয় দেখিয়ে ও চাপ দিয়ে ময়মনসিংহ-৬ আসনের ন্যাপ প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে।[৬]

এমনকি নির্বাচন প্রস্তুতির দিনগুলোতে এদেশে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর যে কোনো দল বা কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন, এ খবরটা বেতার-টিভির কর্মকর্তারা বেমালুম গায়েব করে ফেলেন। বাংলাদেশের কোথাও বিরোধীদলীয় সমাবেশ, শোভাযাত্রা হয়ে থাকলেও জাতীয় বেতারের কর্তারা সে খবর সুকৌশলে এড়িয়ে যান। আওয়ামী লীগের বড়, মাঝারি ও ছোট নেতাদের ‘বিশাল’ জনসভার বক্তব্য তুলে ধরতেই বাংলাদেশ বেতারে সম্প্রচারের সিংহভাগ সময় ব্যয় করা হতো। টেলিভিশনে সংবাদ পরিবেশনাতেও ছিল সেই একই চেহারা।[৭]

বেতারের অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ডে প্রীত হয়েই সম্ভবত বাংলাদেশ বেতারে ২৫ জন অনুষ্ঠান সংগঠককে সহকারী আঞ্চলিক পরিচালক বা সমমর্যাদাসম্পন্ন পদে এবং ১৯ জন অনুষ্ঠান প্রযোজককে অনুষ্ঠান সংগঠকের পদে গণপ্রমোশন দেয়া হয়। প্রমোশনপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে প্রথম গ্রুপে ৩ জন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন এবং একজন মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন বলে শোনা যায়। অর্থাৎ সর্বমোট ৪৪ জন অফিসারের মধ্যে ৪ জন বাদ দিলে ৪০ জনই পাকিস্তান আমলে সগৌরবে ‘রেডিও পাকিস্তানে’ কাজ করেছেন এবং বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা অব্যাহত রেখেছিলেন।[৮]

সরকারি সহায়তায় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রচার সত্ত্বেও বিরোধীদলগুলোর প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। বিরোধীদলগুলোর মধ্যে ন্যাপ (ভাসানী) এবং জাসদের প্রচার সভাগুলোতে তখন আশাতীত লোক সমাগম ক্ষমতাসীন দলের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দেয়।[৯]

এ উপমহাদেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়াটাকে একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা যেন নিজেরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারেন, সেই লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর কর্মীরা সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে নিজ এলাকায় মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দিত। জীবননাশের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, অপহরণসহ নানা উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করা থেকে বিরত রাখা হতো।[১০]

১৯৭৩-এর ৭ মার্চ, জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে। স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কাছেই ভোটকেন্দ্র। বিপুল উৎসাহ নিয়ে সবাই ভোট দিতে যাচ্ছেন। তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যিনি ইংরেজি থেকে বাঙলায় বাংলাদেশের সংবিধানের অনুবাদ করেছিলেন, সেই প্রফেসর আনিসুজ্জামান যাচ্ছেন ভোট দিতে।[১১]

দুই গাড়ি ভরে তিনি সহকর্মীদের সাথে ভোটকেন্দ্রে গেলেন। সাথে উপাচার্য অধ্যাপক ইন্নাস আলী, রেজিস্ট্রার মুহম্মদ খলিলুর রহমান, ইংরেজি বিভাগের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী। সকলেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, সম্মানিত শিক্ষক এবং সাধারণ্যে অতি পরিচিত মুখ। সকলের মনের মধ্যে প্রচণ্ড উৎসাহ। কিন্তু ভোটকেন্দ্রে পোঁছে তাঁদের সেই উত্তুঙ্গ উৎসাহ দপ করে নিভে গেল। তারা জানলেন, তাদের সকলের ভোট-ই দেয়া হয়ে গেছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সরকারি প্রার্থীকেই ভোট দিতেন, হয়তো অন্যরাও তাই দিতেন। তবে উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মীরা সেই আশার ওপর ভর করে নিশ্চুপ থাকতে চাননি।[১১]

ভোট দেয়া শেষ হলো। ভোট গণনা শুরু হবার পর কোনো কোনো আসনে স্থানীয় অফিসাররা বিরোধীদলীয় প্রার্থীকে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি। বিরোধীদলীয় নেতাদের মধ্যে টাঙ্গাইলে ভাসানী ন্যাপের ড. আলীম-আল-রাজী ক্ষমতাসীন মন্ত্রী আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে, জাসদের শাজাহান সিরাজ স্থানীয় আওয়ামী নেতা আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে, ন্যাপের (ভাসানী) আবদুর রহমান মীর্জা তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে, বাকেরগঞ্জে জাসদের মেজর (অব.) জলিল ক্ষমতাসীন দলের আবদুল মান্নান ও হরনাথ বাইন-এর বিরুদ্ধে দু'টি আসনে, ভাসানী ন্যাপের রাশেদ খান মেনন ক্ষমতাসীন দলের ফজলুল হক ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে দু'টি আসনে, সিলেটে মোজাফফর ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মুজিব সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে, কুমিল্লায় ন্যাপ-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ক্ষমতাসীন দলের ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর বিরুদ্ধে এবং ভাসানী ন্যাপের মোশতাক আহমেদ চৌধুরী ক্ষমতাসীন দলের এম সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এদের মধ্যে এমএ জলিল, শাজাহান সিরাজ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরীর নাম টেলিভিশনে বিজয়ী বলে ঘোষণাও করা হয়। আরো প্রায় এক ডজন বিরোধী প্রার্থী অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না হলে এবং

আওয়ামী লীগ অসৎ পন্থা অবলম্বন না করলে, নিজেদের নির্বাচনী এলাকা থেকে তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতেন।[১২]

বাবুগঞ্জে মেননের প্রতিদ্বন্দ্বী সার্জেন্ট ফজলুল হক নিজেই অভিনন্দন জানিয়ে মেননকে ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু পরদিন টিভি ঘোষণায় জানা গেল মেনন পরাজিত হয়েছেন।[১৩]

আওয়ামী লীগ মনে করেছিল, নির্বাচনে গুরুত্বহীন কিছুসংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না। কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন, তা কিছুতেই তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই যখন তারা দেখতে পান যে, আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হলো।[১৪]

ভোট গণনা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তখন অন্তত ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরিভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। হেলিকপ্টার আরোহীরা সমস্ত ব্যালট ছিনিয়ে নেয় এবং সেগুলোর পরিবর্তে নিজেদের প্রার্থীর পক্ষে ব্যালটপেপার ভর্তি বাক্স নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে।[১৪]

কিছু কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা অস্বাভাবিক ভোট পান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আবদুর রাজ্জাক ফরিদপুর-১৬ আসনে মোট ১,২৯,২৫১ ভোটের মধ্যে পান ৯৫,১১৪ ভোট, ঢাকায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মোট ১,৩০,১১১ ভোটের মধ্যে পান ১,০৭,৬৮৯ ভোট, গাজী গোলাম মোস্তফা ঢাকা-১০ আসনে মোট ২,৮৫,১২০ ভোট ও প্রদত্ত ১,৬২,৩৩৬ ভোটের মধ্যে পান ১,১০,২৮৪ ভোট। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা-১৫ আসনে পান ১,০৫,৯৫৮ ভোট। যখন দেখা গেল যে, ঢাকায় শেখ মুজিবের চেয়ে বেশি ভোট পেয়ে গেছেন গাজী গোলাম মোস্তফা, তখন তাঁর ভোট বাড়িয়ে করা হয় ১,১৪,৯২৮ ভোট; যেখানে মোট ভোটের সংখ্যা ছিল ১,৩৮,৪১৭। এর আগে, এমনকি ১৯৭০ সালের স্বতঃস্ফূর্ত নির্বাচনেও উক্ত আসনগুলোতে এত ভোট পড়তে দেখা যায়নি।[১৫]

সরকারি ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল ২৮৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ২৮২টি আসনে জয়লাভ করেছেন। বিরোধী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন বাকি ৭টি আসন। দু'টি বিরোধী রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রার্থী মানিকগঞ্জের ধামরাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান

ও টাঙ্গাইল থেকে জাসদের আবদুস সাত্তার নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অন্য ৫টি আসনে জয়লাভ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, রাজনৈতিক অঙ্গনে যাদের খুব একটা পরিচিতি ছিল না।[১৬]

মেজর জলিল বরিশালের একটি অঞ্চল থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে ছিলেন আওয়ামী লীগের হরনাথ বাইন; যার তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না। ভোটের পরদিন সকাল পর্যন্ত মেজর জলিল চার হাজার ভোটে এগিয়ে ছিলেন। বাকি ছিল দু'টি কেন্দ্রের ভোট গণনা, যেখানে মোট ভোটের সংখ্যা চার হাজারের মতো। স্বাভাবিকভাবেই মেজর জলিলের জেতার কথা। ফলাফল ঘোষণা কয়েক ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিস্ময়করভাবে বাকি দু'টি কেন্দ্রের মোট ভোটারের চেয়েও বেশি ভোট পান হরনাথ বাইন। ঈশ্বর সম্ভবত এভাবেই অনেক ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে এমন গায়েবি ভোটার পাঠিয়েছিলেন।[১৭]

রাজধানীর বাইরে সারা দেশে সর্বাধিকসংখ্যক ভোট পেলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর জামানত লজ্জাজনকভাবে বাজেয়াপ্ত হলো। 'স্বদেশ' পত্রিকায় কাজী খালেক শেখ মুজিব ও শাহ্ মোয়াজ্জেমের দু'টি ছবি একত্রে ছেপে লিখলেন–'দুই বিজয়ী বীর'। 'স্বদেশ' পত্রিকার সাংবাদিককে শেখ মুজিব ডেকে ধমক দিয়ে বললেন, বাংলাদেশে দু'জন বিজয়ী বীর হতে পারে না, এখানে একজনই বীর। অচিরেই কাজী খালেকের চাকরি গেল। পত্রিকার প্রশাসক পদ থেকে তাকে বিতাড়িত করা হলো।[১৮]

ন্যাপের (মো.) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ দাবি করেন যে, নির্বাচনে কারচুপি না হলে তার দল ২৫টি আসনে জয়ী হতো। কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের মতে, অবাধ নির্বাচন হলে বিরোধীদলগুলো হয়তো ৩০/৪০টি আসনে জয়ী হতো। ৩০০ আসনের সংসদে তা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু বিরোধীদল ও স্বতন্ত্র মিলে যে মাত্র ৭টি আসনে জয়ী হলো, তার ফল হিতে বিপরীত হয়েছিল। প্রথমত, এই নির্বাচনের ফলাফল থেকে মুজিবের মনে ধারণা হলো যে, তিনি দারুণ জনপ্রিয়। তখন তিনি জনপ্রিয় ছিলেন ঠিকই, কিন্তু যতটা তাঁর ধারণা হয়েছিল অতটা নয়। দ্বিতীয়ত, বিরোধীদল কার্যত না থাকায় সংসদ পরিণত হলো 'রাবার স্ট্যাম্পে'– মুজিবের ইচ্ছাই সংসদের ইচ্ছা।[১৯]

১৯৭৩ সালের ৯ মার্চ ব্রিটিশ সংবাদপত্র 'গার্ডিয়ান'-এ 'ভূমিধ্বস বিজয়ের পরে শেখ মুজিব একদলীয় শাসনের ইঙ্গিত দিয়েছেন' শিরোনামে একটি সংবাদ ছাপা হলো। সেখানে বলা হয়, গতকালের নির্বাচনের ফলাফলে বিরোধীদলকে ফলত নিশ্চিহ্ন করায় লজ্জিত হওয়ার বদলে শেখ মুজিব

চিত্র-কথন: শুরুতেই জালিয়াতির অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর স্বাধীন রাষ্ট্রের যাত্রা শুরুর মাত্র ১৫ মাস, ততদিনে মুজিব সরকার ও তাঁর নিজের যাদুকরী জনপ্রিয়তায় নিম্নমুখী ধারা শুরু হয়েছে। ঠিক এই সময়ে এসে স্বাধীন দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলো।

যদিও সরকার সেই নির্বাচনে 'নিরপেক্ষতা' বজায় রাখার 'প্রতিশ্রুতি' দিয়ে যাচ্ছিল তথাপি সেটা যে সত্য নয়, তা ছিল স্পষ্ট। রাষ্ট্রযন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীন মহল নির্বাচনে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যবহার করে যাচ্ছিল।

ভোটের দিনে নিজের কেন্দ্রে ভোট দিতে গেলে আলোকচিত্র সাংবাদিক ও রিপোর্টাররা ঘিরে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে। বোঝাই যায় যে, সরকারপ্রধানকে কাছে পেয়ে সারা দেশে নির্বাচন কেমন হচ্ছে, নির্বাচনী কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব নিরপেক্ষতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে কি-না, বিরোধীদল আইনসম্মত সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কি-না এসব নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। সরকারপ্রধানের উত্তর যে 'ইতিবাচক' ছিল তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মাত্র সাতটি আসনে বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীকে 'জয়লাভের সুযোগ' দেয়া হয়েছিল। বিরোধীদলের সব গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা ও প্রার্থীদের জবরদস্তিমূলকভাবে 'পরাজিত' করা হয়েছিল। নির্বাচনী বর্বরতা-দস্যুতা ও জালিয়াতির অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছিল নবীন রাষ্ট্রের কথিত গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনাতেই।

স্বাধীন সংবাদপত্রের কল্যাণে এর সবকিছুই তখন 'ওপেন সিক্রেট'। দেশের সংবাদপত্রকেও এজন্য খুব চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। বছর দুয়েক পর সব স্বাধীন সংবাদপত্র বাজেয়াপ্ত ও প্রকশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

বলেছেন, তিনি বিরোধীদলের নির্বাচিত সদস্যদের আনুষ্ঠানিক বিরোধীদল হিসেবে বিবেচনা করবেন না। তখনো আটটি আসনের ফল প্রকাশিত হওয়া বাকি ছিল। আওয়ামী লীগ ২৭৪ আসন, তিনটি বিরোধীদল একটি করে আসন পেয়েছিল এবং তিনজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি বিজয় উদ্‌যাপনের জন্য সাংবাদিকদের সাথে চা ও কেক খেতে খেতে বলেন: এই ফলাফল নিশ্চিত করেছে যে, আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে এবং আমিও তাদের ভালবাসি। যে তিনজন সংসদ সদস্য স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তারা আওয়ামী লীগেরই লোক, মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছেন, ওরা আবার আওয়ামী লীগে ফিরে আসবেন। বিরোধীদল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে ২৫টি আসন থাকতে হয়, অপোজিশন ২৫টি আসন পায়নি। তাই বিরোধীদল হিসেবে তারা বিবেচিত হতে পারে না, বিরোধীদলের জন্য প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা তারা পেতেও পারে না, এমনকি রেডিও-টিভিতে বিরোধীদলের জন্য বরাদ্দ সময়ও তাদের দেয়া সম্ভব নয়।[২০]

নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার বীজ বপন হয়েছে এবং পরস্পরের প্রতি জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। গোটা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েই জনমনে সন্দেহ দানা বাঁধে। দেশবাসী মনে করতে থাকেন, বিরোধীদলগুলোর অন্তত ৩০টি আসনে বিজয় ছিল সুনিশ্চিত।[১৫]

নির্বাচনের পর মাত্র এক মাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বের করে দেয়ার অভিযান চালায়। তাদের যুক্তি ছিল, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে যেহেতু বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছে, এমতাবস্থায় দেশে অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই। ১৯৭৩ সালের ৫ এপ্রিল তারা টঙ্গী শিল্প এলাকায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি বামপন্থি দলের শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন। অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়।[২১]

স্বাধীন দেশের প্রথম নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় উদ্‌যাপন ছিল এমনই রক্তাক্ত আর নির্মম।

সূত্র:

১. যদ্যপি আমার গুরু; আহমদ ছফা, মাওলা ব্রাদার্স ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৭৩

২. Nohlen, D, Grotz, F & Hartmann, C (2001) Elections in Asia: A data handbook, Volume 1, Page: 535, ISBN 019924958.

৩. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৩৩১

৪. দৈনিক গণকণ্ঠ; ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৫. প্রাগুক্ত; ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৬. প্রাগুক্ত; ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৭. প্রাগুক্ত; ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩

৮. প্রাগুক্ত; ৬ মার্চ ১৯৭৩

৯. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৭৪

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৭৮

১১. বিপুলা পৃথিবী; আনিসুজ্জামান, প্রথমা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ৭০

১২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৭৯-১৮০

১৩. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৩৩২

১৪. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৮১

১৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৮২

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৮২-১৮৩

১৭. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ২০৩-২০৪

১৮. বলেছি বলছি বলব; শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, অনন্যা প্রকাশন, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা: ২৩০

১৯. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ২০৪

২০. দ্য গার্ডিয়ান; ৯ মার্চ ১৯৭৩

২১. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৮৬

বারো অধ্যায়

রাজনৈতিক নিপীড়ন

'লালবাহিনী'র দৌরাত্ম্য : হত্যা-খুন।

'বঙ্গবন্ধু' না লিখলে, না বললে জনগণ জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলবে'।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের সদস্যরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর নিপীড়ন শুরু করে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তাদের রাজনৈতিক মিত্রকেও ছাড় দেয়নি। সরকারের মিত্র সিপিবি'র ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন ১৯৭৩-এর পহেলা জানুয়ারি 'ভিয়েতনাম সংহতি দিবস' উপলক্ষে ডাকসু'র সাথে যৌথভাবে ঢাকার মতিঝিলে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসে স্মারকলিপি দেয়ার উদ্দেশ্যে মিছিল নিয়ে বের হয়। তখন ডাকসুতে ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্ব ছিল। সেই মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাবের উল্টোদিকে ইউএসআইএস কার্যালয়ের সামনে এলে মিছিলকারীদের কেউ কেউ ইউএসআইএস (আমেরিকান ইনফরমেশন সেন্টার)

দৈনিক ইত্তেফাক

THE DAILY ITTEFAQ

Tuesday, January 2, 1973

প্রেসনোট

ঢাকায় পুলিশের গুলীবর্ষণ

২ জন নিহত ও ৬ জন আহত

বঙ্গবন্ধুর গভীর দুঃখ প্রকাশ

বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

রাষ্ট্রপতি মর্মাহত

আহতদের নামের তালিকা

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

গুলী বর্ষণের প্রতিবাদ

বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি মহাসচিবের আহ্বান

চিত্র-কথন: স্বাধীন রাষ্ট্রে পুলিশি অ্যাক্শন; দুই ছাত্রকে গুলি করে হত্যা

স্বাধীন রাষ্ট্রের মাত্র এক বছর পার হয়েছে। ১৯৭৩-এর ১লা জানুয়ারি, সেদিন ছিল সোমবার। ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেপরোয়া বোমাবর্ষণের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র ইউনিয়ন ও ডাকসু'র যৌথ উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে সমবেত শিক্ষার্থীরা রাজধানীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য মিছিলসহ রওয়ানা হয়। যাত্রাপথে মিছিল তোপখানা রোডে যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যকেন্দ্রের (ইউসিস) সামনে এলে উত্তেজিত শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ তথ্যকেন্দ্রে ঢিল ছোঁড়ে। পুলিশ বাধা দেয়ার জন্য শক্তি প্রয়োগ করলে ছাত্ররা পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারে। এরপরই পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় দুইজন ছাত্র– মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদের।

স্বাধীন রাষ্ট্রের শুরুতেই পুলিশের এই বর্বরতার প্রতিবাদে পরদিন স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। বিকালে পল্টন ময়দানে সমাবেশে ইতিপূর্বে ডাকসু'র পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি ডাকসু'র তৎকালীন ভিপি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রত্যাহার করে নেন এবং ডাকসু'তে মুজিবের 'আজীবন সদস্য' পদ বাতিল করেন। এই গণতান্ত্রিক আচার ও চর্চার পরিণাম হিসাবে ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও ছাত্র ইউনিয়নকে আরো অনেক জুলুম-নির্যাতন সইতে হয়েছিল।

ফটো ক্রেডিট: দৈনিক ইত্তেফাক

কার্যালয়ে ঢিল ছোড়ে। ওইটুকু প্রতিবাদ রুখতে কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই মিছিলে গুলি চালানো হয়। ঘটনাস্থলেই ছাত্র ইউনিয়নের দুই নেতা মতিউল ইসলাম ও মির্জা কাদের নিহত হন। এটা ছিল স্বাধীনতা উত্তর রাজধানী ঢাকায় সবচেয়ে আলোচিত প্রকাশ্য রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা। ওই দিনের ঘটনায় গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত পরাগ মাহমুদের বিবরণ থেকে জানা যায়, পুলিশ প্রথমে মিছিলের অগ্রভাগে থাকা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে রাইফেল দিয়ে আঘাত করে। এ দৃশ্য দেখে মিছিলকারীরা ক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুড়ে মারে। এরপরই বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু হয়।

ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে পরদিন ২ জানুয়ারি স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততায় হরতাল পালিত হয়। একই দিন বিকালে পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সমাবেশে ডাকসু'র পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে দেয়া 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি তৎকালীন ভিপি মুজাহিদুল ইসালাম সেলিম প্রত্যাহার করে নেন এবং তাঁর ডাকসু'র 'আজীবন সদস্য'পদ বাতিল করেন। ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ও ডাকসু'র জিএস মাহবুব জামান উত্তেজিতভাবে ডাকসু'র সিদ্ধান্ত বই থেকে এ সংক্রান্ত পাতাও ছিঁড়ে ফেলেন। সভা থেকে ছাত্রহত্যায় যুক্তদের পদত্যাগ, মিছিল-মিটিংয়ে রক্ষীবাহিনীর হামলার বিচারসহ ৭ দফা দাবিও উত্থাপিত হয়েছিল সরকারের কাছে।[১]

সেই সমাবেশের দু'দিন পর ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শহীদুল ইসলাম আরেক সমাবেশ থেকে মুজাহিদুল ইসলামকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন, যারা শেখ মুজিবের নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' লিখবে না বা বলবে না, জনগণ তাদের জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলবে।[২]

৫ জানুয়ারি ছাত্রলীগ ঢাকায় ন্যাপ (মোজাফ্ফর) ও ছাত্র ইউনিয়ন কার্যালয় জ্বালিয়ে দেয়। এই ধারাবাহিক হামলা সহ্য করতে না পেরে মুজাহিদুল ইসালাম সেলিমকে দলবল নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা মিটমাট করে নিতে হয়।[৩]

ঠিক তার ১০ মাস পর, নভেম্বর মাসে ছাত্র ইউনিয়নের চতুর্দশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে আশ্চর্যজনকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানই আমন্ত্রিত হন।[৩] ১৯৭২ সালের অক্টোবরে নিজ দলের ছাত্র সংগঠনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জাসদ সৃষ্টিতে নেতিবাচক অবদান রাখা শেখ মুজিব, মাত্র এক বছর পর ১৯৭৩ সালের নভেম্বরে ছাত্রসমাজের মধ্যে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়া এই নেতা আশ্রয় খুঁজছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের কাছে; যাদেরকে বছরের প্রথম দিন শুধু গুলি করে মেরেই ক্ষান্ত হননি, পঞ্চম দিনের মাথায় তাদের কেন্দ্রীয়

চিত্র-কথন: গুলিবিদ্ধ হয়েছে মতিউল। কিন্তু তার সংগ্রামী সাথীরা শ্লোগান দিয়ে যাচ্ছে।

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

কার্যালয়ও পুড়িয়ে দিয়ে ধারাবাহিক আক্রমণের মুখে তরুণ কমিউনিস্টদের মাথা নত করতে বাধ্য করেছিলেন তিনি।

গোপালগঞ্জের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ালিউর রহমান লেবু এবং কমলেশ বেদজ্ঞ মোজাফ্‌ফর ন্যাপের নেতা ছিলেন। তারা আসলে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক হিসেবে ওই দলে কাজ করতেন। এ দুজনই ছিলেন 'হেমায়েত বাহিনী'র নেতৃস্থানীয় সদস্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় 'হেমায়েত বাহিনী'র প্রধান শুধু যুদ্ধই করেনি, সে নানা কায়দায় লুটপাট করেছে সোনাদানা ও টাকা-পয়সা। কমলেশ বেদজ্ঞ এই লুটপাটে বাধা দিলেও হেমায়েত শোনেনি। কমলেশ একটি ডাইরিতে সে সব লুণ্ঠিত সম্পদের বিবরণ নোট করেছিলেন।

১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তিন দিন পর ১০ মার্চ শনিবার সকাল দশটায় ওয়ালিউর রহমান লেবু ও কমলেশ বেদজ্ঞ একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি সেরে কয়েকজন সহকর্মীর সাথে কোটালিপাড়া থেকে গোপালগঞ্জ সদরে ফেরার পথে হেমায়েতের নেতৃত্বে সশস্ত্র মোজাম সর্দার, মোহন প্রমুখ তাদের পথরোধ করে এবং কমলেশ বেদজ্ঞকে ডাইরিটা ফেরত দিতে বলে। ডাইরিটা দিতে অস্বীকার করলে তারা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে

চিত্র-কথন: 'লালঘোড়া দাবড়ায়ে দেবানে'

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ– *চারিদিকে অভাব-অনটন, দারিদ্র্য-হাহাকার, হতাশা-ক্ষোভ। আর সেই সাথে যুক্ত হয়েছিল রাষ্ট্রীয় নিপীড়ক জাতীয় রক্ষীবাহিনী, আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের 'প্রাইভেট বাহিনী' আর তার চেয়ে এগিয়ে থাকা আওয়ামী লীগের বিশেষায়িত 'লালবাহিনী'র অত্যাচার-নির্যাতন।*

আওয়ামী শ্রমিক লীগ নেতা আব্দুল মান্নান ছিলেন 'লালবাহিনী'র প্রধান। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে ভয়ঙ্কর নির্যাতন-নিপীড়নের কারণে 'লালবাহিনী' আর তার নেতা আব্দুল মান্নান তখনকার বাংলাদেশে জনমনে হত্যা-জুলুমের সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন।

বিরোধী রাজনৈতিক মহল এবং সংবাদপত্রের ভাষ্যমতে, 'লালবাহিনী' ছিল মুজিবের 'লেলিয়ে দেয়া বাহিনী'। এটা ছিল তাঁর নিজস্ব প্যারামিলিশিয়া। বিভিন্ন জনসভা এবং রাজনৈতিক কর্মীসভায় শেখ মুজিব স্বয়ং 'লালঘোড়া' আর 'লালবাহিনী দাবড়ায়ে দেবানে' বলে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে হুমকি দিতেন।

ছবিতে কোনো একটি অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের ডান পাশেই দৃশ্যমান সেই মূর্তিমান সন্ত্রাস আব্দুল মান্নান, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে-দলনে যিনি মুজিবের ডান হাত-ই ছিলেন বটে!

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালুকদার/দৃক

জখম করে। এরপর আহত সবাইকে একটি নৌকায় উঠিয়ে মাঝ নদীতে নিয়ে নৌকাটি ডুবিয়ে দেয়। নৌকা ডুবে মুক্তিযোদ্ধা কমলেশ, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মানিক এবং বিষ্ণু নিহত হন। মৃতবৎ অবস্থায় লুৎফর রহমান গঞ্জর নদীর পাড়ে পড়ে থাকেন। লেবু সাঁতরে পার্শ্ববর্তী হাবিবুর রহমানের বাড়িতে আশ্রয় নেন। বাড়িটি ঘেরাও করে হেমায়েতবাহিনী আগুন ধরিয়ে দিতে গেলে লেবু বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। তাকে তিন মাইল পর্যন্ত পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় খুনিরা। তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে লেবুকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটানো হয় প্রকাশ্যে গ্রামবাসীর সামনে।[৪]

এই খুনের সঙ্গে 'জড়িত সন্দেহে' ঘটনার দুদিন পর হেমায়েত উদ্দিনকে আটক করা হলেও আট মাস পর তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেয়া হয়। ইতোমধ্যে তিনি 'বীরবিক্রম' খেতাবেও ভূষিত হন।[৫]

ওয়ালিউর রহমান লেবু কমিউনিস্ট পার্টির তরুণ নেতা ছিলেন। একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা লেবু মুক্তিযুদ্ধে ৮ ও ৯ নম্বর সেক্টরের প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরির সুযোগ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ ক্ষেতমজুর ও গণমানুষকে কমিউনিস্টদের পতাকাতলে সমবেত করার জন্য উলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন গোপালগঞ্জের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের কাছে বিপুল জনপ্রিয় 'লেবুভাই'।[৫]

নিহত এ দু'জন জনপ্রিয় নেতারই নির্বাচনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল। কমলেশ বেদজ্ঞ তিয়াত্তরের মার্চের নির্বাচনে কোটালিপাড়ায় (ফরিদপুর-১২) আওয়ামী লীগের প্রার্থী সন্তোষ আচার্যের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে ওয়ালিউর রহমান গোপালগঞ্জ আসনে প্রার্থী হওয়ায় সেখানকার মূল আওয়ামী প্রার্থী মোল্লা জালালকে সম্ভাব্য পরাজয়ের আশঙ্কায় প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই পরে সেখানে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মুজিব প্রার্থী হচ্ছেন দেখে ওয়ালিউর রহমান মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেও তার জনপ্রিয়তা সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃত্বকে বিচলিত করেছিল।[৫]

আওয়ামী লীগের হেমায়েতের হাতে নিহত সিপিবি নেতা কমলেশ বেদজ্ঞ

ফটো ক্রেডিট: সুতপা বেদজ্ঞ

ওয়ালিউর রহমান, কমলেশ বেদজ্ঞ, শ্যামল ব্যানার্জি মানিক ও বিষ্ণুপদ কর্মকার সেদিনের হামলায় নিহত হলেও স্থানীয় দুর্গাপুর গ্রামের লুৎফর রহমান (পরবর্তীকালে গোপালগঞ্জ জেলা কৃষক লীগের সভাপতি) নামে তাদের এক সহযোগী মুমূর্ষু দশায় অলৌকিকভাবে বেঁচে যান এবং তার মাধ্যমেই এই রোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে।[৫]

সেই সময় দলীয় ক্যাডার আর রক্ষীবাহিনী ছাড়াও নানা 'প্রাইভেট বাহিনী' গড়ে উঠেছিল। 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে' মুজিব শাসনামলে ঢাকায় পুলিশের একটি 'স্পেশাল বাহিনী'ও সক্রিয় ছিল। বড় ভয়ঙ্কর ছিল 'স্পেশাল বাহিনী'। সাদা টয়োটা গাড়িতে ঘুরে বেড়াত তারা। হঠাৎ কাউকে 'সন্দেহজনক' মনে হলে গাড়িতে তুলে নিয়ে উধাও করে দিত। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যেত না।[৬]

মুজিব আমলে ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আদলে গড়া আলোচিত সংগঠন ছিল 'লালবাহিনী'। এই 'লালবাহিনী' মারমুখী শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছিল আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন আওয়ামী শ্রমিক লীগের নেতৃত্বে। এই বাহিনীর নেতা ছিলেন শ্রমিক লীগের নেতা আব্দুল মান্নান। 'লালবাহিনী'র ক্যাডাররা লাল জামা পরতো। মাথায় লাল টুপি বা ক্যাপ থাকতো তাদের।[৭]

শেখ মুজিব স্বয়ং এই বাহিনীর ভয় দেখাতেন। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে এক বিরাট জনসভায় 'লালবাহিনী দিয়ে দাবড়ানো'র ভয় দেখান জনগণকে। এই লালবাহিনী ছিল তাঁর নিজস্ব প্যারামিলিশিয়া।[৮]
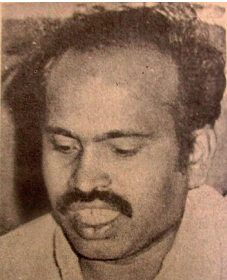
চিত্র-কথন:

জাতীয় শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান, যার নেতৃত্বে প্রাইভেট মিলিশিয়া খুনে লাল বাহিনী গড়ে তোলা হয়।

ফটো ক্রেডিট: ইত্তেফাক

'লালবাহিনী'র তৎপরতার কেন্দ্র ছিল দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল। প্রথমে এই বাহিনী একটি ইতিবাচক উদ্দেশ্যেই গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে সরকারি ও উর্দুভাষীদের মালিকানাধীন কারখানা দখলের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এই ধরনের অবৈধ ও নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে কল-কারখানা রক্ষার জন্যই 'লালবাহিনী'র গোড়াপত্তন।[৭]

কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বাম সংগঠনগুলোকে উৎখাত এবং সর্বগ্রাসী চাঁদাবাজি হয়ে পড়ে এদের কার্যক্রমের প্রধান অংশ। বিরোধীদলগুলোর সমর্থক প্রায় সব সিবিএ-ইউনিয়ন হাইজ্যাক করে এরা। তবে পোশাকিভাবে 'রাজাকার ও সমাজবিরোধীদের নির্মূল'-এর নামেই এসব গুণ্ডামি বৈধ করে নেয়া হচ্ছিল। 'লালবাহিনী' বিশেষভাবে 'বিহারি' নামে পরিচিত উর্দুভাষীদের ওপর আক্রমণাত্মক ছিল। ঢাকায় বাহাত্তরের 'মে দিবস'-এর সমাবেশে আবদুল মান্নান ঘোষণা দেন, 'সরকার যদি বিহারিদের আটক ও বিচার না করে তাহলে তার সংগঠনই সেই কাজটি করবে।'[৭]

১৯৭২-এর জুন থেকে 'লালবাহিনী' ঘোষণা দিয়ে কথিত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে 'শুদ্ধি অভিযান' শুরু করে। এমনকি অভিযানকালে আটককৃতদের 'শাস্তি' প্রদানের আইনগত ক্ষমতার আব্‌দারও তারা করেছিল। এই ধরনের এক শুদ্ধি অভিযানেরই করুণ শিকার হন আহমেদ ফজলুর রহমান। তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ, আগরতলা মামলায় সহ-অভিযুক্ত এবং মুক্তিযুদ্ধের আগে যে সব উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ রাজনীতির সঙ্গে গোপনে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তাদের একজন।

১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল 'মে দিবস'-এর আগের দিন ঢাকায় 'ব্যাপকভিত্তিক শুদ্ধি অভিযান'-এর সময় 'লালবাহিনী'র কয়েক ডজন সদস্য আহমেদ ফজলুর রহমানকে ধানমন্ডির বাসভবন থেকে মারতে মারতে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় শ্রমিক লীগ অফিসে। সেখানে স্বয়ং বাহিনীপ্রধান আবদুল মান্নান ছিলেন। তার সামনেই ফজলুর রহমানকে জেরা করা হয়। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর ১৩টি পেট্রোলপাম্প দখলের অভিযোগ আনে লালবাহিনী। পরে খোদ প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে শ্রমিক লীগ অফিস থেকে মুক্তি পান ফজলুর রহমান। পরদিন ঢাকার অনেক দৈনিক পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়। আহমেদ ফজলুর রহমান লালবাগ থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছিলেন।[৭]

শিল্পাঙ্গনে এ ধরনের অস্থিরতার মধ্যেই ১৯৭৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ড শিল্পাঞ্চলে 'আর আর টেক্সটাইল' মিলে কেবল একটি ঘটনাতেই ২২

জন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। জেলা প্রশাসন অবশ্য প্রেস রিলিজে ৯ জনের কথা স্বীকার করে। আর 'দৈনিক গণকণ্ঠ' নিহতের সংখ্যা ৫০ বলে উল্লেখ করে। বাঁশের তৈরি শ্রমিক কলোনিতে চারদিক থেকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারপর তিন দিক থেকে গুলি ছোড়ার মাধ্যমে এই আক্রমণ হয়। এ নিয়ে পরদিন চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লায় হরতাল পালিত হয়।

গণমাধ্যমের ভাষ্য থেকে জানা যায়, নোয়াখালী অঞ্চলের শ্রমিক প্রাধান্যপূর্ণ এই কারখানায় কিছুদিন পর সিবিএ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোনোভাবেই সরকারদলীয় শ্রমিক সংগঠনটি তার শাখা স্থাপন করতে পারছিল না; তারই প্রতিশোধ ছিল এই হামলা।[৭]

১৯৭২-এর মার্চ মাসে খুলনায় শ্রমিকদের আন্দোলন বন্ধ করতে গিয়ে এই লাল বাহিনী রীতিমতো তাণ্ডব ঘটায়। তাদের গুলিতে সরকারি হিসেবমতে নিহত হন ৩৬ জন শ্রমিক, আহত হন ৮০ জন। কিন্তু বেসরকারি হিসেবে নিহত হয়েছিলেন দুই হাজারের বেশি লোক।[৮]

১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি 'বাকশাল' গঠন প্রশ্নে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উদ্যোগের বিরোধিতা করলে এই 'লালবাহিনী'র প্রধান আবদুল মান্নানকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।[৭]

যতদিন কেউ শীর্ষ নেতৃত্বের অনুগত থাকতো, ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের দলীয় লোকেরা সব অপরাধেই ক্ষমা পেয়ে যেত। একটা কথা চালু হয়ে গিয়েছিল– খুন করেও যদি একবার শেখ মুজিবের কাছে পৌঁছানো যেত এবং শুধু পায়ের ওপর পড়ে বললেই হতো, অপরাধ করে ফেলেছি, এখন কী করবো? তিনি পিঠের ওপর দু'টি থাপ্পড় দিয়ে বলতেন– যা হতভাগা, এবার

চিত্র-কথন:
৮ ও ৯ নং সেক্টরের
মুক্তিযুদ্ধের সমন্বয়করী বীর মুক্তিযোদ্ধা ওয়ালিওর রহমান লেবু।

ফটো ক্রেডিট: সুতপা বেদজ্ঞ

বেঁচে গেলি। আর কখনো এমনটি করিস না।[৯]

তিন

ফেব্রুয়ারি মাস। ১৯৭৩ সাল। একটি রাজনৈতিক দলের সভা চলছিল। পাশের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো দু'জন পথচারীকে। তৃতীয় জনকে ধরতে গেলে সে চিৎকার করে উঠলো, 'আমি কোনো দল করি না...আমি কোনো দলের লোক নই।'

থমকে গেল হাইজ্যাককারীরা। তারপর ওদেরই একজন চিৎকার করে উঠলো, 'এ লোকটা পোস্তগোলার ব্যাংক লুট করেছে, ধর ব্যাটাকে।' তারপর হাটুরে কিল-ঘুষি। সে মানুষটার কণ্ঠ মিলিয়ে গেল শোরগোলে। হারিয়ে গেল সে জনারণ্যে। পিটিয়েই মেরে ফেলা হলো হতভাগ্য যুবককে। পরদিন মৃত্যুর আগে ভয়ার্ত সেই যুবকের রক্তাক্ত ছবি ছাপা হলো পত্রিকায়।

এই ছিল সারা দেশের নিত্যদিনের সাধারণ চিত্র। যে কাউকে রাস্তায় 'গণপিটুনি' দিয়ে মেরে ফেলতে শুরু করলো একদল সংগঠিত মানুষ। প্রখ্যাত সাংবাদিক নির্মল সেন লিখলেন 'দৈনিক বাংলা'য় কালজয়ী এক উপ-সম্পাদকীয় 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শিরোনামে।

তিনি লিখলেন, 'মানুষ তেল-চাল-ডাল-নুন নিয়ে শুধু স্বাভাবিক জীবনযাপন করার কথা ভাবে না, ভাবে– রাস্তায় তথাকথিত 'জনতার আক্রোশে' পৈতৃক প্রাণটা কখন বিপর্যস্ত হয়। কখন আততায়ীর গুলি ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তাকে। সে শুধু স্বাভাবিক জীবনের প্রতিশ্রুতি নয়, চায় একটা স্বাভাবিক মৃত্যুরও গ্যারান্টি।'[১০]

চার

সাবেক এ আই জি শফিউল ইসলাম শেখ মুজিবের শাসনামলে এক থানার ওসি ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপরে আওয়ামী লীগের কর্মীদের নির্যাতনের ঘটনা তার প্রকাশিত বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। শফিউল ইসলাম নিজেও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

একদিন সন্ধ্যায় শফিউল ইসলাম থানায় কাজ করছেন। এমন সময় মাঝ বয়েসী এক হিন্দু ভদ্রলোক হঠাৎ করেই তার রুমে ঢুকে নিঃশব্দে সোজা পা জড়িয়ে ধরে কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগলেন,

স্যার আমাকে বাঁচান।

তার এই চাপা কান্নার উদ্দেশ্য হলো অন্যরা যাতে কেউ না জানতে পারে। কারণ তার এই থানায় আসার খবর অত্যাচারী নব্য ক্ষমতাধরদের কানে যায়, তবে তার পরিণতি হবে আরো ভয়াবহ। শফিউল ইসলাম তাকে অভয় দিলেন, আশ্বস্ত করলেন।

আপনার সমস্যা নির্ভয়ে বলুন।

স্যার ওরা জানতে পারলে আমাকে খুন করে ফেলবে।

জনগণের যদি জানমালের কোনো নিরাপত্তাই না-দিতে পারলাম, তবে আমার এখানে থাকার প্রয়োজন কি? আপনি বলুন আপনার কি সমস্যা?

দৃঢ়তার সঙ্গে শফিউল ইসলাম পুনর্বার অভয় দিলেন।

ভদ্রলোক বলতে শুরু করলেন। তিনি একজন বর্ধিষ্ণু হিন্দু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। পাকবাহিনী আর তার দোসর দালালরা তার বাড়ি ঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়িয়ে দিয়েছে। তিনি সোমত্ত মেয়ে নিয়ে এক গরিব আত্মীয়ের বাড়িতে উঠেছেন। প্রতি রাতে কতিপয় আওয়ামী লীগের গুন্ডা সেই বাড়িতে গিয়ে তার মেয়েকে ধর্ষণ করে। মেয়েটির বাবা অসহায়ের মত নিরুপায় হয়ে থানা আওয়ামী লীগের সভাপতিকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন সমাধান দিতে পারেননি। নিরুপায়ের মতো জানতে চান।

স্যার আমি এখন কি করবো?

যাদের নাম তিনি উল্লেখ করলেন, তারা আওয়ামী লীগের কর্মী। যারা এখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কোনো আইনী শক্তি তাদেরকে পরাভূত করতে পারে না, এমন দোর্দন্ড প্রতাপ নিয়েই সকল বিষয়ের উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তারা। শফিউল ইসলাম দাঁড়িয়ে মাটিতে বসা নির্যাতিতা মেয়ের সেই পিতার দু'বাহু ধরে দাঁড় করালেন।

যাদের নাম বললেন মেয়েটির পিতা, তাদের দু'জনকে ওসি চেনেন। দু'দিন আগে সরকার ১০/৫ টাকার নোট ডিমোনিটাইজের ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় ব্যাংকে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ব্যাংকের পাশে রাস্তায় লম্বা লাইন ধরে

অসংখ্য মানুষ বাতিলকৃত টাকা জমা দিতে যখন ভোগান্তির চরম সীমায়, তখন ঐ দু'জন ধর্ষক সন্ত্রাসী সেই লাইনে গিয়ে তাদের কাছ থেকে সেইসব টাকাগুলো জোর করে কেড়ে নিয়ে তাদের নিজেদের নামে ব্যাংকে জমা দিতে লাগলো, বিশেষ করে যারা দূর-দূরান্ত থেকে আসছে, তাদের টাকা। ভুক্তভোগী এমন দু'জন থানাতে এসে কান্নাজড়িত কণ্ঠে অসহায়ভাবে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ শফিউল ইসলামের কাছে করেছিলো।

রাতে কার্ফিউ দিয়ে ধর্ষণ, অস্ত্র রাখা ও টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে অস্ত্রসহ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলো। গ্রেফতার অভিযানের পরে ভোরবেলার দিকে বাসায় এসে শফিউল ইসলাম ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। সকালেই ঢাকা থেকে মন্ত্রী সাহেবের পিএস ফোন করেছেন, লাইনে আছেন, শফিউল ইসলামের সাথে কথা বলবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পিএস হাজতে থাকা দু'জন আসামীর নাম ধরে বললেন, তাদেরকে কেনো গ্রেফতার করা হয়েছে? তাদের এখনই ছেড়ে দিতে বললেন।

কিছু পরে এসপি সাহেব টেলিফোন করে বরিশাল গিয়ে তার সাথে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে তিনি ঐ আসামী দু'জনের নাম উল্লেখ করে বললেন, কেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে?

এর মধ্যেই নজিরবিহীনভাবে দু'জনের জামিন হয়ে গেলো পাঁচদিনের। জামিন হওয়ার তিনদিনের মাথায় এলেন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তারপর সেই দু'জন ধর্ষকের নাম ধরে তিনিও বললেন, তাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ? কেনো তাদের গ্রেফতার করেছেন? শফিউল ইসলাম মন্ত্রী মহোদয়কে একজন শিক্ষিত অসহায় বাবা তার মেয়ের সম্ভ্রম না রক্ষা করতে পারার যে অকুতি তার বর্ণনা এবং আসামীদের ভয়ে নিরূপায় হয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে কান্নার বর্ণনা দিলেন। প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে বাতিল ঘোষিত নোট ছিনিয়ে নিয়ে নিজ নামে জমা দেওয়াসহ অন্যান্য অপকর্মের বর্ণনা দিলেন।

এতোকিছু শুনেও মন্ত্রী মহোদয় তাদের দু'জনকে সাথে করে ঢাকাতে নিয়ে গেলেন। তারও কিছুদিন উঁচু মহলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে মামলা থেকে বেকসুর খালাস হয়ে তারা ফুলের মালা নিয়ে শহরে ফিরে এলো।[১১]

সূত্র:

১. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৫০

২. দৈনিক বাংলা; ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩

৩. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৫১

৪. ছেলে হত্যার বিচারের আশায় কবরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন লেবু ভাইয়ের বুড়ো মা : খুনীর নাম হেমায়েত; কুলদা রায়-এর ব্লগ থেকে, ২৪ জুলাই ২০১০ সালের কুলদা রায়ের ব্লগটি দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন−

৫. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৫২

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪৪

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪৫-২৪৭

৮. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ১৯৯

৯. মুজিব ভাই; এবিএম মূসা, প্রথমা প্রকাশন, চতুর্থ মুদ্রণ, জুলাই ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৮১

১০. স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই; নির্মল সেন, তরফদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃষ্ঠা: ৮৭-৯০

১১. পুলিশ জীবনের সারি বাঁধা পথে; শফিউল ইসলাম (সাবেক এআইজি); মুক্তচিন্তা; ফেব্রুয়ারি ২০০৮, ৮৭-৯৭

তেরো অধ্যায়

সিরাজ শিকদারের হত্যাকাণ্ড

সিরাজ পাকিস্তানকে উপনিবেশবাদী, ভারতকে বৈরী আধিপত্যবাদী এবং আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থি সুবিধাবাদী ও আধিপত্যবাদী গণবিরোধী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন।

'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার?'[১৬]

রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বিচারবহির্ভূত হত্যার উপাখ্যান রচিত হলো মুজিব সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী।

ষাটের দশকের বুয়েট (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)। ঝাঁকড়া চুলের শক্ত পুরুষালী চোয়ালের এক নবীন ছাত্র অনেকেরই নজর কাড়লো। বরিশালের কাদা-মাটির গন্ধ তখনও তার গায়ে। কিন্তু চোখ দু'টো অসম্ভব রকমের উজ্জ্বল আর দৃঢ় সংকল্পে স্থির। ছাত্র ইউনিয়নের মিছিলে উদ্দীপ্ত এই তরুণের শ্লোগান, তুখোড় বক্তৃতা আর জ্বলজ্বলে চোখ দেখে সবাই বুঝেছিল যে, এই ছেলের ভেতর আগুন আছে। ছেলেটা নজর কাড়লো কমিউনিস্ট নেতাদেরও। কমিউনিস্ট পার্টিতে যুক্ত হলেন।

ছাত্র অবস্থাতে পার্টি কংগ্রেসে ছিলেন ছাত্র প্রতিনিধি। তখনও কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন শুরু হয়নি। বুভুক্ষের মতো এই তরুণ পড়েন মার্ক্স্ ও লেনিনের বই। বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর এই তরুণের চোখ-মুখের দৃঢ়তা হয়তো সকলেই দেখতো। কিন্তু কেউ-ই হয়তো বুঝতে পারেনি যে, সে নিজেকে তৈরি করছে ভবিষ্যতের বিপ্লবের জন্য। ছেলেটির ডাক নাম 'সেরা', পুরো নাম সিরাজ শিকদার।

এর মধ্যেই পার্টি ভাঙলো। ছাত্র ইউনিয়নও ভাঙলো। সিরাজ যোগ দিলেন মেনন গ্রুপে। মেনন গ্রুপের সহ-সভাপতি হলেন তিনি। ছাত্রজীবন শেষ হলো সেই বছরেই। তিনি যোগ দিলেন সিঅ্যান্ডবি'র কনিষ্ঠ প্রকৌশলী পদে। কিন্তু যার চোখে বিপ্লবের স্বপ্ন, তিনি কি আর ৯টা-৫টার অফিসে বসে কাজ করতে পারেন? তিন মাসের মধ্যেই চাকরি ছেড়ে দিলেন। যোগ দিলেন এক বেসরকারি কোম্পানিতে।

১৯৬৮ সালের ৮ জানুয়ারি কয়েকজন সমমনাকে নিয়ে গঠন করলেন 'পূর্ব বাংলার শ্রমিক আন্দোলন' নামে একটি প্রস্তুতি সংগঠন। এই শ্রমিক আন্দোলনকেই তিনি ১৯৭১-এর ৩ জুন বরিশাল জেলার পেয়ারা বাগানে 'সর্বহারা পার্টি'তে রূপান্তরিত করেন।

১৯৭০ সালেই সিরাজ শিকদারের 'বিপ্লবী পরিষদ' বিভিন্ন জেলায় পাকিস্তানি প্রশাসন ও 'শ্রেণি শত্রুর' বিরুদ্ধে গেরিলা অপারেশন চালায়। ১৯৭১ সালের ৮ জানুয়ারি তারা ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ ও ময়মনসিংহে উড়ান স্বাধীন পূর্ব বাংলার পতাকা। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ এই বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লেখে, যা লিফলেট আকারে সারা দেশে প্রচার করা হয়। এর চার নম্বর দফাটি ছিল– পূর্ব বাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও ব্যক্তিদের সমন্বয়ে জাতীয় মুক্তি পরিষদ বা জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন।

সিরাজ শিকদার কবিতাও লিখতেন। কবিতাগুলো উঁচুমানের কাব্য না হলেও, সেই কবিতাগুলোর ছত্রে ছত্রে মিশে থাকতো মাও সেতুং-এর বিপ্লবী রণকৌশল। তার একটি কবিতার লাইন–

'আর কয়েকটা শত্রু খতম হলেই তো গ্রামগুলো আমাদের;
জনগণ যেন জল, গেরিলারা মাছের মতো সাঁতরায়'

১ মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার ঘোষণা দেন, উত্তাল হয়ে উঠে গোটা পূর্ব পাকিস্তান। পরদিন 'পূর্ব

বাংলার শ্রমিক আন্দোলন’ শেখ মুজিবকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে সংগঠনটি সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অস্থায়ী ‘বিপ্লবী জোট সরকার’ গঠন এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ‘জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদ’ গঠনের অনুরোধ জানায়। শেখ মুজিব তখন ব্যস্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে। শেখ মুজিব ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বাধীন ‘শ্রমিক আন্দোলনে’র এই খোলা চিঠি আমলে নেননি; পুরোপুরি অগ্রাহ্য করেছিলেন। হতে পারে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পাওয়ার পর আওয়ামী লীগ তখন ‘একলা চলো’ নীতিতে অটল।

মুজিবনগর সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ নেয়ার পর সেই সরকারের প্রতি আরেকটি খোলা চিঠি দেয়া হয় ‘শ্রমিক আন্দোলন’-এর পক্ষ থেকে। সেখানে যুদ্ধের ময়দানে করণীয় বিষয় তুলে ধরা হয়। তবে এবারও প্রবাসী সরকার ‘শ্রমিক আন্দোলনে’র সেই চিঠিতে দৃক্পাত করেনি।

কিন্তু সিরাজ শিকদার থেমে থাকেননি। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার পর তিনি বরিশালের পেয়ারা বাগানে ৩০ এপ্রিলে গড়ে তোলেন ‘জাতীয় মুক্তিবাহিনী’। ৩ জুন পার্টির নতুন নাম দেয়া হয় ‘পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি’। ১৯৭১ সালের অক্টোবরে সর্বহারা পার্টি দলের গেরিলাদের নির্দেশ দেয় পাকিস্তানি বাহিনী, ভারতীয় বাহিনী ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে। কারণ, সিরাজ শিকদার পাকিস্তানকে উপনিবেশবাদী, ভারতকে বৈরী আধিপত্যবাদী এবং আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থি সুবিধাবাদী ও আধিপত্যবাদী গণবিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

বরিশাল থেকে শুরু করে বিক্রমপুর, মানিকগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বহারা পার্টির গেরিলারা পাকবাহিনীর সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে। ১৯৭১ সালের আগস্ট পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরে থেকে লড়াই-সংগ্রাম করেছে মূলত এ দেশের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি ও গ্রুপ, যার মধ্যে ‘সর্বহারা পার্টি’ অন্যতম। বরিশাল অঞ্চলে অসংখ্য সফল হামলা চালিয়ে ‘সর্বহারা পার্টি’ পাকিস্তানি বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। তবে স্বাধীনতার যত ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে বরিশালে সর্বহারা পার্টির অবদানকে খুব কৌশলে উহ্য রেখেছেন রাজনৈতিক মদদপুষ্ট ইতিহাসবিদরা। দুঃখজনক হলেও সত্যি, আওয়ামী লীগ ও সর্বহারা পার্টির সম্মুখ যুদ্ধে ১৯৭১-এর নভেম্বরের মধ্যে সর্বহারা পার্টির অনেক সদস্য নিহত হয়েছিল।

সর্বশেষ

গ্রেফতারের পর পলায়নকালে পুলিসের গুলীতে সিরাজ সিকদার নিহত

গতকাল (বৃহস্পতিবার) শেষ রাত্রিতে প্রাপ্ত পুলিসের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয় যে, 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি' নামে পরিচিত একটি গুপ্ত চরমপন্থী দলের প্রধান সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে পুলিস ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রামে গ্রেফতার করেন। একই দিন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁহাকে ঢাকা পাঠানো হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময়

(শেষ পৃঃ ৫-এর ৪ঃ কঃ দ্রঃ)

ময়না তদন্তের পর মর্গের ভিতরে গৃহীত সিরাজ সিকদারের লাশের ছবি —ইত্তেফাক
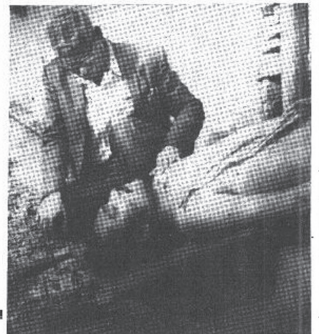
সিরাজ সিকদারের লাশ দাফন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

নিহত সিরাজ সিকদারের লাশ গতকাল (শুক্রবার) তাঁহার পিতা জনাব আবদুর রাজ্জাক সিকদার কর্তৃক সনাক্তকরণের পরে সন্ধ্যায় মোহাম্মদপুর গোরস্থানে দাফন করা হইয়াছে। গতকাল সকাল সোয়া ১১টার দিকে তাঁহার লাশ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়না তদন্ত করা হয়।

পুলিসের প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়ঃ "সিরাজুল হক সিকদার ওরফে সিরাজ সিকদারকে গত ১লা জানুয়ারী চট্টগ্রাম হইতে গ্রেফতার করিয়া ঐদিনই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ঢাকায় আনা হয় এবং তাঁহার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী গত ২রা জানুয়ারী রাত্রে একটি পুলিস-ভ্যানে তাঁহাকে তাহার দলের লোকদের একটি গোপন আস্তানার দিকে লইয়া যাওয়ার সময় তিনি পলায়নের চেষ্টা চালাইলে পুলিস গুলী চালায় এবং জনাব সিকদার ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন।" এই ঘটনা রাত সাড়ে ১১টার দিকে সাভারের তালবাগ এলাকায় ঘটে বলিয়া জানা গিয়াছে।

রাত ৩টার দিকে জনাব সিকদারের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়। গতকাল (শুক্রবার) সকাল সোয়া ১১টার দিকে ময়না তদন্ত হয়। তাহার শরীরে ৫টি বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। ৪টা বুলেট দেহ ভেদ করিয়াছে। ১টি বুলেট ফুসফুসের ভিতরে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পরনে ক্রীম রংয়ের টেট্রনের প্যান্ট ও গায়ে সাদা টেট্রনের

চিত্র-কথন: বাঙলার আরেক সিরাজ– আরেক প্রদীপ

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নিখাদ দেশপ্রেমের স্বাক্ষর রেখে জীবনদানের বিনিময়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপন করেছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এর দু' শ' বছর পর বাঙলার বঞ্চিত-নিপীড়িত গণমানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির শপথে উদ্দীপ্ত আরেক যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল এর ভেজা মাটির কোমল বুকে; তিনি আরেক সিরাজ– অর্থাৎ, আরেক প্রদীপ– সিরাজ শিকদার।

১৯৭০ সালেই তিনি পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। '৭১-এর জানুয়ারির গোড়াতেই পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন স্বাধীন বাঙলার পতাকা।

পহেলা মার্চের ঘটনার পরদিনই শেখ মুজিবকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে অস্থায়ী 'বিপ্লবী জোট সরকার' গঠন এবং সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ পরিষদ গঠনেরও আহ্বান জানান।

'৭১-এর এপ্রিলে গড়ে তোলেন 'জাতীয় মুক্তিবাহিনী'। অক্টোবরে তিনি একই সাথে পাকিস্তানি ও ভারতীয় সামরিক বাহিনী এবং 'মুজিববাহিনী'সহ আওয়ামী লীগের সশস্ত্র ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। সিরাজ পাকিস্তানকে উপনিবেশবাদী, ভারতকে বৈরী আধিপত্যবাদী এবং আওয়ামী লীগকে ভারতপন্থি সুবিধাবাদী ও আধিপত্যবাদী গণবিরোধী শক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

১৬ ডিসেম্বরের পর সিরাজ ও তার 'পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি' ঘোষণা করে যে, পাকিস্তানের উপনিবেশ থেকে বাংলাদেশ এবার 'ভারতীয় উপনিবেশ' হয়েছে। তিনি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তি ও সংগঠনের যৌথ অথবা সমন্বিত নেতৃত্বে 'জাতীয় বিপ্লবী সরকার' গড়ে তোলার তাগিদ দেন। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের নিয়ে সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনী

গঠন এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তাদের বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থচেতনা অথবা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিলাষ কিংবা রাজনীতির মঞ্চে নিজ নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা– এসবের কোনোটাতেই লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাননি তিনি। সমাজের কায়েমি স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই ছিল তার। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূলমন্ত্র থেকে বিচ্যুত সরকার ও তার সমর্থক-পৃষ্ঠপোষক কায়েমি স্বার্থপর সামাজিক গোষ্ঠী বাঙালির এই নতুন সিরাজ– নতুন আলোর প্রদীপকে মেনে নিতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধের এই মহান পুরুষকে আটক করা সম্ভব হলেও তাকে বিচারের জন্য আদালতের কাঠগড়ায় তুলতে সাহস পায়নি মুজিব সরকার। ক্ষমতাসীনদের হয়তো ভয় ছিল– বিচারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মুক্তি পেয়ে সসম্মানে বেরিয়ে আসবেন সিরাজ। দেশের তরুণ ও যুবসমাজসহ গণমানুষের মধ্যে এমনিতেই তার যে যাদুকরী জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে, তার ওপর আদালতের অমন কোনো সিদ্ধান্ত তাকে অসম রাজনৈতিক ভাবমূর্তি এনে দিতে পারে। যে ভাবমূর্তি তখনকার রাজনৈতিক মঞ্চের প্রধান পুরুষের জন্যও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারতো।

আর সে কারণেই কি শেখ মুজিব তাকে বিচারের সম্মুখীন করার কোনো চেষ্টা না করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিচারবহির্ভূত হত্যার দ্বারে বলি দিলেন? রাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম বিচারবহির্ভূত হত্যার উপাখ্যান রচিত হলো মুজিব সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী।

ফটো ক্রেডিট: দৈনিক ইত্তেফাক

স্বাধীনতার পরে সর্বহারা পার্টি মনে করতো, পাকিস্তানের উপনিবেশ থেকে দেশ এবার ভারতীয় উপনিবেশ হয়েছে। এ সময় নতুন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ের তোলার প্রশ্নে সর্বহারা পার্টি সরকারের প্রতি একটি খোলা চিঠি লেখে। ওই চিঠিতে ভারতীয় সৈন্যদের অনতিবিলম্বে সরিয়ে নেয়া; যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের দিয়ে নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী গঠন করা; স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং তাদের বিচার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়। এতে সব দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে 'জাতীয় বিপ্লবী সরকার' গঠনসহ ২৭টি দাবি পেশ করা হয়। তবে মুজিব সরকার আগের মতোই সর্বহারা পার্টির একটি দাবিতেও কর্ণপাত করেনি।

এরপর সিরাজ শিকদার পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ হিসেবে উল্লেখ করে 'পূর্ব বাংলার বীর জনগণ, আমাদের সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি, পূর্ব বাংলার অসমাপ্ত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার মহান সংগ্রাম চালিয়ে যান' মর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল পেশ করেন, যেখানে আওয়ামী লীগকে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক ও বেঈমান হিসেবে উল্লেখ করে তাদেরকে ভারতের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৬ ডিসেম্বরকে 'কালো দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সর্বহারা পার্টির ডাকে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪-এ বিজয় দিবসে দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হলে মওলানা ভাসানী বিবৃতি দিয়ে তা সমর্থন করেন। ওই সময় দেশব্যাপী গণভিত্তিসম্পন্ন পার্টি গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করেন। সিরাজ শিকদার দিনে দিনে জনপ্রিয় নেতা হয়ে উঠতে থাকেন। ছাত্র-তরুণরা দলে দলে তার সংগঠনে যোগ দিতে থাকে। সামরিক বাহিনীর কিছু অফিসারের মধ্যে সিরাজ শিকদারের বিপুল প্রভাব ছিল।[১]

১৯৭৪ সালে দলটির ব্যাপক বিকাশ হয়। তবে এই সময় তার দলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৯৭৩ সাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ফাঁড়ি, থানা, বাজার ও ব্যাংক লুটের ঘটনা ঘটতে থাকে। এর অনেকগুলোতেই আবদুল হকের নেতৃত্বাধীন 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি' এবং সিরাজ শিকদারের 'পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি'র জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে।[২]

সিরাজ শিকদার সেই দিনের গ্রাম-গঞ্জ ও শহরের কিছু লোকের কাছে, বিশেষ করে যারা সরকারি কর্মকাণ্ডে হতাশ ছিলেন, রবিনহুডের মতো এক আকর্ষক

চরিত্র হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি ও তার সঙ্গীদের ছদ্মবেশে অতর্কিত উপস্থিতি ও নিমেষে মিলিয়ে যাওয়া নিয়ে সেই সময় বেশ রোমাঞ্চকর গল্প শোনা যেত। তার দল সর্বহারা পার্টির সদস্যদের প্রচারপত্র বিলি, হঠাৎ চিকামারা এবং অতর্কিতে পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর ওপর হামলা চালানো নিয়ে লোকজন, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত থাকতো।

এ রকম পরিস্থিতিতে ১৯৭৩ সালে বিজয় দিবসের আগের রাতে শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে– সিরাজ শিকদার ও তার দল এসে ঢাকায় সরকারবিরোধী লিফলেট প্রচারসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালাতে পারে। এই আশঙ্কায় রাজধানীতে রাতের বেলায় সাদা পোশাকে পুলিশ ভিন্ন গাড়ি নিয়ে টহল দিতে থাকে।[৩]

ওই রাতে প্রধানমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শেখ কামাল ধানমন্ডি এলাকার তার সাতজন সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে একটি মাইক্রোবাসে চড়ে শহরে টহল দিতে বের হন। একপর্যায়ে সিরাজ শিকদারের খোঁজে টহলরত স্পেশাল পুলিশ মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে মাইক্রোবাসটি দেখতে পায় এবং সন্দেহ ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে কোনো সতর্ক সংকেত না দিয়েই অতর্কিতে এর ওপর গুলি চালায়। এতে শেখ কামাল ও তার ছয়জন সঙ্গী আহত হন। পরে পুলিশই তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। শেখ কামালকে পরে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।[৩]

সিরাজ শিকদারকে গ্রেপ্তারের আয়োজন চলতে থাকে। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা আঁচ করতে পেরে এবং বিভিন্ন সূত্রে সে সংবাদ পেয়ে সিরাজ শিকদার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আরো গোপন অবস্থানে সরে যাবেন। মেজর ডালিমকে সিরাজ শিকদারের বাল্যবন্ধু পুলিশ সুপার মাহবুব বলেছিলেন, সিরাজ শিকদার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধরা পড়বেন।

পুলিশ সুপার মাহবুব মেজর ডালিমকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, সিরাজের দলের এক লোকের কাছে থাকা তালিকায় মেজর ডালিমের নাম পাওয়া গেছে। সিরাজ শিকদারকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল।[৪] তখনকার এক ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার 'ভাগ্নে' এই দলের সদস্যপদ লাভ করেছিল। তার মাধ্যমে সিরাজ শিকদারকে পাঠানো সবগুলো চিঠিই পুলিশের হাতে পৌঁছে যায়। এভাবেই পুলিশ জানতে পারে, চট্টগ্রামে '৭৫-এর ১ জানুয়ারি

তার বৈঠকের কথা।

চট্টগ্রামের হালিশহরে বৈঠকে নির্ধারিত সবাই উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষ হওয়ার আগে নিয়ম ভঙ্গ করে একজন সদস্য বাইরে ঘুরে আসার কথা বলে চলে যায়। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। অথচ নিরাপত্তার কারণে সে বৈঠকে নির্ধারিত হয়েছিল, সকলের আগে 'কুরিয়ার'সহ বেরিয়ে যাবেন সিরাজ শিকদার।[৫]

মিটিংশেষে কুরিয়ারসহ সিরাজ শিকদার একটি বেবিট্যাক্সি ভাড়া করেন। এ সময় তার পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের প্যান্ট, টেট্রনের সাদা ফুলশার্ট, চোখে সানগ্লাস এবং হাতে ব্রিফ্‌কেস। হালিশহরে বৈঠকশেষে যখন তারা বেবিট্যাক্সিতে উঠেছেন, ঠিক সেই সময় একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাদের কাছে 'লিফ্‌ট্‌' চায়। সিরাজ শিকদার তার চাপাচাপিতে আগন্তুককে বেবিট্যাক্সিতে নিতে বাধ্য হন।

পুলিশ চট্টগ্রাম শহর থেকে হালিশহর পর্যন্ত পুরো রাস্তার ওপর কড়া নজর রেখেছিল। বেবিট্যাক্সি যখন নিউমার্কেটের কাছে আসে, তখনই সেই অনাহূত সহযাত্রী লাফ দিয়ে বেবিট্যাক্সির সামনে গিয়ে পিস্তল উঁচিয়ে ড্রাইভারকে থামতে বলে। ড্রাইভার ভয়ে বেবিট্যাক্সি থামিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে স্টেনগান হাতে সাদা পোশাকের পুলিশ ঘেরাও করে ফেলে বেবিট্যাক্সিটি।

ঘটনার আকস্মিকতায় লোকজন জমে যায়। একজন ভদ্রলোকের এই পরিণতির কারণ জানতে চাইলে জবাব দেয়া হয়– সে একজন পলাতক কালোবাজারি। তাই তাকে এভাবেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। বেবিট্যাক্সি আটক করার পর পরই ছয়জন স্টেনগানধারীর একজন এগিয়ে এসে তার চোখ বেঁধে ফেলে এবং হাতকড়া পরিয়ে দেয়। সঙ্গী মহসীনেরও ঘটে একই পরিণতি। গ্রেপ্তারের পর সিরাজ শিকদারকে নিয়ে যাওয়া হয় ডবলমুরিং থানায়। এই থানা থেকেই খবর পাঠানো হয় সর্বত্র। জরুরিভিত্তিতে সেদিন সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম-ঢাকা বিমানে বন্দিদের জন্য আসন সংগ্রহ করা হয়।

সন্ধ্যায় যে বিমানে তাদের ঢাকা নিয়ে আসা হয় সে বিমানটি যাত্রী নিয়ে আসছিল কক্সবাজার থেকে। চট্টগ্রাম পৌঁছার পর, নিয়মভঙ্গ করে ঢাকাগামী যাত্রীদের কয়েকজনকে নেমে যেতে বলা হয়। যাত্রীরা নেমে গেলে একটি বিশেষ গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় বন্দিদের। ককপিটের পরেই, সামনের চারটি আসন 'সংরক্ষিত' হয় তাদের জন্য।

কিন্তু বিমান ছাড়ার সময় ঘটে বিপত্তি। বিমানের পাইলট বন্দি অবস্থায় কোনো

যাত্রীকে বহন করতে অস্বীকার করেন। কিছুটা বাক-বিতণ্ডার পর ঢাকার উদ্দেশে পাড়ি জমায় ওই দিন বাংলাদেশ বিমানের শেষ ফকার বিমান ফ্লাইট। ঢাকা পৌঁছানোর পর পরই তড়িঘড়ি করে নামিয়ে দেয়া হয় যাত্রীদের। তারপর বিমানটিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় হ্যাঙ্গারের কাছে। আগে থেকেই পেছনের গেট দিয়ে আসা পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল সেখানে।

বিমান থেকে নামার সময় আকস্মিকভাবে পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর দৌড়ে এসে তার বুকে লাথি মেরে চিৎকার করে বলেন, 'হারামজাদা, তোর বিপ্লব কোথায় গেল?' এ পর্যায়ে উপস্থিত পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তা হস্তক্ষেপ করে আরো আক্রমণের হাত থেকে সিরাজ শিকদারকে রক্ষা করেন। একজন বলে ওঠেন, এতো অস্থির হওয়ার কিছু নেই, তাকে জায়গামতো নিয়ে ব্যবস্থা করা হবে।'[৬]

বিমানবন্দর থেকে সিরাজ শিকদারকে সোজা নিয়ে যাওয়া হয় মালিবাগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সদর দপ্তরে। সেখানে 'পাগলা ঘণ্টা' বাজিয়ে সতর্ক করে দেয়া হয় সবাইকে। সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়। স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস ঘিরে ফেলে কয়েক শ' পুলিশ।

সিরাজ শিকদারকে যখন গাড়িতে করে নিয়ে আসা হয় তখন সামনে-পিছনে ছিল কড়া প্রহরা। সাইরেন বাজিয়ে সরিয়ে দেয়া হয় রাস্তার লোকজন। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় 'কমিউনিস্ট টাস্ক ফোর্স' এবং 'রক্ষীবাহিনী'র ওপর।[৭]

পুলিশ অফিসাররা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেন সিরাজ শিকদারকে। সিরাজ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তাকে মৃত্যুভয় দেখালে তিনি বলেন, 'সেই মৃত্যুকেই আমি গ্রহণ করবো, যেই মৃত্যু দেশের জন্য এবং গৌরবের মৃত্যু।'[৭]

সিরাজকে জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকার তৎকালীন পুলিশ সুপার মাহবুব উদ্দিন আহমদকে। এই পুলিশ সুপার নির্মমতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। অবাক বিষয়, পুলিশ সুপার মাহবুব ও সিরাজ শিকদার ছিলেন ছোটবেলার বন্ধু। দু'জনই বরিশালে লেখাপড়া করেছেন। কুদরত (মাহবুবের ডাকনাম) এবং সেরা (সিরাজ শিকদার), এই দু'জনের বন্ধুত্বের কথা বরিশাল শহরের অনেকেই জানতেন। জীবনের শেষ প্রহরে সেরা তার বাল্যবন্ধু কুদরতের সঙ্গে আবার মিলিত হলেন- অন্যভাবে।[৮]

সিরাজ শিকদারকে আটকের খবর শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথম দেন পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল ই এ চৌধুরী। ওই সময় ই এ চৌধুরী ছিলেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান কর্মকর্তা। এরপর প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'গণভবনে' ওইদিন বিকালে সিরাজকে নিয়ে কী করা হবে এ বিষয়ে বৈঠক হয়। ই এ চৌধুরী ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম প্রমুখ। এরা সবাই স্থির করেন, তাকে পুলিশ হেফাজতে রাখা ঠিক হবে না। সে কারণে তাকে মালিবাগে পুলিশের বিশেষ শাখা থেকে শেরেবাংলা নগরে 'রক্ষীবাহিনী'র কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই হস্তান্তরের আগে তাকে আনা হয় শেখ মুজিবের সামনে।[৬]

রাত সাড়ে দশটায় পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় সিরাজ শিকদারকে মুখোমুখি করা হয় শেখ মুজিবের। তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেই প্রধানমন্ত্রী তখন আলাপে ব্যস্ত ছিলেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারির সঙ্গে। এ সময় সিরাজ শিকদার প্রশ্ন করেন–

রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাউকে বসতে বলার সৌজন্যবোধ কি আপনার নেই?

সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে একজন পুলিশ সুপার এগিয়ে এসে পিস্তলের বাঁট দিয়ে তার মাথায় আঘাত করেন। গণভবনে কথা কাটাকাটির পর তাকে নিয়ে যেতে বলেন শেখ মুজিব। রাত তখন বারোটা।[৭]

চার

মধ্যরাতেই শোরগোল বেঁধে যায় শেরেবাংলা নগরের তৎকালীন 'রক্ষীবাহিনী' হেড কোয়ার্টারে। তাড়াহুড়ো করে সেখানে আটক অন্য বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্যত্র। সমগ্র এলাকা আলোকিত করে জ্বালিয়ে দেয়া হয় সার্চলাইট। পুরো এলাকা কর্ডন করে ফেলে রক্ষীবাহিনী। সকলের মুখেই গুঞ্জন আর ফিস্‌ফিসানি। তখনও কেউ জানে না কাকে নিয়ে আসা হচ্ছে। রাত সোয়া বারোটায় তৎকালীন 'রক্ষীবাহিনী' অপারেশন-প্রধানসহ হেডকোয়ার্টারে আসেন। এসেই ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার গার্ড থেকে সিরাজ সিকাদারের দলের দু'জন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে হেড কোয়ার্টারে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন।

মহসিনসহ সিরাজ শিকদারকে রাত সাড়ে বারোটায় নিয়ে আসা হয় 'রক্ষীবাহিনী' হেড কোয়ার্টারে। তারপরই একজনকে আরেকজনের কাছ থেকে আলাদা করে

ফেলা হয়। রক্ষীবাহিনী হেড কোয়ার্টারের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশের বিশেষ টিম ও রক্ষীবাহিনীর ১১ ব্যাটালিয়নের 'এসপি কোম্পানি'র ওপর।

সেই রাতের দ্বিপ্রহরে মেজর ডালিম আর কর্নেল নাজমুল হুদা গোপনে 'রক্ষীবাহিনী' প্রধান কর্নেল নূরুজ্জামানের অনুমতি নিয়ে সিরাজ শিকদারকে দেখতে যান। সঙ্গে কিছু ফল ও খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন তারা, কিন্তু কোনো কিছু খাওয়ার অবস্থা তার ছিল না। মৃতপ্রায় অচেতন অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল ঘরের মেঝেতে। কর্নেল হুদা আগে সিরাজ শিকদারকে না দেখলেও মেজর ডালিমের সিরাজের সাথে দেখা হয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু সেই কালরাতে অতিপরিচিত কিংবদন্তি সিংহপুরুষ সিরাজ শিকদারের নির্যাতনে বিকৃত মুখটাকে চিনতে পারেননি মেজর ডালিম। সেই রোমহর্ষক দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করতে না পেরে দুঃখ ও গ্লানির অবর্ণনীয় বেদনা বুকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন দু'জনেই।[১০]

২ জানুয়ারি ভোর পর্যন্ত অভুক্ত অবস্থায় তাকে আটক রাখা হয় রক্ষীবাহিনীর হেড কোয়ার্টারে। ২ জানুয়ারি সকালে সিরাজ শিকদারকে কড়া প্রহরায় নিয়ে যাওয়া হয় সাভারে। চারটি ডজ লরি ও একটি টয়োটা জিপ অনুসরণ করে তাকে।

সাভারে তাকে সারা দিন রেখে দেয়া হয় তৎকালীন রক্ষীবাহিনী ক্যাম্পে। সিরাজ শিকদার রক্ষীবাহিনীর জিম্মায় যখন ছিলেন, তখন তিনি বারবার একটা কথাই বলছিলেন– I know my fate is decided. (আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে)।[১১]

সন্ধ্যার পর পুলিশের কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত হন সেখানে। রাত ৯টার দিকে তাকে আনা হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটু আগে। সেখানেই হাত বেঁধে রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয় বলে অনুমান করা হয়। পার্শ্ববর্তী এলাকায় যারা গুলির শব্দ শুনেছেন, তারা কেউ ভয়ে বের হননি। ভেবেছেন, সে সময়ের নিত্যদিনের মতোই এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। পরদিন অনেকেই রাস্তার ওপর দেখেছেন জমাটবাঁধা ছোপ ছোপ রক্তের দাগ।[১২]

সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়, পুলিশ তাকে নিয়ে অস্ত্রের সন্ধানে সাভারে গিয়েছিল। গাড়ি থেকে লাফিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গুলিতে সিরাজ শিকদার নিহত হন।[১৩]

এ সরকারি ভাষ্য তখন জনগণ ও সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বিশ্বাস করেনি।

সিরাজ শিকদারকে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে পুলিশ হেফাজতে হত্যা করা হয়েছে বলেই ধারণা করা হতো এবং বিনা বিচারে হত্যার জন্য লোকজন সরকারকে দায়ী করতো।[১৪]

পুলিশই সিরাজ শিকদারকে হত্যা করেছিল, সেটা তাদের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্বীকারোক্তিতে ধরা পড়ে। তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসার মইনুল হোসেন চৌধুরী ঢাকা ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে পুলিশের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সিরাজ শিকদারের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, 'কর্নেল সাহেব, আপনাদের আর আমাদের যুদ্ধের মধ্যে তফাৎ এটাই'।[১৪]

মাত্র ৩২ বছর বয়সে এভাবেই আজন্ম বিপ্লব-পিয়াসী এই তরুণের জীবনের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে। সিরাজ শিকদারের লাশ তার মা-বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঢাকার মোহম্মদপুরে তাজমহল রোডের জামে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্থানে পুলিশ পাহারায় তাকে দাফন করা হয়।[১৫] কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও সিরাজ শিকদারের জানাজায় ছদ্মবেশে উপস্থিত হন দুই বেদনাহত সেনা কর্মকর্তা, একজন মেজর ডালিম আরেকজন মেজর নূর চৌধুরী।

সিরাজের মৃত্যুর তিন সপ্তাহ পর ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিব নিজেই জাতীয় সংসদে এক ভাষণে বলেন–'কোথায় আজ সিরাজ শিকদার? তাকে যখন ধরা গেছে, তার সহযোগীরাও ধরা পড়বে।' তিনি যেন এই হত্যাকাণ্ডকে এক ধরনের কৃতিত্ব হিসেবেই বিবেচনা করছিলেন। উল্লেখ্য, সিরাজ শিকদারকে ধরার ক্ষেত্রে তথ্য দিয়ে সহায়তা করায় সরকার অন্ততঃ দু'জনকে বিদেশে পাঠিয়ে পুনর্বাসিত করে।[১৬]

সিরাজ শিকদার হত্যার ফলাফল হয়েছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এই হত্যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জাতীয় রাজনীতির পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে। মেজর নূর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ছাত্র ইউনিয়নে মেনন গ্রুপের সদস্য ছিলেন। পরে তিনি 'সর্বহারা পার্টি'র সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন সিরাজ শিকদারের অনুরক্ত একজন, যিনি এই বিপ্লবীর হত্যার ঘটনায় ক্ষুব্ধ হন।[১৭]

ধারণা করা হয়, শেখ মুজিবের শরীরে 'বার্স্ট ফায়ার' করেন মেজর নূর। শেখ মুজিবের পরিবারের সবাইকে হত্যা করার বিষয়ে জানতে চাইলে পরবর্তী সময়ে মেজর নূর বলেন, 'ওরা আমার নেতাকে খুন করেছে, আমি সবাইকে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছি।'[১৮]

সিরাজ শিকদারের বোন শামীম শিকদার জানান, সিরাজের দেহে গুলির চিহ্ন পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, স্টেনগান দিয়ে বুকে ছয়টি গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সিরাজ শিকদারকে শেখ মুজিবের নির্দেশেই হত্যা করা হয়েছে বলে সারা শহরে রটে গেল। তখন ১৯ বছরের তরুণী শামীম শিকদার, তার ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। সে সর্বহারা পার্টির কাছ থেকে একটা রিভল্ভার পেয়েছিল এবং তার ভাইয়ের হত্যাকারীকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধান করছিল। শামীম বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের একজন।[১৯]

বলাই বাহুল্য, শামীম শিকদার তার মিশনে সফল হতে পারেনি।

এই হত্যাকাণ্ডের পর, 'বাংলার বাণী'র সম্পাদকীয়তে লেখা হয়– 'বিপ্লব করিবার জন্য চারু মজুমদারকে যে কল্পনা বিলাসে পাইয়া বসিয়াছিল তার পরিণতি সকলের জানা থাকার কথা। সিরাজ শিকদারের পরিণতি তাহার চাইতে ভিন্নতর কিছুই হয় নাই........ সিরাজ শিকদার ধৃত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবার পর আশা করা যায়, যাহারা এই দেশে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতাকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারা অতঃপর নিজেদের ভুল ধরিতে পারিয়াছেন।'[১৬]

২০০১ সালে অবমুক্ত করা সি আই এ'র গোপন দলিল যা সিরাজ শিকদার হত্যার তিনদিন পরে গ্রন্থিত হয়েছিলো সেখানে সিরাজ শিকদারকে সন্ত্রাসবাদী নেতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিলো। দলিলে পুলিশের ভাষ্যেরই পুনরাবৃত্তি করে বলা হয় পুলিশের কাছ থেকে পালানোর সময় সিরাজ শিকদার গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। দলিলে উল্লেখ করা হয় ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪-এ ঘোষিত জরুরী অবস্থার পরে সিরাজ শিকদারকে হত্যা সবচেয়ে নাটকীয় এবং উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দলিলে আরো বলা হয়, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বন্ধে সরকারের সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে আরো বেশী ক্র্যাক ডাউন করা উচিত। সি আই এ'র গোপন দলিলে এটা স্পষ্ট যে সি আই এ দৃশ্যত সিরাজ শিকদারের হত্যাকাণ্ডে উৎফুল্ল হয়ে সরকারকে আরো বেশী এমন ঘটনা ঘটানোর জন্য উৎসাহ দিয়েছিলো। তবে দলিলের শেষে এই আশংকাও প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, সিরাজ শিকদারের হত্যাকাণ্ড সরকারের জন্য কাউন্টার প্রোডাক্টিভ হতে পারে, কারণ নানা দলে ও উপদলে বিভক্ত সন্ত্রাসবাদীদের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য সিরাজ শিকদারের শহীদি ইমেজ কাজ করতে পারে।[২০]

সূত্র:

১. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৪২

২. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১০৭

৩. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ৬৫

৪. যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি; রাষ্ট্রদূত লে. কর্নেল (অব.) শরিফুল হক ডালিম বীরউত্তম, অনলাইনে প্রকাশিত ই-বুকের পৃষ্ঠা: ৫০২

৫. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৪২

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৩

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৪

৮. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৫৫

৯. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৯৬

১০. জিয়া থেকে খালেদা জিয়া অতঃপর; কর্নেল (অব.) শরিফুল হক ডালিম বীরউত্তম, অনলাইনে প্রকাশিত ই-বুকের পৃষ্ঠা: ১৮

১১. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১০১

১২. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৪৫

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৬

১৪. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা: ৬৪

১৫. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৫৫

১৬. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৯৭

১৭. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৭৪

১৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৭৫

১৯. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৫২

২০. CIA-RDP79T00865A000100040001-7

চৌদ্দ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

রক্ষীবাহিনী

অফিসারদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল ভারত এবং ভারতীয়দের হাতে।[১৫]

নির্মম নির্যাতন ও হাজারো মানুষ হত্যার দায় রয়েছে।[২৬]

সৈয়দ আলী আহসান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। সাভারে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পশ্চিমাঞ্চলের কয়েক একর জমি রক্ষীবাহিনীদের জন্য সরকারীভাবে অধিগ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে পানির কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের একটি সমঝোতা হয় যে, প্রতিদিন সকালে এক ঘন্টার জন্য, বিকেলে এক ঘন্টার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বাসস্থানের কাছে যে পানির ট্যাঙ্কটি আছে সেখান থেকে রক্ষীবাহিনীরা পানি পাবে। অতর্কিতে একদিন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর কয়েকজনের গোলযোগ বাধে এবং রক্ষীবাহিনীর লোকেরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন চতুর্থ

শ্রেণীর কর্মচারীকে বেঁধে নিয়ে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অফিস এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়, ভিসি অফিসের ত্বরিত হস্তক্ষেপে লোক দুজন উদ্ধার পেল।

সৈয়দ আলী আহসানের সাথে রক্ষীবাহিনীর দুজন অফিসার সৌজন্য সাক্ষাৎকারে এলেন। তারা উভয়ই সুদর্শন এবং আকৃতি ও অবয়বে অবাঙ্গালি বলে সৈয়দ আলী আহসানের মনে হলো। পরিচয় দেয়ার পরে সৈয়দ আলী আহসান জানলেন যে তারা দুজনেই ভারতীয়; একজন কুর্গের,অপরজন মহারাষ্ট্রের।[৪৭]

৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, রাত্রি ভোর না হতেই 'রক্ষীবাহিনী' ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী কমিউনিস্ট নেতা শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেনকে ঘুম থেকে তুললো। ১৯৭১-এ শান্তি সেন দেশের ভিতরে থেকেই পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে এক বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম রচনা করেন। অরুণা সেনকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এলে তিনি দেখলেন সেখানে তার পুত্রবধূ রীনাও রয়েছে। তাদের নিয়ে তারা প্রায় দুই মাইল দূরে ভেদরগঞ্জ রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে রওয়ানা হলো। রাস্তায় রীনার প্রতি তারা নানা অশ্লীল উক্তি করছিল। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখলেন সেখানে প্রতিবেশী কলিমদ্দি, মোস্তফা, গোবিন্দ নাগ ও হরিপদ ঘোষও রয়েছে। চেহারা দেখেই বোঝা গেল তাদের ওপর গুরুতর দৈহিক নির্যাতন হয়েছে। বিশেষ করে কলিমদ্দি ও মোস্তফাকেই বেশি অসুস্থ দেখা গেল। কলিমদ্দি, মোস্তফা– দুই ভাই। এদের সংসারে আর কোনো সক্ষম ব্যক্তি নেই। অপরের জমি চাষ করে এরা কোনোমতে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের রয়েছে স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ে।

ক্যাম্পে আসতেই অনেক রক্ষীবাহিনী সদস্য এসে বন্দিদের ঘিরে দাঁড়ালো। শুরু হলো রীনার ওপর অপমান-বৃষ্টি। কেউ অশ্লীল মন্তব্য করে, কেউ চুল ধরে টানে, কেউ চড় মারে, কেউ খোঁচা দেয়– এমনই সব বর্বরতা। বন্দিদের রোদের মধ্যে বসিয়ে রেখে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় তাদের একটি কামরায় ঢুকালো। অনেক রাত্রিতে রীনাকে তারা দোতলায় নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই শোনা গেল রীনার হৃদয়বিদারী চিৎকার। প্রায় আধ ঘণ্টা পর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে থেমে গেল। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে রীনাকে গভীর রাতে তারা

এনে কামরার মধ্যে ফেলল। রীনার অর্ধচেতন দেহ বেতের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। রক্ত ঝরছে। রীনার জ্ঞান ফিরলে পানি চাইল। রীনা আস্তে আস্তে কথা বলতে পারলো। রাত্রি তখন ভোর হয়ে এসেছে।
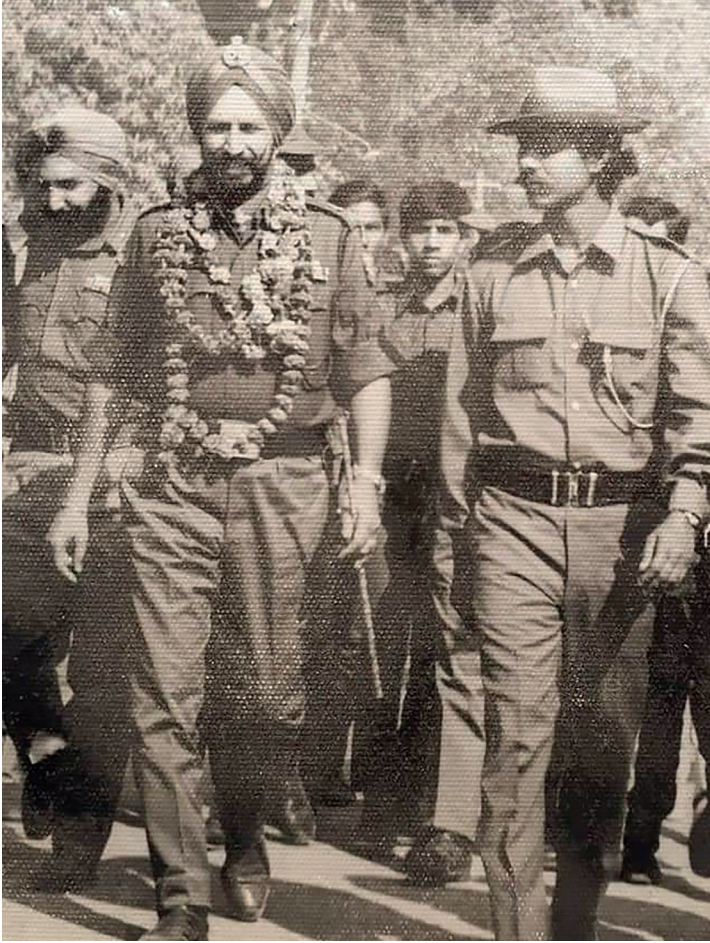
চিত্র-কথন:

***১৯৭১** এ ঢাকায় জেনারেল অরোরার বায়ে কাদেরিয়া বাহিনীর কমান্ডার আনোয়ারুল আলম শহীদ, যিনি পরিবর্তিতে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উপপ্রধান হন।*

***ফটো ক্রেডিট:** সংগৃহীত*

রীনাকে নির্যাতনের সময় দোতলায় ভেদরগঞ্জ ও ডামুড্যার আওয়ামী লীগ সম্পাদকরা এবং এই দুই স্থানের ক্যাম্প কমান্ডাররা উপস্থিত ছিল। তারা শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায় আছে, তাদের ধরিয়ে দিতে বলে এবং অস্ত্র কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করে। রীনা কিছুই জানে না বলায় তাকে এমন সব অশ্লীল কথা বলে, যা কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে বলা তো দূরের কথা, কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসা ও গালি দেয়ার পর ভেদরগঞ্জ ক্যাম্পের কমান্ডার বেত নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এলোপাতাড়ি এমনভাবে পিটাতে থাকে যে, পর পর তিনখানা বেত ভেঙে যায়। আবার জিজ্ঞাসা করে শান্তি সেন ও চঞ্চল কোথায়? অস্ত্র কোথায়? রীনার একই উত্তর। ক্ষিপ্ত হয়ে রীনাকে তারা সিলিংয়ের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় এবং দুই কমান্ডার দুদিক থেকে একসঙ্গে চাবুক চালাতে থাকে।

মারার সময় রীনা বলেছিল 'আমাকে এভাবে না মেরে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলুন'। জবাবে তারা বলে, 'সরকারের একটা গুলির দাম আছে, তোকে সাত দিন ধরে পিটিয়ে মেরে ফেলবো। অল্প পরেই রীনা অচেতন হয়ে যায়। কিন্তু তারা ওই দেহের ওপরেই চাবুক চালাতে থাকে। জ্ঞান ফিরে এলে রীনা দেখে যে, সে মেঝের ওপর পড়ে আছে। পানি চাইলে তাকে পানিও দেওয়া হয়নি।[১]

কমরেড শান্তি সেনের স্ত্রী রক্ষীবাহিনীর কাছে আটক হওয়া ও নির্যাতন নিয়ে এরকম একটি লিখিত বিবৃতি দিয়েছিলেন। সেই সময়ে এই বিবৃতি দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

১৯৭১ সালের **২৫** মার্চ তারিখে ঢাকা রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যে পুলিশ বাহিনী পাক দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলে বীরত্বের ইতিহাস রচনা করেছিল, সেই পুলিশ বাহিনীর বড় অংশই মুক্তিযুদ্ধশেষে স্বাধীন দেশে ফিরে আগের পেশায় থাকতে উৎসাহ বোধ করলো না।

৭৫১ জন পুলিশ সদস্য স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিয়েছিলেন। এসব কারণে স্বাধীনতার পরে সুসংগঠিত একটি বাহিনী হিসেবে পুলিশকে দ্রুত পুনর্গঠিত করা যায়নি। কর্তব্য সম্পাদন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রও তাদের হাতে ছিল না। এদিকে দলীয়
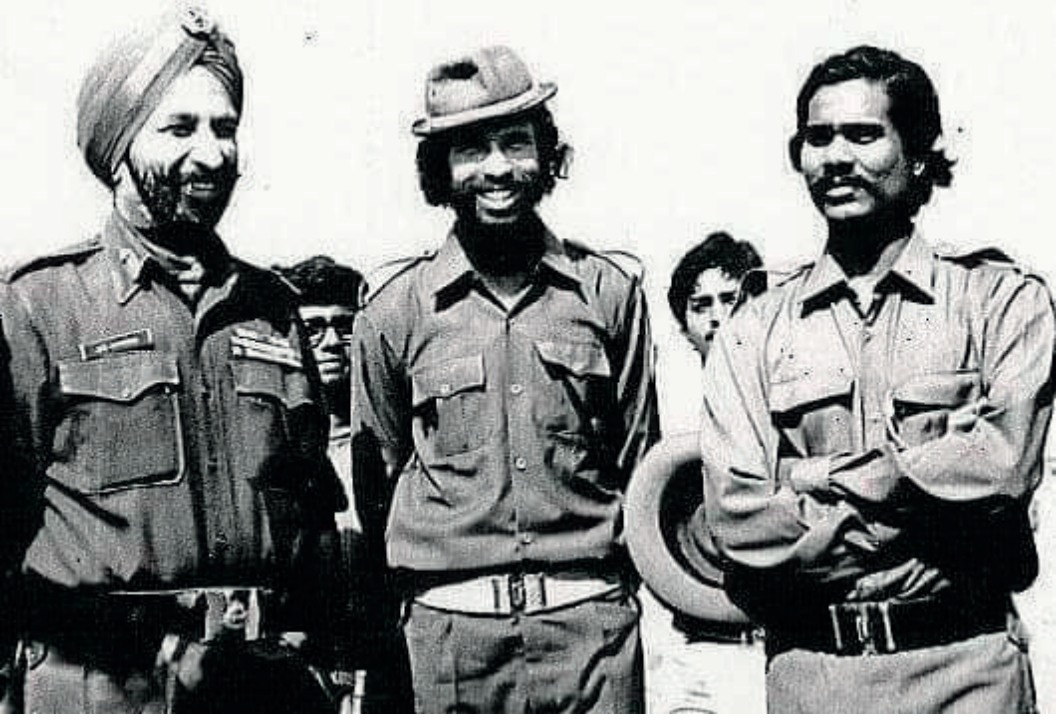
চিত্র-কথন:

মিত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল অরোরা ও কাদের সিদ্দিকীর সাথে মুক্তিযুদ্ধকালীন টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীর বেসামরিক প্রধান আনোয়ার উল আলম শহীদ। রক্ষীবাহিনীতে তিনি লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদায় উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ বাহিনী বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হলে তিনি সেনাবাহিনীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পুনর্নিয়োগ পান। পরবর্তীতে তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং বিদেশে বাংলাদেশ মিশন ও দূতাবাসে কূটনীতিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ফটো: সংগৃহীত

‘ক্যাডার’ ও দুর্বৃত্ত কিংবা বিপথগামী মুক্তিযোদ্ধারা যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো সেগুলো ছিল পুলিশের অস্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নতমানের। স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত চোরাচালানের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চোরাচালান ছিল স্বাভাবিক ঘটনা।[২]

সে পরিস্থিতিতে দুর্বল বেসামরিক প্রশাসনের জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্যের দরকার ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীকে বেসামরিক কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে আওয়ামী লীগ সরকার আগ্রহী ছিল না। কারণ, যুদ্ধকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর আচরণের অভিজ্ঞতা ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সময় ধরে লালিত বিশ্বাসে তারা মনে করতো,

প্রাতিষ্ঠানিক কোনো সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ চালানো সম্ভব। পাকিস্তান আমলে বিপুল সম্পদ সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দ হতে দেখে আওয়ামী লীগ মনে করেছিল যে, বড় একটি সামরিক বাহিনী লালন করা বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ও দরিদ্র একটি দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। এছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের 'নিয়মিত' ঘটনা দেখে আওয়ামী লীগ নেতারা সামরিক বাহিনীর মতো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীনদের জন্য একটি 'হুমকি' হিসেবেই মনে করতেন।

এদিকে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল বাংলাদেশে বড় আধুনিক সামরিক বাহিনী প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল যে, বাংলাদেশের ওপর যেকোনো আগ্রাসনের সময় ভারতের সক্রিয় সাহায্য পাওয়া যাবে। ভারতের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে প্রায়ই বলা হতো যে, বাংলাদেশের গোটা সম্পদ জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যই ব্যয় হওয়া উচিত।

নতুন সরকারের সামরিক বাহিনী সম্পর্কে এমন বিবেচনা ও ভারতীয় ইচ্ছার সমীকরণে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন একটি আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছিল যে, স্বাধীনতার পর পর শান্তিরক্ষার কাজটা খুব চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই শান্তিরক্ষার সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী 'রক্ষীবাহিনী' জাতীয় একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কলকাতায় প্রবাসী সরকারের চিন্তায় স্থান করে নিয়েছিল।

এই আধা-সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য হবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা এবং প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকে সাহায্য করা। কিন্তু এই বাহিনী থাকবে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। এই বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে।[৩]

ভারতীয় উপদেষ্টা এবং সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

ভারতীয় সামরিক বাহিনী যেদিন বাংলাদেশ থেকে চলে যায়, সেদিন থেকেই

'রক্ষীবাহিনী' মোতায়েন করা হয়।[৪]

একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তেমন আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিল না।[৫]

এটা খুব কৌতূহলোদ্দীপক যে, আইন প্রণয়নের আগেই 'রক্ষীবাহিনী' তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারির মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়। 'রক্ষীবাহিনী' প্রধানত যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তা হলোঃ বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার, সীমান্তে চোরাচালান রোধ, পণ্যের অবৈধ গুদামজাতকরণ ও কালোবাজারি বন্ধ এবং চূড়ান্তভাবে সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা।[৬]

চার

'রক্ষীবাহিনী' নামটা অবশ্য প্রথমে ছিল না। এই বাহিনীর জন্য প্রথমে নাম ভাবা হয়েছিল ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স, ন্যাশনাল গার্ড, আর্মড পুলিশ ইত্যাদি। বাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকেই সুপারিশ আসে, যেন নামটা বাংলায় হয়। শেষ পর্যন্ত সরকারও বাংলা নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। অনেক আলোচনার পর নতুন বাহিনীর নাম ঠিক করা হয় 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' (জেআরবি)।[৭]

এই বাহিনীর প্রায় সকলেই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। একটা বড় অংশ ছিল 'মুজিববাহিনী'র। বাকিরা 'কাদেরিয়া বাহিনী'র সদস্য।

'রক্ষীবাহিনী' গড়ে উঠেছিল একই সঙ্গে সরকার প্রধানের এমন এক 'নিজস্ব' প্রহরীদল হিসেবে, যাদের কার্যক্রম ছিল ঝড়ো পুলিশের মতো এবং তৈরি হচ্ছিল 'বিকল্প সেনাবাহিনী'র আদলে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব যখন ভারতীয়দের হাতে তখন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠনের কাজটি দেশের নিজস্ব ব্যবস্থাপনাতেই হচ্ছিল। এই বৈপরীত্য ছিল বিস্ময়কর ও প্রশ্নবোধক।

আরো বিস্ময়কর ছিল, পরিকল্পিতভাবেই রক্ষীবাহিনীকে রাখা হয়েছিল প্রধানমন্ত্রীর অধীনে; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়। এই বাহিনীর পোশাক রাখা হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো। আবার রক্ষীবাহিনীর

মহাপরিচালক কর্নেল নূরুজ্জামান 'বাকশাল'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ১১২ নম্বর সদস্য ছিলেন।[৮]

ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে পোশাকের ব্যাখ্যা হিসেবে রক্ষীবাহিনীর উপ-প্রধান জানান, বাহিনীর জন্য প্রথম পোশাকের চালান আসে ভারত থেকে। দুই ধরনের পোশাক পাঠায় ভারত। একটা খাকি পোশাক, আরেকটা জলপাই রঙের পোশাক। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পোশাক যেহেতু খাকি রঙের ছিল, তাই কেউ এই পোশাক নেয়নি। জলপাই রঙের পোশাকই রক্ষীরা বেছে নেয়। পরবর্তী সময়ে এই পোশাকই 'রক্ষীবাহিনী'র পোশাক হিসেবে গৃহীত হয়।

অনেকেই মনে করতো, যেহেতু ভারতীয় সেনারা একই পোশাক ব্যবহার করে তাই এই বাহিনীর পোশাকে ভারতীয় সেনার অনুপ্রবেশ ঘটবে।[৯] রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকে আরো যুক্তি ছিল, আমাদের প্রতিবেশী মিয়ানমারের সেনাবাহিনীও সামরিক পোশাক হিসেবে জলপাই রঙের কাপড় ব্যবহার করে।[১০]

আবার কোনো কোনো মহল বলতো, 'রক্ষীবাহিনী'র সদস্যদের বেশির ভাগই ভারতীয়। কারণ, 'রক্ষীবাহিনী'র সদস্যদের মতো কালো মানুষ বাংলাদেশে নেই'।[১১]

তবে 'রক্ষীবাহিনী'র পোশাক থেকে জলপাই রঙ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। রক্ষীবাহিনীর দ্বিতীয় ব্যাচের সদস্যদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজের সময় সরকার স্পষ্টতই ঘোষণা করেছিল যে, পোশাকের রঙ যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করা হবে। দ্বিতীয় ব্যাচের কুচকাওয়াজ উপলক্ষে স্যুভেনিরেও এর উল্লেখ ছিল। বাহিনীর চতুর্থ ব্যাচের সদস্যদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনিরেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর পোশাকের রঙ হবে ধূসর নীল।[১২] ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত হয়েছিল, অথচ কোনো 'অজানা কারণে' তার জলপাই রঙের পোশাক পরিবর্তিত হয়নি।

'মুজিববাহিনী'র প্রধান প্রশিক্ষক জেনারেল উবানের পরামর্শ ও সহায়তায় 'রক্ষীবাহিনী' গঠিত হয় বলে জেনারেল উবান দাবি করেছিলেন। এমনকি তিনি এটাও দাবি করেছিলেন যে, রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের ভারতে নিয়ে প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম দেবার বিষয়ে তিনিই ভারত সরকারকে রাজি করিয়েছিলেন।[১৩]

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তৎকালীন মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের মাধ্যমেই 'রক্ষীবাহিনী'র প্রধানতম প্রশিক্ষক হিসেবে জেনারেল উবানের

নিযুক্তি ঘটেছিল, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে উবানের পদমর্যাদা ছিল 'প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপদেষ্টা'।[১৪]

চিত্র-কথন:

রক্ষীবাহিনীতে লোক নিয়োগের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন। পত্রিকার প্রথম পাতায় চার কলাম জুড়ে ছিলো এই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি ছাপা হয়েছিলো **১৯৭৫** *সালের জুলাই মাসে।*

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

চিত্র-কথন: রাজনৈতিক প্রতিপক্ষবিনাশী রক্ষীবাহিনী

মুজিব আমলের গণবিরোধী কুখ্যাত 'রক্ষীবাহিনী'। পুরো নাম জাতীয় রক্ষীবাহিনী (জেআরবি)। নামে জাতীয় রক্ষীবাহিনী হলেও এটা মূলত ছিল ফ্যাসিবাদী সরকার ও শাসকগোষ্ঠীকে তাদের জনপ্রিয় গণভিত্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের হাত থেকে অরাজনৈতিকভাবে, অগণতান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে 'সুরক্ষা' দেয়া, 'নিরাপদ' করে তোলা।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে যাত্রা শুরুর পরবর্তী অন্তত অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাসে সবচাইতে গণধিকৃত রাষ্ট্রীয় বাহিনী এই রক্ষীবাহিনী। মুজিব সরকারের অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রতিবাদী ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে নির্মূল করাই ছিল এই বিশেষ বাহিনীর মূল লক্ষ্য ও দায়িত্ব। অগণন মানুষকে অবর্ণনীয় নির্যাতন আর হাজার হাজার মানুষ হত্যার দায় রয়েছে এদের।

রাষ্ট্রীয় নিয়মিত বাহিনী বলা হলেও নিয়মিত বাহিনীর শর্ত পূরণ করা হয়নি। মুজিব সরকারের বিবেচনা ও ভারতীয় ইচ্ছার সমীকরণে এই আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু 'রক্ষীবাহিনী'কে প্রতিরক্ষা কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে না দিয়ে রাখা হয়েছিল সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের অধীনে। গড়ে উঠেছিল প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব রাষ্ট্রীয় বাহিনী হিসেবে এবং তৈরি হচ্ছিল 'বিকল্প সেনাবাহিনী'র আদলে।

এই বাহিনীর উর্দি বা ইউনিফর্ম রাখা হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো। জনমনে ক্রমশ ধারণা তৈরি হয়েছিল যে, যেহেতু ভারতীয় সেনাবাহিনী একই রকম জলপাই রঙের উর্দি বা পোশাক ব্যবহার করে, তাই এই পোশাকে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটবে। এমন ধারণাও ছিল যে, রক্ষীবাহিনীর বেশির ভাগ সদস্যই ভারতীয়।

সংযুক্ত আলোকচিত্রটিতে অবিকল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মতো উর্দি পরিহিত রক্ষীবাহিনীর একজন সৈনিককে দায়িত্বে নিয়োজিত দেখা যাচ্ছে, যার হাতে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, যেটা সেল্‌ফ্ লোডিং রাইফেল (এসএলআর) কিংবা কালাশ্‌নিকভ্ রাইফেল (একে-৪৭) হিসেবে পরিচিত।

ছবিতে রক্ষীবাহিনীর এই সৈনিককে খাদ্যশস্যবাহী একটি ট্রাকের উপর প্রহরারত দেখা যাচ্ছে, যা ওই সময়ের খাদ্য সংকট ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতির চিত্র তুলে ধরেছে। সরকারদলীয় ক্যাডারদের দ্বারা খাদ্যবোঝাই ট্রাক ছিনতাই হচ্ছিল, আর ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের হাতে খাদ্যশস্য লুট হওয়ার ভয় ছিল।

*মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারতীয় পরামর্শে কলকাতায় প্রবাসী সরকার এই বাহিনী গড়ে তুলবে বলে ঠিক করেছিল। ভারতীয় উপদেষ্টা ও সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় **১৯৭২** সালের ফেব্রুয়ারির শুরুতেই দায়িত্ব পালনে মোতায়েন করা হয় রক্ষীবাহিনীকে। 'মুজিববাহিনী'র প্রশিক্ষক ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল উবান ছিলেন এই বাহিনীর প্রধানতম প্রশিক্ষক।*

বাহিনীর অফিসার এবং কখনো জেসিও-দেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ভারতে। আর সাধারণ সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ঢাকার সাভারে। কয়েকটি বিশেষ জেলার লোকদেরই এখানে নিয়োগ করা হতো। বিশেষত 'মুজিববাহিনী' আর

টাঙ্গাইলের 'কাদেরিয়া বাহিনী'র জন্য রক্ষীবাহিনীর দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

এদের দেয়া হয়েছিল সীমাহীন গণবিরোধী ক্ষমতা আর নজিরবিহীন 'ইনডেম্‌নিটি' বা দায়মুক্তি; যার বদৌলতে তারা দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি– শেষ পর্যন্ত কোনো কাজে আসেনি সরকার প্রধানের এই নিজস্ব রাষ্ট্রীয় বাহিনী। '৭৫-এর ১৫ আগস্টের প্রত্যুষে কয়েক হাজার সৈনিকসহ রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে শুরুতেই আত্মসমর্পণ করেছিল এই বাহিনী। আর প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের বাসভবনে প্রহরারত রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরা কোনো রকম 'বিপদের ঝুঁকি' না নিয়ে প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করেছিল।

ফটো ক্রেডিট: স্টিভ্ রেমার/ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

'রক্ষীবাহিনী'র অন্যান্য প্রশিক্ষক হিসেবেও এক বিশেষ চিন্তার ও রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় শিবিরে 'মুজিববাহিনী'র প্রশিক্ষকদের মধ্যে যারা সমাজতন্ত্র-বিরোধী মনোভাবাপন্ন ছিলেন বলে দেখা যায়, তাদেরই বাছাই করে রক্ষীবাহিনীর প্রশিক্ষক করা হয়। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি অদ্ভুত ব্যাপার ছিল– এর অফিসারদের এবং ক্ষেত্রবিশেষে সুবেদারদেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ভারতে এবং সৈনিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো ঢাকার সাভারে।[১৫]

'রক্ষীবাহিনী'তে লোক নিয়োগে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কয়েকটি বিশেষ জেলা ছাড়া অন্য এলাকার লোকদের 'রক্ষীবাহিনী'তে নেয়া হতো না। বিশেষ করে টাঙ্গাইলের 'কাদেরিয়া বাহিনী'র জন্য 'রক্ষীবাহিনী'র দ্বার উন্মুক্ত ছিল।[১৬]

'রক্ষীবাহিনী'র সাফল্য বর্ণনা করার সময়ও এই বাহিনীর আক্রমণের লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। রক্ষীবাহিনীর সাবেক এক শীর্ষ কর্মকর্তা কাজের সাফল্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'রক্ষীবাহিনীর অভিযানের ফলে দেশের সন্ত্রাসী দলগুলো, বিশেষ করে নক্‌শাল বাহিনী, সর্বহারা, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল), সাম্যবাদী দল ও জাসদের 'গণবাহিনী'র তৎপরতা অনেকটা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।'[১৭] অর্থাৎ, মূলত বামপন্থিদের বিরুদ্ধেই 'রক্ষীবাহিনী'র অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

এই বাহিনী গঠনের সময় বলা হয়েছিল, 'দক্ষ মুক্তিযোদ্ধাদের দেশের কাজে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে' রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি। অথচ পরিচালকদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে নেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে থেকে, আনোয়ার-উল-আলম শহীদকে নেয়া

হয় 'কাদেরিয়া বাহিনী' থেকে এবং সারোয়ার হোসেন ছিলেন 'মুজিববাহিনী'র মাদারীপুর অঞ্চলের একজন কমান্ডার। বাকি গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক অধিকাংশই ছিলেন পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক অফিসার। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারগোষ্ঠী থেকে কর্নেল নূরুজ্জামান ব্যতীত কারোই ঠাঁই হয়নি রক্ষীবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিসরে।[১৮]

তবে এটাও ঠিক যে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদস্থ সেনা কর্মকর্তা ছিলেন সর্বসাকুল্যে **১৮-১৯** জন। স্বাধীনতার আগে একজন ছাড়া তারা সবাই 'মেজর' ছিলেন। কিছুসংখ্যক সেনা কর্মকর্তাকে তখন নবগঠিত বাংলাদেশ রাইফেল্স-এ নিয়োগ দিতে হয়। ফলে রক্ষীবাহিনীতে এ এন এম নূরুজ্জামান ছাড়া আর কোনো সেনা কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানী রাজি ছিলেন না।[১৯]

পাঁচ

'রক্ষীবাহিনী' কাজ শুরু করলো। কাজ শুরুর পরেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে রক্ষীবাহিনীর পক্ষপাতমূলক আচরণ সকলের নজরে আসতে থাকে। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীকে বঞ্চিত করে রক্ষীবাহিনীকে সরকার উন্নত বেতন, খোরাক, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে বলে প্রচারণা শুরু হয়।[২০]

সামরিক বাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মানসিক দূরত্ব থাকলেও 'রক্ষীবাহিনী'র কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকলেই একমত পোষণ করতেন। সকল সদস্যেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, রক্ষীবাহিনীর বাজেট প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে অনেক বেশি। এবং রক্ষীবাহিনীর রসদ থেকে শুরু করে সকল সরঞ্জামের সুবিধা অন্যান্য বাহিনীর চেয়ে ভালো ছিল বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো।[২১]

যদিও 'রক্ষীবাহিনী'র সদস্যদের বেতনের স্কেল এবং খাবার ও পোশাকের সুবিধা ছিল পুলিশের মতো, যা ছিল সেনাবাহিনীর চেয়ে অনেক কম।[২২] **১৯৭৩-৭৪** অর্থবছরে রক্ষীবাহিনীর বাজেট ছিল সর্বসাকুল্যে ৯ কোটি টাকা এবং সেই সময় সেনাবাহিনীর বাজেট ছিল ৯২ কোটি টাকা, যা আবার বাড়িয়ে **১২২** কোটি টাকা করা হয়েছিল।[২৩]

১৯৭৫ সালের **১৫** আগস্টের মর্মান্তিক ঘটনার পর 'রক্ষীবাহিনী'কে তার সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদসহ যখন সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয়, তখন কী

দেখা গেল? 'রক্ষীবাহিনী'র হাতে তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদই নেই। অস্ত্রের মধ্যে ছিল এসএমজি, অত্যাধুনিক রাইফেল, এলএমজি ও কয়েকটি মর্টার।[২৪]

'রক্ষীবাহিনী' সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে এক বিশেষ রাজনৈতিক বাহিনী হিসেবে অবর্ণনীয় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তারা গুম, গ্রেপ্তার, নির্যাতনের এমন সব রেকর্ড তৈরি করে, যা আগের সমস্ত নজিরকে ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭৫-এ রক্ষীবাহিনী বিলুপ্ত করার পর ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর একটি ক্যাম্প উঠে গেলে সেখানে গণকবর আবিষ্কার হয়। সেখানে ৬০টি নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। অনুমান করা যায়, এই হতভাগ্যরা রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন।[২৫]

বিশিষ্ট বামপন্থি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী হায়দার আকবর খান রনো রক্ষীবাহিনীর হাতে দশ হাজারের বেশি কমিউনিস্ট, বামপন্থি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন।[২৬]

১৯৭৪ সালের ২৫ জানুয়ারি 'দৈনিক গণকণ্ঠ'তে প্রকাশিত জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তরের বিবরণে দেখা যায়, কেবল ১৯৭৩ সালে রক্ষীবাহিনী ৪ হাজার ১৯৬ ব্যক্তিকে আটক করেছিল।[২৭]

কালীগঞ্জে রক্ষীবাহিনীর দু'টি ক্যাম্প ছিল। একটি কালীগঞ্জ বাজারে, অপরটি ছিল গাজীর হাটে (কালার বাজার নামেও পরিচিত)। আর এগুলো নিয়ন্ত্রিত হতো পার্শ্ববর্তী ঝিনাইদহের নারিকেলবাড়িয়া থেকে। সেখানে ছিল রক্ষীবাহিনীর বড় একটি ক্যাম্প। কালার বাজারে রক্ষীবাহিনী গণকবরস্থান গড়ে তুলেছিল। এখানে ২০-২৫ গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে শুয়ে পড়তে অর্ডার দেয়া হতো। তারপর সে সব মানুষের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত রক্ষীবাহিনীর সৈনিকরা। নক্‌শালদের প্রতি সহানুভূতি থাকার দায়ে এ শাস্তি দেয়া হতো গ্রামবাসীদের।[২৮]

রক্ষীবাহিনী অনেক তুচ্ছ ঘটনায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনরোষ বয়ে এনেছিল। যেমন, ১৯৭৩ সালের ২৯ জুন চট্টগ্রামে ইস্টার্ন রিফাইনারির একটি বাস এই বাহিনীর একটি লরিকে ওভারটেক করলে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ওই গাড়ি ঘেরাও করে তাতে গুলিবর্ষণ করে। এতে একজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় অনেকে।[২৯]

সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, 'দুষ্কৃতকারী' এবং 'রাজনৈতিক

চিত্র-কথন:

মুক্ত ফুলগাজীতে ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড-প্রধান লে.জে. জগজিৎ ও অরোরার সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম। মুক্তিযোদ্ধাদের গুণগত মান নিয়ে তিনি বলেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের মান নয় সংখ্যা বাড়ানোই লক্ষ্য ছিলো।

ফটো: সংগৃহীত

প্রতিপক্ষ' অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং একপর্যায়ে কথিত 'ভুয়া রেশনকার্ড' উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে।[৬]

তারা যেকোনো বাড়িতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারতো। দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী-শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে আটক রাখতে পারতো। প্রতিটি অপারেশনের পর তারা জনগণ থেকে আরো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং জনমনে ক্রমশ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়।[৬]

কোনো আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিল দুঃসাধ্য। এর

প্রধান কারণ, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ ধরনের সংস্থার মতো নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিল না।[৬]

রক্ষীবাহিনীর যেকোনো সদস্য বা অফিসার বিনা ওয়ারেন্টে কেবলমাত্র সন্দেহবশত আইনের পরিপন্থি তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে যেকোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার, যেকোনো ব্যক্তি-স্থান-যানবাহন-নৌযান ইত্যাদি তল্লাশি এবং আইনশৃঙ্খলাবিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, শুধুমাত্র এমন সন্দেহে যেকোনো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারতো।[৩০]

উপরন্তু রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের নজীরবিহীন 'ইনডেমনিটি' বা 'দায়মুক্তি' দেয়া হয়েছিল। যার অর্থ– সদস্যরা তাদের যেকোনো কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এ নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।[৩০]

যখন তারা মফঃস্বল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করতো নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য তখন জেলা প্রশাসন কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে 'আগমনী রিপোর্ট' দেয়ার প্রয়োজন মনে করতো না।[৩১]

আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচরণবিধি ছিল না। নিজেদের কাজকর্মের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতেন না। কোনো গ্রেপ্তার কিংবা তল্লাশির রেকর্ডও তারা রাখতেন না। তাহলে তারা কীভাবে কাজ করছেন– আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লিডার হাফিজ উদ্দিন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'আমরা যেভাবে কাজ করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি।' প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন জানিয়েছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের হিসাবের জন্য কোনো রেজিস্টারও তাদের ছিল না।[৩২]

নিজেদের এরা 'অপরাজেয় শক্তি' মনে করতো। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে খুশি সেখানে শিবির স্থাপন করতো। সন্দেহভাজন লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে আসতো। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যেকোনো রকম নির্যাতনের পন্থা অবলম্বন করতো। কোনো রসিদ না দিয়ে তল্লাশিকালে তারা জনগণের সম্পত্তি জব্দ করার নামে হরণ করতো। ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করতো ঘড়ি, ট্রানজিস্টার বা রেডিওসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। এমন খবরও পাওয়া যায় যে, বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তারা টাকা

গুলী করে হত্যা করা হবে

দালালদের খেসারত দিতেই হবে : মুজিব

বিপুল সম্বর্ধনা

চিত্র-কথন:

স্বাধীন বাংলাদেশে বিনা বিচারে হত্যার সংস্কৃতি কে চালু করেছে তা নিয়ে রাজনৈতিক শিবিরে নানা বয়ান চালু আছে। আওয়ামী লীগ বলার চেষ্টা করে বিনা বিচারে হত্যার জন্য মূল অভিযুক্ত বাহিনী র‍্যাব যেহেতু খালেদা জিয়ার আমলে তৈরি তাই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে বিনা বিচারে হত্যাকাণ্ড শুরুর দায় খালেদা জিয়ার।

ইতিহাস বলে, বিনা বিচারে হত্যার ইঙ্গিত শেখ মুজিবই প্রকাশ্যে দেন এবং তা জাতীয় দৈনিকে ফলাও করে প্রচার করাও হয় স্বাধীনতার মাত্র কয়েকমাস পরেই।

১৯৭২ সালের ২২ জুন নোয়াখালীতে শহীদ ভুলু স্টেডিয়াম প্রায় ৭ লাখ লোকের এক সমাবেশে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন, "সমাজবিরোধীরা যদি তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে"। ১৯৭২ সালের ২৩ জুন প্রকাশিত 'দৈনিক পূর্বদেশ'-এর প্রতিবেদনে শেখ মুজিবের সেই বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

এই ঘোষণা ছিলো শেখ মুজিবের অধীনস্ত মিলিশিয়া রক্ষী বাহিনীর হাতে হাজার হাজার মানুষকে বিনা বিচারে হত্যার পূর্বাভাষ।

ফটো: সংগৃহীত

সংগ্রহ করতো। গৃহস্থের ঘরে গিয়ে নিয়ে আসতো হাঁস-মুরগি। কোনো লোক তাদের কাজকর্মের বিরোধিতা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করে তার লাশ নদীতে নিক্ষেপ করতো।[৩২]

সরকারের বিরোধী যে কাউকে তারা 'দেশবিরোধী' বলে সাব্যস্ত করতো এবং এভাবে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে তারা। ফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের একটি 'ফ্যাসিস্ট বাহিনী' হিসেবেই রক্ষীবাহিনী তার পরিচিতি অর্জন করে।[৩৩]

মুজিব সরকারের পরিকল্পনা ছিল 'বাকশালে'র প্রত্যেক জেলা গভর্নরের অধীনে রক্ষীবাহিনীর একটি করে ইউনিট মোতায়েন করা। ফলে দ্রুত এই বাহিনীর বিকাশ ঘটানো হচ্ছিল। ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্বমুহূর্তেও জেলা গভর্নররা প্রশিক্ষণরত ছিলেন এবং ১৪ আগস্ট বিকেলেও এই গভর্নরদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন রক্ষীবাহিনীর একজন কর্মকর্তা।[৩৪]

১৯৭৫ সালের ৬ অক্টোবর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বাধীন সরকার এক অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশিত হয় ৯ অক্টোবর। এই নির্দেশনায় রক্ষীবাহিনীর যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, ব্যাংক ব্যাল্যান্স, যানবাহন ইত্যাদি সেনাবাহিনী অথবা অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার ঘোষণা দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঢাকার সাভার, চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী, খুলনার গিলতলা, সিলেটের বটেশ্বর ইত্যাদি স্থানে বিপুল ভূ-সম্পদের মালিকানা লাভ ছাড়াও সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ বাংলাদেশে সেনা আমলাতন্ত্র বিস্তৃত করার এক উপলক্ষ হয়েছিল।[৩৪]

সেনাবাহিনীতে রক্ষীবাহিনীর আত্তীকরণ শুরু হয় ১৯৭৫-এর ১২ অক্টোবর। খুব ধীরে এই আত্তীকরণ সম্পন্ন হচ্ছিল। অফিসারদের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্তীকরণ করা হয়। পুরো পদক্ষেপটি আইনগতভাবে সঠিক ধারায় এগোলেও প্রশাসনিকভাবে ছিল অভিনব এবং বিস্ময়কর। তারা এমন একটি বাহিনীকে দেশের সুশৃঙ্খল প্রতিরক্ষা কাঠামোতে একীভূত করে নেয়, যে বাহিনী স্বরাষ্ট্র বা প্রতিরক্ষা কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ছিল না, যে বাহিনী গড়ে উঠেছিল ভিন্ন একটি দেশের সেনা কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতা ও তত্ত্বাবধানে, যে বাহিনীর জনবলের বিরাট এক অংশের সামরিক জীবনের শুরু হয়েছিল বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং যে বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিশ্বাসযোগ্য ও বিবেচনাযোগ্য অভিযোগ ছিল। এতসবের পরও কোনো ধরনের প্রকাশ্য তদন্ত বা জবাবদিহিতার মুখোমুখি না করেই এবং তার সদস্যদের মেধা, যোগ্যতা ও অতীত রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন থাকার পরও রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর মতো সুশৃঙ্খল একটি বাহিনীতে একীভূত করা হয়।[৩৫]

পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজের জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করে গেছেন যে, এই সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। জিয়াউর রহমানকে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত চারজন ছিলেন রক্ষীবাহিনী থেকে আত্তীকৃত।

এই ঘটনাবলীর আরেকটি কাকতালীয় দিক হলো, মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ ঢাকায় শেরেবাংলা নগরে সেনাবাহিনীর যে মিলব্যারাকে নিহত হয়েছিলেন, সেটি ছিল রক্ষীবাহিনীরই প্রধান কার্যালয়, মাত্র কয়েকদিন আগে যা সেনাবাহিনীতে আত্তীকৃত হয়েছিল এবং যেখানে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি ইউনিট অবস্থান করছিল।[৩৬]

একটি রক্ষীবাহিনী ব্যাটালিয়ন, যেটি ২২ ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট হয়েছিল, সেটি ৩ নভেম্বর ১৯৭৫-এর অভ্যুত্থানে তার অধিনায়কের নির্দেশে অংশগ্রহণ করেছিল। দু'বছর পর বগুড়া সেনানিবাসেও শৃঙ্খলাবহির্ভূত কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। ৪৮ ঘণ্টার মতো সময় ধরে বিশৃঙ্খলায় জড়িয়ে থাকার কারণে এ ব্যাটালিয়নটিকে ডিস্‌ব্যান্ড করা হয় বা ভেঙে দেয়া হয়।[৩৭]

৬ অক্টোবরের মাত্র চার সপ্তাহ পর ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান ছাড়াও লে. কর্নেল হাওলাদার, ক্যাপ্টেন দীপক প্রমুখ 'রক্ষীবাহিনী' কর্মকর্তা ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শেষোক্ত জনই ৪ নভেম্বর সাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে বঙ্গভবনে ঢুকে মন্ত্রিসভার বৈঠকের মধ্যে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ৩ নভেম্বরের অসফল অভ্যুত্থান যে 'ভারতীয় সর্মথনপুষ্ট' হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছিল তার পেছনে প্রধান প্রমাণ হিসেবে কাজ করে ওই অভ্যুত্থানে রক্ষীবাহিনী থেকে সদ্য রূপান্তরিত সেনা পদাতিক ব্যাটালিয়নগুলোর অপারেশনাল উপস্থিতি। ঢাকার মিরপুর ও সাভারে অবস্থানকারী এরকম পাঁচটি রূপান্তরিত ব্যাটালিয়নকে এই অভ্যুত্থানে সংশ্লিষ্ট করা হয়।[৩৮]

সীমাহীন 'ক্ষমতা চর্চা' ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধারাবাহিকতায় রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরীণ নিয়ম-কানুন ও শান্তি-শৃঙ্খলা অচিরেই ভেঙে পড়ে। পদমর্যাদার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো।[৩৯] এসবের মধ্যে ছিল উন্মত্ততা, সেন্ট্রিকে আঘাত করা, কর্তব্য পালনকালে জুয়া খেলা, অধঃস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ইত্যাদি।[৪০] এভাবে জনগণের কাছে ভাবমূর্তি হারাবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষীবাহিনী থেকে সদস্যদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও দিনে দিনে বেড়ে চলছিল।[৩৯]

রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা পরে যুক্তি দেখিয়েছেন, সর্বহারা পার্টি, গণবাহিনী ও মার্ক্‌স্‌বাদী-লেলিনবাদী নামধারী উগ্র বামদলের নৈরাজ্য আর খুনোখুনি ঠেকাতে এই শক্তি প্রয়োগের দরকার ছিল। উগ্র বামপন্থিরা শাসকদলের কর্মী-সমর্থকদের বেপরোয়াভাবে খুন করছিল বলে তাদের অভিযোগ। বস্তুতপক্ষে এসব উগ্র বামদল যত না শাসকদলের লোক মেরেছে

তার চেয়ে অনেক বেশি বামপন্থিদের মেরেছে শাসকদল। এই ধরনের সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শাসকদলই প্রথম হত্যা শুরু করে। সর্বোপরি যদি শাসকদল গণতন্ত্রকে সম্মান প্রদর্শন করতো, যদি আইনের প্রতি তাদের আনুগত্য থাকতো, তাহলে বিরোধীদলে সশস্ত্র তৎপরতার বিকাশ তো দূরের কথা, জন্মও নিতে পারতো না।[২৫]

মুজিব আমলে রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য নির্যাতনকারী বাহিনীর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সাপ্তাহিক 'হলিডে' ছিল বেশ সোচ্চার।[৪১] 'হলিডে'তে এক প্রতিবেদনে লেখা হয়– 'তুলনা করতে পছন্দ না করলেও এই বাহিনীর কাজের সঙ্গে অনেকেই ভারতের সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ বা সিআরপি'র কাজের মিল খুঁজে পেয়েছে। এই বাহিনী সন্ত্রাসবাদ আক্রান্ত পশ্চিম বাংলায় তৎপরতা চালিয়ে আসছে। রক্ষীবাহিনীর নির্দয়-নির্বিচার অপারেশন, যেখানে সংবেদনশীলতার লেশমাত্র নেই, তাকে সিআরপি'র সমগোত্রীয় বলে প্রতিপন্ন করেছে। জাতীয় রক্ষীবাহিনী মূর্তিমান সন্ত্রাস। একে গঠন করা হয়েছে জনগণকে দমনে, বিপ্লবী রাজনীতি উৎখাতকরণে এবং বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও তার মুরুব্বী ভারতের স্বার্থ রক্ষায় লাঠিয়ালের কাজ করতে।'[৪২]

মুজিব শাসনামলে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ যে সব কারণে সরকারের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল, তার মধ্যে একটি ছিল রক্ষীবাহিনীর কার্যক্রম। বস্তুত গণমাধ্যমকে 'মুক্ত' অবস্থায় রেখে দিলে রক্ষীবাহিনীকে কোনোভাবেই এতটা 'মুক্ত হস্তে' তাদের কার্যক্রম চালাতে দেয়া সম্ভব হতো না। রক্ষীবাহিনীর 'অবাধ' ভূমিকার স্বার্থেই গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল।[৪৩]

এই কারণে গণমাধ্যমের ওপর রক্ষীবাহিনীরও আক্রোশ ছিল। চুয়াত্তরের **১৯** মার্চ রক্ষীবাহিনী 'গণকণ্ঠ'-র প্রেসের যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে যায়; যা ছিল গণমাধ্যমের প্রকাশনা বন্ধে ওই সময়কার এক অভিনব নজির।[৪৩] রক্ষীবাহিনী, মুজিববাহিনী ও সমজাতীয় বাহিনীগুলোর হত্যা, সন্ত্রাস ও নির্যাতন সম্পর্কে দেশি-বিদেশি পত্রিকায় বেশ কিছু রিপোর্ট ছাপা হয়েছিল। এসব রিপোর্ট ছাপার 'অপরাধে' দেশের বহু দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিংবা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। বিদেশি অনেক সাংবাদিককেও অপদস্থ হতে হয়েছে। ১৯৭৫-এর মে মাসে 'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ এক প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেখানে লেখা হয়–

"জনগণের মধ্যে শেখ-এর যাদুকরী ইমেজ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এই পটভূমিতে শেখের পদক্ষেপগুলোও ক্রমেই নির্দয় হচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎকাল পর্যন্ত অন্তত দু'হাজার আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী খুন হয়েছেন। শেখ মুজিব দু'টি বেসামরিক সংগঠনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটি হচ্ছে তার ভাগ্নের নেতৃত্বাধীন এক লাখ সশস্ত্র একগুঁয়ে যুবকের সংগঠন 'যুবলীগ'। এটি 'জাতীয় শুদ্ধি অভিযানে' নিয়োজিত। অপরটি হচ্ছে তার (মুজিব) নিজস্ব নিরাপত্তাবাহিনী– নিষ্ঠুর 'রক্ষীবাহিনী'। শেষোক্ত বাহিনীটি যেকোনো কারণে যখন-তখন অত্যাধুনিক অস্ত্র উঁচিয়ে মিল-কারখানায় প্রবেশ করে, শ্রমিক নেতাদের উপর খবরদারি করে। গ্রাম এলাকায় আকস্মিক কারফিউ জারি করে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়। এরা লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় নির্মম নির্যাতন চালিয়ে থাকে, যার পরিণতিতে এযাবৎ বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।"[৪৪]

তবে, রক্ষীবাহিনীর শুধু নেতিবাচক অবদানই নয়, দু'-একটি ইতিবাচক ভূমিকাও ছিল। একটা মৌলিক অবদান বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সেটা হচ্ছে পিটি-প্যারেডের জন্য সামরিক কমান্ড সম্পৃক্ত শব্দাবলী, যা পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ও উর্দুতে ছিল, সেগুলোকে বাংলায় করা। যেমন: 'এটেনশ্‌ন্'-এর বদলে 'সোজা হও', 'স্ট্যান্ড ইজি'র বদলে 'আরামে দাঁড়াও'।[৪৫]

'রক্ষীবাহিনী' নামের এই খুনী বাহিনীর সদস্যদের হাতে কত মানুষ গুম কিংবা খুন হয়েছে, তার সত্যিকার হিসাব হয়তো কখনোই পাওয়া যাবে না।[৪৬]

পরিশিষ্ট-৩৬

Registered No. DA-1.

Extraordinary

Published by Authority

WEDNESDAY, MARCH 8, 1972

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

NOTIFICATION

No. 212-Pub.—8th March, 1972—The following Order made by the President, on the advice of the Prime Minister, of the People's Republic of Bangladesh on the 7th March, 1972, is hereby published for general information:—

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

MINISTRY OF LAW AND PARLIAMENTARY AFFAIRS

(Law Division)

President's Order No. 21 of 1972.

THE JATIYA RAKKHI BAHINI ORDER, 1972.

WHEREAS it is expedient to provide for the Constitution of Jatiya Rakkhi Bahini and matters ancillary thereto;

Now, THEREFORE, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:—

1. (*1*) This Order may be called the Jatiya Rakkhi Bahini Order, 1972.

(*2*) It extends to the whole of Bangladesh.

(*3*) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the first day of February, 1972.

2. In this Order, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "Bahini" means the Jatiya Rakkhi Bahini constituted under this Order;

(b) "Commanding Officer" means an officer commanding a unit or a body of Rakkhis;

(c) "Director" means the Director of the Bahini appointed under Article 5;

(d) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh;

(e) "Officer" means a superior officer or a subordinate officer;

(f) "prescribed" means prescribed by rules made under this Order;

(g) "Rakkhi" means a member of the Bahini other than an officer;

(h) "subordinate officer" means such officer as may be prescribed;

(i) "superior officer" means the Director and such other officer as may be prescribed;

(j) "unit" means a unit of the Bahini.

3. Every person appointed or enrolled under this Order shall be subject to this Order wherever he may be and shall remain so subject until his discharge in accordance with the provisions of this Order.

4. (1) There shall be raised and maintained in accordance with the provisions of this Order a Bahini to be called the Jatiya Rakkhi Bahini.

(2) The Bahini shall consist of such number and classes of officers and Rakkhis and shall be constituted in such manner as the Government may from time to time direct.

5. (1) The Government shall appoint a Director of the Bahini and may appoint such other officers as it may deem fit.

(2) The Director and the other officers shall be appointed in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.

(3) The Director and the other officers shall possess, and may exercise, such powers and authority over their subordinate officers and the Rakkhis for the time being under their command as is provided by or under this Order.

6. The Rakkhis shall be enrolled in such manner, for such period and on such terms and conditions as may be prescribed.

7. The superintendence of the Bahini shall vest in the Government and the Bahini shall be administered, commanded and controlled by the Director in accordance with the provisions of this Order and any rules made thereunder and such orders and instructions as may be made or issued by the Government from time to time.

8. (1) The Bahini shall be employed for the purpose of assisting the civil authority in the maintenance of internal security when required by such authority as may be prescribed.

(2) The Bahini shall render assistance to the Armed Forces when called upon by the Government to do so in such circumstances and in such manner as may be prescribed.

(3) The Bahini shall perform such other functions as the Government may direct.

9. It shall be the duty of every officer or Rakkhi promptly to obey and execute all orders and warrants lawfully issued to him by any competent authority and to apprehend all persons whom he is legally authorised to apprehend and for whose apprehension sufficient grounds exist and deliver such persons to the custody of the police.

10. Every person subject to this Order shall be entitled to receive his discharge from the Bahini on the expiration of the period for which he was appointed or enrolled and may, before the expiration of that period, be discharged from the Bahini by the Government, Director or such other officer and subject to such conditions as may be prescribed.

11. (*1*) Subject to such rules as the Government may make under this Order, the Director may, at any time, award any one or more of the following punishments to any subordinate officer or Rakkhi whom he finds to be guilty of disobedience, neglect of duty or remissness in the discharge of any duty, or of rendering himself unfit to discharge his duty, or of other misconduct in his capacity as a subordinate officer or Rakkhi, namely:—

(*a*) dismissal from service;

(*b*) removal from service;

(*c*) compulsory retirement;

(*d*) reduction in rank or grade;

(*e*) stoppage of promotion;

(*f*) forfeiture of seniority for not more than one year;

(*g*) forfeiture of pay and allowances for not exceeding twenty-eight days;

(*h*) forfeiture of increment in pay;

(*i*) fine to any amount not exceeding one month's pay;

(*j*) confinement to quarter-guard for a term not exceeding twenty-eight days;

(*k*) severe reprimand;

(*l*) reprimand;

(*m*) extra guard, picquets, patrol or fatigue;

(*n*) confinement to Lines for a term not exceeding one month, with or without drill, extra guard, fatigue or other duty.

(2) The Director may place under suspension any subordinate officer or Rakkhi against whom action under clause (*1*) is required to be taken or against whom any investigation or inquiry is required to be made.

(3) Notwithstanding anything contained in clause (*1*), no subordinate officer or Rakkhi shall be awarded any punishment under this Article unless he has been given an opportunity of being heard.

(4) Any subordinate officer or Rakkhi aggrieved by any action taken under sub-clauses (*a*) to (*i*) of clause (*1*) may prefer an appeal to the prescribed authority in the prescribed manner.

12. Any person subject to this Order who deserts or attempts to desert the Bahini shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

13. Whenever any person subject to this Order deserts, his Commanding Officer shall give written information of the desertion to such civil authorities as in his opinion may be able to afford assistance towards the capture of the deserter and such authorities shall thereupon take steps for apprehension of the said deserter in like manner as if he were a person for whose apprehension a warrant had been issued by a Magistrate, and shall deliver the deserter, when apprehended, to the custody of the Bahini.

14. No person subject to this Order shall be at liberty to resign his appointment or to withdraw himself from all or any of the duties of his appointment, without the sanction of the Commanding Officer with whom he is serving or of some other officer authorised by the Commanding Officer to grant such sanction.

15. Any person subject to this Order who is guilty of any violation of duty or wilful breach or neglect of any rule or lawful order made by any competent authority, or who resigns his appointment or withdraws himself from all or any of the duties of his appointment in contravention of the provision of Article 14, or who, being absent on leave, fails, without reasonable cause, to report himself for duty on the expiration of such leave, or who is guilty of cowardice, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

16. The Director may delegate, to such extent and in respect of such subordinate officer or Rakkhi as he may think fit, the powers conferred upon him by any provision of this Order to any superior officer.

17. (*1*) The Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Order.

(*2*) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

(*a*) prescribe the period for which and the manner in which persons may be appointed as officers or enrolled as Rakkhis;

(*b*) prescribe the training of officers and Rakkhis;

(*c*) prescribe the discharge of officers and Rakkhis;

(*d*) prescribe the terms and conditions of service of officers and Rakkhis;

(*e*) regulate the powers and functions of the Director and other officers;

(*f*) regulate the classes of officers and Rakkhis;

(*g*) provide for any other matter necessary for the constitution, maintenance, administration, command, control and discipline of the Bahini and for carrying the provisions of this Order into effect.

DACCA;
The 7th March, 1972.

ABU SAYEED CHOWDHURY
President of the
People's Republic of Bangladesh

AZIMUDDIN AHMAD
Deputy Secretary.

Printed and Published by Md. Harmuz Hossain, Officer on Special Duty, Establishment Division, In-charge, Bangladesh Government Press, Dacca.

সূত্র:

১. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ৪৬৯-৪৭০

২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭৩

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৬

৪. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৫৭

৫. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭৪-৭৫

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৭

৭. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার-উল-আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২১

৮. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২১৯

৯. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার-উল-আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৩৪

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৭

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭১

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭০

১৩. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯

১৪. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২২৩

১৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২২৬

১৬. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩০

১৭. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার-উল-আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৭৮

১৮. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২২৪

১৯. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার-উল-আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৩৫

২০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৯

২১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮১

২২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৩

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৬

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৭

২৫. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব: ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ২৮

২৬. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৭১

২৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২১৯-২২০

২৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৮৯

২৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৭৩

৩০. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৭৮

৩১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮০

৩২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮১-৮২

৩৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৪

৩৪. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২২৭

৩৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২২৮

৩৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৬৩

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৬৪

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৫৯

৩৯. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৮৫

৪০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৬

৪১. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৩০

৪২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩০

৪৩. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ২৫৩

৪৪. বাংলাদেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের সূচনাপর্ব : ইতিহাসের কাঠগড়ায় আওয়ামী লীগ; আহমেদ মুসা, ডানা পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ১৩৮

৪৫. রক্ষীবাহিনীর সত্য মিথ্যা; আনোয়ার উল আলম, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৩৬

৪৬. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৩৪

৪৭. ১৯৭৫ সাল; সৈয়দ আলী আহসান; বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স; প্রকাশকাল-২০০২; পৃষ্ঠা: ১৪০-১৪১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাত খুন

> ‘হলের ভেতরে মারতে গেলি কেন? ওদের ডেমরা-টেমরা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলেই তো হতো।’[৩]

> পুরো মুজিব আমলে এই একটিমাত্র হত্যাকাণ্ড তদন্ত ও বিচারের আওতায় এবং তার খবর সংবাদ মাধ্যমে এসেছিল।[৫]

প্রতিদিনের মতো ১৯৭৪ সালের ৪ এপ্রিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হল ও সূর্যসেন হলে রাত নেমেছিল। আর সব বাসিন্দার মতো রাতের ঘুম নেমে আসার কথা ছিল সূর্যসেন হলের ৬৩৫ ও ৬৪৮ নম্বর কক্ষের বাসিন্দাদের চোখেও। পার্থক্য শুধু এটুকুই–এই দুই কক্ষের সাতজন তরুণকে সেই দিনের মধ্যরাতে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে যেতে হয়েছিল এক শিহরণ জাগানো খবরের শিরোনাম হয়ে।

১০-১৫ জন সশস্ত্র ছাত্রলীগ কর্মী ওই দুই কক্ষ থেকে সাতজন ছাত্রকে ডেকে বাইরে এনে অস্ত্র তাক করে, হাত উঁচু করিয়ে ধাক্কাতে-ধাক্কাতে মুহসীন হলে নিয়ে যায়। সেখানে টিভি রুমের সামনের করিডোরে তাদের হাত-পা বেঁধে দাঁড় করানো হলো। এরপর রাতের আঁধারে স্টেনগানের হিংস্র গর্জনে প্রকম্পিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। একসঙ্গে সাত ছাত্রের

দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল বুলেটের আঘাতে।

দিনের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এই বীভৎস হত্যাযজ্ঞের সংবাদ মুখে মুখে রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর ঢাকা শহর ছাপিয়ে গোটা দেশ। আতঙ্ক তখন চারদিকে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হল ছাড়তে শুরু করে। রাতের বেলা ভৌতিক পরিবেশ। ৬ এপ্রিলের পত্রিকায় কালো রিভার্স হেডিংয়ে এই ঘটনাটা প্রধান শিরোনাম হয়। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'সহ বিদেশি গণমাধ্যমগুলো গুরুত্ব সহকারে সংবাদটি প্রকাশ করে।

সেই রাতে সূর্যসেন হলের ৬৩৫ নম্বর কক্ষে কয়েকজন ছাত্র গল্প করছিল। ওই কক্ষেই ছিল নাজমুল হক কোহিনুর। রাত ১টা ২৫ মিনিটে সূর্যসেন হল থেকে প্রথম দুই-তিনটা গুলির শব্দ পাওয়া যায়। এ সময় ১০ থেকে ১৫ জন অস্ত্রধারী হলের ভেতর ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে পঞ্চম তলায় উঠে আসে। প্রথমে তারা ৬৩৪ নম্বর রুমের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে 'কোহিনুর' নাম ধরে ডাকতে থাকে। ওই কক্ষের ভেতর থেকে এক ছাত্র পাশের কক্ষে যোগাযোগ করতে বলে। অস্ত্রধারীরা পাশের ৬৩৫ নম্বর কক্ষের দরজা ধাক্কাতে শুরু করে। তারা কোহিনুরকে দরজা খুলতে বলে। কিছুক্ষণ এ অবস্থা চলতে থাকলে অপারগ হয়ে কোহিনুর ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়। অস্ত্রধারীরা তাদের 'হ্যান্ড্স্ আপ্' করতে বলে। কোহিনুরসহ ওই কক্ষে তখন ছিল চারজন। চারজনই মাথার ওপর হাত তুলে কক্ষ থেকে বের হয়।

একই কায়দায় অস্ত্রধারীদের অন্য গ্রুপ ৬৪৮ নম্বর কক্ষ থেকে আরো তিনজনকে বের করে নিয়ে আসে। এই সাতজনের দিকে অস্ত্র তাক করে সারিবদ্ধভাবে তাদেরকে হাঁটিয়ে ৫ম তলা থেকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। এ সময় কোহিনুর বিষয়টি আঁচ করতে পেরে তাকে প্রাণে না মারার জন্য কাকুতি-মিনতি শুরু করে। দোতলা পর্যন্ত নামার পর ২১৫ নম্বর কক্ষের সামনে গিয়ে আরো এক ছাত্রের খোঁজ করে অস্ত্রধারীরা। ওই ছাত্র বিপদ বুঝতে পেরে জানালা ভেঙে দোতলা থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ে। ততক্ষণে অস্ত্রধারীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে যায়। ওই ছাত্রকে না পেয়ে অস্ত্রধারীরা জানালার কাছে গিয়ে দেখে, কেউ দৌড়ে পালাচ্ছে। জানালা দিয়েই গুলি করা হয় তাকে। কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

সাতজন হতভাগ্য ছাত্রকে যখন সূর্যসেন হল থেকে মুহসীন হলের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন রাত ২টা ৪ মিনিট। মুহসীন হলের টিভিরুমের সামনের করিডোরকে বধ্যভূমি হিসেবে নির্বাচিত করে এই সাতজনকে সেখানে দাঁড় করানো হয়। রাত ২টা ১১ মিনিটে হতভাগ্য ওই ছাত্রদের লক্ষ্য করে 'বার্স্ট

ফায়ার' করা হয়। গুলিবিদ্ধ ওই ছাত্ররা লুটিয়ে পড়ে এবং ছটফট করতে করতে প্রাণ হারায়। রক্তে ভেসে যায় পুরো করিডোর। তাদের মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর অস্ত্রধারীরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে ত্রাসের রাজত্ব আরো বিস্তৃত করে। রাত ২টা ২৫ মিনিটে তারা ধীরে-সুস্থে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ভোর ৪টা ৫৫ মিনিটে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরেই ছিল একটি পুলিশ ফাঁড়ি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক প্রান্তে রাজধানীর পুলিশ কন্ট্রোল রুম। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অস্ত্রধারীদের এমন তৎপরতার মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সেখানে হাজির হতে পারেনি। হত্যাকাণ্ডের প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ ছাত্রলীগ থেকে আওয়ামী লীগের দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে শুদ্ধি অভিযানের হুমকি দেয়া হচ্ছিল। ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুল হক চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধান এই শুদ্ধি অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তাদের প্রতি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাকের আশীর্বাদ ছিল। যারা নিহত হন তারা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মণির অনুসারী, কয়েকজন ছিলেন শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব ওই সময় চিকিৎসার জন্য মস্কোতে ছিলেন। খুনিদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করে শফিউল আলম প্রধানের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মিছিল হয়।[১]

নারকীয় হত্যাযজ্ঞের তিন দিন পর পুলিশ ছাত্রলীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম প্রধানসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। অপর দু'জন হলেন– কামরুজ্জামান ওরফে কামরুল এবং মাহমুদুর রহমান ওরফে বাচ্চু। পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসে, এই হত্যাযজ্ঞে শফিউল আলম প্রধান সরাসরি জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই নারকীয় ঘটনা ঘটে বলে পুলিশের তদন্তে বলা হয়।[২]

বছর দু'য়েক পর আব্দুর রাজ্জাক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এই মামলার অন্যতম সাজাপ্রাপ্ত আসামি আব্বাসউদ্দিন আফসারিকে দেখতে পেয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, 'হলের ভেতরে মারতে গেলি কেন? ওদের ডেমরা-টেমরা নিয়ে ফেলে দিয়ে আসলেই তো হতো?'[৩]

মুক্তিযুদ্ধের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই 'সেভেন মার্ডার'-এর মতো আর কোনো ঘটনাই তৎকালীন সময়ে এমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়– *"মুহসিন হলের কোণে*

বধ্যভূমিতে দুই ইঞ্চি পুরু রক্তের চিহ্নও হয়তো দুই-চারদিন পরে মুছিয়া যাইবে। কিন্তু যে জিনিসটা শত ঢাকাঢাকি আর চুনকামেও মুছিবে না, সেটা জাতির মুখের কলঙ্ক, প্রশাসনের কপালের কালিমা। কিন্তু তাতেই-বা কার কি? অমন তো কতই ঘটিল। কতজনে কতকিছু বলিল। প্রশাসনের কাফেলা কি থামিয়া দাঁড়াইয়াছে? নাকি স্তব্ধ-নিশ্চল হইয়া গিয়াছে মৃত্যু'র মিছিল?

আমরা সবাই একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতেছি। না-জানার ভান করিতেছি। আমরা বধির না হইলেও বোবা। আমরা কিছু বলিতে পারি না। কিন্তু অত দূরে কলিকাতায় বসিয়া 'আনন্দবাজার' দেখিতেও পাইয়াছে, কিঞ্চিৎ বলিতেও পারিয়াছে। সে বক্তব্য বড় ইঙ্গিতপূর্ণ। ইহা আমাদের আত্মবিনাশের অশুভ বার্তা বহন করে। গত শনিবারের উপ-সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমরাও এই আসন্ন সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শুভবুদ্ধির কাছে আপীল জানাইয়াছিলাম, যে'রূপ জানাইয়াছি দুই বৎসর যাবত। কিন্তু তাতে কি লাভ হইয়াছে? কার শুভবুদ্ধি আমরা জাগ্রত করিতে পারিয়াছি? এই যে 'গভর্নমেন্ট উইদিন গভর্নমেন্ট'-এর কালোছায়া স্পষ্ট পরিদৃষ্ট হইতেছে, পারিয়াছি কি সরকার ও ক্ষমতাসীন দলকে সে সম্পর্কে সতর্ক ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে? নাকি পারিয়াছি অস্ত্রের ভাষায় যারা কথা বলে, যারা ভ্রাতৃরক্তে হাত রাঙায়, তাদের নিবৃত্ত করিতে? পারিয়াছি কি এই উপলব্ধি জাগ্রত করিতে যে, যাহারা অস্ত্রের ভাষায় কথা বলে তাহারা নিজেরাও অস্ত্রের শিকারে পরিণত হয়? আমরা কিছুই করিতে পারি নাই। আমরা ব্যর্থ। আমাদের প্রশাসন ব্যর্থ। বোধ করি, ইহা আমাদের সামগ্রিক জাতীয় ব্যর্থতারই কালিমামণ্ডিত চিত্র।

বাংলাদেশ জুড়িয়া প্রতিদিন প্রতি রাত্রিতে কত হত্যা, কত লুণ্ঠন, কত অগ্নিসংযোগ, কত শ্বেত-সন্ত্রাস, কত মর্মান্তিক ঘটনাই তো ঘটিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরেও গত এক বছর-সোয়া বছরের মধ্যে চার-পাঁচবার বেআইনি অস্ত্রের প্রকাশ্য মহড়া হইয়াছে। সংঘটিত হইয়াছে সশস্ত্র আক্রমণ, পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড; হলের পর হল লণ্ডভণ্ড হইয়াছে এবং অস্ত্রের মুখে হইয়াছে ব্যালট বাক্স ছিনতাই। প্রশাসন 'দুষ্কৃতকারীদের' খুঁজিয়া বাহির করার 'দৃঢ় সংকল্প' বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। পূর্ণ শান্তি-নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা দান করিয়াছেন। বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার ও শ্বেত-সন্ত্রাস বন্ধ করার বজ্র-কঠোর সংকল্প পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। এবং তজ্জন্য 'স্পেশাল পাওয়ার'ও হাতে লইয়াছেন। কিন্তু কি তার ফলাফল? নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, এতটুকু ফল অর্জিত হয় নাই। বরঞ্চ, পরিস্থিতির দিন দিন দ্রুত অবনতিই ঘটিতেছে। ড. মাযহারুল হকের আলোড়ন সৃষ্টিকারী উক্তিটিরই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা যাইতে পারে, 'আমরা প্রতিদিন তীব্রবেগে এগিয়ে চলেছি রসাতলে'।

... মহাসমুদ্রে কোথায় যেন একটা বিরাট পানির পাক সৃষ্টি হইয়াছে। সেই পাক আমাদের দ্রুতবেগে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ডুবাইয়া মারিতে। আমরা অসহায়ভাবে ধ্বংসের সেই দুর্নিবার আকর্ষণে ধাইয়া চলিয়াছি। যেন আমাদের আর কোন ভরসাই অবশিষ্ট নাই। আমরা যে সমগ্র জাতি সেই মহাসমুদ্রের পাকের টানে ধাইয়া চলিতে চলিতে আর্তচিৎকার করিয়া বলিতেছি, বাঁচাও! বাঁচাও! কে শোনে কার কথা?

আইনের দেবী নাকি অন্ধ। তিনি কারো চেহারা দেখিতে পান না। আইন-শৃঙ্খলা ও শান্তি-নিরাপত্তা রক্ষার সুমহান দায়িত্ব যারা বহন করেন, তাহাদেরও মুখ চিনিয়া আইন প্রয়োগ করিতে গেলে চলে না। আইনের দণ্ড প্রয়োগের পথে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোন বাছ-বিচার আসিয়া দাঁড়াইলে আইনের ব্যর্থতা সেখানে অনিবার্য। প্রশাসন আজ আত্মজিজ্ঞাসা করুন, পরিপূর্ণ সততা সহকারে নিজেকে প্রশ্ন করুন: আমাদের এই যে লজ্জাকর নিদারুণ ব্যর্থতা, এর কারণ কি আইন-প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদেরই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, পক্ষপাতিত্ব, অন্যায় হস্তক্ষেপ ও নির্লজ্জ আত্মপ্রবঞ্চনাই নয়? যদি নিজেকে প্রশ্ন করার মতো এইটুক, সততা ও সৎসাহস তাহারা দেখাইতে পারেন, তবে প্রশ্নের সদুত্তরও পাইবেন। উহারই মধ্যে পাইবেন শুধু শান্তি প্রতিষ্ঠার নয়, শুধু শ্বেত-সন্ত্রাস নির্মূল করার নয়, সামগ্রিক জাতীয় আত্মবিনাশের মুখ হইতেও ফিরিবার ও ফিরাইবার পথ-নির্দেশ। আর যদি প্রশাসন সেই সৎসাহস, সততা ও সত্যনিষ্ঠা দেখাইতে না পারে, তবে তারা জানিয়া রাখুন, যাহা চলিতেছে ইহার কোন শেষ নাই এবং যে 'পয়েন্ট অব নো রিটার্নের' দিকে দেশ ও জাতি ধাবিত হইতেছে, সেখান হইতে কোন প্রত্যাবর্তন নাই।'[৪]

দ্রুত বিচারকাজ শুরু হয়। শেখ মুজিবের শাসনামলেই বিচারে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। কিন্তু '৭৫-এর পর এই সকল মৃত্যুদণ্ড আর কার্যকর হয়নি।

হত্যা মামলার বিচার চলাকালে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক বিবৃতি দিয়ে শফিউল আলম প্রধানের পক্ষ নেয়। পুরো মুজিব শাসনামলে কেবল এই একটিমাত্র হত্যাকাণ্ড তদন্ত ও বিচারের আওতায় এবং তার সব খবর সংবাদ মাধ্যমে এসেছিল। শফিউল আলম প্রধানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের হলে তাতে 'অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা' গ্রেনেড ছুড়ে মারে।[৫]

মুহসীন হলে সাত ছাত্রলীগ কর্মী খুনের কয়েক মাস আগে ১৯৭৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে একই সঙ্গে আসাদ, শহীদ,

মিন্টু ও মোশতাক নামে চার যুবককে হত্যা করা হয়েছিল। এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী না হলেও ছাত্রলীগ কর্মী ছিল। এই ঘটনা ছিল 'মুজিববাহিনী'র উপদলীয় কোন্দলের জের।[৫]

এই তরুণরা খুন হন শামসুন্নাহার হলের পার্শ্ববর্তী শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। এ ঘটনায় চারজন মারা গেলেও ইদ্রিস নামে একজন আহত অবস্থায় বেঁচে যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. বি ওয়ালিউর রহমানের স্ত্রী বিলকিস রহমান, যিনি তখন 'দ্য মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় কাজ করতেন, তিনি ছিলেন উল্লিখিত ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শী! ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে এ বিষয়ে পত্রিকায় মতামত প্রকাশের কারণে সরকারি চাপে তিনি 'মর্নিং নিউজ' থেকে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। তবে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরের সেই রাতের হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বেঁচে যাওয়া আহত ইদ্রিসের জবানিতে 'মর্নিং নিউজ'-এ এই হত্যাকাণ্ডের নায়কদের সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়ে পড়লে তা সেই সময় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অনেকের জন্য বিব্রতকর হয়ে ওঠে।[৬]

চিত্র-কথন: সন্ত্রাস-নরহত্যার মূর্ত প্রতীক

স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রথম বর্ষের শুরু– চারিদিকে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা-অরাজকতার প্রবল প্রতিপত্তি। রাষ্ট্রক্ষমতার অধীশ্বররা রাষ্ট্র পরিচালনার অতি প্রয়োজনীয় এবং অতি প্রাথমিক জ্ঞান এবং শিক্ষা-*দীক্ষা ও বোধ-বুদ্ধির অভাবে সূচনাতেই ব্যর্থতার সোপান রচনা করেছেন।*

সারা দেশে মিল-কলকারখানাসহ রাষ্ট্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের মালিকানাধীন সম্পদ-সম্পত্তি লুটতরাজের হিড়িক পড়ে গেছে। এসবের কুশীলব ক্ষমতাসীন মহল আর তাদেরই লোকজন-আপনজন, মুখে তাদের 'জাতীয়তাবাদ' আর 'দেশপ্রেমে'র মুখরোচক শ্লোগান, মুক্তিযুদ্ধের সাথে যাদের সিংহভাগেরই কোনো সম্পর্কই ছিল না।

সর্বব্যাপী এই দখল-লুণ্ঠনকারী দলীয় দুর্বৃত্তদের প্রতিহত করতে সেই একই দলীয় লোকজন নিয়ে তৈরি করা হলো 'লালবাহিনী'; গোড়াতেই হলো আরেক নতুন মাত্রার নৈরাজ্যের গোড়াপত্তন। সামরিক কিংবা আধা-সামরিক নিয়মিত বাহিনীর মতো উর্দি-ক্যাপ পরিধান করে হাজির হলেন এই 'বাহিনী'র প্রধান আওয়ামী শ্রমিক লীগের নেতা আব্দুল মান্নান।

প্রতিদ্বন্দ্বী বাম রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠন উৎখাত এবং বিরোধীদলীয় সিবিএ-ইউনিয়ন হাইজ্যাক আর সর্বগ্রাসী চাঁদাবাজি হয়ে উঠলো এই 'বাহিনী'র প্রধান কাজ। '৭২-এর জুন মাসে 'লালবাহিনী' তাদের কথিত শুদ্ধি অভিযান শুরু করে 'আটক' যে কাউকে শাস্তি প্রদানের আইনগত ক্ষমতাও চেয়েছিল। আওয়ামীবিরোধী শত শত শ্রমিক হত্যার দায় রয়েছে এদের।

'লালবাহিনী'র এই গণবিরোধী দৌরাত্ম্যের মধ্যেই '৭২ সালে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে এর ৮০ হাজার সদস্যের, যাদের *বেশির ভাগই ছিল প্রকৃতপক্ষে বেআইনি অস্ত্রধারী, এক সমাবেশে সালাম গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। তাঁর পাশেই*

সালাম গ্রহণ করছেন নরহত্যা-সন্ত্রাস-জুলুম-চাঁদাবাজির মূর্ত প্রতীক আব্দুল মান্নান এমসিএ।

ফটো ক্রেডিটঃ দৈনিক পূর্ব দেশ

সূত্রঃ

১. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩৬

২. চাঞ্চল্যকর সে সব খুন (১৪) মুহসীন হলের রোমহর্ষক সেই সেভেন মার্ডার; বাংলাদেশ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার, ২১ মে ২০১৫

৩. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩৭

৪. বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর; সম্পাদনাঃ মুনিরউদ্দীন আহমদ, নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি, ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৪০

৫. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩২৪

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৩২৫

পনেরো অধ্যায়

ছাত্রলীগের ভাঙন ও জাসদের জন্ম

স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ-এর অপরিচ্ছন্ন ধারণা।

মুক্তিযুদ্ধের তরুণদের মধ্যে 'সমাজকে বদলে দেবার' আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব এসব বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছিল। আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণে দলের মধ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথাও কেউ ভাবেনি।

'৭৩-এ ডাকসু নির্বাচনে সরকার সমর্থিতরা রোকেয়া হলে গুলি ছুঁড়ে ও বোমা ফাটিয়ে ব্যালটবাক্স ছিনতাই করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল মুখ কাপড়ে ঢেকে এতে নেতৃত্ব দেয়।[১৮]

মুক্তিযুদ্ধের আগে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ছিল একটি রাজনৈতিকভাবে উদ্দীপ্ত, সুসংগঠিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত সংগঠন। সংগঠনে ছিল দু'টি প্রধান কর্তৃত্বের ধারা। একটি ধারার নেতৃত্বে ছিলেন শেখ মুজিবের বোনের ছেলে শেখ ফজলুল হক মণি। আরেক ধারার নেতৃত্বে ছিলেন সিরাজুল আলম খান। এ দুজনের মধ্যে ছিল শত্রুতা। এ শত্রুতাই পরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ তৈরি করেছিল, যার প্রভাবেই হয়েছিল ছাত্রলীগে বিভাজন এবং জাসদের উত্থান।[১]

শেখ মুজিবের কাল্ট তৈরিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সিরাজুল আলম খান।[২] তিনি ছিলেন

শেখ মুজিবের সবচেয়ে 'আস্থাভাজন শিষ্য'। এটাই ছিল সিরাজুল আলম খানের ক্ষমতার ভিত্তি। জাসদের উত্থানের মাধ্যমে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ায় দু'জনই দুর্বল হয়ে পড়েন।[২]

সিরাজুল আলম খান ছাত্রলীগের ভেতরে ১৯৬৩ সালে আবদুর রাজ্জাক ও কাজী আরেফকে নিয়ে একটা গোপন উপদল বা সেল তৈরি করেন। এই উপদলের সদস্যরা আঙুল কেটে রক্ত ছুঁয়ে শপথ নেন, যতদিন 'পূর্ব বাঙলা' স্বাধীন না হবে, ততদিন তারা ব্যক্তিগত কোনো সুযোগ-সুবিধার পেছনে ছুটবেন না, এমনকি বিয়েও করবেন না। এই উপদলটির নাম দেয়া হয় 'স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী পরিষদ'। 'বিপ্লবী বাঙলা' নামে তারা অনিয়মিত একটা বুলেটিন বের করতেন।[৩]

এই সেলটিই পরবর্তীকালে আরো শক্তিশালী ও সংহত হয়ে স্বাধীনতার পরে 'জাসদ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। 'বিপ্লবী পরিষদ' অত্যন্ত সচেতনভাবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও জেলা কমিটিগুলোতে সাধারণ সম্পাদকের পদটি নিজেদের আয়ত্তে রাখার চেষ্টা করতো।[৪]

ছাত্রলীগের যে সব কর্মী সিরাজুল আলম খানের অনুগত ছিলেন, তারা এ সময় উপদলটির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। আশ্চর্যজনকভাবে তখনও তাদের মূল দর্শন ছিল 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'। 'অগ্নিযুগের' বিপ্লবী বাঘা যতীন, সূর্য সেন, প্রীতিলতা এবং পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামী সুভাষ বোস ছিলেন তাদের আদর্শ। পাশাপাশি তারা চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রোকেও আইডল মানতে থাকেন।[৫]

এই উপদলটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ হবে। ছাত্রলীগের ভেতরে তারা স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র মিলিয়ে একটা অগোছালো রাজনীতির প্রচার শুরু করেন এবং সাথে সাথে তারা দলের মধ্যেই শেখ মণি গ্রুপের আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হন।[৫]

ছাত্রলীগের শেখ মণিপন্থি নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ও তার অনুসারীরা সিরাজুল আলমপন্থি বা 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ'কে উদ্দেশ করে একটি ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোগান দিতেন– 'হো হো মাও মাও, চীনে যাও ব্যাঙ খাও'।[৬]

সিরাজপন্থিরা উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই নেতা জিন্নাহ ও গান্ধীকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতেন। আবার স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করার উদাহরণের জন্য সুভাষ বোসকে তারা পছন্দ করতেন। এছাড়া প্রথাগত

কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বলয়ের বাইরে গিয়ে একটি বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলার জন্য ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গুয়েভারার প্রতি এই উপদলের আলাদা রকমের সমীহ ছিল। কারণ ফিদেল মূলত ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী এবং ফিদেলের মতো জাতীয়তাবাদী লড়াই থেকেই সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটিয়ে ফেলা যাবে—এমন একটা ধারণা হয়তো তাদের আপ্লুত করেছিল। সিরাজুল আলম খান তার অনুসারী ও ভক্তদের কাছে হয়ে উঠলেন 'বাংলার কাস্ত্রো'। অবশ্য সিরাজুল আলম খানের এই উপাধির জন্য মূল কৃতিত্ব শেখ মুজিবেরই। তিনি একবার এক সংবাদ সম্মেলনে সিরাজুল আলম খানকে দেখিয়ে বলেছিলেন—'এই হলো আমার কাস্ত্রো'।[৭]

জাসদের নেতা-কর্মীদের চিন্তায় এক ধরনের তারুণ্যের রোমান্টিক বিপ্লবী ভাবনা ছিল। কিন্তু কোনো গভীর চিন্তাশীলতা ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া তরুণদের মধ্যে 'সমাজকে বদলে দেয়ার' প্রবল উচ্চাশা জন্ম নিয়েছিল। নয় মাসের প্রত্যক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামে জয়ী হয়ে একটা স্বাধীন দেশ লাভেই তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা স্তিমিত হবার নয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব সেটা বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং সংগঠনে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করার মতো প্রয়োজনীয় সংস্কারের কথাও কেউ চিন্তা করেনি।

১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারির ৫ থেকে ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় একটি প্রস্তাবে 'শ্রেণি সংগ্রাম'কে তীব্রতর করে সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। ১৯-২২ মার্চ চার দিনব্যাপী ছাত্রলীগের বর্ধিত সভায় বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়।[৮] শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব একটি ছাত্র সংগঠনে আলোচিত হওয়া দেখে এটা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, সমাজতন্ত্রের ধারণা তাদের কত গভীরভাবে আপ্লুত করেছিল।

এর পরেই '৭২-এ ২৬ মার্চে রেডিও-টেলিভিশন ভাষণে শেখ মুজিব বৈজ্ঞানিক সমাতজন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রণয়নের ঘোষণা দেন। তারপর থেকেই সিরাজপন্থিরা তাদের রাজনৈতিক শ্লোগানে ও প্রচারণায় 'আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য' ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু করে।[৯]

এই সময়েই 'স্বাধীন বাঙলা বিপ্লবী পরিষদে'র আরেক নেতা আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সিরাজুল আলম খানের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। আব্দুর রাজ্জাক দলের ভেতরে এই অতি বাম প্রবণতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) শেখ মুজিবকে আজীবন সদস্যপদ দেয়ার সিদ্ধান্ত

নেয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেসিয়াম মাঠে '৭২-এর ৭ মে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। শেখ মুজিবের উপস্থিতিতে সেখানে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ পাল্টাপাল্টি শ্লোগান দেয়। সিরাজপন্থিদের শ্লোগান ছিল, 'সমাজতন্ত্রের ভিত্তি কী– মার্ক্স্বাদ মার্ক্স্বাদ'; 'কৃষকরাজ, শ্রমিকরাজ– কায়েম করো, কায়েম করো'; 'কমরেড শেখ মুজিব– লাল সালাম, লাল সালাম'।[১০]

অন্য গ্রুপটি শ্লোগান দেয়, 'শেখ মুজিবের মতবাদ– গণতান্ত্রিক সমাজবাদ', 'কৃষক-শ্রমিক-গণরাজ– কায়েম করো, কায়েম করো, 'জাতির পিতা শেখ মুজিব– লও সালাম, লও সালাম' ইত্যাদি।[১০]

শেখ মুজিবের নিজেরও 'লাল সালাম' বা 'মার্ক্স্বাদ' ধরনের বিপ্লবী শ্লোগানে তীব্র আপত্তি ছিল। এক গ্রুপ শেখ মুজিবকে 'লাল সালাম', আরেক গ্রুপ শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করে 'লও সালাম' বলতো। 'লাল সালামওয়ালারা' সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও 'লাল সালামে' শেখ মুজিব আগ্রহী ছিলেন না। কোন সালামের প্রতি শেখ মুজিবের চূড়ান্ত পক্ষপাত ছিল সেটা অবশ্য কিছুদিন পরেই নির্ধারিত হয়ে যায়।

ছাত্রলীগের এই দুই পরস্পরবিরোধী গ্রুপ ১৯৭২-এর ২১-২৩ জুলাই কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেয়। সিরাজপন্থি গ্রুপের সম্মেলন হবে পল্টন ময়দানে, অপর গ্রুপেরটা হবে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে। উভয় গ্রুপই পোস্টারে জানায়, শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। ২০ জুলাই রাত পর্যন্ত সিরাজপন্থিরা আশা করেছিলেন, শেখ মুজিব তাদের সম্মেলনটিই উদ্বোধন করবেন অথবা কোনোটিতেই যাবেন না। সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে শেখ মুজিব ২১ জুলাই সকালে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে গিয়ে হাজির হন। যদিও তিনি জানতেন, ছাত্রলীগের ৯০ শতাংশ কর্মী-সমর্থক পল্টনের সম্মেলনটির সঙ্গে একাত্ম।[১১]

ছাত্রলীগ আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেল। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, উজ্জীবিত বামপন্থিদের সাথে শেখ মুজিব নেই। থাকার কথাও নয়। কারণ শেখ মুজিব কখনো বামপন্থি ছিলেন না। ছাত্রলীগ বিভক্ত হয়ে গেলেও একটা আলাদা রাজনৈতিক দল তখনো তৈরি হয়নি। আবদুর রাজ্জাক এই বামপন্থি গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানায় সংকট তৈরি হয়েছিল। কারণ, তাকে সভাপতি করেই নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার একটা পরিকল্পনা ছিল।[১২]

ন্যাপ নেতা আলীম আল-রাজীকে নিয়ে আলোচনা হয়েছিল প্রস্তাবিত দলের সম্ভাব্য সভাপতি হিসেবে। তার সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগাযোগ ফলপ্রসূ হয়নি।[১২]

ঠিক সেই সময় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন মেজর (অব.) আব্দুল জলিল। জলিল মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিলেন কনিষ্ঠতম মেজর। তিনি ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক ছিলেন।[১২] জলিল তখন সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে নির্দিষ্ট কিছু না করে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। জলিলকেই নতুন রাজনৈতিক দলের সভাপতির পদ গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। মেজর জলিল হন নতুন দলের সভাপতি আর আ স ম আব্দুর রব সাধারণ সম্পাদক। দলের নামকরণ করা হয় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা সংক্ষেপে 'জাসদ'। জার্মান নেতা হিটলারের নাজি দল National Socialist German Workers Party-এর সাথে জাসদের নামের কিছুটা মিল থাকায় দলটিকে প্রথম থেকেই সমালোচিত হতে হয়।

মেজর জলিল রাজনীতির লোক ছিলেন না। রাজনীতির পরিভাষাও বুঝতেন না। তবে দেশের গরিব মানুষের জন্য কিছু একটা করার ইচ্ছা ছিল তার। তিনি উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তিনি 'ইতিহাসশাস্ত্রে' এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।[১৩]

১৯৭২ সালের ১৩ নভেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে জাসদের পক্ষ থেকে প্রথম সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ১৭ নভেম্বর ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ দিকের চত্বরে জাসদের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জলিল ও রব দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার অভিযোগ এনে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন।[১৪]

জাসদের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন '৭২-এর ২৩ ডিসেম্বর সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত হয়।[১৪] প্রথম পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ১১-১৩ মে পল্টন ময়দানে। সম্মেলনে ৫৪ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। একটি পদে কারো নাম ঘোষণা না করে ফাঁকা রাখা হয়। কথিত আছে, সেই পদে কর্নেল তাহের যোগ দেবেন, এজন্যই তা ফাঁকা রাখা হয়েছিল। কর্নেল তাহের সামরিক বাহিনীর চাকরি ঠিক তখনই ছাড়তে রাজি ছিলেন না।[১৫]

পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হওয়ার আগেই জাসদ ১৯৭৩-এর ৭ মার্চের সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়। নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে তাদের প্রথম পছন্দ ছিল 'নৌকা'

আর দ্বিতীয় পছন্দ ছিল 'মশাল'। আওয়ামী লীগ ছাড়া একমাত্র জাসদই ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়। ভোলায় জাসদের শক্তিশালী প্রার্থী ছিলেন ডাঃ আজাহার উদ্দিন। তিনি '৭০-এর নির্বাচনেও বিজয়ী হয়েছিলেন। ওই একই আসনে শেখ মুজিব মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমা দেবার আগের দিন আওয়ামী লীগের গুণ্ডারা ডাঃ আজাহার উদ্দিনকে অপহরণ করে, ফলে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। ওই আসনে শেখ মুজিব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হন।[১৬]

জাসদ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে উঠলেও ধীরে ধীরে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কার্যকর বিরোধীদলের অনুপস্থিতিতে জাসদের পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টি হয়েছিল। নানাদিক থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক চিন্তার লোক এসে দলে দলে জাসদে যোগ দিলো। তবে ষাটের দশক থেকে সিরাজপন্থিরা স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের যে স্বপ্ন লালন করতেন, মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অনেকের কাছে সে স্বপ্নের কোনো মূল্য ছিল না। কেউ এ দলে যোগ দিয়েছিলেন মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, কেউ একটা তৈরি এবং জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম পেয়ে তাতে ঢুকে পড়েছিলেন নিজস্ব মতলব নিয়ে, কেউ-বা এসেছিলেন শুধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করার জন্য। দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার জন্য জাসদের নেতৃত্ব বাছবিচার না করেই সবাইকে দলে স্বাগত জানিয়েছিল।[১৭]

'৭৩-এর ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মুজিববাদী ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন যৌথ প্যানেল দেয়। তাদের প্যানেলে সহ-সভাপতি ও সাধারণ

ডাকসুতে জাসদ ছাত্রলীগ মনোনীত সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী আ ফ ম মাহবুবুল হক। তিনি ও তাঁর পূর্ণ প্যানেল ডাকসু নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হতে চললে, ছাত্র ইউনিয়ন ও মুজিববাদী ছাত্রলীগের যৌথ প্যানেল লেনিন-গামা পরিষদের গুণ্ডারা গ্রেনেড ফাটিয়ে ব্যালটবাক্স ছিনতাই করে।

এই ব্যালটবাক্স ছিনতাইয়ের জন্য ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম জাসদ ছাত্রলীগকে দায়ী করে বিবৃতি দেয়। লেনিন– গামা পরিষদের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী ছাত্র ইউনিয়ন নেতা নূহ-উল-আলম লেনিন বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের সদস্য।

ফটো ক্রেডিট: ইত্তেফাক

সম্পাদক প্রার্থী ছিলেন যথাক্রমে নূহ-উল-আলম লেনিন (ছাত্র ইউনিয়ন) এবং ইসমত কাদির গামা (ছাত্রলীগ)। এর বিপরীতে জাসদ সমর্থিত ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী ছিলেন আ ফ ম মাহবুবুল হক ও জহুর হোসেন। ভোট গণনার সময় দেখা যায়, মাহবুব-জহুর পরিষদ বিপুল ভোটে জিতে যাচ্ছে। হলগুলোতেও একই অবস্থা। এমনকি জাসদ/ছাত্রলীগ জিতে গেছে দেখে রোকেয়া হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহিম ফল ঘোষণা করতে গড়িমসি করেন।[১৮] সন্ধ্যায় ভোট গণনা যখন প্রায় শেষ তখনই ঘটলো অঘটন। লেনিন-গামা পরিষদের সমর্থকেরা গুলি ছুড়ে ও বোমা ফাটিয়ে ব্যালটবাক্স ছিনতাই করে নিয়ে গেল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটেনি।

পরদিন ছাত্র ইউনিয়ন পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে জানায়, জাসদ-সমর্থিত ছাত্রলীগের ছেলেরাই ব্যালটবাক্স হাইজ্যাক করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে, শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামাল মুখ কাপড়ে ঢেকে এই ব্যালটবাক্স ছিনতাইয়ে নেতৃত্ব দেন।[১৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরীর কাছে এনিয়ে অভিযোগ জানালে তিনি কোনো রকম ব্যবস্থা নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে সরকারে যোগ দেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।[১৮]

'৭৪-এর শুরু থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে জাসদ। ১৭ মার্চ পল্টনে জাসদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে জলিল ও রব অত্যন্ত জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন।

এ সভায় জাসদের সভাপতি মেজর (অব.) এম এ জলিল প্রাথমিক কর্মসূচি হিসেবে 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও'-এর কথা ঘোষণা করেন। এ সভায় জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব ঘেরাও-এর চূড়ান্ত কর্মসূচি হিসেবে ৮ এপ্রিলের মধ্যে 'রক্ষীবাহিনী'কে অস্ত্রশস্ত্রসমেত ব্যারাক ও ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসার অনুরোধ জানান। অন্যথায় এরপরে কোনো গুলি চললে দেশে আগুন জ্বলবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন। তিনি বলেন, আজ থেকে 'ডাইরেক্ট অ্যাক্শন' শুরু হলো।

তিনি কৃষকদের 'লেভি' প্রদান থেকে বিরত থাকতে বলেন এবং যারা আগামীকাল থেকে 'লেভি' আদায় করতে যাবেন, তাদের মাথা রেখে দেয়ার কথা বলেন। তিনি প্রথমে গ্রাম থেকে 'গণপিটুনি' শুরু করার আহ্বান জানান।

চিত্র-কথন: প্রতিবাদী বিক্ষোভে আধা-সামারিক রক্ষীবাহিনীর অ্যাক্‌শন

১৯৭৪-এর ১৭ মার্চ, এদিন স্বাধীন দেশের রাজধানীতে প্রথম প্রবল রাজনৈতিক প্রতিবাদী বিক্ষোভের বিরুদ্ধে আধা-সামরিক 'রক্ষীবাহিনী' বেপরোয়াভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সামরিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে অর্জিত স্বাধীন রাষ্ট্রে সূচনা থেকেই সরকারের গণতন্ত্রের পরিপন্থি ও গণবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে '৭৪-এর শুরুতেই সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল জাসদ। '৭২-এর নভেম্বরে যাত্রা শুরু করে ব্যাপক জনসমর্থন ও জনপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে খুব দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে সামরিক ও বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দল জাসদ।

সদ্যস্বাধীন রাষ্ট্রে সর্বব্যাপী দুর্নীতি-অনাচার-নৈরাজ্য এবং সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা ও অকার্যকারিতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল নতুন প্রতিষ্ঠিত অথচ ব্যাপক গণভিত্তিসম্পন্ন দলটি। সশস্ত্র যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জনের পর ক্রমাগত অকার্যকর দশায় উপনীত রাষ্ট্রে মাত্র এক বছর চার মাস আগে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলটি স্বাধীনতা ও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের দুই বছর তিন মাসের মাথায় রাজধানীর পল্টন ময়দানে আয়োজিত বিরাট জনসভা থেকে দাবি-দাওয়া আদায়ে বিশাল মিছিল নিয়ে মন্ত্রীপাড়া মিন্টো রোডে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করে।

কিন্তু দাবি-দাওয়া প্রশ্নে গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থায় না গিয়ে সরকার সেদিন আধা-সামরিক রক্ষীবাহিনীকে বেপরোয়া অ্যাক্‌শনে নামিয়ে দিয়েছিল। ব্যাপক ও নির্বিচার গুলিবর্ষণে সেদিন যে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছিল, আহত হয়েছিল তার সংখ্যা জানা যায়নি। পরবর্তী সময়ে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে যে, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজনের লাশ রক্ষীবাহিনী ট্রাকে করে সরিয়ে ফেলেছিল। ছবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রাজপথে হতাহত শত শত নেতা-কর্মী-সমর্থকের মধ্যে আহত অবস্থায় জাসদ সভাপতি মেজর (অব.) আব্দুল জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রবসহ কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে।

এই ঘটনার পরপরই দমন-পীড়ন শুরু হয় জাসদ-এর বিরুদ্ধে। ওই রাতেই পুলিশ জাসদের মুখপত্র 'দৈনিক গণকণ্ঠ' অফিসে হানা দেয় এবং সম্পাদক কবি আল্‌-মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেতা-কর্মীদের রুম ভাঙচুর ও লুটপাট করা হয়। পরদিন আওয়ামী লীগ মিছিল করে গিয়ে জাসদ কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়।

ফটো ক্রেডিট: বাংলার বাণী

তা ছাড়া সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষকশ্রেণির এজেন্টদের ঘেরাও-এর দাবিসম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে জাসদ ঢাকা থেকে এই ঘেরাও অভিযান শুরুর কথা বলে। রেডক্রসের চেয়ারম্যান, মহল্লার ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেআইনি গাড়ি-বাড়ি-জমি-সম্পত্তি দখলদার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা, ভূয়া লাইসেন্সধারী, সরকারি আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় কারাগার, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, সংসদ সদস্যদের অফিস ও বাসগৃহ, রেডিও, টিভি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রক্ষীবাহিনীর কার্যালয় এবং সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ঘেরাও করাকে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়।[১৯]

জনতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সভা শেষ হতে না হতেই এক বিশাল মিছিল মন্ত্রিপাড়া মিন্টো রোডের দিকে রওয়ানা হয়। মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন মেজর জলিল ও রব। মিছিল গিয়ে থামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়ির সামনে। মুহুর্মুহু শ্লোগান চলতে থাকে। কয়েক ট্রাক বোঝাই রক্ষীবাহিনী আর পুলিশ এসে উপস্থিত হয়। হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হয়। এতে অনেকেই হতাহত হন।

সরকারি প্রেস নোটে বলা হয়, তিনজন নিহত আর আঠারো জন আহত হয়েছেন। তবে পরবর্তী সময়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্বীকার করেন ৪০ থেকে ৫০ জনের মৃতদেহ রক্ষীবাহিনী ট্রাকে করে সরিয়ে ফেলে।[২০]

কে প্রথম গুলি চালিয়েছিল– সেটা নিয়ে দুরকম বক্তব্য জাসদের পক্ষ থেকে পাওয়া যায়। সেদিন জাসদের কেন্দ্রীয় এক নেতা বলেন, গুলি প্রথমে জাসদের লোকেরাই করেছিল এবং 'গণবাহিনী'র নেতা হাসানুল হক ইনু গুলিটা করেছিলেন।[২১] আরেক পক্ষ বলে, ছাত্রনেতা আ ফ ম মাহবুবুল হক স্টেনগান থেকে বার্স্ট ফায়ার শুরু করেন।[২২]

তবে সেখানে প্রহরারত বিডিআরের একজন মেজর এবং রক্ষীবাহিনী, পুলিশ ও বিডিআরের মিলিত বাহিনীর নিরাপত্তা অধিনায়ক ঢাকার তৎকালীন ডিআইজি রকিব খোন্দকারের ভাষ্য একেবারেই ভিন্ন; যখন ঊর্ধ্বতন এই পুলিশ কর্মকর্তা জাসদ নেতা-কর্মীদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন ঘটে এক নাটকীয় ঘটনা। রক্ষীবাহিনীর এক তরুণ লিডার মেশিনগান হাতে জিপ থেকে নেমেই চিৎকার করে বলেন, 'রক্ষীবাহিনী, তোমরা এখনো চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কী? গুলি চালাও।' বলেই নিজের মেশিনগান থেকে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ শুরু করেন তিনি।[২৩]

চিত্র-কথন:

পারুলিয়া ক্যাম্পে যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পর্কে সেক্টর কমান্ডারকে নির্দেশনা দিচ্ছেন মেজর জলিল এবং সর্বাধিনায়ক এমএজি ওসমানি।

ফটো ক্রেডিট: ইত্তেফাক

তবে জাসদের পক্ষ থেকে দায় কেন নিজেদের ওপর নিয়ে একে অন্যের দিকে এভাবে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছিল তা বোধগম্য নয়। তবে এমন কাদা ছোড়াছুড়ির ঘটনা থেকে বোঝা যায়, জাসদও শুরুতেই নেতৃত্বের লড়াইয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

এর পরদিনই জাসদের বিরুদ্ধে শুরু হয় দমন-পীড়ন। সেদিন রাতেই পুলিশ জাসদের মুখপত্র 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকা অফিসে হামলা করে এবং সম্পাদক কবি আল্-মাহমুদকে গ্রেপ্তার করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাসদের নেতাকর্মীদের রুম ভাঙচুর ও লুটপাট হয়। পরদিন আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তাদের মতে 'জাসদের দুষ্কৃতকারীদের' বিরুদ্ধে ঢাকায় মিছিল বের করে জাসদের অফিস পুড়িয়ে দেয়। গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ জাসদের নেতাকর্মীদের খুঁজতে থাকে।

জাসদ থেকে প্রচারপত্র ছেপে ১৭ মার্চের 'ঘেরাও আন্দোলনে'র যুক্তি তুলে ধরে বলা হয়, 'এটা হচ্ছে কিউবার বিপ্লবের ১৯৫৩ সালে মনকাদা দুর্গ আক্রমণের

অনুরূপ।’[২৪] জাসদ প্রচলিত পার্লামেন্টারি রাজনীতিকে অন্তঃসারশূন্য মনে করতো এবং প্রচলিত এই রাজনীতিকে শুধু বর্জনই নয়, এটাকে চিরতরে নির্মূল করার স্বপ্ন দেখতো।[২৫]

চার

এরমধ্যে সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে সোশ্যালিস্ট ইউনিট সেন্টার অব ইন্ডিয়ার (এসইউসিআই) যোগাযোগ হয়। এই দলটি নিজেদের ভারতের একমাত্র খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টি বলে মনে করতো।[২৬] ১৯৭৩ সালের শেষদিকে সিরাজুল আলম খান ভারতে যান এবং এসইউসিআইয়ের প্রধান নেতা শিবদাস ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন।[২৬] শিবদাস ঘোষ সিরাজুল আলম খানকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেন। এরফলেই পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে, জাসদের অনেক প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় এসইউসিআইয়ের মতাদর্শের হুবহু প্রতিফলন ছিল।[২৭]

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আখলাকুর রহমান ’৭৩-এ পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন এবং জাসদের তাত্ত্বিক নেতা হিসেবে যোগ দেন। এর আগে তিনি পাকিস্তানের সম্পদশালী ২২ পরিবারের অন্যতম সায়গল পরিবারের মালিকানাধীন ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেডের চিফ ইকোনোমিস্ট হিসেবে চাকরি করতেন।[২৮]

জাসদ লক্ষ্য স্থির করে শ্রমিক, কৃষক ও তরুণদের মধ্য থেকে উঠে আসা ‘পেশাদার বিপ্লবী’দের নিয়ে এলাকাভিত্তিক গেরিলা ইউনিট গড়ে তোলা হবে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রধান রণকৌশল হবে শহরাঞ্চলে উপর্যুপরি গণআন্দোলন এবং গ্রামাঞ্চল থেকে অভিযানের সমন্বয়ে একটা বিপ্লবী অভ্যুত্থান সংঘটিত করা। গেরিলা ইউনিটগুলোর কর্তব্য হবে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে শ্রেণিশত্রুদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা। কাজের মধ্যে দিয়েই গেরিলারা তাদের সংখ্যা ও শক্তি বাড়াবে এবং একটি ‘বিপ্লবী সেনাবাহিনী’তে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম দেয়া হয় ‘বিপ্লবী গণবাহিনী’।[২৯] ’৭৪-এর জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘গণবাহিনী’ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৩০]

এদিকে জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. শাজাহানকে ‘গণবাহিনী’র ‘সুপ্রিম কমান্ডার’ নিয়োগ করা হয়। সাংগঠনিক কাঠামোটি গড়ে তোলা হয় অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন ‘লাল ফৌজের’

আদলে। লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহেরকে 'গণবাহিনী'র ফিল্ড কমান্ডার এবং জাতীয় কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনুকে 'ডেপুটি কমান্ডার' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।[৩০]

এর মধ্যে কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী ছেড়ে নদী উন্নয়নবিষয়ক একটি সরকারি সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। জাসদের সঙ্গে তাহেরের সংযোগ হয়েছিল কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই আনোয়ার হোসেনের মাধ্যমে। আনোয়ার হোসেন সিরাজ শিকদারের দল করতেন। সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে বিপ্লবী প্রচেষ্টায় কর্নেল তাহেরও যুক্ত ছিলেন। তাহের সিরাজ শিকদারের দলকে মুক্তিযুদ্ধের আগে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের নীতি-কৌশল শেখাতেন। সে সময় সিরাজ শিকদার বলেন, তাহের যেহেতু একজন পেটিবুর্জোয়া সামরিক অফিসার, তাই তার কাছ থেকে কোনো সামরিক শিক্ষা নেয়া যায় না। ১৯৬৯ সালেই সিরাজ শিকদারের সঙ্গে তাহের ও তার ছোট ভাইয়ের রাজনৈতিক সম্পর্কের ইতি ঘটে।

১৯৭১ সালের ২০ জুলাই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে আগস্ট মাসে তাহের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে তিনি একটি পা হারান। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে নকল পা লাগিয়ে তাহের বাংলাদেশে ফিরে এলে কর্নেল ওসমানী তাকে নিয়োগ দেন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে।[৩১]

জাসদের নীতি-কৌশল কর্নেল তাহেরকে ব্রিফ করার দায়িত্ব পান হাসানুল হক ইনু। কর্নেল তাহের তার নারায়ণগঞ্জের বাসায় ইনুর সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি জাসদে যোগ দেন; যদিও সে সময় তিনি সরকারি চাকরিতে ছিলেন।

সিরাজুল আলমপন্থিদের উদ্দেশ করে শেখ মণিপন্থিরা ব্যাঙ্গাত্মক শ্লোগান দিতেন–'হো হো মাও মাও, চীনে যাও ব্যাঙ খাও'। সেই শ্লোগানের কথাই বাস্তব হলো নারায়ণগঞ্জে কর্নেল তাহেরের বাসায়। হাসানুল হক ইনুর সাথে দীর্ঘ রাজনৈতিক আলোচনার এক পর্যায়ে কর্নেল তাহেরের সহধর্মিণী বেগম লুতফা তাহের সোনা ব্যাঙের পা ভেজে ইনুকে আপ্যায়িত করেছিলেন। যদিও এই সুখাদ্যটি খাওয়া কর্নেল তাহের চীন থেকে শেখেননি, তিনি আমেরিকায় কমান্ডো ট্রেনিং করতে গিয়ে শিখেছিলেন।

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এসেও পুরোপুরি ক্যান্টনমেন্ট ছাড়েননি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহের। তিনি সেনাবাহিনীর নন-কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সক্রিয় গোপন সংগঠন 'বিপ্লবী সৈনিক

সংস্থা'র ওপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর ভেতর গঠন করা হয় 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। স্বাধীনতা যুদ্ধে মাহবুবুর রহমান ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। পাকিস্তানের পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট থেকে সপরিবারে দেশে ফিরে এসে তিনি টাঙ্গাইলে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে তিনি বিভিন্ন এলাকায় কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ করেন।

তাহের গোপনে গোপনে সৈনিকদের মধ্যে ছড়িয়েছেন বিপ্লবের মন্ত্র, আর্মিকে গণমুখী করার মন্ত্র; আশা দিয়েছেন এমন এক আর্মি গড়ার, যেখানে সৈনিকরা অফিসারদের মতো বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাবে। স্বপ্ন দেখিয়েছেন এমন এক আর্মির, যেখানে হাবিলদারের উপরে আর কোনো র‍্যাঙ্ক থাকবে না। যে সব সৈনিক তাহেরের দেয়া মন্ত্র, আশা ও স্বপ্ন বিশ্বাস করেছে, তারা যোগ দিয়েছে তার 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'য়। এই সৈনিক সংস্থা বাংলাদেশের এক ক্রান্তিকালে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে।

এদিকে আওয়ামী লীগের অনেক নেতাই তখন জীবনে প্রথমবারের মতো ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে রীতিমতো উল্লসিত, অধৈর্য ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে তাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদ নয়-ছয় করার ভয়ঙ্কর প্রবণতা। জাসদের কর্মীরা ছিলেন তরুণ, একগুঁয়ে ও প্রতিবাদী। ফলে সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। জাসদের নেতাকর্মীদের ওপর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা হামলা চালাতে থাকেন। সে সময় একদিন বরিশালে মেজর জলিলের ওপরও আক্রমণ করা হয়। তিনি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান। এরপর মেজর জলিলের ওপর আরো একটি আক্রমণ হয়। তাতে তিনি এবং জাসদের আরো আটজন কর্মী আহত হন। 'রক্ষীবাহিনী' রাজশাহী শহরে জাসদের অফিসে হামলা চালায় এবং সবকিছু তছনছ করে দেয়। নানা জায়গায় জাসদের নেতাকর্মীদের হত্যা করা শুরু হয়।[৩২] '৭৩ সালে এসব সংঘর্ষে জাসদের ২৩ জন কর্মী নিহত হন বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়।[৩৩]

জাসদের নেতা-কর্মীদের ওপর নেমে এলো 'রক্ষীবাহিনী'র নির্মম নির্যাতন। তাদের হাতে ধরা পড়লে জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল কম। কতজনকে যে তারা গুলি করে বা পিটিয়ে মেরেছে, তার কোনো হিসাব নেই। 'এন্‌কাউন্টার' শব্দটা তখনই চালু হয়। 'বেআইনি অস্ত্র নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় কিংবা আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে কতিপয় দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে'– রক্ষীবাহিনীর এই বয়ান ছিল গৎবাঁধা।[৩৪]

জাসদ আশা করেছিল, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে সৃষ্ট ঘটনাবলী একটা স্ফুলিঙ্গ ঘটাবে, '৫২-এর ভাষা আন্দোলনে কয়েকজন ছাত্রের মৃত্যু যেমনটি ঘটিয়েছিল। কিন্তু ১৭ মার্চ নিহতের সংখ্যা '৫২ সালের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে তা খুব বেশি আলোড়ন তোলেনি।[৩৫]

জাসদের 'গণবাহিনী'ও প্রতিপক্ষকে পাল্টা খুনের এবং বদলার রাজনীতি শুরু করলো। গণবাহিনীর আক্রমণে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা-কুমারখালী অঞ্চলের সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়ার হত্যা ছিল রোমহর্ষক। তার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জমি দখল এবং নানা ধরনের অনাচারের অভিযোগ ছিল। তাই গণবাহিনী তাকে 'মৃত্যুদণ্ড' দেয়।[৩৪]

'৭৪-এর ২৫ ডিসেম্বর কোরবানির ঈদের দিনে তাকে ঈদের জামাতে প্রকাশ্যে বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে হত্যা করা হয়।[৩৬] হত্যাকাণ্ডের আগে দু'টো আলাদা সশস্ত্র দল কুমারখালী থানা ও খোকসা থানার পুলিশদের নিরস্ত্র করে। দুই থানায় অফিসারসহ ৪০ জন পুলিশ ছিল।[৩৬]

গোলাম কিবরিয়া শেখ মুজিবের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শেখ মুজিব তাকে 'মিয়াঁভাই' বলে সম্বোধন করতেন। এই ঘটনার তিন দিন পর ২৮ ডিসেম্বর দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়।[৩৭]

শেখ মুজিব জরুরি অবস্থা জারির আগে সিরাজুল আলম খানের সাথে একটা বৈঠক করেন। সেখানে তিনি সিরাজুল আলম খানকে বলেন, তিনি একটা 'জাতীয় দল' গঠন করতে চান। সিরাজুল আলম খান বলেন, এত দলের দরকার নেই। এতে তার সম্মতি নেই। তিনি চান একটা জাতীয় সরকার, যেখানে সব দলের অংশগ্রহণ থাকবে।[৩৮]

আ স ম আব্দুর রবের রিপোর্টে তার প্রতিফলন ঘটে স্পষ্টভাবে। এতে বলা হয়, 'প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল আদৌ বিশ্বাসী নয়। কারণ, আমাদের দেশে শাসকগোষ্ঠীর চাপিয়ে দেয়া প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থায় যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তা কোনোক্রমেই সর্বহারা মেহনতি মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, কর্মজীবী মধ্যবিত্ত ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না। এ নির্বাচন পদ্ধতিতে সমাজের প্রতিপত্তিশালী ধনিক শ্রেণির লোক ছাড়া আর কেউ বাস্তবে অংশগ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং এই নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার দখলদার ব্যক্তিমাত্রই সমাজের ধনিক শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

তাই এই প্রথাগত নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ গণবিরোধী ভূমিকা পালনে বাধ্য। .... এই নির্বাচন পদ্ধতিতে সৃষ্ট পার্লামেন্ট 'মেহনতি জনতার শত্রুদের আড্ডাখানা' ছাড়া আর কিছুই নয়। ... এই তথাকথিত গণতন্ত্র অর্থাৎ শোষকের গণতন্ত্র প্রথায় অনুষ্ঠিত নির্বাচন দেশের শোষিত মেহনতি জনতার সমস্যা সমাধানে ফলপ্রসূ কিছু হবে না। ... ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি আমরা বাংলাদেশে আর কোনোদিনও ঘটতে দেবো না। বাংলাদেশের বুকে এরপর যদি আর কোনো নির্বাচন হয়, সে নির্বাচন হবে মেহনতি জনতার নির্বাচন। শোষকগোষ্ঠীর ভণ্ড গণতান্ত্রিক নির্বাচন নয়।'[৩৯]

শেখ মুজিবের প্রস্তাব নিয়ে সিরাজুল আলম খান দলের অন্য নেতাদের সাথে কথা বলেন। একটা সমঝোতা যখন প্রায় হয়েই যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় বাগড়া দিলেন শেখ ফজলুল হক মণি।[৪০]

১৯৭৫-এর ২ জানুয়ারি আবারো সিরাজুল আলম খানের সাথে বৈঠক হবার কথা থাকলেও এর আগেই '৭৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা জারি হয়। জরুরি অবস্থা জারির পরদিন সিরাজুল আলম খান গোপনে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যান।[৪০]

'সহিংস' রাজনীতিতে জাসদের অবদান ছিল 'নিখিল' নামে একটি হাতবোমার উদ্ভাবন। নিখিল চন্দ্র সাহা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক। মেধাবী এই তরুণ সবেমাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যন্ত্রকৌশল বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। '৭৪-এর ২৬ নভেম্বরের হরতালের প্রস্তুতি হিসাবে ঢাকা শহরে একটা শক্তির মহড়া দেয়ার পরিকল্পনা হয়। নিখিল দায়িত্ব নেন বোমা বানানোর।[৪১] যাত্রাবাড়ীতে গফুর মেম্বারের বাড়িতে নিখিল তার দুই সহযোগী গোলাম মোরশেদ নয়ন ও কাইয়ুমকে নিয়ে বোমা বানানো শুরু করেন। অসাবধানতায় বোমা বিস্ফোরিত হয়। নিখিলের শরীর মারাত্মকভাবে পুড়ে যায়। ২৬ নভেম্বর হাসপাতালে নিখিলের মৃত্যু হয়।[৪২] জাসদ নিখিল উদ্ভাবিত বোমার নাম দেয় 'নিখিল'। এই বোমা বিস্ফোরিত হলে তারা বলতো–'একটি নিখিলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে'। এভাবেই তাদের মৃত সহযোদ্ধাকে তারা সম্মান জানাতো।

সূত্র:

১. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৮

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৮০

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৯

৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২০

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২১

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২২

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭১

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৩

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৫

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮০

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮২

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৩

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৯২-৯৩

১৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১০২

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৯৮

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১১৫

১৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১০৬

১৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি; মোহা. রোকনুজ্জামান, মীরা প্রকাশন, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৬২

২০. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১১০-১১১

২১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১১৩

২২. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ও বাংলাদেশের রাজনীতি; মোহা. রোকনুজ্জামান, মীরা প্রকাশন, ২০০৫, পৃষ্ঠা: ৬২

২৩. কাছে থেকে দেখা ১৯৭৩-১৯৭৫; মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১৯৪

২৪. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১১২

২৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২০

২৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২১

২৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২২

২৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২৪

২৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১২৯

৩০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৩৫

৩১. কর্নেল তাহের কেন জাসদে যোগ দিয়েছিলেন; বিডিনিউজ২৪, ৩০ নভেম্বর ২০১২,

৩২. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৩৩

৩৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৩৪

৩৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৬

৩৫. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ৩২

৩৬. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৪৭

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৮

৩৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৫৭

৩৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল কর্তৃক প্রকাশিত ঐতিহাসিক রাজনৈতিক রিপোর্ট; মে ১৯৭৩

৪০. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ১৫৮

৪১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৪

৪২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৪৫

ষোল অধ্যায়

বাংলাদেশ-ভারত ২৫ বছরের চুক্তি

আনুষ্ঠানিক স্বৈরশাসনের পক্ষাবলম্বনের মাধ্যমে ভারতই প্রথম চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল।

'অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক' চুক্তি মূলত বাংলাদেশকে ভারতের পণ্যের বাজারে রূপান্তরেরই আরেকটি প্রয়াস।[৮]

পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শান্তিবাহিনী' ভারতের আশ্রয়ে থেকে, তাদের সমরাস্ত্র ও রসদসহ পূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।

'দাসত্বের চুক্তি' হিসেবে পরিচিতি পায়।

১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করার মাত্র ক'দিন পরই ১৭ মার্চ সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ইন্দিরা গান্ধীকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় এবং দুই দেশ যুক্ত ইশতেহার ও মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।[১] দুই দেশের দুই নেতা স্বাক্ষর করেন নবায়নযোগ্য একটি ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি।[২]

চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ– শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। প্রস্তাবনায় ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল।[২]

চুক্তির প্রস্তাবনায় উপরোক্ত আদর্শসমূহ অর্জনে 'দুই দেশের সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতি' যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করে 'সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে' উভয় দেশের সীমান্তকে চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।[২]

এই চুক্তিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয় পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং সর্বপর্যায়ে বৈঠক আহ্বান করে সে ব্যাপারে মতবিনিময় করবে। উভয় পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী ক্ষেত্রসমূহে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কের পরিসর বিস্তৃত করার পদক্ষেপ নেবে। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করার কথা বলা হয়। উভয় পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী, সমতল উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবার ব্যাপারে উভয় পক্ষ কাজ করবে।[৩]

এ ছাড়াও বলা হয় যে, কোনো পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপন করা থেকে বিরত থাকবে, একে অপরের ওপর কোনো আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবে না এবং নিজ ভূখণ্ডে এমন কোনো সামরিক আয়োজনে ব্যস্ত থাকবে না; যা অপর পক্ষের জন্য সামরিক ক্ষতি বা নিরাপত্তার ওপর হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। উভয় পক্ষ অপর পক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে যেকোনো তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকবে।[৪]

কোনো পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থি হয় এমন কোনো বিষয়ে এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যেকোনো রকমের অঙ্গীকার প্রদান থেকে বিরত থাকবে।[৪]

এই চুক্তি ছাড়াও যৌথ ইশতেহারে দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে বৃহৎ শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব ও সামরিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখা হবে এবং উভয় পক্ষ ভারত মহাসাগরকে একটি পারমাণবিক

অস্ত্রমুক্ত অঞ্চল হিসেবে বহাল রাখার প্রচেষ্টা চালাবে।[৪]

স্থগিত ট্রানজিট পুনর্বহাল এবং সীমান্ত-বাণিজ্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন করা হয়।[৪] ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই চুক্তি ছিল উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের সরকারের সাধারণ নীতিসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ এবং বহু রক্ত ও আত্মদানের মধ্যে দিয়ে স্থাপিত দুই দেশের বন্ধুত্বের এক শক্তিশালী বন্ধনের প্রতীক।[৫]

এই চুক্তির বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে এই অঞ্চলের একই রকম আরো কয়েকটি চুক্তির সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে। এর মধ্যে দু'টি চুক্তি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। এর একটি হলো ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এবং অপরটি হলো আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।[৫]

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির শিরোনামে যে শব্দ কয়টি ব্যবহার করা হয়েছিল সেগুলো ছিল– শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা; যেখানে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তিতে ছিল– বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি।[৬]

ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির ২ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ ছিল একেবারে অভিন্ন এবং উভয় ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ সম্পর্কে একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। প্রথমটির ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং পরেরটি ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার অভিন্ন ভাষা ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে শুধুমাত্র ব্যতিক্রম ছিল বাংলাদেশ-ভারত চুক্তিতে একটি ইংরেজি Shall শব্দের এবং ভারত-সোভিয়েত চুক্তিতে একটি will শব্দের ব্যবহার।

বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ ও ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর বিবরণ ছিল সম্পূর্ণ অভিন্ন। উভয় চুক্তির ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে শিল্প, সাহিত্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সাদৃশ্যমূলক মনোভাব ব্যক্ত করা হয়।[৬]

প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কবিষয়ক উভয় চুক্তির ৮, ৯ ও ১০ নম্বর অনুচ্ছেদ শুধু অভিন্নই ছিল না, উপরন্তু উভয় চুক্তিতেই নিশ্চয়তা বোঝাতে গিয়ে ইংরেজি Shall শব্দ ব্যবহার করা হয়। এমনকি উভয় চুক্তির বাক্যবিন্যাস এবং গঠনশৈলীও ছিল পরস্পরের অনুরূপ। ব্যতিক্রম হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ

চুক্তি যেখানে ছিল প্রাথমকিভাবে ২৫ বছর মেয়াদি, সেখানে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ ছিল ২০ বছর।

আফগানিস্তানে প্রকৃত অর্থে সোভিয়েত আগ্রাসনের এক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আফগানিস্তানের (রাষ্ট্রপতি নূর মোহাম্মদ তারাকি) মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তির সঙ্গে উপরোক্ত চুক্তি দু'টির তুলনা করলে আরো চমকপ্রদ তথ্য বের হয়ে আসে। ১৯৭৮ সালের ৫ ডিসেম্বর সম্পাদিত আফগান-সোভিয়েত চুক্তির শিরোনাম ছিল 'বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি'। এই চুক্তির ১ নম্বর অনুচ্ছেদেও উভয় দেশের জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়।[৬]

আফগান চুক্তির ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত চুক্তি দু'টির ৮ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ৪ নম্বর অনুচ্ছেদ এবং ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে একই কথা বলা হয়। তিনটি চুক্তিতেই অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে একই রকমের মনোভাব প্রকাশ করা হয়। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ছিল এই যে, উপরোক্ত চুক্তি দু'টির মতো না হয়ে আফগান-সোভিয়েত চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে সামরিক ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের শর্ত পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।[৭]

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সামরিক কৌশলগত প্রয়োজনেই আফগানিস্তানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল এবং এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপই ছিল এই চুক্তির উপজীব্য বিষয়।[৭]

ভারত ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে সেই বিশেষ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে, যখন বাংলাদেশ ইস্যুতে উদ্ভূত জটিল সমস্যা নিয়ে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছ থেকে সম্ভাব্য হুমকির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে এগোতে হচ্ছিল। নিজের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ভারতের জন্য তখন সামরিক সহায়তা ছিল অপরিহার্য। সেই মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে দিয়েই ভারত নিজের নিরাপত্তার পক্ষে আশু ও তাৎক্ষণিক সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছিল।[৭]

অন্যদিকে বাংলাদেশ যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন এ

চিত্র-কথন:

১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ তারিখে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি। বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তিতে ছিল ১২টি দফা। চুক্তিটি ২৫ বছর মেয়াদী হলেও নবায়নযোগ্য ছিল। চুক্তি সাক্ষরের পরে হাস্যোজ্জ্বল শেখ মুজিব এবং ইন্দিরা গান্ধী।

ফটো: সংগৃহীত

দেশে ভারত-সোভিয়েত কিংবা আফগান-সোভিয়েত ধরনের চুক্তি সম্পাদনের মতো পরিবেশ ছিল না। ভারত তিন দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন থাকায় বাংলাদেশের ওপর বৈদেশিক আগ্রাসনের হুমকির কোনো আশঙ্কা ছিল না। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর এবং সেই সময়ের নম্র ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশ বার্মাও (বর্তমান মিয়ানমার) বাংলাদেশের জন্য কোনো রকম হুমকির কারণ ছিল না।[৭]

বরং কোনো রকমের হুমকির অনুপস্থিতিতেও মৈত্রী চুক্তিতে উল্লিখিত সামরিক শর্তগুলো প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতির পক্ষেই আগাম ইঙ্গিত ঘোষণা করছিল।[৮]

বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন ছিল প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে রূপান্তরেরই আরেকটি প্রয়াস।[৮]

একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী এবং অপর একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে ঠিক এমনতরো সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের অর্থই হলো চুক্তির লাভজনক দিকগুলো সব সময় শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই যাবে।[৮]

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ও তাদের বিশেষ মিত্র সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) ছাড়া দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এই চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং এই চুক্তি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। সর্বপ্রথম এই দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী।[৯] এই চুক্তি 'দাসত্বের চুক্তি' হিসেবে পরিচিতি পায়।

তবে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, এই চুক্তির প্রথম বরখেলাপ করে ভারত। গণতন্ত্র এই চুক্তির অন্যতম ভিত্তি হলেও শেখ মুজিব যখন সকল দল নিষিদ্ধ করে একদলীয় শাসন জারি ও 'বাকশাল' ছাড়া অন্যদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ বারিত করে আনুষ্ঠানিক স্বৈরশাসন কায়েম করেন, তখন ভারত তাতেও সমর্থন দিয়ে যায়।

১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর এই হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটা তরুণ অংশ ভারতে আশ্রয় নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত শুরু করে। তা ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের 'শান্তিবাহিনী' ভারতে আশ্রয় পেয়ে তাদের দেয়া রসদ ও পূর্ণ সহযোগিতা নিয়েই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

সূত্র:

১. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৩৭

২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩৮

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩৯

৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪০

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪১

৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪২

৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪৩

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪৪

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪৫

সতের অধ্যায়

ফারাক্কা ব্যারেজ:
বাংলাদেশের মরণবাঁধ

ফারাক্কা ইস্যুতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রথম অভিযোগ পেশ করে জাতিসংঘে এবং সেটা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর '৭৬-এর জানুয়ারিতে।

'৭২-এ ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু গঙ্গার পানি বণ্টন এই কমিশনের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে রাখা হয়নি।

'৭৫-এর ২১ এপ্রিল এই ব্যারেজ দিয়ে অভিন্ন নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ শুরু হয়। বাংলাদেশের অন্যতম প্রাণপ্রবাহ পদ্মার মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল সেদিন।

শেষ বিচারে গঙ্গা তো ভারতীয় নদী-ই: ভারতের সেচমন্ত্রী

'বর্ষার মাঝামাঝি। পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে। দিবারাত্রি কোন সময়েই মাছ ধরিবার কামাই নাই। সন্ধ্যার সময় জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায় নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জেলে নৌকার আলো ওগুলি। সমস্ত রাত্রি আলোগুলি এমনিভাবে নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়। এক সময় মাঝরাত্রি পার হইয়া যায়। শহরে, গ্রামে,

রেল-স্টেশনে ও জাহাজঘাটে শ্রান্ত মানুষ চোখ বুজিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। শেষরাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি ওঠে। জেলে-নৌকার আলোগুলি তখনো নেভে না। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিষ্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মতো দেখায়।'

অমর কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দোপাধ্যায় বর্ষায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'দের জীবন এভাবেই চিত্রিত করেছিলেন। পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী, হিমালয়ে উৎপন্ন গঙ্গানদীর প্রধান শাখা এবং বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী।

পদ্মা নদীকে ঘিরে পরিবেশ-প্রকৃতি আর এই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা এক বিশিষ্ট রূপ নিয়েছিল। সেই নদী আজ প্রায় মৃত। উত্তাল জলরাশির জায়গায় শুধু ধু-ধু বালুচর। আজ আর 'জাহাজঘাটে দাঁড়াইলে নদীর বুকে শত শত আলো অনির্বাণ জোনাকির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে' দেখা যায় না। কোনো আলোই 'নদীবক্ষের রহস্যময় ম্লান অন্ধকারে দুর্বোধ্য সংকেতের মতো সঞ্চালিত হয়' না, 'শেষরাত্রে ভাঙা ভাঙা মেঘে ঢাকা আকাশে ক্ষীণ চাঁদটি' উঠলেও 'জেলে-নৌকার আলো' আর দৃশ্যমান হয় না। নৌকার খোল ভরে জমতে থাকে না মৃত সাদা ইলিশ মাছ।

ভারত ভাগের পরে পশ্চিমবঙ্গ হঠাৎ করেই তার আয়ের মূল উৎস পূর্ব বাঙলার উর্বর ভূমি হারায়। বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল ছিল পূর্ব বাঙলা। যোগাযোগের জন্য নদীব্যবস্থা, কাঁচামালের জন্য উর্বর ভূমি, শিল্পের জন্য চা, পাট সবকিছুই ভাগে পড়ে মূলত পূর্ববঙ্গের । ১৯৫০ সালেও পশ্চিমবঙ্গের আয় ছিল ভারতের সর্বোচ্চ। কিন্তু ১৯৬৬ সালেও মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় ভারতের গড় আয়ের চেয়ে কম এবং জাতীয়ভাবে অষ্টম। ১৯৬৭-৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শতকরা ৮০ ভাগ বেড়ে যায়।[১]

বাণিজ্যকেন্দ্র ও প্রধান সমুদ্রবন্দরনগরী হিসেবে কলকাতা নির্ভরশীল ছিল হুগলী নদীর ওপর। বড় বড় জাহাজ চলাচলের জন্য এই নদী দেশভাগের পর আর উপযোগী ছিল না। দশকের পর দশক ধরে নিম্নগামী স্রোত অথবা মোহনার ঊর্ধ্বমুখী জোয়ারবাহিত পলিতে হুগলী নদী বন্ধ ও রুদ্ধ হয়ে যায়। নদী খননের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা দেয়নি। ষাটের দশকের শেষদিকে হুগলী নদীতে এত বেশি পলি জমা হয় যে, ২৬ ফুটের অধিক লম্বা জাহাজ আর বন্দরে প্রবেশ করতে পারতো না। ব্রিটিশ আমলে যে বন্দর ভারতের প্রধান বন্দর ছিল, ১৯৭১ সাল নাগাদ সেই বন্দরের অবস্থান নেমে আসে ষষ্ঠ স্থানে। অথচ কমবেশি দুই শতাব্দী ধরে ভারত

চিত্র-কথন:

ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে পাকসিতে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মা নদীতে বেকার ভেসে থাকা জেলে নৌকা। পরিবেশগত বিপর্যয়ের সাথে সাথে পদ্মা নদীর উপরে নির্ভরশীল হাজার হাজার পরিবারের জীবন ও জীবিকাও ধ্বংস হয়েছে।

ফটো ক্রেডিট: বাপী রায়/ এলামি স্টক ফটো

মহাসাগরে সামুদ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্যে এই কলকাতা বন্দরই প্রভাব বিস্তার করে ছিল।[২]

১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায় নির্বাচনে অত্যন্ত খারাপ ফল করেন। নিজের আসনে পরাজিত হওয়ার হাত থেকে কোনোরকমে টিকে থাকার পর তিনি **১৯৫৩** সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য নানা পরিকল্পনা হাতে নেন। এই নতুন পরিকল্পনার সাথে ছিল ফারাক্কায় গঙ্গা নদীর ওপর ব্রিজ ও ব্যারেজ নির্মাণ। এই ব্যারেজের উদ্দেশ্য ছিল হুগলী নদীর জলপ্রবাহ বৃদ্ধি এবং পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।[৩]

১৯৬০ সালেও ফারাক্কায় গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন করেনি, যদিও বছরের পর বছর ডা. বিধান রায় এই প্রকল্পের জন্য চিৎকার করেছেন উচ্চকণ্ঠে।[৪]

ডা. বিধান চন্দ্র রায় এই প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে বলেছেন– এ পরিকল্পনা শুধু রাজ্যের অর্থনীতির জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নয় বরং কলকাতা বন্দরকে নির্বিঘ্ন করার জন্যও অত্যাবশ্যক। এই বন্দর দিয়ে বিপুল পরিমাণ আমদানি-রপ্তানি পণ্য আনা-নেওয়া করা হয়। এই পরিকল্পনা কলকাতা শহরকে অতিরিক্ত লবণাক্ততা থেকে রক্ষা করবে।[৫]

এর জবাবে নেহেরু কিছু সহানুভূতিশীল কথা বলে ডা. রায়কে জানান যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধুনদের জল সমস্যার বিষয়টি সমাধানের পরই কেবল ওই প্রকল্পটির সরকারি অনুমোদন দেয়া হবে।[৬]

১৯৬১ সালের জানুয়ারি মাসে, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ 'গঙ্গা ব্যারেজে'র বিষয়টি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দেয়।[৫]

ভারতেও ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্নমত ছিল। একদল ভারতীয় বিশেষজ্ঞ মনে করেন, 'যে সব স্বাভাবিক কারণে ভাগীরথীর উৎস মজে গিয়েছে ও গঙ্গার সঙ্গে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে সে সব স্বাভাবিক কারণের কোনো প্রতিকারই ফারাক্কা ব্যারেজ করতে পারবে না। সুতরাং এ পন্থায় ভাগীরথীর নাব্যতা পুনরুজ্জীবিত করে তা কিছুদিনের জন্যও স্থায়ী করা যাবে না।'[৭]

অবশেষে ওই প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৬৪ সালে। এর অনেক আগেই ডা. রায়ের চিতাভস্ম ওই নদীর জলের মন্থর ধারায় ভেসে যায়। ডা. রায় ওই নদীর জলপ্রবাহের উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। দেশ ভাগের ২৮ বছর পর ১৯৭৫ সালে যখন ওই ব্যারেজের কাজ সমাপ্ত হয়, তখন নেহেরু ও ডা. রায় আর বেঁচে ছিলেন না। আর ব্যারেজটি এত দেরিতে নির্মিত হয় যে, কলকাতা বন্দরের অবনতি আর ঠেকানো যায়নি। নদীতে পলি জমে যাওয়ায় ওই অপূরণীয় অবনতি ঘটে।[৫] বিপরীতে এ পাড়েও বিপর্যয় ঘটে এবং এর বৈরী প্রভাবে পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের দীর্ঘস্থায়ী ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়।

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছোট-বড় ৫৪টি অভিন্ন নদী আছে। জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এই নদীগুলো বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উজানের দেশ হওয়ায় ভারত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে সব সময়ই। অভিন্ন নদীর পানির ওপর

বাংলাদেশেরও ঐতিহাসিক এবং আইনগত অধিকার আছে।[৮]

২৯ অক্টোবর ১৯৫১ সালে পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় তাদের উদ্বেগের কথা লিখিতভাবে ভারত সরকারকে জানায়। ৮ মার্চ ১৯৫২-তে ভারত সরকার লিখিতভাবে উত্তর দেয়। তারা বলে– 'প্রকল্পটি এখন প্রাথমিক সমীক্ষামূলক পর্যায়ে আছে এবং আপনাদের উদ্বেগ অনুমাননির্ভর'।[৯] অবশেষে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। যারা সেসময় প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের সাথে আমাদের রাজনৈতিক বিচ্ছেদ হয়েছে এবং যারা উদ্বেগকে 'অনুমাননির্ভর' বলে উত্তর দিয়েছিলেন তারাও স্বর্গবাসী হয়েছেন। কিন্তু পাকিস্তানের সেই উদ্বেগ অনুমাননির্ভর ছিল না।

ভারতের তৎকালীন সেচমন্ত্রী ড. কে এল রাও ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি ফারাক্কা বিষয়ে পাকিস্তানের উদ্বেগের জবাবে বলেছিলেন– 'শেষ বিচারে গঙ্গা তো একটা ভারতীয় নদীই।'[১০] গঙ্গা যে একটি আন্তর্জাতিক নদী এবং এর পানিতে শুধু ভারতেরই হিস্যা নয়, যে ভূমিতে তা প্রবাহিত হয়, তাদেরও হিস্যা আছে এবং এটাই আন্তর্জাতিক আইন– এটা এই রাজনীতিবিদ বিস্মৃত হয়েছিলেন।

ফারাক্কা ব্যারেজ চালু না হলেও স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়েই তা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারেও এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়– 'পূর্ববর্তী সরকারের অমার্জনীয় অবহেলার কারণে ফারাক্কা বাঁধ ভবিতব্যে পরিণত হয়েছে, যা পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ ও স্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়েছে। এই সমস্যার একটি ন্যায়সংগত সমাধানের উদ্দেশ্যে জরুরিভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতির সকল পন্থা ব্যবহার করা হবে।'[১১]

ভারতের লোকসভায় ফারাক্কা প্রশ্নে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭২ সালের ১৬ আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর শিষ্য বাম নেতা সমর গুহ জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে 'যথাসময়ে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণে সরকারি ব্যর্থতা' সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। ভারতের সেচ ও বিদ্যুৎ উপমন্ত্রী বি এন কুড়িল লোকসভায় বলেন, গঙ্গা বাঁধের নির্মাণকাজ ১৯৭১ সালের জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে এবং বাঁধের সংযোগ খালের নির্মাণকাজ ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকে সংযোগ খালের মাধ্যমে ভাগীরথীতে পানি প্রবাহ চালু করা সম্ভব হবে।[১২]

পানির পরিমাণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, 'সংযোগ খালে পানি সরবরাহের পরবর্তী

চিত্র-কথন:

ফারাক্কা ব্যারেজের কারণে শুকিয়ে যাওয়া গোড়াই নদী। গোড়াই নদী প্রমত্তা পদ্মার অন্যতম প্রধাণ শাখা নদী। ২০১১ সালে তোলা এই ছবিতে পানিশূন্য নদীবক্ষের পেছনে বিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। এই ব্রিজটি ছিল বৃটিশ আমলে নদীর উপরে তৈরি ভারতবর্ষের প্রধান ব্রিজের একটা।

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

পাঁচ বছর শুষ্ক মৌসুমসহ সারা বছর ৪০,০০০ কিউসেক পানি প্রবাহিত হবে।' তবে এর পরবর্তী দু'বছর পানির পরিমাণে তারতম্য ঘটবে। এভাবে সাত বছর পর মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে সামগ্রিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হবে। বিবৃতির শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মন্ত্রী উল্লেখ করেন, 'বাংলাদেশের বৈধ স্বার্থ রক্ষিত হবে এবং আমরা এমন কিছু করবো না যাতে এই স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়।'[১২]

বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে ১৮ কিলোমিটার উজানে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত রাজমহল ও ভগবানগোলার মাঝামাঝি (পশ্চিমবঙ্গ-বিহার সীমান্তে) ফারাক্কা নামক স্থানে গঙ্গা নদীর ওপর এই বাঁধ নির্মিত হয়।[৭] ১৯৬১ থেকে নির্মাণকাজ শুরু হয়ে ১৯৭৫-এ শেষ হয়। পুরো প্রকল্প শেষ হতে সে সময় চব্বিশ মিলিয়ন ডলার

খরচ হয়। ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল এই ব্যারেজ দিয়ে অভিন্ন নদীর জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়। যে পদ্মা নদী পূর্ব বাঙলাকে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা করেছিল তার মৃত্যুঘণ্টা বেজে গেল সেদিনই।

ফারাক্কা নির্মাণের ফলে পদ্মা নদীর পানি প্রবাহ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নিচে ১৯১০ সালে পদ্মার প্রস্থ ছিল ১৬০০ মিটার আর ১৯১৫ সালে গভীরতা ছিল ২৪৮ ফুট। বর্তমানে প্রমত্তা পদ্মা আর নেই, পায়ে হেঁটেও পার হওয়া যায়। এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর। গঙ্গার প্রবাহ হ্রাসের কারণে নদীতে অধিক পরিমাণে পলি জমার ফলে এর জল পরিবহন ক্ষমতা কমে গেছে। খুলনা অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।[৮] পদ্মার অববাহিকা কার্যত মরুভূমির রূপ নিয়েছে। নদীর ওপর নির্ভর মানুষের জীবন ও জীবিকা ধ্বংস হয়ে গেছে।

শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রবাহ আরো হ্রাস পাওয়ায় গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প হুমকির মুখে পড়েছে।[১৩] পদ্মার পানি দিয়ে এই প্রজেক্টের কৃষিকাজ পরিচালিত হতো। ওই প্রকল্পের প্রত্যক্ষ আওতায় ১,২১,৪১০ হেক্টর জমির সেচ নির্ভরশীল। প্রজেক্ট এলাকায় গভীর নলকূপ বসিয়ে কোনো রকমে কৃষিকার্যক্রম চালু আছে। তাতে করে ভূ-গর্ভের পানির স্তর অনেক গভীরে চলে যাচ্ছে; ফলে দিন দিন গভীর নলকূপে পানি উত্তোলনের হার কমে যাচ্ছে। এ অঞ্চলের জীববৈচিত্র্যও নষ্ট হয়ে গেছে। উপকূলীয় লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত মিঠা পানির মাছ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আগে পদ্মা নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যেত, আজ আর সেই প্রাচুর্য নেই।

বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্যের সাথে জড়িয়ে আছে নদী। নদীর সাথে বাংলাদেশের নিবিড় সম্পর্ক। সে নদী হারিয়ে যাচ্ছে। বিস্তীর্ণ জনপদে এখন পানির জন্য হাহাকার। বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে বহু নদী হারিয়ে যাওয়ার মূল কারণ ফারাক্কাসহ গঙ্গা ও পদ্মার উজানে প্রায় একশটি নদীতে বাঁধ দিয়ে ভারত কর্তৃক পানি প্রত্যাহার করার পরিবেশ বিধ্বংসী প্রকল্প।

ফারাক্কার কারণে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদে বিপর্যয়ের ইতিহাস রচিত হয়েছে। পদ্মায় বর্তমানে শুকনো মৌসুমে পানি প্রবাহ প্রায় শূন্যের কোঠায়। এর বিরূপ প্রভাবে দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে পানি সংকট দেখা দিয়েছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাংলাদেশের চার কোটিরও বেশি মানুষের জীবন ও জীবিকা। একে একে শুকিয়ে যাচ্ছে পদ্মার সবগুলো শাখা নদী।

গঙ্গার প্রবাহ সংকটে বহু শাখা ও উপ-নদীর নৌ-চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ অঞ্চলে এখন ৩২০ কিলোমিটার নৌপথ শুষ্ক মওসুমে বন্ধ রাখতে হয়।

ফারাক্কা বাঁধে ভারত একতরফা পানি প্রত্যাহার করায় গঙ্গা অববাহিকার অনেকগুলো নদী মরে গেছে, অনেকগুলো মৃতপ্রায়। দেশের পশ্চিম ও উত্তরের এমন মৃত বা মৃতপ্রায় নদীগুলো হচ্ছে– মহানন্দা, পাগলা, বারনাই, গুমানি, বড়াল ও ইছামতি এবং আরো অনেক।

দক্ষিণে অনেক নদী হারিয়ে গেছে কিংবা মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছে। এই নদীগুলো হচ্ছে– মাথাভাঙ্গা, গড়াই, ভৈরব, বেতনা, কোবাদা, কোদালিয়া, মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রা, কচুয়া, কুমার, আড়িয়াল খাঁ, বলেশ্বর, কচা, পালং, তরাকী, রূপসা, বিশখালী, ভদ্রা, শিবশা, চন্দনা, বেগবতী, লোহালিয়া, তেঁতুলিয়া, ভোলা, খোলপেটুয়া, ইছামতি, কালিন্দী, ধানসিঁড়ি, পশুর, শাহবাজপুর ও রায়মঙ্গল।

এছাড়া শুকিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রধানতম জলপ্রবাহ প্রমত্ত প্রবাহিনী যমুনা। শুকনো মৌসুমে তাতে শত শত চর জেগে ওঠে। নৌ-চলাচলের পথ হয়ে পড়ে সীমিত কিংবা বন্ধ।

অবাক বিষয় এই যে, ১৯৭২-এ যে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন গঠিত হয়, সেটার বিবেচ্য বিষয়ে গঙ্গার পানি বণ্টন ইস্যুটা ছিল না। দু'টো অসম শক্তি যখন মোকাবিলা করে, তখন সিদ্ধান্ত শক্তিমানের পক্ষেই যায়। ফারাক্কা ইস্যুতে প্রথম থেকেই শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে আমরা একটা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতাম।

ফারাক্কা বাঁধের এ বিপর্যয়ের দিকটি হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছিলেন এ দেশের গণমানুষের নেতা মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এই বাঁধের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত গঠনের লক্ষ্যে বিশাল লং-মার্চের আয়োজন করেছিলেন ১৬ মে ১৯৭৬ সালে; যা আজও ফারাক্কা লং-মার্চ নামে পরিচিত।

অবাক বিষয় এই যে, ফারাক্কা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অভিযোগ বাংলাদেশ প্রথম জাতিসংঘে দাখিল করে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৬-এর জানুয়ারিতে। ততদিনে অনেক ক্ষতিই চূড়ান্ত রূপ নেয়ার পথে এগিয়ে গেছে।

সূত্র:

১. The Agony of West Bengal, Ranajit Roy, New Age Publishers, 1972, page: 93

২. West Bengal: an analytical study; Sponsored by the Bengal Chamber of Commerce & Industry, Calcutta, New Delhi, Oxford & IBH Pub. Co. [1971] page: 56

৩. দেশভাগের অর্জন : বাঙলা ও ভারত (১৯৪৭-১৯৬৭); জয়া চ্যাটার্জী, মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ২৮১

৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৮২

৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৮৩

৬. My Years with Dr. B.C. Roy, 1982, S. Chakrabarty, C- 447

৭. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১১০

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩৬

৯. Case Study of Transboundary Dispute Resolution: the Ganges River controversy; Authors: Aaron T. Wolf and Joshua T. Newton, page: 8

১০. বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক; মোহাম্মদ সেলিম, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, পৃষ্ঠা: ১১১

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১১২

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১১৩

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৩৭

আঠারো অধ্যায়

বন্ধুর পার্বত্য চট্টগ্রাম

১৯৫০-এর দশকেই পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। এ লক্ষ্যে কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেতে বলে গোয়েন্দাদের।[১২]

'র'-এর কর্মকর্তা বলছেন, আরো পরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠায় সহায়তার সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

১৯৭৬ সালে 'বাঙালি পুনর্বাসনের' মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট শুরু হয়নি।[২০]

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলটি বাঙলার স্বাধীন সুলতানি যুগে ১৫৫০ সালের দিকে প্রণীত বাঙলার প্রথম মানচিত্রে বিদ্যমান ছিল। তবে এর প্রায় ৬০০ বছর আগে ৯৫৩ সালে আরাকানের রাজা এই অঞ্চল অধিকার করেন। ১২৪০ সালের দিকে ত্রিপুরার রাজা এই এলাকা দখল করেন। ১৫৭৫ সালে আরাকানের রাজা এই এলাকা পুনর্দখল করেন এবং ১৬৬৬ সাল পর্যন্ত অধিকারে রাখেন। মুঘল সাম্রাজ্য ১৬৬৬ হতে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এলাকাটি সুবা বাংলার অধীনে শাসন করে। ১৭৬০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই এলাকা নিজেদের আয়ত্তে আনে। এবং সেই ধারাবাহিকতায় ১৮৬০ সালে এটি ব্রিটিশ

ভারতের অংশ হিসাবে যুক্ত হয়। ব্রিটিশরা এই এলাকার নাম দেয় চিটাগং হিল ট্র্যাক্ট্‌স্‌ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এটি চট্টগ্রাম জেলার অংশ হিসাবে বাঙলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে এই এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অংশ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় যে সব পাহাড়ির বাস, তাদের মূলত দুই ভাগে করা যায়– খাইয়ুংথা বা নদীর সন্তান, যাদের মূল পূর্বসূরি বাঙলার বাইরের। এরা বাঙলার বাইরের প্রাচীন কোনো ভাষায় কথা বলে আর ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে এরা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এই শ্রেণির জনগোষ্ঠী হলো 'চাকমা'।[১]

আর তং সা বা পাহাড়ের সন্তান, যাদের মূল পূর্বসূরি হচ্ছে মিশ্র। এরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়। এরা বিভিন্ন রকমের আলাদা ভাষায় কথা বলে এবং সভ্যতার বিচারে খাইয়ুংথাদের থেকে অনেক পিছিয়ে। এই শ্রেণির প্রধান জনগোষ্ঠী হিসেবে আছে টিপ্‌রা, লুসাই বা কুকি, যাদের আবার অনেক ছোট ছোট উপদল রয়েছে।

খাইয়ুংথা এবং তং সা– দু'টি শব্দই পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরের। খাইয়ুং অর্থ নদী আর তং অর্থ পাহাড়। থা অথবা সা-এর অর্থ হচ্ছে সন্তান। সাধারণ পাহাড়ি বোঝানোর জন্য এগুলো বলা হয়। এর বাইরে যেসব গোষ্ঠী এখানে বাস করে তাদের বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে। এদের ভাষা বা জীবনধারায় কোনো নির্দিষ্ট সামঞ্জস্য নেই। প্রতিটি গোষ্ঠীর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

বাঙালিরা পাহাড়িদের দু'টি ভাগে ভাগ করে থাকে। একটা হচ্ছে বন্ধুভাবাপন্ন, যারা চট্টগ্রাম জেলার সীমান্ত এলাকার বেশ কাছাকাছি বসবাস করে। এদের বলা হয় 'জুম্ম'। আর বন্ধুভাবাপন্ন নয়, এমন বাকি সব পাহাড়ি গোষ্ঠী, যাদের প্রায়ই একনামে 'কুকি' বলে চালানো হয়। ভাষার পার্থক্যের কারণে এরা বাঙালিদের কাছে একেবারেই বোধগম্য নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী বিষয়ে ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ডিসিডিএম) ক্যাপ্টেন টমাস হার্বার্ট লেউইনের মতে, চট্টগ্রামের পাহাড়ে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীর বেশির ভাগই নিশ্চিতভাবে দুই পুরুষ আগে 'আরাকান' (অর্থাৎ, পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে) থেকে এসেছে। আসলে ১৮২৪ সালে বার্মার (বর্তমান মিয়ানমার) যুদ্ধে শরণার্থী হিসেবে এরা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে থেকে এখানে এসেছিল। শস্য-সুফলা আরাকানের ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধের শেষ হয়।[১]

চিত্র-কথন:

১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধের পানিতে মহাপুরম এলাকা ডুবে যাওয়ায় সন্তু লারমাদের পরিবার খাগড়াছড়ির পানছড়িতে আবাস গড়ে তোলেন। এদিকে বাঁধের প্রকল্প গ্রহণের সময়ে প্রতিশ্রুত পুনর্বাসন ব্যবস্থা না পাওয়ায় স্থানীয় মানুষের মাঝে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে "উপজাতি এলাকা" বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তা বাতিল করা হয়, স্পেশাল স্ট্যাটাস বাতিল করা হয়। এতে অসন্তোষ আরো বাড়ে। এসময় নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন সন্তু লারমা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সন্তু লারমা বামপন্থি ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতিতে জড়িত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ করে তিনি খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি থানার একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন।

১৯৭২ সালে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন সন্তু লারমা। তার ভাই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন এর সাধারণ সম্পাদক। নিয়মতান্ত্রিকভাবে দাবি আদায় সম্ভব হবে না মনে করে ১৯৭৩ সালে তারা সংগঠনের সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠন করেন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নেন। ছবিতে শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র সহযোদ্ধাদের সঙ্গে সন্তু লারমা।

ফটো: সংগৃহীত

পার্বত্য চট্টগামে ১২টা ভিন্ন জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাস করে। এদের বেশির ভাগই ১৬ থেকে ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময় এই অঞ্চলের বাইরে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয়, সবচেয়ে আগে আসে চাকমা সম্প্রদায় এবং পাহাড়ি অঞ্চল অতিক্রম করে এসে ১৭ শতকের মধ্যেই তারা চট্টগ্রামের সমতল ভূমি থেকে শুরু করে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় বাস করতে থাকে। সে সময় স্থানীয় বাঙলাভাষীদের সাথে জমি নিয়ে চাকমা সম্প্রদায়ের নিরন্তর ঝামেলা লেগেই থাকতো। তাই এক সময় চাকমাদেরকে সরে গিয়ে পাকাপাকিভাবে পাহাড়েই আশ্রয় নিতে হয়।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা শুধু অর্থনৈতিক কারণে অভিবাসনের ফলেই ঘটেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল তিনটি বৃহৎ আঞ্চলিক শক্তির মিলনস্থল; আরাকান, ত্রিপুরা আর বাঙলার শাসকরা একেক সময় এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব কিংবা শাসনভার গ্রহণ করেছেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আর ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে এই অঞ্চলের রাজনৈতিক আর আইনগত কাঠামো নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে।[৩]

আঠারো শতকের শুরুতে মোগল প্রশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চলে কর আরোপ করে, সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে বাণিজ্যের ওপরও কর ধার্য করে। সেই সময়ই কর আদায়ের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে কর সংগ্রাহকদের বসতি গড়ে ওঠে, যারা স্থানীয়দের কাছে থেকে কর হিসেবে তুলা সংগ্রহ করে মোগল প্রশাসনের ভাণ্ডারে পৌঁছে দিত। এভাবেই মোগলরা তাদের রাজনৈতিক সীমানার বাইরে হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য স্থাপন করে।[৪]

পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ১৭৮৯ সালে ব্রিটিশরা তুলার বদলে নগদ অর্থে কর পরিশোধের আইন করে। সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ফ্রন্টিয়ার। সেই সময়ই 'টাকার কারবারি'রা পার্বত্য চট্টগ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে থাকে, যাদের সবাই ছিল বাঙলাভাষী। ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই পাহাড়িদের প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ভাঙন শুরু হয়; ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দেখা দেয়। এই সময় লুসাই চিন গোষ্ঠী ব্রিটিশদের সাথে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হয়।[৫]

ব্রিটিশ আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিক ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। ১৮৭০ সালেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতি ৯৬ জন অধিবাসীর বিপরীতে একজন সামরিক সদস্য মোতায়েন ছিল। উচ্চ পদমর্যাদা ও ক্ষমতাসম্পন্ন একজন ব্রিটিশ অফিসার এই সামরিক বাহিনীর কমান্ড বা নেতৃত্বে থাকতেন। তিনি বিভিন্ন

বিবদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি স্থাপন ও ফৌজদারি অপরাধের বিচারের দায়িত্ব পালন করতেন। কর আদায়ের ভার ছিল স্থানীয় গোত্র প্রধানদের হাতেই। এ সময় ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর নিরাপত্তায় বাঙলাভাষীদের ব্যাপকভিত্তিক অভিবাসন ঘটতে থাকে।[৬]

১৮৯২ সালে লুসাই পাহাড়, যা আজকের মিজোরাম, ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হলে ফ্রন্টিয়ার অঞ্চল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্রিটিশদের কাছে তার কৌশলগত গুরুত্ব হারায়। ১৮৯২ সাল থেকেই ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে মিজোরামে নতুন অধিকৃত অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ ও শান্তি স্থাপনের কাজে চলে যায়।[৭]

১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার আইন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে 'টোটালি এক্সক্লুডেড্' জেলা হিসেবে মর্যাদা দেয়। ফলে সমতলের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তখন থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী বাঙলাভাষীদের বদলে ব্রিটিশদের সাথেই রাজনৈতিক নৈকট্য স্থাপন করে। স্থানীয় প্রধানরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি স্বশাসিত 'প্রিন্স্‌লি স্টেট'-এ রূপান্তরের স্বপ্ন দেখতে থাকেন।[৮]

উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের ধারণা ছিল, তাদের এলাকা ভারত বা বার্মার অন্তর্ভুক্ত হবে। যে কারণে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলিত হলেও ১৫ আগস্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা এবং বান্দরবানে বার্মার (মিয়ানমার) পতাকা উত্তোলিত হয়। ১৭ আগস্ট র‍্যাড্‌ক্লিফ্ রোয়েদাদ প্রকাশিত হলে জানা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। ২১ আগস্ট পাকিস্তানি সৈন্যরা রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে গিয়ে ভারতীয় ও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলন করে।

পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পর ১৯৫৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সরাসরি পাকিস্তানের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে আনা হয়। তবে স্থানীয়দের চাপে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ স্ট্যাটাস্ বহাল থাকে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ওই সময় সরাসরি রাজধানী করাচির নিয়ন্ত্রণে শাসিত হতে থাকে। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হবার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলের বাসিন্দাদের জন্য ব্যাপকভাবে

উন্মুক্ত হতে শুরু করে। আনুষ্ঠানিক বাধা থাকা সত্ত্বেও বাঙলাভাষীরা পার্বত্য অঞ্চলের খুচরা ও পাইকারি বাজারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।[৯]

১৯৬৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের 'স্পেশাল স্ট্যাটাস্' বাতিল করে দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতলের অধিবাসীদের বসতি স্থাপনে যে আনুষ্ঠানিক বাধা ছিল তা দূর হয়।[১০]

পাকিস্তানি শাসকরা পার্বত্য চট্টগ্রামে জমির 'প্রলোভন' দেখিয়ে সমতলের বাঙালিদের বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করে। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে পাহাড়ি জনসংখ্যা ছিল শতকরা ৯৭ ভাগ, '৬১ সালে তা কমে ৮৫ ভাগে দাঁড়ায়।[১১]

পাকিস্তান আমলে ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থায়নে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে এর নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। ইন্টারন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি এবং ইউতাহ্ ইন্টারন্যাশনাল ইন্কর্পোরেট ৬৭০.৬ মিটার দীর্ঘ ও ৫৪.৭ মিটার উচ্চতার এ বাঁধটি নির্মাণ করে। এ বাঁধের পাশে ১৬টি জলকপাট সংযুক্ত ৭৪৫ ফুট দীর্ঘ একটি পানি নির্গমন পথ বা স্পিলওয়ে রাখা হয়। এ স্পিলওয়ে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ৫ লাখ ২৫ হাজার ঘনফুট পানি নির্গমন হতে পারে। প্রকল্পের জন্য তখন ২৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা বাজেট নির্ধারণ করা হলেও পরে তা ৪৮ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়।

কাপ্তাই এলাকার অধিবাসীরা পানি সংরক্ষণের কৃত্রিম বাঁধ নির্মাণের ফলে তাদের বাড়িঘর এবং চাষাবাদযোগ্য জমি হারিয়েছেন। চল্লিশ হাজারের বেশি চাকমা অধিবাসী প্রতিবেশী দেশ ভারতে চলে যায়। জমি অধিগ্রহণ ওই এলাকায় বিরোধ ও সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এছাড়া, বাঁধ নির্মাণের কারণে জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়েছে। বন্যপ্রাণী এবং তাদের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভারত বরাবর মনে করতো, পার্বত্য চট্টগ্রামে যে নাগা ও মিজো সংগঠকরা লুকিয়ে আছে তারা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর সহায়তায় কাজ করে। ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরবর্তীকালে (জওহরলাল নেহেরুর শাসনামল) এর পাল্টা কর্মসূচি হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানকে দেশটির রাজনৈতিক মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার কর্মসূচির নিয়ে এগিয়ে যেতে নিজস্ব গোয়েন্দাদের সবুজ সংকেত দেন ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা। আরো পরে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্মকর্তা বি. রমন এ সম্পর্কে

চিত্র-কথন: 'মুজিববাহিনী'র বুলেট বেল্ট

শত্রুমুক্ত স্বাধীন দেশে, রাজধানী ঢাকাতে 'মুজিববাহিনী'র নামে শ্লোগানসংবলিত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথে নেমেছে অল্প ক'জন লোক। প্ল্যাকার্ডের লেখায় বলা হচ্ছিল, কাস্তে-কোদাল নিয়ে সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হবে।

'মুজিব*বাহিনী'র মুক্তিযোদ্ধা নামের এই লোকেরা কী ধরনের হিংসাত্মক অথবা অহিংস শ্লোগান দিচ্ছিল আজ আর তা জানা কঠিন। তবে মাত্র এ ক'জন লোকই রাজপথে তাদের কণ্ঠ উচ্চকিত করে তুলতে না-ই পারুক, হাত উঁচু করে মেলে ধরেছিল মেশিনগানের বুলেট বেল্ট।*

মনে হচ্ছে, সেদিনের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অথবা অন্য যে কোনো প্রতিপক্ষ-প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ বা গোষ্ঠীকে হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দমন করার, কোণঠাসা করে রাখার এ ছিল 'মুজিববাহিনী'র ফলদায়ক কৌশল– যে হুমকি ও কৌশল বাস্তবে রূপায়িত করতেও জুড়ি ছিল না তাদের।

বেসামরিক লোকজনের হাতে যুদ্ধাস্ত্র মানেই তা বেআইনি– এরকম জোরালো রাষ্ট্রীয় ঘোষণা জারির বহু পরেও রাজধানী এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে 'মুজিববাহিনী' এ ধরনের ঘোরতর আইনবিরোধী সশস্ত্র শক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করতো অবাধে; সে কি 'স্বদেশ' কিংবা 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার জন্য? না-কি ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার অভিপ্রায়ে?

ফটো ক্রেডিট: আমানুল হক/দৃক

বলেছেন, 'পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আইএসআই'র চালানো কার্যক্রমের অবসান ঘটাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙলাভাষীদের পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং 'বাংলাদেশ' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহায়তার সিদ্ধান্ত নেন।[১২]

ভারতীয় তরফ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সংশ্লিষ্টতার একটি বড় উপাদান ছিল একটা বিশেষ বাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে অপারেশনে পাঠানো। এই বাহিনীর নাম ছিল 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'। জেনারেল উবান ছিলেন এই ফোর্সের প্রথম ইন্সপেক্টর জেনারেল। ১৯৬২ সালের শেষদিকে এই ফোর্স গড়ে উঠেছিল। '৭১ সালে এই জেনারেল উবানই ছিলেন 'মুজিববাহিনী'র প্রশিক্ষক।[১৩]

পার্বত্য চট্টগ্রামে চূড়ান্ত অপারেশনের সময় কেবল 'মুজিববাহিনী' নয়, 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' নামের সেই আন্-কন্ভেন্শনাল বাহিনীকেও ভারতীয়রা পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করায়। এই ফোর্সের দায়িত্ব ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারত নিয়ন্ত্রিত মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের খুঁজে বের করা এবং নিশ্চিহ্ন করা।[১৩]

রাঙ্গামাটি ও সংলগ্ন সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেপড়া এই 'স্পেশাল ফোর্স' গড়ে ওঠার সময় সমস্ত আর্থিক, অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিয়েছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত দেরাদুনের অবকাঠামোর প্রায় সবই সিআইএ'র সহায়তায় তৈরি হয় মূলত ওই 'স্পেশাল ফোর্স'কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যই।[১৩]

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাথে মুজিববাহিনীর পার্বত্য চট্টগ্রাম দিয়ে অভিযান শুরু হয় নভেম্বরের শেষে। ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রশাসনিক তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে তিনজনকে সার্কেল চিফ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিল। এর মধ্যে চাকমা সার্কেল চিফ রাজা ত্রিদিব রায় মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারের সমর্থক ছিলেন। বান্দরবান সার্কেলের চিফ অংশু প্রুয়ে চৌধুরী নিরপেক্ষ অবস্থান নেন এবং মং সার্কেল চিফ মং প্রুয়ে সাই চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর অনেক সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তবে রাজা ত্রিদিব রায় এবং বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের

সভাপতি বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ভূমিকার কারণে এই প্রচারণাই ব্যাপকতা পায় যে, স্থানীয় মানবগোষ্ঠীগুলো 'বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে।'[১৪]

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের বিশেষ অস্তিত্ব ছিল না। সত্তরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় পরিষদে নির্বাচিত হন স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজা ত্রিদিব রায় আর প্রাদেশিক পরিষদে অংশু প্রুয়ে চৌধুরী ও মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। এরা কেউ-ই আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন না। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাত্রজীবনে বাম রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর বিপক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছিল অতি ক্ষীণ। ঠিক এই পটভূমিতে ডিসেম্বরে এই এলাকায় শুরু হয় জেনারেল উবানের 'মুজিববাহিনী' ও 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'-এর অভিযান।

ভারতের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সীমান্ত পথে 'মুজিববাহিনী'র সদস্য ও 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'-এর সদস্যরা ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পানছড়িতে প্রবেশ করে। একদল চাকমা তাদের অভ্যর্থনা জানাতে যায়। এদের জন্য তারা একটি খাসিও সঙ্গে নিয়েছিল। 'মুজিববাহিনী' ও 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স'-এর এই সদস্যরা খাসিটি নিলেও অভ্যর্থনাকারী সবাইকে হত্যা করে। এরপর তারা পানছড়ির পাহাড়ি গ্রামগুলোতে হামলা শুরু করে। বাড়িঘরে লুটপাট চালায় এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করে এবং মেয়েদের ধর্ষণ করে। তাদের হামলায় সেদিন পানছড়িতেই ৩২ জন নিহত হয়। পানছড়ি থেকে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পথে তারা ১৭৬টি বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। ১৪ ডিসেম্বরও তারা ২২ জনকে হত্যা করে।[১৫]

নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের ওপর উল্লিখিত ধাঁচের আক্রমণ চলে এসময় পুরো পার্বত্য চট্টগ্রাম জুড়ে এবং তা অব্যাহত থাকে একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ। ১৯৭২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি গড়ে ওঠে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি' এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রায় এক বছর পর গড়ে ওঠে এই সংগঠনের সশস্ত্র শাখা 'শান্তিবাহিনী'। 'শান্তিবাহিনী' গড়ে ওঠার অন্যতম তাৎক্ষণিক কারণ ছিল পাহাড়ি গ্রামগুলোকে 'মুক্তিযোদ্ধা'দের (প্রকৃতপক্ষে ভারত নিয়ন্ত্রিত 'মুজিববাহিনী' ও 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স') তাণ্ডব থেকে রক্ষা– তথা 'শান্তি' স্থাপন।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছিলেন ১৯৭৩-এর নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হাতে গোনা স্বল্পসংখ্যক বিরোধীদলীয় সদস্যের একজন। তিনি '৭০-এর নির্বাচনেও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হন। সেই সূত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী গণপরিষদেরও

সদস্য ছিলেন। সংবিধান প্রণয়নকালে পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবগোষ্ঠীগুলোর জাতিগত স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি বিষয়ে লারমার সংসদীয় আবেদন দু'দফা অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি পরিষদ কক্ষ থেকে ওয়াক্আউট করে প্রতিবাদ জানান।

ভারতের 'স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স' এবং জেনারেল উবানের প্রশিক্ষিত 'মুজিববাহিনী'র দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর নিগ্রহ এবং তার কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয় সংসদে তাদের জাতিগত পরিচয়ের বিষয়টি অগ্রাহ্য হওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়েই মানবেন্দ্র লারমা ও বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যক্রম শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির। এই সংগঠনেরই সামরিক শাখা হলো 'শান্তিবাহিনী'– ১৯৭৩ সালে যার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা।[১৬]

এই 'শান্তিবাহিনী'কে মোকাবিলায় শেখ মুজিব ভারতের কাছে সুনির্দিষ্ট সামরিক সহায়তা চেয়েছিলেন।[১৭]

বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সামরিক বাহিনী চলে যাওয়ার সময় তাদের সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেড রেখে দেয়া হয়েছিল কক্সবাজারে এবং ওই ব্রিগেড ১৯৭২ সালের জুলাই পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে 'অপারেশন' চালিয়ে তবেই দেশে প্রত্যাবর্তন করে। কক্সবাজারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি ব্রিগেডের উপস্থিতি গোপন রেখেই বাহাত্তরের ১২ মার্চ জানানো হয়েছিল, বাংলাদেশ থেকে সব ভারতীয় সৈন্য চলে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুদিন পর মার্চের শেষে এই বিষয়টি গণমাধ্যমে নিয়ে আসেন তরুণ এক মার্কিন সাংবাদিক। সরকার প্রথমে গণমাধ্যমের ওই প্রতিবেদনের সত্যতা অস্বীকার করলেও পরে অধিকতর বিব্রত অবস্থা এড়াতে 'পূর্বতন ভাষ্য প্রত্যাহার' করে নেয়।

বাংলাদেশের প্রচলিত রাজনৈতিক বয়ানে বরাবরই '১৯৭৬ সালে বাঙালিদের পুনর্বাসনের মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংকট শুরু' বলে ভুলভাবে দেখানো হয় এবং এর সঙ্গে 'এসএফএফ' ও 'মুজিববাহিনী'র কোনো যোগসূত্র দেখাতেও মোটা দাগে তারা ব্যর্থ হন।[১৮]

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের ১৯৬৪-তে অবলুপ্ত 'স্পেশাল স্ট্যাটাস্' পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়নি। অন্য যেকোনো জেলার চাইতে পার্বত্য জেলাগুলোর সরকারি প্রশাসনকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এর ফলে প্রশাসন এবং পার্বত্য জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরি হবার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল।[১৯]

১৯৭৫-এর জুন মাসে ‘বাকশাল’ সরকারের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব রাঙ্গামাটিতে আসেন। হাজার হাজার পার্বত্য অধিবাসীকে শেখ মুজিবের জনসভায় আনা হয় দূর-দূরান্ত থেকে। সেই জনসভায় শেখ মুজিব সবাইকে ‘বাঙালি’ হয়ে গিয়ে মূল ধারায় যুক্ত হবার আহ্বান জানান। এই সময় পাহাড়ি জনগণ সভাস্থল ত্যাগ করতে শুরু করে। এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছিল যে, কেউ-ই শেখ মুজিবের ‘বাঙালি হয়ে যাবার আহ্বান’ ভালোভাবে নেয়নি।

শেখ মুজিব পাহাড়িদের এই বলেও সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা ‘শান্তিবাহিনী’র ‘প্রতিরোধ আন্দোলনে’ যুক্ত হয় বা সমর্থন করে তবে সবাইকে ভয়ঙ্কর পরিণতি ভোগ করতে হবে। এই ভয়ঙ্কর পরিণতির মধ্যে ছিল সেনাবাহিনী পাঠানো এবং পাহাড়িদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে বাঙলাভাষীদের অভিবাসিত করা।[২০]

এরপর থেকে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা পাঠানো শুরু হলো। দীঘিনালা, রুমা এবং আলীকদমে সেনানিবাস গড়ে তোলা হলো এবং ঘাগড়া-তে একটি আনসার ব্যাটালিয়ন নিয়োগ দেয়া হলো।

শেখ মুজিবের আমলেই পাহাড়ে ব্যাপক নিপীড়ন ও গ্রেপ্তার এবং বেপরোয়া খুন ও ধর্ষণ শুরু হলো, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হলো। পরবর্তীকালে এই নিপীড়ন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২০]

১৯৭৪ সালের প্রথমদিকে প্রথম সেনাবাহিনীর একটি ব্যাটালিয়ন পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে সেনা সদস্যদের স্থায়ীভাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এতে স্থানীয় সার্কেল চিফ বা রাজারা সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনটি ফ্রি-স্টেশন ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অসম্মতি জানালেন না। সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় একটি সেনানিবাস স্থাপনের। এবং ওই বছরের শেষদিকে দীঘিনালায় সেনানিবাস নির্মাণের কাজে হাত দেয় মুজিব সরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা মোতায়নের পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর দেয়া দু’টির মধ্যে একটি হেলিকপ্টার দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে তল্লাশি চালানো হতো।[২১]

উল্লেখ্য, মানবেন্দ্র লারমার শ্বশুরবাড়ি ছিল দীঘিনালায়।[২১]

চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়সহ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একটি অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাহাড়ি জনগোষ্ঠী নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে গিয়েছিল। যুদ্ধের পুরো সময়কালে

পাহাড়ি জনগণের বৃহদাংশ তাদের নির্লিপ্ত ও নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রেখেছিল। এদেরই ছোট একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল।

কিন্তু যুদ্ধের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে সদ্যস্বাধীন দেশে 'মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য অস্ত্রধারী'রা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর ওপর হামলা শুরু করলো। তাদের গ্রামের পর গ্রাম তছনছ ও লুটতরাজ করলো। তারা পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা তছনছ করে দিলো যুদ্ধজয়ের পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে।[২২]

কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে আসল সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তৎপরতা প্রথম শুরু করলো সদ্যস্বাধীন দেশের নতুন সরকার। 'রক্ষীবাহিনী' নামানো হলো এবং তারা পাকবাহিনীর সহযোগীদের খুঁজে বের করা ও তাদের লুকানো অস্ত্র, গোলাগুলি উদ্ধারের নামে অত্যাচার-নির্যাতন আর ধ্বংস-লুটতরাজের একশেষ করে ছাড়লো। এটা ঠিক যে, যুদ্ধের শেষদিকে পাকিস্তানি বাহিনী পাহাড়ি জনগোষ্ঠী থেকে 'রাজাকার' ও 'মুজাহিদ' বাহিনীতে সদস্য সংগ্রহ করেছিল, কিন্তু 'রক্ষীবাহিনী'র এসব 'অপারেশনে' শত শত নিরপরাধ ও নিরীহ পাহাড়ি নারী-পুরুষ-শিশু নির্মম নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হয়। [২৩]

সূত্র:

১. চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও অধিবাসী; অনুবাদঃ রাজীব এল দাস, দিব্য প্রকাশ, ২০১৭, পৃষ্ঠাঃ ৩৮-৩৯

২. Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh; IWGIA Document 51, Wolfgang May (ed.), Page: 14-15

৩. প্রাগুক্ত; Page: 16

৪. প্রাগুক্ত; Page: 18

৫. প্রাগুক্ত; Page: 19

৬. প্রাগুক্ত; Page: 20

৭. প্রাগুক্ত; Page: 22

৮. প্রাগুক্ত; Page: 23

৯. প্রাগুক্ত; Page: 25

১০. প্রাগুক্ত; Page: 26

১১. পার্বত্য চট্টগ্রামে বহুমাত্রিক সমস্যার ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক পটভূমি; শাহরিয়ার কবীর, বিডিনিউজ২৪, ৭ জানুয়ারি ২০১০

১২. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ৭৩

১৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৭২

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১২০

১৫. মুক্তিযুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রাম; শরবিন্দু শেখর চাকমা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ৪৩

১৬. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২৯১

১৭. J. N. Dixit, Liberation and Beyond: Indo-Bangladesh relation; UPL, 1999, Dhaka, page: 138, 158

১৮. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ১২০-১২১

১৯. Genocide in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh; IWGIA Document 51, Wolfgang May (ed.), Page: 27

২০. প্রাগুক্ত; Page: 58-59

২১. ১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন; আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ১৫২

২২. Cited in Uddin, Nasir. "Living on the margin: the positioning of the 'Khumi'within the sociopolitical and ethnic history of the Chittagong Hill Tracts." Asian Ethnicity 9, no. 1 (2008): 33-53.

Cited in- NASREEN, ZOBAIDA (2017) The Indigeneity question: State Violence, Forced Displacement and

Women's Narratives in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh, Durham theses, Durham University.

Available at Durham E-Theses Online. To view this Thesis Scan the QR Code:

২৩. Tribal Insurgency in Chittagong Hill Tracts; Kazi Montu, Economic and Political Weekly, Vol. 15, No. 36 (Sep. 6, 1980), pp. 1510-1512. To view this Journal Scan the QR Code:

উনিশ অধ্যায়

’৭৪-এর দুর্ভিক্ষ

‘ভাত দে হারামজাদা, তা না হলে মানচিত্র খাবো’।

’৭২-এর শুরুতে মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, মহাদুর্ভিক্ষ আসন্ন।

’৭৩-এর শুরুতে পণ্যমূল্য বাড়ছিল ক্রমাগত। শিশুখাদ্যের দাবিতে মিছিলে যোগ দিলেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মায়েরা।

খাদ্য সরবরাহ ও পণ্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে মওলানা ভাসানীর আমরণ অনশন।

খাদ্য সংগ্রহ ও ভারতে খাদ্য চোরাচালান দমনে অব্যাহতভাবে ব্যর্থ সরকার।

প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ সংস্থার চেয়ারম্যানের ঢাকার বাসা। সন্ধ্যার দিকে দারোয়ানের নজর এড়িয়ে কীভাবে যেন ছয় সদস্যের একটি অভুক্ত পরিবার বাসায় ঢুকে পড়লো। হাড্ডির সাথে সেঁটে থাকা চামড়া, জ্বলজ্বলে চোখ– পশুর মতো। কোলের বাচ্চাটির নাক, মুখ ও চোখে মাছি ভন্ ভন্ করছে। পরিবারের কর্তাটি ভাত চাইলো না। চেয়ারম্যানের স্ত্রীর কাছে মিনতি করলো ফ্যান (ভাতের মাড়) দিতে। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখে গৃহকর্তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, ঠোঁট কেঁপে-কেঁপে উঠছে। বাচ্চাদের জন্য রান্নাকরা বুটের ডাল আর

চিত্র-কথন:

১৯৭৪–এর দুর্ভিক্ষে লঙ্গরখানার সামনে ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুদের ভিড়। কর্মসংস্থান না থাকায় এবং দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় এ সময় গ্রামাঞ্চলের গরিব লোকজন দলে দলে শহরাঞ্চলে এসে ভিড় জমাতে থাকে। সরকার অব্যাহতভাবে দাবি করতে থাকে যে, পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। যখন ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনো খাদ্যমন্ত্রী গোটা জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছিলেন যে, খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা একটি সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি দাবি করছিলেন যে, সরকারের হাতে যথেষ্ট চালের মজুত রয়েছে।

সরকারি দলের নেতারা তখন এ পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ী, মজুদদার, কালোবাজারি ও চোরাচালানিদের দায়ী করে বলছিলেন যে, তারা খাদ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। তারা বলছিলেন, 'সমাজবিরোধী' এবং 'রাষ্ট্রবিরোধী' লোকেরাই ছিল এ পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

দেশের অসংখ্য দরিদ্র লোক ক্ষুধার তাড়নায় মিষ্টি আলু, কচু, কলার থোড়, চালের কুড়া, ভাতের মাড় ও নানারকম লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে বাধ্য হলো।

ফটো ক্রেডিট: মিশেল লোহ্যো

কুঁড়োর রুটি সবই দিয়ে দিলেন তিনি পরিবারটিকে। ওরা যা না খেল, তার চেয়ে এঁটো করলো বেশি। অনেক দিন না খেতে খেতে খাওয়ার অভ্যাস চলে গেছে ওদের। বাড়িতে আর কোনো খাবার কিংবা হাতে কোনো পয়সা না থাকাতে পেট ভরে পানি খেয়ে সে রাতে ঘুমুতে গেল প্রকৌশল ও জাহাজ নির্মাণ সংস্থার চেয়ারম্যানের সন্তানেরা।[১]

স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ নামের এই ভূখণ্ডে অনেক আগে থেকেই খাদ্য ঘাটতি ছিল একটি নৈমিত্তিক ঘটনা। খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালেও ছিল ৫ লাখ টন। ষাটের দশকের শেষের দিকে তা বেড়ে প্রায় ১৫ লাখ টন হয়। ১৯৬৮ সাল থেকে পরপর তিন বছর ভয়াবহ বন্যা হয়। ১৯৬৮ সালে ১৪,৪০০; ১৯৬৯ সালে ১৬,০০০ এবং ১৯৭০ সালে ১৬,৪০০ বর্গমাইল এলাকা বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পত্তিনাশসহ প্রায় ২২ লক্ষ টন ধান বিনষ্ট হয়। এমনকি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালেও বন্যা হয় এবং প্রায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত হয়। এতে প্রায় ৩,০০,০০০ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয় এবং একই বছরে অভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি ১১ শতাংশ হ্রাস পায়।[২]

১৯৭৪ সালে দেশ দু'বার বন্যার কবলে পড়ে। প্রথমবার সিলেটে এক আকস্মিক বন্যায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। একই বছর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত দেশব্যাপী বন্যা ছিল দেশের ইতিহাসে ভয়াবহতম। আকস্মিক বন্যায় দেশের সমস্ত বোরো ফসল বিনষ্ট হয়। এতে মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় দেড় লাখ টন। চাষযোগ্য বিল ও হাওড় অঞ্চলে প্রধান ফসল বোরো ধান পুরোপুরিভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। মাঝ-বছরী বন্যায় দেশের মোট এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং বন্যাকবলিত হয় প্রায় ৩ কোটি লোক। এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। প্রায় ১ কোটি একর জমি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিপুলসংখ্যক গবাদিপশু নিহত ও ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়।[৩]

এই বন্যার পটভূমিতে রংপুরের বাসন্তী ও দুর্গা নামে দুই নারীর ছবি 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। সেই ছবির দুই যুবতী লজ্জা নিবারণের জন্য একটি শতচ্ছিন্ন মাছ ধরার জাল জড়িয়ে যে নিদারুণ অসহায় ভঙ্গিতে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তাতে ১৯৪৩-এর মতো একটি ভয়াবহ মন্বন্তরের সংকেত নির্দেশিত হয়েছিল।[৪]

আগস্টের মাঝামাঝি আমনের বিছন যখন উঠছে, বন্যা তখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো। সদ্য রোয়া আমনের চারা সব নষ্ট হয়ে গেল। সেপ্টেম্বরের প্রথমে ব্রহ্মপুত্র আবারো বিপদসীমা অতিক্রম করলো। আগের বন্যার পর রোয়া ধানের যা অবশিষ্ট ছিল এবার সেটাও গেল।[৫]

১৯৭২-এর মার্চে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'নিউজউইক'-এর প্রচ্ছদ নিবন্ধ (Cover Story) 'Bangladesh : Fight for survival'-এ স্পষ্ট বিবরণ ছিল, 'বাংলাদেশে খাদ্য ব্যবস্থাপনার সংকট দুর্ভিক্ষের জন্ম দিতে যাচ্ছে এবং দেশটিতে মানবিক বিপর্যয় ঘটবে'।[৬]

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছিলেন অনেকে। তবে ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হবার আগে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময় ছিল দেশের জন্য সবচেয়ে বেশি সংকটজনক।[৩] বাহাত্তরের ২২ জানুয়ারি দেশে ফিরে মার্চে মওলানা ভাসানী প্রথম যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন, তার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'মহাদুর্ভিক্ষ অত্যাসন্ন'।[৬]

'৭৩ সাল থেকেই হু হু করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল। শিশুখাদ্যের দাম চলে গেল নাগালের বাইরে। শিশুখাদ্যের দাবিতে মিছিল হলো, তাতে যোগ দিলেন গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের মায়েরা। ১৯৭৩ সালের মে মাসে মওলানা ভাসানী খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য কমানোর দাবিতে আমরণ অনশন শুরু করেন। ভাসানীর অনশনের খবরে সারা দেশ স্ফুলিঙ্গের মতো জেগে উঠলো। মতিঝিলে ন্যাপ অফিসের দোতলায় আমরণ অনশনরত ভাসানী শুয়ে থাকতেন। হাজার হাজার মানুষ তাকে এক নজর দেখার জন্য মতিঝিলে ছুটে এসেছিল।

অনশনের দ্বিতীয় দিনে সন্ধ্যায় তিনটি গাড়ি নিয়ে শেখ মুজিব স্বয়ং এসে হাজির হলেন। মওলানা ভাসানীর সাথে একান্তে আলাপের পরে যখন তিনি ফিরে যাচ্ছেন, তখন সমবেত জনতা খাদ্যের দাবিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্লোগান তোলে। হঠাৎ শ্লোগান উঠলো– 'ইয়াহিয়া গেছে যে পথে, মুজিব যাবে সেই পথে'। এই শ্লোগানে শেখ মুজিবের চেহারা তখন অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিল।[৭]

১৯৭৩ সালের ১০ অক্টোবর দেশের সুপরিচিত ও জনপ্রিয় 'দৈনিক গণকণ্ঠে'র সম্পাদকীয়'র শিরোনাম ছিল: 'ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি'।[৬]

একদিকে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবং অন্যদিকে চোরাচালান দমনে সরকারি ব্যর্থতা অব্যাহত থাকায় খাদ্য বিভাগের হাতে যে সামান্য খাদ্য মজুদ ছিল, প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের জুন মাসের মধ্যে তা তলানীতে এসে ঠেকে।[৮] এভাবে বাংলাদেশ এক ব্যাপক খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়। বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন আগে থেকেই এ ধরনের ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে অব্যাহতভাবে সতর্ক করে আসছিলেন।[৯]

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় প্রতিদিনই জিনিসপত্রের দাম বাড়তে

চিত্র-কথন: বাসন্তী ও দুর্গা

’৭২ থেকে ’৭৫, স্বাধীন দেশের প্রথম *তিন-চারটি বছর, শুধু যে আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ এবং ভয়ঙ্কর রকম অবনতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল তা নয়, সর্বব্যাপী অনিয়ম আর নৈরাজ্য তখন জাতীয় অস্তিত্বকে গ্রাস করতে উদ্যত। নেতিবাচক সমস্ত ধারা ও সূচকের পেছনে কুশীলব ক্ষমতাসীন দল ও মহল, তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তি ও গোষ্ঠী এবং তাদেরই দেশি-বিদেশি রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।*

জাতীয় অর্থনীতির অভাবনীয় মাত্রার অব্যাহত সংকট ও দুর্দশা জাতির দেহের মেদ-মাংস সাবাড় করার পর এর অস্থিমজ্জা শুষে নিচ্ছিল। নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত সমাজে তখন ত্রাহি! ত্রাহি!! রব। কিন্তু পল্লী-প্রধান বাঙলার দূর আর প্রত্যন্ত পল্লীজীবনের খবর কতটুকুই-বা এসে পৌঁছতো সেদিনের গণমাধ্যম অর্থাৎ, সংবাদপত্রের কাছে। সংকট-দুর্দশার বিরুদ্ধে নগরজীবনে দাবি উত্থাপন আর প্রতিবাদ জ্ঞাপনের যে আচার-সংস্কৃতি, সেদিনের অতি পশ্চাদ্‌পদ গ্রামীণ জীবনে তা ছিল অনুপস্থিত।

খাদ্য সংকটে সারা দেশে মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের শিকার, হাজার হাজার কঙ্কালসার আদম সন্তান যখন পথের ধুলায় ধুঁকে মরছে, নিরন্ন-অনাহারী পল্লীবাসীর ঢল যখন বয়ে চলেছে শহর-নগর অভিমুখে, তখন তাদের বস্ত্র সংকটের বিষয় পেছনে পড়ে গিয়েছিল নিশ্চয়ই। উত্তরবঙ্গে পল্লীর বস্ত্র সংকটে জর্জরিত শত শত অর্ধ-উলঙ্গ নারী শহরে এসে প্রশাসনের দপ্তর ঘেরাও করেছিল।

রংপুরের বন্যকবলিত জনপদে লজ্জা নিবারণের জন্য ‘বাসন্তী’ ও ‘দুর্গা’ নামে দুই যুবতী নারীর দেহে মাছ ধরার শতচ্ছিন্ন জাল জড়ানোর ছবি তখনকার প্রধানতম জাতীয় সংবাদপত্র ‘দৈনিক ইত্তেফাক’-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকর্তারা এতসবের পেছনে নিজেদের দায় স্বীকার করে নিতে চাননি।

ফটো ক্রেডিট: আফতাব আহমেদ

থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতি সের মোটা চালের দাম ছিল ৩.৯০ টাকা, ক্রমাগত বেড়ে তা আগস্ট মাসে ৪.৭৮ টাকায়, সেপ্টেম্বর মাসে ৬ টাকায় ও অক্টোবর মাসে দাঁড়ায় ৭.১৬ টাকায়।[১০]

১৯৭১-৭২ সালে যেখানে মাঝারি মানের এক মণ চালের দাম ছিল ৫৭.১০ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৪৪.৪০ টাকায়। ১৯৭৪ সালে প্রায় সকল সামগ্রীর মূল্য ৩০০ থেকে ৪০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।[১০]

এভাবে ১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই সারা দেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। ইতোমধ্যেই খাদ্যের অভাবে দেশের লোক অনাহার ও অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিল।[১১]

কর্মসংস্থান না থাকায় এবং দ্রব্যমূল্য ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় এ সময় গ্রামাঞ্চলের গরিব লোকজন দলে দলে শহরাঞ্চলে এসে ভিড় জমাতে থাকে। এ অবস্থায় দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সংবাদপত্রসমূহ বারংবার সরকারকে সতর্ক করে দিলেও সরকার অব্যাহতভাবে দাবি করতে থাকে যে, পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রংপুরে যখন ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তখনো খাদ্যমন্ত্রী গোটা জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছিলেন যে, খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা একটি সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি দাবি করছিলেন যে, সরকারের হাতে যথেষ্ট চালের মজুদ রয়েছে।

সরকারি দলের নেতারা তখন এ পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ী, মজুদদার, কালোবাজারি ও চোরাচালানিদের দায়ী করে বলছিলেন যে, তারা খাদ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। তারা বলছিলেন, 'সমাজবিরোধী' এবং 'রাষ্ট্রবিরোধী' লোকেরাই এ পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এপ্রিল মাসেও খাদ্যমন্ত্রী ফণীভূষণ মজুমদার আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রতি মাসে ২,০০,০০০ টন করে খাদ্যশস্য আমদানি করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এই বক্তব্য ছিল অসত্য।[১১]

দেশের অসংখ্য দরিদ্র লোক ক্ষুধার তাড়নায় মিষ্টি আলু, কচু, কলার থোড়, চালের কুড়া, ভাতের মাড় ও নানারকম লতাপাতা খেয়ে জীবনধারণ করতে বাধ্য হলো। অনশনকে যদি দুর্ভিক্ষের একটি পর্যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকেই সোনার বাংলার মাটিতে অসংখ্য লোক অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছিল।[১২]

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে কৃষকেরা তাদের জমি-জিরাত বিক্রি করে খাদ্য কিনতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে হিসেব করে দেখা গেছে যে, উত্তরবঙ্গে ১ লাখ বিঘা জমি হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এসব জমি প্রধানত আওয়ামী লীগের স্থানীয় চাঁইরা সস্তায় কিনে নেয়।[১৩]

জনগণের অবর্ণনীয় দুর্দশাকেও আওয়ামী লীগের নেতারা সম্পদ সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

কমলাপুর স্টেশন ও তোপখানা রোডের ফুটপাতে প্রতিদিন ৮-১০টা মৃতদেহ পড়ে থাকতো। বামপন্থি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবী হায়দার আকবর খান রনো পার্বতীপুর রেলস্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মে অসংখ্য মৃত ও মৃতপ্রায় মানুষকে পড়ে থাকতে দেখেন, যাদের গায়ে পা না দিয়ে চলা ছিল অসম্ভব। জুতার তলার চামড়া খেয়েও ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা চালাতো।[১৪]

'গাইবান্ধা স্টেশনে ১৯ আগস্ট ৮৮-ডাউন লোকাল ট্রেন এসে ভিড়েছে, প্লাটফর্মে পড়ে থাকা ক্ষুধায় মৃতপ্রায় লোকটা বুক ঘষে গিয়ে বেচাইন যাত্রীর উগলে ফেলা বমির ভাতগুলো গোগ্রাসে চেটে নিচ্ছে'— দুর্ভিক্ষ নিয়ে লিখতে গিয়ে পত্রিকায় লিখলেন এক কলাম লেখক।[১৫]

কলামিস্ট আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী পত্রিকায় কিছু লিখতে না পারার বেদনায় লিখলেন— 'বন্ধুগো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে...।' কী বিষ, কেন আমরা নীল হয়ে উঠেছি, তা বলতে দেবেন না সম্পাদক সাহেব।

পত্রিকায় দুর্ভিক্ষের খবর সেন্সর করা হচ্ছিল। এতসব সেন্সরের মাঝেও পত্রিকায় শিরোনাম হলো— 'ত্রাণশিবিরগুলোতে ক্ষুধা আর মৃত্যুর হাহাকার' (দৈনিক জনপদ); 'আশ্রিত মানুষ কি নামবে ভিক্ষুকের মিছিলে' (বাংলার বাণী); 'আমরা কোথায় যাই' (দৈনিক বাংলা)।

সন্তান বিক্রি হয়েছে যত্রতত্র, সর্বত্র। নারীর দেহ বিক্রি হয়েছে রাজধানীতে। শঙ্কা প্রকাশ করেছে সংবাদপত্র— 'এ নগরী যেন রমণীকুলের হাট না হয়ে দাঁড়ায়'। 'তারপর লাশের পালা শুরু। শেরপুরে যে মানুষ ক'টি গত রাতে রাস্তায় ধুঁকছিল, কি আশ্চর্য! পরদিন রাতে তারা নিশ্চুপ, একদম অনড়।'

‘ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তচীৎকারে ঘুম ভাঙার’ শিরোনাম হলো রাজধানীর প্রতিবেদনে। গ্রামের জরিপ বেরুলো সাংবাদিকদের চেষ্টায়, দেখা গেল শতকরা ৮০টি পরিবারের হাতে সপ্তাহ কাটাবার খাদ্য নেই। জমি বিক্রি চললো জলের দরে। সিলেটে অনাহারক্লিষ্ট পিতা-মাতা হত্যা করলো কন্যাকে। রাজধানীর পথে পথে বিস্ময়– ‘এরা জীবিত না কঙ্কাল’। কবি শামসুর রাহমানের কলমে বিস্ময়– ‘এ কোন বাংলাদেশ’। বগুড়ায় চেষ্টা চললো হাঁস-মুরগির খাদ্য খেয়ে বাঁচা যায় কি-না; কলেরা ভেদবমি থেকে যারা বাঁচলো তাদের কেউ আত্মহত্যা করলো, কেউ আত্মীয়াকে দেহদানে নামালো। যে কবির কলম ’৬৯-এ লিখেছিল ঐতিহাসিক সংবাদ শিরোনাম, ‘মৃতের জানাজা মোরা কিছুতেই করিব না পাঠ কবরের ঘুম ভাঙে– জীবনের দাবি আজ এতই বিরাট’, তিনিই আবার ’৭৪-এ উচ্চারণ করলেন,

‘রাজপথে এসব শিশুর কঙ্কাল– মাতৃস্তনহীন
দধীচির হাড় ছিল এর চেয়ে আরো কি কঠিন?’
তারপর এলো ‘লঙ্গরখানার পদাবলী’–
‘লাইনে অভুক্ত মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফুরিয়ে যায় খাবার।
স্রেফ ভুষিগুলো তুলে দেয়া হয় পাতে।
গ্রামে গ্রামে আরেক মাতম্–
লঙ্গরখানাকে ওরা ভয় পায়–
সারা দিনে একবার খেতে দেয়।’ (ঢাকা ডাইজেস্ট)[১৫]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর হিসাবমতে, ওই সময় ৫০ লাখ নারী নগ্নদেহে ছিল; পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।[১৬]

সেই সময় ‘দৈনিক ইত্তেফাক’-এর ফটো সাংবাদিক আফতাব আহমেদ ‘জাল-পরা বাসন্তী’ শিরোনামের বিখ্যাত ছবিটা তোলেন। ‘ইত্তেফাক’-এর প্রথম পাতায় ছাপা হয় সেই ছবি। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের রূপ সারা দুনিয়াতে এই ছবির মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়।

ছবিতে দেখা যায়, বাসন্তী নামের এক যুবতী তার সমস্ত শরীরে মাছ ধরার জাল জড়িয়ে লজ্জা নিবারণের মিথ্যে সান্ত্বনা বুকে নিয়ে কলাগাছের ভেলায় চড়ে কলাগাছের পাতা সংগ্রহ করছেন। সেই ভেলায় আরেকজন নারী দুর্গতি রাণী বাঁশ হাতে ভেলার অন্য প্রান্তে বসে নিয়ন্ত্রণ করছেন বন্যার পানিতে ভেসে চলা ভেলাটিকে।

চরম দারিদ্র্য আর তার সাথে মিলিত ক্ষুধার দুঃসহ প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে ছবিটা।

দেশে-বিদেশে তোলপাড় শুরু হয়। বাসন্তীর জালপরা ছবিটিকে ঘিরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকার। সরকারের পক্ষ থেকে ছবিটিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়।

অথচ কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, 'ইত্তেফাক'-এর সেই আলোকচিত্রী আফতাব আহমেদকে বাসন্তীর কাছে যে নিয়ে গিয়েছিল, সে ছিল আওয়ামী লীগের গ্রাম পর্যায়ের এক কর্মী। তার নাম আনসার আলী। আফতাব আহমেদ পরবর্তীকালে 'একুশে পদক' পান।

আফতাব আহমেদ ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা আলোকচিত্র সাংবাদিক। আমরা ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় 'জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণের দলিল পড়ছেন', সেই যে বিখ্যাত ছবিটা দেখি, সেটাও তুলেছিলেন আফতাব আহমেদ।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সর্বদা জোর প্রচার চালানো হয়, 'জালপরা বাসন্তী' ছবিটা সাজানো ছবি ছিল। কিন্তু ছবিটা সাজানো ছিল না।

সবচেয়ে দুর্গত এলাকা ছিল রংপুর, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, সিলেট ও বরিশাল। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে যখন বেসরকারিভাবে কিছু লঙ্গরখানা গড়ে উঠেছিল, তখন সরকারিভাবে দুর্ভিক্ষ ঘোষিত হলো। সরকারিভাবে লঙ্গরখানা চালু হতে থাকলো অক্টবরের শুরুতে। প্রায় ছয় হাজার লঙ্গরখানা দৈনিক সাড়ে তেতাল্লিশ লাখ মানুষের মধ্যে রান্নাকরা খাবার বিলিয়েছে।[১৭]

অনেক অর্থনীতিবিদ, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী একবাক্যে দাবি করেছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সে বছর বন্যা না হলেও অসংখ্য মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করতো। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন মহল ও সরকারের অযোগ্যতা, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতিই নয়, সরকার এবং ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীর অবহেলা আর উদাসীনতা ছিল এই দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলাংশে দায়ী। অভিযোগ রয়েছে যে, সে সময় ব্যাপকহারে খাদ্য চোরাচালানও অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল।[১২] যদিও 'নিরপেক্ষ গবেষণা'য় খাদ্য চোরাচালানকে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে শনাক্ত করা যায়নি।

সারা দেশে স্থাপিত লঙ্গরখানাগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের দুর্নীতি, খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে কারচুপি এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের ছত্রচ্ছায়ায় সারা দেশে মজুদদারি ও চোরাচালান

অব্যাহত থাকায় দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি।[১৮]

দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন লঙ্গরখানা খুলে খিচুড়ি খাওয়ানো হতো, সেখানে ফাপর দালালি করতে যেতেন আওয়ামী লীগের কিছু নেতা ও সংসদ সদস্য। লঙ্গরখানা তদারকির সময় তারা 'স্টেট এক্সপ্রেস ৫৫৫' ব্র্যান্ডের বিলাতি সিগারেট ফুঁকতেন, এবং তা-ও লুকিয়ে নয়, ক্ষুধার্ত মানুষের সামনেই। তাদের নাইলনের দামি শার্টের বুকপকেটে রাখা থাকতো সেই সিগারেটের প্যাকেট, যা জ্বলজ্বল করতো বলে দৃষ্টিগোচর হতো। অথচ ৫৫৫ ব্র্যান্ডের সিগারেটের শত ভাগই চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে ঢুকতো এবং প্রতি প্যাকেটের দাম ছিল তখন ২৫ টাকা। পঁচিশ টাকায় তখন একটি দরিদ্র পরিবার কয়েকদিনের খাদ্যের সংস্থান করতে পারতো।[১৯]

সরকারিভাবে জাতীয় সংসদে ঘোষিত তথ্য অনুসারে দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ২৭,৫০০। তবে বেসরকারি হিসেবে এই সংখ্যা ১ লাখের বেশি। মোট লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল ৫,৮৬২টি।[২০]

লঙ্গরখানায় খাবার গ্রহীতাদের সব থেকে বড় অংশ অর্থাৎ ৪৫ ভাগ ছিল দিনমজুর। আর ৩৯ ভাগ ছিল কৃষক। তবে দিনমজুরদের মধ্য থেকে যদি কৃষি-মজুরদের আলাদা করা হয়, তাহলে এই দুর্গত মানুষদের বেশির ভাগই ছিল কৃষক।[২১]

অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে নিয়মিত খাদ্য সাহায্য পেয়ে আসছিল। সমাজতান্ত্রিক কিউবার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক থাকার কারণে এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা (বিজেএমসি) থেকে কিউবায় ৪০ লাখ চটের বস্তা রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয়ায় যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৪-এর সেপ্টেম্বরে খাদ্য সাহায্য বন্ধের হুমকি দেয়। কারণ 'পিএল-৪৮০' অনুযায়ী খাদ্য সাহায্য পেতে হলে, সেই দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কালো তালিকাভুক্ত কোনো দেশের সাথে বাণিজ্য করতে পারে না।[২২]

সরকার আর সিপিবি ঘরানার বাম মহল দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় সরকারের ব্যর্থতাকে ঢাকতে মার্কিন খাদ্য সাহায্য না দেয়াটাকেই প্রধান কারণ হিসেবে দেখিয়ে থাকে। অথচ অমর্ত্য সেনের গবেষণায় দেখা গেছে, শেখ মুজিবের শাসনকালে ১৯৭৪-এ মাথাপিছু চালের উৎপাদন সর্বোচ্চ ছিল।[২৩] ফলে মার্কিন খাদ্য সাহায্য না পাওয়া দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী নয়।

ময়মনসিংহ, রংপুর আর সিলেট জেলাতে দুর্ভিক্ষ সবচেয়ে বেশি আঘাত

হেনেছিল। এই জেলাগুলোতে চালের উৎপাদন ১৯৭৪ সালে বেড়েছিল যথাক্রমে ২২, ১৭ ও ১০ ভাগ।[২৪]

১৯৭৪-এর বন্যার অনেক আগে থেকেই চালের দাম বাড়তে থাকে। বন্যার কারণে আমন চাষের যা ক্ষতি হয়েছিল, তার কোনো প্রভাব দুর্ভিক্ষের প্রথম মাসগুলোতে ছিল না। কারণ, সেই আমন শস্য ঘরে তুলবার কথা ছিল নভেম্বর-ডিসেম্বরে। আমনের বাস্তব ঘাটতির চেয়ে ঘাটতির গুজব ছিল জোরালো। এই সুযোগে ব্যবসায়ী ও মজুদদাররা খাদ্যশস্য বাজার থেকে হাওয়া করে দেয়।[২৫]

বস্তুত চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ বাংলাদেশের নব্য ধনিক শ্রেণির সামনে সম্পদ পুঞ্জিভবনের একটি বড় দরজা উন্মোচন করে দিয়েছিল।[৬]

দুর্ভিক্ষ সংঘটনে বন্যার প্রভাব ছিল পরোক্ষ। কৃষকেরা সবচেয়ে বেশি কাজ করে এবং আয় করে আষাঢ়-শ্রাবণে অর্থাৎ জুন-আগস্টে। সেই সময়েই বন্যার পানিতে কাজের সুযোগও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে কৃষক ও কৃষিমজুরের ক্রয়ক্ষমতা কমে গিয়েছিল মারাত্মকভাবে।[২৬]

শুধু গ্রামীণ কৃষক আর দিনমজুরই নয়, সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনে খাদ্য প্রাপ্তি একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্তরাও ভাতের মাড় খাওয়া শিখলো ১৯৭৪ সালে। বাসায় বাসায় ভাতের মাড় খাওয়া শুরু হলো। তারা লবণ মিশিয়ে ভাতের মাড় খেত। মধ্যবিত্ত সচেতন বাঙালি এটাকে চরম অপমান ও অসম্মান হিসেবে নিয়েছিল।

দুর্ভিক্ষ শহুরে চাকরিজীবীদের জীবনেও বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা রেশনের কুড়ায় বানানো রুটির পোকা বেছে নাশ্‌তা করে দামি গাড়িতে চড়ে অফিসে যেতেন।[২৭]

ভিক্ষুকরাও বাসায় বাসায় ঘুরে ভাত নয়, ভাতের মাড় চাইতো, তাও সহজে পেত না।[৬]

দারিদ্র্যের দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় বিদেশি সাহায্যসামগ্রীর অধিকাংশ এ সময় বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হতো। কম্বল, জ্যাম, টিনের খাদ্য, গুঁড়ো দুধ– সবকিছুই (বিশেষ মূল্য দিলে) ঢাকার দোকানপাটে পাওয়া যেত। এক দূতাবাসের হিসাবে, দূতাবাসটি পশ্চিম দেশীয় নয়, বিদেশি সাহায্য ও সাহায্যসামগ্রীর ১৫ শতাংশেরও কম দুর্গত জনসাধারণের হাতে পৌঁছায়। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মণিকে দুর্ভিক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, ‘দোষ আমাদের সরকারের নয়, দোষ সেসব সরকারের যারা

প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মতো খাদ্যশস্য পৌঁছে দেয়নি।'[২৮]

চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষকালেই রচিত হয়েছিল কবি রফিক আজাদের কবিতা 'ভাত দে হারামজাদা'– যা সে সময় ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। শহুরে মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গের বেদনা আর অপমান বিস্ফোরকের মতো ঝরে পড়ে রফিক আজাদের কলমে। কবিতার দুটো বিস্ফোরক লাইন ছিল–

"ভাত দে হারামজাদা,
তা না হলে মানচিত্র খাবো।"

দুর্ভিক্ষ চলাকালীন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার সময় পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিব পৃথিবীর সবচাইতে ধনাঢ্য দেশ আমেরিকার ঐশ্বর্য্যের প্রতীক জন ডি রকফেলার (৩য়)-এর সাথে আলাপ করেন। কিন্তু সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত সময়ে শেখ মুজিব 'ব্লেয়ার হাউসে' আসতে পারেননি।[২৯]

রকফেলার বিলম্ব সত্ত্বেও শেখ মুজিবকে অত্যন্ত অমায়িকভাবে গ্রহণ করেন এবং সাক্ষাতের জন্য যতটা সময়ের প্রয়োজন তা দিলেন।

হালকা সবুজ সোফায় সোজা হয়ে বসে হঠাৎ তাঁর বাগ্মীসুলভ কণ্ঠস্বর চড়িয়ে মুজিব বললেন যে, বিদেশিরা যখন তার দেশের দারিদ্র্য নিয়ে কৌতুক করেন এবং বলেন যে, তাকে সাড়ে সাত কোটি লোকের জন্য– এদের মধ্যে অসংখ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত– খাদ্য ভিক্ষা করতে হবে, তখন তিনি অত্যন্ত আহত বোধ করেন।

পরদিন 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এ এই সাক্ষাৎ নিয়ে লেখা হলো–

"মুজিব এমন সহজভাবে, স্বভাবসুলভ ঔদ্ধত্যে নয়, কথা বলেন যে, বাংলাদেশ যেন তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বললেন, 'আমার কি আছে জানেন? আমার সম্পদ আছে।' তিনি যে নিজেকে একজন সোশ্যালিস্ট দাবি করছেন এবং তিনি যে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা বলছেন না, এটা বুঝতে কম করেও মিনিটখানেক সময় লাগলো। বললেন, 'আমার দুই শ' মিলিয়ন টন চুনাপাথর আছে, আমার পাঁচ শ' মিলিয়ন টন কয়লা আছে, আমার নয় ট্রিলিয়ন ঘনফুট

চিত্র-কথন:

দুর্ভিক্ষের সময়ে লঙ্গরখানার বাইরে ক্ষুধার্ত মানুষ

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

প্রাকৃতিক গ্যাস আছে।' এই হচ্ছে আমেরিকানদের ধারণার প্রতিবাদে মুজিবের জবাব। আমেরিকানরা ধরে নিয়েছে যে, বাংলাদেশে মূলধন নেই, সম্পদ নেই, ভবিষ্যতও নেই। এ ধারণা মুজিব পরিবেশিত তথ্যের ও তাঁর 'মর্যাদার' পক্ষে অবমাননাকর।

মুজিবের লক্ষ্যবস্তু অত্যন্ত জরুরি; 'আমার দেড় হাজার লঙ্গরখানা আছে। আমার লোকদের বাঁচানোর জন্য চাই মোট চার হাজার তিন শ' লঙ্গরখানা (প্রশাসনের প্রতিটি ইউনিটে একটি করে)– নিজের পেটে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন মুজিব।

যুক্তরাষ্ট্রকে দেবার মতো বাংলাদেশের কিছুই নেই– এ সত্য সম্বন্ধে সচেতন মুজিব, তাই দু'দেশের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য আমেরিকানদের অনুগ্রহ ও মানবিক দায়িত্ববোধের ওপর ভরসা করছেন।

এই পর্যায়ে জন ডি রকফেলার কথা বলার সুযোগ পেলেন। বললেন: দু'দেশের মধ্যে হাজার ব্যবধান সত্ত্বেও আমেরিকান ও বাঙালিরা একই স্বাধীন বিশ্বের অংশ'।[২৯]

সূত্রঃ

১. উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর; ত্রিশোনকু, শব্দশৈলী, ২০১১, পৃষ্ঠাঃ ২৫৩

২. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৭১

৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ২৭৩

৪. বিচিত্রা; ৩য় বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৩ জানুয়ারি ১৯৭৫

৫. দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ; অমর্ত্য সেন, অনুবাদঃ শিবাদিত্য সেন, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, রথযাত্রা ১৪১৮, পৃষ্ঠাঃ ১৩২

৬. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনীঃ ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠাঃ ২৭৯

৭. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠাঃ ৩১৮-৩১৯

৮. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৭৫

৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১০৯

১০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ২৭৬

১১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ২৭৬-২৭৭

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ২৭৮

১৩. ফিনান্সিয়াল টাইম্‌স্ (লন্ডন); কেভিন রেফার্টি, ৬ জানুয়ানি ১৯৭৫

১৪. শতাব্দী পেরিয়ে; হায়দার আকবর খান রনো, তরফদার প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠাঃ ৩২১

১৫. বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর; সম্পাদনাঃ মুনিরউদ্দীন আহমদ, নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠাঃ ৫৪০-৫৪৭

১৬. ডেইলি মেইল (লন্ডন); জন পিলজার, ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৪

১৭. দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ; অমর্ত্য সেন, অনুবাদঃ শিবাদিত্য সেন, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, রথযাত্রা ১৪১৮, পৃষ্ঠাঃ ১৩৩।

১৮. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ২৭৯

১৯. কাছে থেকে দেখাঃ ১৯৭৩-১৯৭৫; মেজর জেনারেল এম খলিলুর রহমান, প্রথমা প্রকাশন, জুলাই ২০১৬, পৃষ্ঠাঃ ৭৪-৭৫

২০. বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪

২১. দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ; অমর্ত্য সেন, অনুবাদঃ শিবাদিত্য সেন, দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোং (প্রাইভেট) লিমিটেড, রথযাত্রা ১৪১৮, পৃষ্ঠাঃ ১৪৩

২২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৩৭

২৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৩৮

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৪০

২৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৪৯-৫০

২৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৪৯

২৭. উনসত্তর থেকে পঁচাত্তর; ত্রিশোনকু, শব্দশৈলী, ২০১১, পৃষ্ঠাঃ ২২১

২৮. শিকাগো ডেইলি নিউজ; জো গেন্ড্‌ল্‌ম্যান, ২৩ জুন ১৯৭৫

২৯. ওয়াশিংটন পোস্ট; স্টীফেন এস রোজেনফেল্ড, ৪ অক্টোবর ১৯৭৫

বিশ অধ্যায়

তাজউদ্দীনের বিদায়

বাকশাল গঠন করার পরিণাম হবে ভয়াবহ: তাজউদ্দীন

অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রকাশ্যে বলেন: মুজিব দুর্নীতিপরায়ণদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। তার আত্মীয়-স্বজনও এ ধরনের কাজের সাথে জড়িত।

তাজউদ্দীন উপলব্ধি করেন, যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তার উল্টো স্রোতে চলতে শুরু করেছে দেশ।

পাকিস্তানের মিলানওয়ালি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে শেখ মুজিবকে এক অতিথিশালায় রাখা হয়েছে। আজকে ভুট্টো এসেছেন; তিনি প্রায়ই আসেন, গল্প করেন তার পুরনো রাজনৈতিক বন্ধুর সাথে। ভুট্টো ছাড়া এই অতিথিশালার বাইরের খবর কিংবা দেশের খবর জানার কোনো উপায় নেই শেখ মুজিবের।

এখন অবশ্য ভুট্টো পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার মালিক। একথা-সেকথা বলতে বলতে তিনি মুজিবকে বলেন,

> তোমার সাধের বাংলাদেশ ভারতীয়
> সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে– জানো এটা?

শেখ মুজিব বিস্মিত, বিহ্বল, হতাশ, ক্ষুব্ধ। বিহ্বল অবস্থা কাটিয়ে তীব্র উষ্মা নিয়ে স্বভাবসুলভ দৃঢ় কণ্ঠে শেখ মুজিব ভুট্টোকে বললেন,

> তা'হলে আমি প্রয়োজনে তোমার সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে তাড়িয়ে দেব।

ভুট্টো মিটিমিটি হাসেন।

কারণ, ভুট্টো জানতেন শেখ মুজিবের অলক্ষ্যেই এই আলাপ গোপনে রেকর্ড হচ্ছে।

পরদিন আবার এলেন ভুট্টো– হাস্যোজ্জ্বল। হাতে একটা টেপ-রেকর্ডার। কুশলাদি বিনিময় করেই টেবিলে টেপ-রেকর্ডার রেখে চালিয়ে দিলেন। আগের দিনের পুরো আলাপ বাজতে থাকলো। নিশ্চুপ হয়ে শুনতে থাকলেন শেখ মুজিব। পেছনে উষ্মামিশ্রিত জলদগম্ভীর কণ্ঠে শেখ মুজিব বলে চলেছেন, "তা'হলে আমি প্রয়োজনে তোমার সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে তাড়িয়ে দেব......।"[১]

দেশে ফিরে তিনি বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করলেন সর্বব্যাপী ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি। শুধু ভারতীয় বাহিনীই নয়, ভারতীয় আমলারাও নানা কাজ করছে। এটা সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ না-কি ভারতের দখলিকৃত উপনিবেশ, সেটা বুঝতেও কষ্ট হচ্ছে। শেখ মুজিবের কানে ভাসে ভুট্টোর কণ্ঠস্বর:

> তোমার সাধের বাংলাদেশ ভারতীয় সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে– জানো এটা?

শেখ মুজিব প্রথম থেকেই ভারতের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এদিকে তাজউদ্দীনের বিরোধীরা শেখ মুজিবকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের নিকট দেশ বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং ভারতের সমর্থনে তিনি বেশ শক্তিশালী। তাজউদ্দীনের নামে শেখ মুজিবের কান ভারী করা শুরু হয়। তাজউদ্দীন আহমদ তার নামে শেখ মুজিবের কাছে এই চুকলি কাটার বিষয়ে জানতে পেরে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, যদি কোনোভাবে কেউ প্রমাণ করতে পারেন যে, সত্যিই এ ধরনের কিছু, কোনো চুক্তি তিনি করেছেন, তাহলে তিনি সরকার থেকে কেবল পদত্যাগই নয়, ফাঁসিতে ঝুলতেও প্রস্তুত আছেন।[২]

স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিব আর তাজউদ্দীন এই দুই নেতার মধ্যে তৈরি হয় এক দূরতিক্রম্য দূরত্ব। এ বিষয়ে অনেকে মনে করেন যে, শেখ মুজিবের

হৃদয়ে মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিতিজনিত অতৃপ্তিবোধ ছিল। এই অতৃপ্তিই তাকে প্রচ্ছন্নভাবে এত দ্রুত ভারতবিমুখ করে তোলে। শেখ মুজিব দেশে প্রত্যাবর্তন করে ভারতের সঙ্গে যে আচরণ করেন, তা দেশটির নেতাদের নিকট এক বিপন্ন বিস্ময়ে পরিণত হয়।

অথচ তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধাই ছিলেন। প্রায় একই সঙ্গে এই দুই নেতা মুসলিম লীগ রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের কাল থেকে মুজিব ও তাজউদ্দীন হয়ে ওঠেন একে অন্যের পরিপূরক।[৩]

ষাটের দশকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে মুজিব-তাজউদ্দীন এই নবীন জুটির আবির্ভাব ঘটে রাজনৈতিক মঞ্চে। তারা আওয়ামী লীগে প্রগতিশীল নতুন ধারার সূচনা করেন। তারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতেন একত্রে। বাস্তবায়ন করতেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। তাদের কাজ দেখে মনে হতো তারা এক ও অভিন্ন সত্তা।[৪]

চূড়ান্ত বিচারে শেখ মুজিব ‘বাঙালি মুসলিম জাতীয়াতাবাদী’ ছিলেন। অন্যদিকে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন ‘খাঁটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ’-এর চেতনায় সমৃদ্ধ একজন লিবারেল সোশ্যালিস্ট ডেমোক্র্যাট। তাজউদ্দীন আহমদ যেখানে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলীর অধিকারী, মুজিব সেখানে জনসম্মোহনী ক্ষমতাধর অবিসংবাদিত নেতা। মুজিব আবেগে আক্রান্ত হন আর তাজউদ্দীন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং নির্মোহ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত একজন প্রয়োগবাদী রাষ্ট্রনায়ক।

তাজউদ্দীন আহমদ তার এই যোগ্যতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে।[৩] শেখ মুজিবের অবর্তমানে পুরো মুক্তিযুদ্ধ নানা বাধা মোকাবিলা করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীনের একক নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়।

স্বাধীনতার পর দু’জনের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্যের প্রধান বিষয়ই ছিল শর্তযুক্ত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ ও পররাষ্ট্রনীতি। তাজউদ্দীন আহমদ আমেরিকা বা বিশ্ব আর্থিক সংস্থাগুলোর কোনো সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন। অন্যদিকে শেখ মুজিব পিতৃসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনর্গঠন ও জনগণকে বাঁচানোর জন্য যেকোনো দেশের সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। এক্ষেত্রে দুই নেতার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের বিষয়টি শুরু থেকে লক্ষ্য করা গেলেও সম্ভবত ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে তা প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হয়। ৩ জানুয়ারি পটুয়াখালীর এক জনসভায় মুজিব ‘বাংলাদেশকে বিদেশি সাহায্য থেকে

বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র’ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। পরদিন ৪ জানুয়ারি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, ‘ধনবাদী দেশের সাহায্য নিয়ে কোনোদিন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য চাই একই মতাদর্শে বিশ্বাসী তথা সমাজতান্ত্রিক দেশের সাহায্য এবং সেই সাথে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মনোভাব।’[৫]

তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ উত্থাপিত হতে থাকে। যুদ্ধশেষে বাংলাদেশ সরকার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতের নিকট কিছু কাগজের মুদ্রা ছাপিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে ভারতবিরোধী সেন্টিমেন্ট যখন তুঙ্গে, তখন জাসদ সমর্থক ‘গণকণ্ঠ’ পত্রিকায় একই নম্বরের দু’টো টাকার নোটের বিশ্বাসযোগ্য ছবি ছাপানো হয়। এই খবরে বাজার সরব হয়ে ওঠে: ভারত বাংলাদেশে জাল মুদ্রা ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কালোবাজারে সেই সব টাকার মাধ্যমে জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাচ্ছে। তাজউদ্দীন আহমদ ভারতে ছাপানো সকল প্রকার মুদ্রা ব্যাংকে জমা দিয়ে বদলি টাকা নেয়ার জন্য জনগণকে দু’মাস সময় দেন।[৬]

চট্টগ্রামে সেরু মিয়া নামের এক কুখ্যাত চোরাচালানকারীর চালান ধরা পড়লো। একটা মহল থেকে তাজউদ্দীনের নামে এই কুৎসা রটনা করা হলো যে এই “সেরু মিয়া” আসলে তাজউদ্দিনেরই ছদ্মনাম। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে কোলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের তহবিল থেকে প্রচুর টাকা আত্মসাত করে তাজউদ্দীন এই চোরাকারবারী ব্যবসা গড়ে তুলেছে বলে এই কুৎসিত অপপ্রচার চালানো হয়।[৭]

শেখ মুজিব চক্রান্তকারীদের প্ররোচনায় তাজউদ্দীনকে এমনই অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে, তার কাছে কে আসে, কী কথাবার্তা হয়; এসব খবর তাঁকে জানাতে তিনি তৎকালীন অর্থসচিব কফিল উদ্দিন মাহমুদকে অনুরোধ করেছিলেন।[৮]

এই মুখোমুখি অবস্থান তাজউদ্দীন আহমদের জন্য মর্মপীড়ার কারণ হয়। তিনি উপলব্ধি করেন, যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তার উল্টো স্রোতে দেশ চলতে শুরু করেছে। এক পর্যায়ে তাজউদ্দীন আহমদ প্রশাসন থেকে সরে আসার জন্য মনস্থির করেন। তবে শেখ মুজিব ও তার অন্যান্য ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর অনুরোধে এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকেন।[৯]

তাজউদ্দীন যখন বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের গভর্নরদের সভায় যোগ দেয়ার জন্য ওয়াশিংটনে যান তার আগেই নিউইয়র্কে পৌঁছেন শেখ মুজিব জাতিসংঘের সভায় যোগদানের জন্য। বাংলাদেশ সে বছর জাতিসংঘের সদস্য

চিত্র-কথন: 'রাজা আর রাজত্বের' দুর্নিবার আকর্ষণ

পাকিস্তান থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় এয়ারলাইন্স পিআইএ-এর বিশেষ ফ্লাইটে ৮ জানুয়ারি ভোরে লন্ডন পৌঁছেছিলেন শেখ মুজিব। লন্ডনে দু'দিন অবস্থানের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর রুপালি 'কমেট' বিমানে ১০ জানুয়ারি সকালে আসেন দিল্লিতে, এবং ওই বিমানেই সেদিন দুপুরে এসে পৌঁছেন স্বদেশের মাটিতে, ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে। বিমানবন্দরে সেদিন জনসমুদ্র। আনন্দে উদ্বেল লাখো মানুষের স্রোত। জনতার স্রোতে ভেসে শেখ মুজিবকে বহনকারী ট্রাক ধীর গতিতে এগিয়ে চলে রেসকোর্স ময়দানের দিকে।

ট্রাকের সামনের অংশে গলাবন্ধ স্যুট পরিহিত শেখ মুজিবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাত্র কুড়ি দিন আগে স্বাধীন দেশে ফিরে আসা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও অন্যরা। জনতার ভীড় ঠেলে ট্রাকটি যখন ধীর গতিতে যাত্রা শুরু করে, তখন প্রিয় নেতা মুজিবের পাশে দাঁড়ানো প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন ছিলেন আনন্দে উচ্ছ্বল। সহযাত্রী অন্যরাও তখন একই রকম উচ্ছ্বলতায় ভরা। চারিদিকের জনস্রোতে সাগরের ঢেউভাঙা শ্লোগান।

কিন্তু জনগণের হৃদয়ের রাজা শেখ মুজিব যেন সত্যিকারের 'রাজা আর রাজত্বে'র দুর্নিবার আকর্ষণ 'চাইলেও' দূরে ঠেলে সরাতে পারছিলেন না। চৈতন্যের মর্মমূলে কে যেন তাঁকে বলে যাচ্ছিল: অপেক্ষাও নয়, বিলম্বও নয়। তাই হয়তো ওই অবস্থার মধ্যেই তাজউদ্দীনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে তার প্রিয় নেতা মুজিব বললেন: 'তাজউদ্দীন, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হবো।' মুহূর্তে পাল্টে গিয়েছিল তাজউদ্দীনের মুখের অভিব্যক্তি, মুহূর্তেই হারিয়ে গিয়েছিল আনন্দমাখা উজ্জ্বল উচ্ছ্বলতা।

ফটো: সংগৃহীত

হয়। সেবার ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ডের সঙ্গে শেখ মুজিবের ১৫ মিনিটের এক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১০]

তাজউদ্দীন আহমদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মুজিবের আহ্বানের অপেক্ষায় থাকেন। বিশ্বব্যাংকের সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনে গিয়ে ঘনিষ্ঠদের ইঙ্গিত দেন, সম্ভবত সেটাই অর্থমন্ত্রী হিসেবে তার শেষ সফর। কাজেই মন্ত্রিপরিষদ থেকে তাজউদ্দীন আহমদের বাদ পড়াটা সাধারণ্যে অকস্মিক বিষয় বলে মনে হলেও তার ঘনিষ্ঠজনরা পূর্বাহ্নেই তা জানতে পারেন। বস্তুত সচেতন মহলে এ বিষয়ে কানাঘুষাও লক্ষ্য করা যায়।[১১]

তাজউদ্দীন আহমদ দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপ ও আমেরিকা সফরশেষে দেশে ফেরার পথে জাপানের টোকিওতে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে বাংলাদেশ দূতাবাসে তিনি প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বলেন, মুজিব দুর্নীতিপরায়ণদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন এবং তার কোনো কোনো আত্মীয়-স্বজনও এ ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত। বলাই বাহুল্য, এই সংবাদ মুজিব যথাসময়েই পান।[১২]

শেখ মুজিব বাকশাল করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তাজউদ্দীন রাগ করে ক'দিন অফিসে যাননি। তারা দু'জন একে অন্যের বাড়িতে যাতায়াত করতেন অবাধে। বুদ্ধি-পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এমন সময় একদিন শেখ মুজিব তাজউদ্দীনের বাসায় এলেন। গম্ভীর মুখে শেখ মুজিব উঠে গেলেন দোতলায়। বাসার সবাই দু'জনের উচ্চৈঃস্বরে তর্কাতর্কি শুনতে পেলেন।

তাজউদ্দীন বলছেন, 'মুজিব ভাই, আজকে আমি আপনাকে যে কথাগুলো বলবো, আমি জানি, আপনি সে কথাগুলো যুক্তি দিয়ে খণ্ডাতে পারবেন না। গণতন্ত্রকে হত্যা করে, সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করে, একমাত্র রাজনৈতিক দল 'বাকশাল' গঠন করার পরিণাম হবে ভয়াবহ। দলের হাতে অস্ত্র। দলীয় ক্যাডারদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বাধা সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আত্মীয়-স্বজন ও দলের প্রভাবশালী লোকেরা অন্যায় সুবিধা নিচ্ছে। মুজিব ভাই, এই জন্যই কি আমরা ২৪ বছর সংগ্রাম করেছিলাম। যেভাবে দেশ চলছে, তাতে এক সময়, যখন আপনিও থাকবেন না, আমরাও থাকবো না, তখন দেশ চলে যাবে রাজাকার, আল্-বদরদের হাতে।'[১৩]

২৬ অক্টোবর ১৯৭৪, তাজউদ্দীন পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর

দিয়ে অফিস থেকে ফোন করে স্ত্রীকে জানালেন, 'লিলি, আমি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছি। ১২টা বেজে ২২ মিনিটে আমি পদত্যাগপত্রে সই করেছি।' তাজউদ্দীনের স্ত্রী '৭২ সাল থেকেই তাকে বলতেন, তিনি মন্ত্রিসভায় বেশি দিন টিকতে পারবেন না, তাকে কাজ করতে দেয়া হবে না।[১৪]

দুপুর একটার কিছু পরে তাজউদ্দীন সরকারি বাসায় ফিরে এলেন বন্ধু আরহাম সিদ্দিকীর গাড়ি করে। নিজের জন্য সরকারি গাড়ি ব্যবহার বন্ধ করলেন পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই। তাজউদ্দীন বাসায় ফিরে আসার পর পরই তার বাড়ি লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল।[১৪]

দেশের সব পত্র-পত্রিকায় শিরোনাম হলো: তাজউদ্দীনের পদত্যাগ। সরকার প্রভাবিত কিছু কাগজে লেখা হলো– 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাজউদ্দীন আহমদকে পদত্যাগ করানো হলো।' বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থটা কী– এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই কেউ খুঁজে পেল না সংবাদপত্রের কোনো বিবরণে।[১৪]

ঐতিহাসিক চরমপত্রের রচয়িতা ও পাঠক এম আর আখতার মুকুল লিখলেন, 'মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন বিদায় নিলেন। মনে হলো, শেখ মুজিবের কোমর থেকে শাণিত তরবারি অদৃশ্য হয়ে গেল। .... ছায়ার মতো যে নির্লোভ ব্যক্তি অসাধারণ নিষ্ঠার সঙ্গে শেখ মুজিবকে অনুসরণ করেছেন, কোনো এক গোপন চক্রান্তের ফাঁদে পা দিয়ে শেখ সাহেব সেই মহৎপ্রাণ ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন।'[১৫]

পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা সচিবালয় ঘিরে রেখেছিল। পদত্যাগ করার পরও তাজউদ্দীনের যেন মুক্তি মিললো না। তার ওপর কড়া নজর রাখা হলো। তার গতিবিধির ওপর রিপোর্ট করার জন্য সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নিযুক্ত করা হলো। প্রথমে সরকারি বাসভবন। সেটা ছাড়ার পর তাজউদ্দীনের নিজস্ব বাসভবনের ওপর নজর রাখা শুরু হলো। তাজউদ্দীন দুঃখ করে বলতেন যে, পাকিস্তান আমলেও যেমন গোয়েন্দা লেগে থাকতো, স্বাধীন বাংলাদেশেও ঠিক একই অবস্থা। বাস্তবে পাকিস্তান থেকে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করলেও বাংলাদেশের রাজনীতি ও প্রশাসন পাকিস্তানের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র ও মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।[৪]

শেখ মুজিব বাস্তবিকই তাজউদ্দীনকে ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীকালে যে 'বাকশাল' গঠন করা হয়, সেখানে তাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে তো নয়-ই, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদেও স্থান দেয়া হয়নি।[১৬]

চিত্র-কথন:

২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের নেতৃবৃন্দ। অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে বক্তব্য দিচ্ছেন। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন 'খাঁটি বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর চেতনায় সমৃদ্ধ একজন লিবারেল সোশ্যালিস্ট ডেমোক্রেট। তাজউদ্দীন আহমদ যেখানে রাষ্ট্রনায়কোচিত গুণাবলীর অধিকারী, মুজিব সেখানে জনসম্মোহনী ক্ষমতাধর অবিসংবাদিত নেতা। মুজিব আবেগে আক্রান্ত হন আর তাজউদ্দীন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং নির্মোহ যুক্তি দ্বারা পরিচালিত একজন প্রয়োগবাদী রাষ্ট্রনায়ক।

তাজউদ্দীন আহমদ তার এই যোগ্যতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাসে। শেখ মুজিবের অবর্তমানে পুরো মুক্তিযুদ্ধ নানা বাধা মোকাবিলা করে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীনের একক নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়।

ফটো: সংগৃহীত

তাজউদ্দীনের অপসারণের পর সিআইএ তাদের 'টপ সিক্রেট ডকুমেন্টে' লেখে–

'প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বামপন্থি অর্থমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভায় সমাজতন্ত্রের পক্ষে মুখ্য প্রবক্তা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বড় বন্ধু তাজউদ্দীন আহমদকে পদত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন।

তাজউদ্দীনের অপসারণ, বিশেষ করে যারা মুজিবের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, সেই সামরিক কর্মকর্তাদের প্রতি একটি সংকেত হিসেবে গণ্য হতে পারতো। এর অর্থ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম। এমনকি তা আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের কাণ্ডারীদের পরিত্যাগের বিনিময়ে হলেও।

তাজউদ্দীন শাসকদল আওয়ামী লীগে বামপন্থিদের নেতা। তিনি বহুদিন ধরে অর্থনৈতিক সমস্যার একটি বাস্তবানুগ সমাধানের দাবি করে আসছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘন ঘন সরকারের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ব্যক্ত করেছেন। মুজিব সংবিধান সংশোধন করে একটি অধিকতর কেন্দ্রীভূত ও কর্তৃত্বপরায়ণ রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাইছিলেন। আর সেই পরিবর্তনকে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের পক্ষে অনুকূল মনে করবেন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছিল তাজউদ্দীনের কাছে।

অবশ্য তাজউদ্দীন আহমদকে অপসারণের সম্ভাব্য একটি কারণ হতে পারে এই যে, বাংলাদেশের জন্য পাশ্চাত্যের দাতা দেশগুলোর একটি কনসোর্টিয়াম গঠনের উদ্যোগে তিনি বিরোধিতা করেছেন। মুজিব হয়তো ভেবেছেন যে, মন্ত্রিসভায় তাজউদ্দীনের অব্যাহত উপস্থিতি সাহায্য সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সমস্যার মধ্যে ফেলে দেবে।'[১৭]

সূত্রঃ

১. স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাজউদ্দীন আহমদের প্রচেষ্টা; কামাল হোসেন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৭২

২. 'মুজিব বাংলাদেশের জনক'; মিজানুর রহমান, প্রথম আলো, ৪ জুলাই ২০০৫

৩. স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাজউদ্দীন আহমদের প্রচেষ্টা; কামাল হোসেন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৬৭

৪. তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা; শারমিন আহমেদ, ঐতিহ্য, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৯৩

৫. মুক্তিযুদ্ধের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন; আতিউর রহমান, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠাঃ ১২৫

৬. দৈনিক পূর্বদেশ, ৩ জুন ১৯৭৩

৭. স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাজউদ্দীন আহমদের প্রচেষ্টা; কামাল হোসেন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৭৬

৮. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা; প্রথম খণ্ড, সম্পাদনাঃ সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ১৯০

৯. আমার বাবার কথা; সিমিন হোসেন রিমি, পৃষ্ঠাঃ ৬৭ এবং আব্দুল মমিনের রেকর্ডকৃত সাক্ষাৎকার।

১০. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা; প্রথম খণ্ড, সম্পাদনাঃ সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠাঃ ১৬১-১৬২

১১. স্বাধীন বাংলাদেশের পুনর্গঠনে তাজউদ্দীন আহমদের প্রচেষ্টা; কামাল হোসেন, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮, পৃষ্ঠাঃ ৫৮২

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ৫৮৩

১৩. তাজউদ্দীন আহমদ : নেতা ও পিতা; শারমিন আহমেদ, ঐতিহ্য, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৯১

১৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠাঃ ১৯২

১৫. এম আর আখতার মুকুল : আমি বিজয় দেখেছি; সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৪, পৃষ্ঠাঃ ১২৮

১৬. বঙ্গবন্ধুর শাসনামল : দিনপঞ্জি ১৯৭৫; অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃষ্ঠাঃ ৩০৩-৩১০ এবং ৪৮০-৪৮৬

১৭. মার্কিন দলিলে মুজিব হত্যাকাণ্ড; মিজানুর রহমান খান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৩, পৃষ্ঠাঃ ১৯৩

একুশ অধ্যায়

বাকশাল:
আনুষ্ঠানিক স্বৈরতন্ত্রের যাত্রা হলো শুরু

তাজউদ্দীন শেখ মুজিবকে বললেন: বাই টেকিং দিস্ স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দ্য ডোর্স্ টু রিমুভ ইউ পিস্ফুলি ফ্রম ইউর পজিশন।[২৬]

চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হলো, এই বিধান জারির পর থেকে শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন এবং ধরে নিতে হবে যে, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।[১১]

দেশের যে অবস্থা! পরবর্তী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৫-৩০টির বেশি সিট পাবে না। দলের বিপর্যয় ঠেকাতে এই 'বাকশাল' ব্যবস্থা। '৮০ সালের মধ্যেই আবার বহুদলীয় গণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবো: শেখ মুজিব[২১]

মধ্য চুয়াত্তরের বর্ষাকালের একটা দিন। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, চারপাশ অন্ধকার, আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান একাকী তাঁর অফিসকক্ষে পায়চারি করছেন। তিনি দৃশ্যত খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং বিচলিত। তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম। অফিসকক্ষে তাকে দেখে মুখ ফেরালেন এবং খুবই বিমর্ষকণ্ঠে স্বগতোক্তির মতো করে বললেন– 'আপনারা বাংলাদেশের মানুষকে চেনেন না। আমি জীবনের অনেকটা বছর তাদের

সাথে একসঙ্গে থেকেছি, বিভিন্ন পর্যায়ে একত্রে কাজ করেছি, তারা অত্যন্ত ক্ষমাহীন। আপনি যদি একটা ভুল করেন বা কোনো কাজে একবার ব্যর্থ হন, তাহলে আপনার সারা জীবনের অর্জন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তারা এখন আমাকে জাতির পিতা বলে; কিন্তু পর মুহূর্তেই তারা বদলে যাবে, আমাকে জাতির...... বলে ডাকতে শুরু করবে।'[১]

তিনি হয়তো তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে দীর্ঘ সময় ধরেই ভেবেছিলেন। কোনো ভুল হয়ে যাচ্ছে কি-না, সেটা নিয়ে সম্ভবত তিনি কিঞ্চিৎ দ্বিধাতেও ছিলেন। এর মধ্যেই এই নবীন দেশ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পার করেছে। চারিদিকে সমস্যা, দলের লোকজন বেপরোয়া, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দুর্বিষহ, মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তায় তখন ভাটার টান। এমন সময় তিনি একদলীয় 'বাকশাল' প্রবর্তন করলেন। সারা জীবন তিনি বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে, অবশেষে কেন একদলীয় ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসনের দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেটার বস্তুনিষ্ঠ কারণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় (?)। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনও জানতেন না, তিনি কার সাথে পরামর্শ করে 'বাকশাল' গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। অনেকে বলেন, তাঁকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন।[২]

তবে 'বাকশাল' নিয়ে সিপিবির উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বাকশাল গঠিত হবার পরে, সাংগঠনিকভাবে নগণ্য প্রতিনিধিত্ব সত্ত্বেও তারা 'বাকশাল' কর্মসূচি এগিয়ে নিতে অতিমাত্রায় আন্তরিক ও উৎসাহী ছিল। এমনকি বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য তারা নিজেদের দলকে বিলুপ্ত করে দেয়।

'শ্রমিক শ্রেণির দল' দাবিদার কোনো দেশের 'কমিউনিস্ট পার্টি'র অপর একটি বুর্জোয়া দলে রাতারাতি এবং স্বেচ্ছায় বিলীন হয়ে যাওয়ার এমন ঘটনা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে বিরল। যদিও দীর্ঘ প্রায় এক যুগ পর প্রকাশিত এক দলিলে সিপিবি দাবি করেছে, বাকশালে যোগ দিলেও পার্টি 'গোপনে তার সংকুচিত একটি কাঠামো' বজায় রেখেছিল।[৩] এতে প্রমাণিত হয়, 'বাকশাল'-এর সাংগঠনিক কাঠামোর বিষয়ে সিপিবি'র অস্বস্তি ছিল।

বাকশাল গঠনের ক্ষেত্রে সিপিবির যে সক্রিয় ভূমিকা ছিল, সেই বিষয়ে দলটির পক্ষ থেকেই স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়।[৪] দল বিলুপ্ত করে বাকশালে যোগদানের বিষয়ে সিপিবি'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় ভোটাভুটিতে যোগদানের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়েছিল।[৫]

বাকশাল কর্মসূচি ঘোষণার কয়েকদিন পর ১৯৭৫-এর ১৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাসভায় বিলুপ্ত সিপিবি ও সেই সময় বাকশালের নেতা মোহাম্মদ ফরহাদ 'বাকশাল'কে একটি 'বিপ্লবী প্রক্রিয়া' হিসেবে অভিহিত করেন।[৬]

বাকশাল নিয়ে দৃশ্যমান আলাপ নিজের রাজনৈতিক সহকর্মীদের সঙ্গে না করলেও সিপিবি'র সঙ্গে ছয় মাস ধরে দীর্ঘ আলাপ করেছিলেন শেখ মুজিব। ১৯৭৪-এর জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মুজিবের সঙ্গে সিপিবির কয়েক দফা বৈঠক হয় এবং মুজিবের নেতৃত্বে (সিপিবির ভাষায়) সৎ ও সমাজতন্ত্রমনাদের নিয়ে যে একটি একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সে বিষয়ে সিপিবি ওয়াকিবহাল ছিল এবং নিজেদের পার্টিকে তারা সেভাবেই প্রস্তুত করছিল।[৭] '৭৩-এর জানুয়ারিতে ঢাকায় এবং মার্চে গোপালগঞ্জে সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের হাতে দলের কর্মী ও সংগঠকদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পরেও সিপিবি'র শর্তহীন ও লাগাতার সমর্থন শেখ মুজিবকে একদলীয় শাসনে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে।

অনেকে মনে করেন, সিপিবি এ সময় পশ্চিমবঙ্গের সিপিআই-এর অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিল। যে অভিজ্ঞতার মূল বিষয় ছিল, সোভিয়েতপন্থি হিসেবে টিকে থাকতে হলে বাম-মধ্য ঘরানার একটি বড় সংগঠনের আনুকূল্য প্রয়োজন। সিপিআই যেটা পেয়েছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে।[৭]

তবে সিপিবি ও সিপিআই উভয় সংগঠনই সেই সময়ের সোভিয়েত তাত্ত্বিক আর. উলিয়ানভ্স্কি ও ভ. পাভ্লভের এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সমাজতান্ত্রিক উত্তরণবিষয়ক তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাদের সেই তত্ত্ব অনুসারে, এশিয়া-অফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সদ্যস্বাধীন দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় অপুঁজিতান্ত্রিক পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে। সমাজতন্ত্রে পৌঁছানোর এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় মার্ক্স্বাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রত্যক্ষ নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার সোভিয়েতপন্থি কমিউনিস্ট পার্টিগুলো ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে এই তত্ত্ব অনুসরণ করে সদ্যস্বাধীন দেশগুলোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় এবং তা যথারীতি ব্যর্থ হয়। এই তত্ত্বের আলোকে অ-ধনবাদী পথে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাতে করণীয়গুলো হলো: মিশ্র অর্থনীতি থেকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় খাতকে একচেটিয়া করে তোলা; সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হওয়া, তাদের 'সহায়তা' নেয়া, 'বৈপ্লবিক একনায়কতন্ত্র' কায়েম– প্রয়োজনে অ-মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে; সব ধরনের পুঁজির বিরুদ্ধে দৃঢ়সংকল্প ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে ১৯৭১-৭৫ পর্যায়ে 'বাকশাল' কায়েম, অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় খাতের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, রাজনীতিতে

ন্যাপ (মো.)-সিপিবি-আওয়ামী লীগের 'গণঐক্যজোট' প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি প্রধান ঘটনাবলীর পেছনে উলিয়ানভ্স্কির উপরোক্ত তত্ত্বের গভীর প্রভাব কাজ করেছে।[৮]

'৭৫ সালের ২৬শে মার্চ এক ভাষণে বাকশাল করার পেছনে শেখ মুজিব তাঁর চারটি লক্ষ্য ছিল বলে প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন। এগুলো হলো– দুর্নীতি দমন, উৎপাদন বৃদ্ধি, জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় ঐক্য রচনা। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রতিটি গ্রামে কো-অপারেটিভ গড়তে হবে। জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা না হলেও ফসল পাবে সবাই। আর জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য দেশে একটিমাত্র দল থাকবে। তাঁর ভাষায়, তিনি চান 'শোষিতের গণতন্ত্র'। বোঝা যায়, তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন সোভিয়েত আদর্শে। পার্থক্য এই যে, 'কমিউন' না করে তিনি 'কো-অপারেটিভ' গড়ার কথা বলেছিলেন, জমির মালিকানা যেখানে ব্যক্তিগত।[৯]

যারা দলীয় রাজনীতি করতেন না, তেমন বুদ্ধিজীবীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাকশালে যোগদানের জন্য কেবল উৎসাহিত নয়, রীতিমতো ভয়-ভীতি দেখানোর ঘটনাও ঘটে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, বাকশালে যোগ দেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও উৎসাহিত করা হয়। বাকশাল সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী এক সেনা সমাবেশে বলেন যে, দেশে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সফল করার জন্য বাকশালে যোগ দিয়ে সেনাবাহিনীকেও সহযোগিতা করতে হবে।[৯]

শেখ মুজিবের নিজের দলের বেশির ভাগ নেতা বাকশাল সমর্থন করেননি। শেখ মুজিব নিহত হবার মাত্র সাত দিন আগে সংসদ সদস্যদের মতামত জানার জন্য যে গোপন ব্যালট করেছিলেন, তাতে ৩০৭ জন সাংসদের মধ্যে 'বাকশাল' পদ্ধতিকে সমর্থন করেছিলেন মাত্র ১১৭ জন।[৯]

স্বাধীন সংবাদ মাধ্যমের অভাবে সেই সময়ের সকল প্রতিবাদ প্রকাশ পাচ্ছিল গুপ্ত হত্যা এবং বোমাবাজির মাধ্যমে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আরম্ভ করে মে মাস পর্যন্ত কয়েকজন সংসদ সদস্যসহ 'বাকশালে'র বহু স্থানীয় নেতা নিহত হন– যশোর, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল ও টুঙ্গিপাড়াসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে।[৯] অথচ এমন সব অরাজকতাকেই 'বাকশাল' প্রবর্তনের

কারণ হিসাবে শাসকদলের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছিল।

বাকশালের সারকথা ছিল এই যে, দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে; তার নাম হবে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ', সংক্ষেপে 'বাকশাল'। বলতে গেলে 'বাকশাল' ছিল আওয়ামী লীগেরই পরিবর্তিত রূপ ও নাম। যদিও এই দলে সিপিবি ও ন্যাপ (মো.) যোগ দিয়েছিল, কিন্তু কার্যনির্বাহী কমিটিতে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দলের প্রতিনিধি ছিল না। নতুন দলটির প্রতীক ছিল আওয়ামী লীগেরই প্রতীক 'নৌকা'। ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে অপর দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। যেমন, সিপিবি'র ছিলেন মাত্র একজন– মো. ফরহাদ। তাও তিনি ছিলেন ৭৭ নম্বর সদস্য।[১০]

এই একটিমাত্র দলে চেয়ারম্যানই হবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী; যদিও ওই চেয়ারম্যান কীভাবে নির্বাচিত হবেন তার কোনো বিধান করা হয়নি। অর্থাৎ, শেখ মুজিব নিজেই হবেন নতুন দলের চেয়ারম্যান, এটা এত বেশি স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেয়া হয় যে, তার জন্য কোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার উল্লেখ করারও প্রয়োজনবোধ করেননি নতুন দলের উদ্যোক্তারা।

চেয়ারম্যানের পর সবচেয়ে ক্ষমতাসম্পন্ন কাঠামো হলো একক দলটির কার্যনির্বাহী কমিটি। সাধারণ সম্পাদকসহ যার ১৫ জন সদস্যের সকলকে চেয়ারম্যানই মনোনীত করবেন।

একক এই দলের শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও যুব বিষয়ে অঙ্গ সংগঠন থাকবে। তার বাইরে দেশে আর কোনো শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মহিলা ও যুব বিষয়ে সংগঠন থাকতে পারবে না।

পার্লামেন্ট নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে, তাকে চেয়ারম্যানের অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিতে হবে।

চেয়ারম্যান ইচ্ছা করলে গঠনতন্ত্র পাল্টাতে পারবেন এবং চেয়ারম্যানই গঠনতন্ত্রের একমাত্র ব্যাখ্যাদানকারী হবেন।

'বাকশাল' ব্যবস্থায় জেলার মূল প্রশাসক হিসেবে যে সব গভর্নর নিয়োগ পাবেন, তারাও হবেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের মনোনীত।[১০]

শেখ মুজিব একটিমাত্র সংসদীয় আসন থেকে নির্বাচিত একজন সংসদ সদস্য ছিলেন মাত্র। সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন লাভ করায় তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা লাভ

করেন। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু '৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে যে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম করা হলো, তাতে সংসদীয় পদ্ধতির অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে রাষ্ট্রপতির হাতে নির্বাহী সমস্ত ক্ষমতা এবং আইন ও বিচার বিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বভার অর্পণ করা হলো।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে এই একদলীয় নয়া পদ্ধতিতেও বিধান করা হয়েছিল যে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। কিন্তু ২৫ জানুয়ারি চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শেখ মুজিব স্পিকারের কাছে নতুন রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে নতুন বিধানে নির্দেশিত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের ব্যবস্থাও অগ্রাহ্য করা হলো। শুধুমাত্র একটি বিলের মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। সমুদয় রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ আসনে আরোহণ করলেন।[১১]

চতুর্থ সংশোধনীর এই বিধান একই সাথে পাস ও প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং ওই সময় বহাল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নেয়া হয়নি– যা ছিল সংবিধানের অপরিহার্য নির্দেশ। কেননা চতুর্থ সংশোধনী পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান বা বহাল রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহকে পদচ্যুত ঘোষণা করা হয়েছিল।

এতে বলা হলো, এই বিধান জারির পর থেকে শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন– যেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। আরো বলা হলো, ধরে নিতে হবে যে, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন।[১১]

'জাতীয় দল' সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কেবল যে দেশের অন্য সকল রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিলুপ্ত করা হয় তাই নয়, দুই যুগের পুরনো আওয়ামী লীগের অস্তিত্বও বিলীন করে দেয়া হয়। কেবল আওয়ামী লীগের বিলুপ্তিই নয়– এসময় সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান ঘটানো হয় এবং সংবিধানের মৌলিক চরিত্রও পাল্টে ফেলা হয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বৈরাচারী রূপ পরিগ্রহ করতে এক দশক সময় নিলেও, বাংলাদেশে স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের মধ্যে আনুষ্ঠানিক স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তা অতীতের চেয়েও নিকৃষ্ট রূপ পরিগ্রহ করায় জনগণই কেবল নয়, তাতে খোদ মুজিব সরকারের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সমর্থক পরিমণ্ডলেও গুরুতর প্রশ্ন ওঠে।[১২]

চিত্র-কথন: মুজিব ও পরিবারতন্ত্র

পাকিস্তানের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানকে ছাড়িয়ে গিয়ে আনুষ্ঠানিক স্বৈরতন্ত্রের যাত্রা শুরু করেছিলেন শেখ মুজিব। তবে সামরিক বাহিনীর তরুণ সেনানায়কদের হস্তক্ষেপে সে যাত্রা বেশি দূর এগোতে পারেনি।

কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে, তিনি কি তাঁর সেই স্বৈরতন্ত্রের ধারায় 'পরিবারতন্ত্র'ও কায়েম করতে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন? নিজ ভগ্নীপতি থেকে শুরু করে নিকটাত্মীয়দের অনেককে সরকারে এবং প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে গ্রহণ এবং দ্বিতীয় পুত্র শেখ জামালকে বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত ইঙ্গিত-আলামত তৈরি করেছিলেন, তাতে এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় 'না' বলে দেয়া নিতান্তই কঠিন।

ছবিতে এক অন্তরঙ্গ পারিবারিক পরিবেশে নিজের যাপিত জীবনের সতর্ক প্রহরীরূপী পত্নী ফজিলাতুন্নেসার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন শেখ মুজিব। মালাটি কেউ হয়তো তাঁকেই পরিয়ে দিয়েছিল। পিতা-মাতার এমন প্রীতিময় আর মমতা মাখানো মুহূর্ত আকর্ণবিস্তৃত হাসিতে উপভোগ করছেন জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল।

ফটো ক্রেডিট: রশীদ তালুকদার/দৃক

'বাকশাল' গঠন করে যখন দু'টি সরকারি আর সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা দু'টি স্বাধীন সংবাদপত্র, মোট চারটি ছাড়া আর সবগুলো সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হলো তখন এই বিষয় নিয়ে বিবিসি'র বাংলা বিভাগের প্রযোজক সিরাজুর রহমানের সাথে এক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমার দেশে ফ্রি-স্টাইল চলবে না'। তিনি আরো বলেছিলেন যে, খবরের কাগজের সংখ্যা কমিয়ে যে নিউজপ্রিন্ট বাঁচবে তা বিদেশে বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে খাদ্যশস্য কিনে তিনি দেশের গরিব মানুষকে বাঁচাবেন। ততদিনে কিন্তু ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, যাতে ৩০ হাজার লোক মারা যাবার কথা সরকারিভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল, পার হয়ে এসেছে বাংলাদেশ।[১৩]

১৯৬৪ সালে পাকিস্তানের 'লৌহমানব' আইয়ুব খানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকালে শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেছিলেন–'যারা গণতান্ত্রিক আদর্শ ও ব্যবস্থায় বিশ্বাসী কেবল সাময়িকভাবেই তাদের কণ্ঠরোধ করা যায়। অত্যাচার ও নিপীড়ন যদি বন্ধ না হয়, গণতন্ত্র যদি পুনরুজ্জীবিত করা না হয়, যদি কর্তৃপক্ষ গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতে না দেন, তাহলে তাদের জেনে রাখা উচিত তেমন পরিস্থিতিতে জনসাধারণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বেছে নিতে পারে। আর যদি তেমনটিই ঘটে তাহলে সেটা হবে এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অধ্যায়।'[১৪] অথচ দেখা গেল সারা জীবন তিনি যা যা বলেছেন, চর্চা করেছেন এবং যে সব 'গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি'র জন্য লড়েছেন, সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে মাত্র দু'-তিন বছরেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়েছেন।[১২]

'বাকশাল' পদ্ধতিতে ভারতের সায় ছিল বলে অনুমান করা যায়। কেননা, ভারতের তৎকালীন ক্ষমতাসীনরা বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের অবলুপ্তি ও 'বাকশাল' প্রবর্তনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[১২]

শেখ মুজিব তাঁর নয়া পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচি ঘোষণা করেন সেগুলো ছিল:[১৫]

এক. প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন। ধাপভিত্তিতে পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে এর অস্তিত্ব থাকবে। ৫০০ থেকে ১০০০ পরিবারের সমন্বয়ে একটি সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। সমবায়গুলো দেশের 'সর্বনিম্ন

অর্থনৈতিক ইউনিট’ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো গঠনের সাথে সাথে সকল ইউনিয়ন পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সার ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং পূর্ত কর্মসূচি পরিচালনাসহ সরকারি সকল সাহায্যমূলক তৎপরতা এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জমির ওপর বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখা হবে, তবে জমির সমস্ত উৎপাদন বিভক্ত করা হবে তিন ভাগে। এরমধ্যে এক ভাগ থাকবে মালিকের কাছে এবং বাকি দুই ভাগ যথাক্রমে সমবায় ও সরকারের কাছে। দেশের সকল কর্মক্ষম বেকার এবং ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সমবায়ের সদস্য হবে এবং তা থেকে সমান হিস্যা ভোগ করবে। যুবগোষ্ঠী এই সমবায় পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

দুই. বাকশাল, যুব সম্প্রদায়, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতি থানায় একটি করে ‘প্রশাসনিক পরিষদ’ গঠন করা হবে। পরিষদের প্রধান হবেন একজন গভর্নর। তিনি একজন সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক কর্মী হবেন– এমন কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না। একজন ‘বিশ্বাসী’ সরকারি কর্মকর্তাকেও গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হতে পারে। ‘জেলা প্রশাসনিক পরিষদ’গুলো কাজ শুরু করার এক বছর পর এ ধরনের ‘থানা প্রশাসনিক পরিষদ’ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

তিন. বিদ্যমান জেলাগুলো বিলুপ্ত করে প্রতিটি মহকুমাকে এক-একটি জেলায় পরিণত করে তাকে জনগণ, বাকশাল, সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত নয়া প্রশাসনিক পরিষদের আওতাধীনে নিয়ে আসা হবে। একজন গভর্নর এ ধরনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করবেন। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেচব্যবস্থা এবং পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদগুলোর ওপর ন্যস্ত করা হবে। জেলা প্রশাসক পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারসহ সরকারের সকল জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিষদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। জেলায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ইত্যাদি ফোর্স গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। অন্য কথায়– পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, আইনশৃঙ্খলা বিধান ও দৈনন্দিন প্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদ এবং গভর্নরের ওপর ন্যস্ত হবে। জেলা প্রশাসনিক পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবে। এগুলো সবই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক-একটি পর্যায় হিসেবে গণ্য হবে।

চার. বিচার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং

বিচারব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হবে, যাতে করে সাধারণ লোকের পক্ষে সুবিচার প্রাপ্তি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হয়। ত্বরিত এবং কম খরচে সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি থানা পর্যায়ে আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।

পাঁচ. রাজধানীকেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে গণমুখী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সচিবালয় উঠিয়ে দিয়ে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করা হবে এবং আরো অধিকসংখ্যক কর্পোরেশনকে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হবে।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান বিষয় ছাড়াও শেখ মুজিব তাঁর প্রবর্তিত নয়া পদ্ধতি পরিচালনার লক্ষ্যে আরো কতিপয় নীতিমালা ঘোষণা করেন। সেগুলো হলো:[১৬]

এক. নয়া পদ্ধতি প্রতিটি পর্যায়ে জাতীয় ঐক্য স্থাপনের সহায়ক হবে। এই পদ্ধতিতে কর্মক্ষম প্রতিটি লোকের জন্য জাতি সংগঠনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য ছিল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, বিডিআর, পুলিশবাহিনী, রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে সকল পেশার লোকদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন। তিনি সমাজের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সকল চিন্তাধারা, সৃজনীশক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে সমাজ ও জাতি গঠনে অবদান রাখার উপযোগী দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগণকে নিয়ে একটি অভিন্ন মোর্চা গঠনে অভিলাষী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবল একটি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে সকল পর্যায় থেকে ক্যাডার সংগ্রহ করেই এ ধরনের মোর্চা গঠন করা সম্ভব।

দুই. প্রস্তাবিত নয়া পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে 'গণবাহিনী'তে রূপান্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছিল। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ বাহিনী গঠন করার ইচ্ছা ছিল না। দেশের প্রতিরক্ষা এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় 'গণবাহিনী'কে নিয়োজিত রাখাই ছিল এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

তিন. গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, জনস্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা ছিল নব-উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

চার. সমন্বিত উদ্যোগে অধিকতর পরিশ্রমে ক্ষেতে-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

পাঁচ. সম্পূর্ণ নতুন ও যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

ছয়. সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা হবে। বিদ্যমান প্রশাসনব্যবস্থা দুর্নীতিতে নিমগ্ন এবং সেজন্য দুর্নীতি অপসারণের লক্ষ্যে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান প্রশাসন পদ্ধতির রূপান্তর সাধন। জনগণ, রাজনৈতিক নেতা এবং নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রতিটি পর্যায়ে সততা, নিষ্ঠা ও দুর্নীতিহীনতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঘুষ গ্রহণকারী এবং আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন জীবনযাপনকারী লোকদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় করে তোলা হবে। কারণ, কেবল দুর্নীতি রোধ করা গেলেই ৩০ শতাংশ সমস্যার সমাধান হবে।

সাত. সকল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাকশালের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্বাহী, কেন্দ্রীয়, জেলা ও অন্যান্য পর্যায়ের আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলোর সদস্যদের বাছাই না করেই বাকশালে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে বাকশালের সদস্য না হলে কেউ সরকারের কোনো দায়িত্বে সমাসীন থাকতে পারবেন না।

আট. দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমেই সরকারের সমস্ত কর্মসূচি শেষ হয়ে যাবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের এটি হবে কেবল প্রাথমিক একটি পর্যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো– শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি ও অবিচারমুক্ত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কেবল বাংলাদেশি ধরনের সমাজতন্ত্রই প্রবর্তিত হবে এবং বাইরে থেকে ধার করা পদ্ধতি এখানে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব ভাবমূর্তি।

নয়. স্বাধীনতাবিরোধী এবং পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেও কোনো কোনো গোষ্ঠী বাংলাদেশকে একটি 'প্রদেশ' হিসেবে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ গোষ্ঠীকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

দশ. শ্রমিক, মালিক এবং সরকারি শ্রম বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিল্প নীতি প্রণয়ন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শেখ মুজিব তাঁর এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁর বক্তব্য ছিল খাপছাড়া এবং অসংলগ্ন।[১৭]

চার

মুজিবের এই উল্টো যাত্রায় তাঁর আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকা খুব অল্প সহকর্মীই সেদিন স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ২৯২ জন সরকারদলীয় সংসদ সদস্যের মধ্যে কেবল জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন চতুর্থ সংশোধনী মেনে নিতে না পেরে সংসদ সদস্যপদ ছেড়ে দেন। এছাড়া আওয়ামী লীগ দলীয় কসবার এমপি এডভোকেট সিরাজুল হকও এসময় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় 'সরকারের গণতন্ত্রবিরোধী' কাজের সমালোচনা করে বক্তব্য রেখেছিলেন।[১৮]

সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল উত্থাপনের আগে ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির সর্বশেষ যে বৈঠক হয়, সেখানে সম্ভাব্য সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জেনারেল ওসমানী বলেছিলেন– 'আমরা আইয়ুব খানকে দেখেছি, আমরা ইয়াহিয়া খানকে দেখেছি। আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে শেখ মুজিবুর রহমান খান হিসেবে দেখতে চাই না।' ওসমানী বা মইনুল হোসেন বা সিরাজুল হকদের এইরূপ বিরোধী অবস্থানের কারণে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক কোনো আচরণ করা হয়েছে বলে জানা যায় না।[১৮]

সেই সভায় জেনারেল ওসমানী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ছাড়াও নূরে আলম সিদ্দিকী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন।[১৯]

যারা এর পক্ষে বলেন তাদের যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশি ছিল। বেশির ভাগ পক্ষের বক্তব্য ছিল এমন– 'বঙ্গবন্ধু আপনি যা-ই করেন সেটাই ভালো, যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সঠিক এবং যা বলেন সেটাই শেষ কথা'।

সংসদীয় দলের সেই সভায় শেখ মুজিব সংসদ সদস্যদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। সংসদ সদস্যদের ঢালাওভাবে দুর্নীতিবাজ বলেন। তরুণ এমপি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এর প্রতিবাদে বলেন, 'আমাদের সবাইকে চোর না বলে যারা চুরি করেছে, যাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে, তাদের বিচার করলেই তো হয়'। এমন সময় পেছন থেকে একজন চেয়ার তুলে মইনুল হোসেনকে আঘাত করতে যায়। শেখ মুজিব

চিৎকার করে উদ্যত ব্যক্তিকে থামতে বলেন।[২০]

সংসদীয় দলের বৈঠকের শেষ দিন, ২১ জানুয়ারি মিজানুর রহমান চৌধুরীর বক্তৃতা করার কথা ছিল। সেদিন তিনি বেশ সেজেগুজেই, স্যুট পরে গিয়েছিলেন।[১৯]

সভার কাজ শুরু হওয়ার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আলোচনার সূত্রপাত্র করলেন। তিনি বললেন, 'বঙ্গবন্ধু, আপনি সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, সেটা আসলে কী এবং কেন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা বুঝিয়ে বলুন। আপনি যা বলবেন, তা-ই গৃহীত হবে এবং পরে তা আইনে পরিণত করা হবে'।

বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে, একদলীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিব আরো বলেন, তিনি কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চান না। উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ আলোচনার মাধ্যমে যা স্থির করবেন সেটাই তিনি গ্রহণ করবেন। শেখ মুজিব সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে এর ওপর আলোচনা করার আহ্বান জানান।

মিজানুর রহমান চৌধুরী আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দাঁড়ান। তার সামনে শেখ মুজিব এবং চার সিনিয়র নেতা উপস্থিত। কথা শুরু করার ক্ষণেই শেখ মুজিব আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন, 'যারা আমার বক্তব্য সমর্থন কর, তারা হাত উঠাও'। পলকের মধ্যে সভাস্থলে হাত উঠে গেল। আড়ালে দু'-চারজন হাত না তুললেও এমনভাবে বসেছিলেন, যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারেন। সে সময় জেনারেল ওসমানী ও মইনুল হোসেন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবত, নূরে আলম সিদ্দিকীও অনুপস্থিত ছিলেন।

মিজান চৌধুরী বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, ওদিকে হাত উঠানো হয়ে গেল। তখন শেখ মুজিব খুব উচ্চৈঃস্বরে মিজানুর রহমান চৌধুরীকে বললেন, 'বসো বসো'। অগত্যা তিনি বসে পড়লেন। তিনি ইঙ্গিতে মিজান সাহেবকে হাত তুলতে নির্দেশ দিলেন। মিজান সাহেব মাথা নেড়ে হাত তুলতে অস্বীকার করলেন।[১৯]

এরপর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী একদিন মিজানুর রহমান চৌধুরীকে নিয়ে গেলেন শেখ মুজিবের কাছে। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী গুমোট ভাব কাটানোর জন্য

বললেন, 'মিজান, তুমি একটা চুটকি বলো। নেতা তো এত কাজ করছেন, তার একটা ডাইভারশন দরকার।' শুনে শেখ মুজিব একটু রাগতস্বরেই বললেন–

> দরকার নেই। আমি ওর কথা শুনতে চাই না।
>
> কেন কী হয়েছে? মিজানুর রহমান বললেন।
>
> তুমি আমার কথা শোননি। বেয়াদবি করেছো। আমি ইশারা করার পরও তুমি সেদিন সংসদীয় দলের সভায় বাকশালের পক্ষে ভোট দেওনি।
>
> আমি আপনার দীর্ঘদিনের কর্মী। চতুর্থবারের মতো সংসদ সদস্য। আপনি শাসনতন্ত্রের যে সংশোধনী করেছেন, তা আপনার ইমেজকে জর্জ ওয়াশিংটন বা আব্রাহাম লিংকনের ইমেজে উন্নীত করে, না আইয়ুবের ইমেজে পর্যবসিত করে, এই দ্বিধা বিদূরিত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কেমন করে ভোট দিই।

এর উত্তরে শেখ মুজিব বলেন, 'এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির গণতন্ত্র গ্রেট ব্রিটেনে এক ভোটে সরকার রক্ষা করেছে। ভারতে ম্যাডাম গান্ধীর সরকার অল্পের জন্য টিকে আছে। এসব আমি বুঝি। কিন্তু দেশের অবস্থা যে পর্যায়ে গেছে, তাতে আগামী নির্বাচন আওয়ামী লীগের জন্য মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। ২৫ থেকে ৩০টির বেশি আসন আমরা পাবো না। তখন জামায়াত অন্যান্য স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে জোট বেঁধে আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে কচুকাটা করবে।

এ অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য আমি এই পথ নিয়েছি এবং এটা অত্যন্ত সাময়িক। '৮০ সালের মধ্যে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও তেল আমরা আহরণ করতে পারবো। এতে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করা সম্ভব হবে।

১৯৮০ সালের মধ্যেই আমি 'বাকশাল' থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের শাসনব্যবস্থা ফিরিয়ে আনবো। সংবিধানকে আবার সংশোধন করবো। যদিও বাকশাল করেছি সংসদে আইনের মাধ্যমে, ওই একই আইনের মধ্যে বিধান রেখেছি, আমি একক সিদ্ধান্তে 'বাকশাল' থেকে ফিরে এসে, বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন করতে পারবো।'[২১]

সেই 'অঙ্গীকার' কতটা জোরালো ও আন্তরিক ছিল সেটার মূল্যায়ন করা আজ কঠিন হলেও জাতীয় ইতিহাস ও চরিত্র নির্ণয়ের স্বার্থে তা বিশেষ প্রয়োজন। সেই সাথে জাতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব কতটা সুষ্ঠু অথবা অগোছালো কিংবা শুধুমাত্র ক্ষমতা ধরে রাখার সুবিধাবাদী চিন্তাধারায় নিমজ্জিত ছিল তা-ও

উদ্‌ঘাটন করা জরুরি।

পাঁচ

যে কেউ ইচ্ছা করলে সরকারি দল 'বাকশালে' যোগদান করতে পারবে, এটা ছিল সরকারি ঘোষণা। আসলে যোগ না দিয়ে কারো নিস্তার পাওয়ার উপায় ছিল না। ভেতরে ভেতরে সমস্ত সরকারি-বেসরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং বুদ্ধিজীবীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল– সবাইকে 'জাতীয় দলে' যোগ দেয়ার আবদেনপত্রে সই করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যাকে 'বিপজ্জনক' মনে করে তাকে সদস্যপদ দেবে না। কিন্তু বাংলাদেশে বাস করে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেঁচে থাকতে চাইলে, জাতীয় দলের সদস্যপদের আবেদনপত্রে সই করতেই হবে। সর্বত্র বাকশালে যোগদানের একটা হিড়িক পড়ে গেল।

শেখ মুজিবুর রহমান যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাকশালে'র কেন্দ্রীয় দপ্তর উদ্বোধন করতে এলেন তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে গোটা দেশের উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, শ্রমিক, কৃষক ও সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে হাজির থাকতে বাধ্য করা হয়েছিল।

সেদিন ছিল মুষলধারে বৃষ্টি। অবিরাম ধারাস্রোতে প্লাবিত হয়ে, ভেজা কাকের মতো সুদীর্ঘ মানুষের সারি– কীভাবে রাস্তায় তারা অপেক্ষা করছিলেন, যারা এ দৃশ্য দেখেছেন ভুলবেন না। মহিলাদের গাত্রবস্ত্র ভিজে শরীরের সঙ্গে একাট্টা হয়ে গিয়েছিল। সুবিশাল জনারণ্যে দেশের নারীকুলকে লজ্জা-শরম জলাঞ্জলি দিয়ে শঙ্কিত চিত্তে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষা করতে হচ্ছিল।[২২]

অবাক করা বিষয় হলো, জাসদের তরফ থেকে মুজিবের 'বাকশাল'-এর জোরালো বিরোধিতা হয়নি। সম্ভবত এই বিষয়ে বিরোধিতায় তাদের নৈতিক ভিত্তি ছিল না। কারণ স্বাধীনতার পর পর সিরাজুল আলম খানের তিন গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী আ স ম আব্দুর রব, শাজাহান সিরাজ ও শরীফ নুরুল আম্বিয়া বিবৃতি দিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের নিয়ে একটি 'জাতীয় বিপ্লবী সরকার' গঠনেরই দাবি জানিয়েছিলেন। তারা সেদিন জরুরি অবস্থা ঘোষণারও আহ্বান জানান, যা ছিল স্পষ্টত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়ার প্রস্তাব।

চিত্র-কথন: পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারিস্ট; পলিটিক্যাল লিডার

শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি আমলের 'তেইশ বছরের ইতিহাস'-এ 'পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারিস্ট'– অর্থাৎ, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিজেকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী অবস্থানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, না-কি 'পলিটিক্যাল লিডার'– অর্থাৎ, সত্যিকারের রাজনীতিজ্ঞ নেতা হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, যার উদাহরণ এই উপমহাদেশে রয়েছে, তা নিয়ে হয়তো দীর্ঘ বিতর্কের অবকাশ ঘটবে আগামীতে।

কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট যে, এই 'তেইশ বছর'-এ তিনি পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতির মঞ্চে-ময়দানে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং আরো যা কিছু করবেন মর্মে আশ্বাস দিয়েছেন এবং পূর্ব বাঙলার সিংহভাগ নিরক্ষর, সহজ ও সরলপ্রাণ মানুষকে তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে বলেছেন, তার সবই ছিল গণতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থার আওতাধীন। উদাহরণসমেত সুনির্দিষ্ট করে বললে তা ছিল ব্রিটিশ সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যেখানে জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাই হবে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ামক শক্তি, সব রকমের পরিবর্তন-পরিবর্ধনের এখতিয়ার থাকবে কেবল তাদেরই হাতে।

কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রে যুদ্ধজয়ী জাতির সামনে তাঁর যেন মনোজাগতিক পরিবর্তন ঘটলো। রাজনৈতিক উত্থানের প্রারম্ভিক ও প্রস্তুতি পর্বে হৃদয়ছোঁয়া যে সব সংসদীয় গণতান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করে পলিমাটির নরম মনের মানুষকে তিনি গরম মেজাজ

এনে দিয়েছিলেন, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে এটাকে রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের সফলতা বিবেচনা করলেও নিজের উচ্চারিত সেই সব মন্ত্রে আর ভরসা রাখতে চাইলেন না। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তাঁর কাছে হয়ে গেল 'ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান'।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কেন এই পরিবর্তন? কেন তিনি জনমত আর জনসমর্থনের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছিলেন না? কেন তাঁর তরফ থেকে বলা হচ্ছিল যে, 'আইনের শাসন নয়, মুজিবের শাসন চাই'? জনগণের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার পূজারী না হয়ে তিনি কি ক্ষমতার পূজারি হতে চাইলেন? যুদ্ধজয়ী জাতির বিবেকরূপী অগ্রসর শ্রেণির আত্মমর্যাদাবোধ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক-সামাজিক পুনর্গঠনের বিপুল চাহিদার মুখোমুখি হওয়ার জন্য রাজনৈতিক মেরু পরিবর্তনই কি আবশ্যক ছিল?

যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাস-চর্চা-অনুশীলন ছিল না মোটেই সেই ব্যবস্থায় তা হলে গেলেন কেন? তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ কারো মতে, যুগোশ্লাভিয়ার মহান নেতা মার্শাল টিটো সর্বব্যাপী প্রতিকূলতা সামাল দেয়ার নামে তাঁকে এই ব্যবস্থার পরামর্শ দিয়েছিলেন– যার ফল হলো 'বাকশাল'।

কারো মতে, 'বাকশাল'-এর মূল পরামর্শক শক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন। মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সক্রিয় সমর্থন ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউএসএসআর) তার প্রভাব-বলয় বাড়াতে চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। অথচ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সোভিয়েত সমর্থন-সহায়তা মুজিব সরকারের প্রত্যাশার বহু দূরে ছিল।

স্বাধীন দেশে ফিরে এসে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার পঞ্চাশ দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। '৭২-এর ফেব্রুয়ারির শেষ নাগাদ পাঁচ দিনের সফরে মস্কো পৌঁছলে বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত-অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন।

তবে এই সফরে মুজিবের বোধগম্য পর্যবেক্ষণ প্রত্যাশিত ছিল যে, রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে মেরু পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা জারি করে দিলেই সেটা সফল কিংবা কায়েম হয় না– আর ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বার্থচিন্তাযুক্ত এবং দুরভিসন্ধিমূলক হিসাবে চিহ্নিত কোনো ব্যবস্থাও, তা সে যে নামেই অভিহিত হোক, জনমনে স্থান করে নেয় না– সেজন্য চাই দীর্ঘ প্রস্তুতি, ত্যাগের প্রেরণা ও আদর্শিক তাড়না।[৩৬]

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে 'বাকশাল' ছিল তাদের তিন বছর আগেকার দাবিরই কাছাকাছি কর্মসূচি। কিন্তু বাকশাল কায়েমের পর প্রথম তাৎক্ষণিক আঘাত আসে জাসদের ওপরই। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাসের ৪৮ ঘণ্টা পরই পুলিশ জাসদের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত *'দৈনিক গণকণ্ঠ'* কার্যালয় দখল করে নেয়।[২৩]

সেই সময়ের বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবের রাজনৈতিক বন্ধু, খন্দকার মোশতাক আহমদ নানাভাবেই চেষ্টা করেছিলেন সংবিধান পরিবর্তন এবং একদলীয় শাসন প্রবর্তন থেকে শেখ মুজিবকে নিবৃত্ত করতে। তিনি শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার স্বামী এম এ ওয়াজেদ মিয়াকে বলেছিলেন, 'এটা মারাত্মক ভুল হবে'। এ বিষয়ে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলার জন্য ওয়াজেদ মিয়ার সাথে খন্দকার মোশতাক আহমদ তিনবার আলাপ করেন।

যেদিন 'বাকশাল' প্রবর্তনের লক্ষ্যে চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হয়, তার আগের রাতেও ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বাসভবনে গেলে সেখানে ওয়াজেদ মিয়াকে গেট থেকে কাছে আমগাছতলায় টেনে নিয়ে যান খন্দকার মোশতাক। তাকে তখন খুব উত্তেজিত দেখালেও তিনি ওয়াজেদ মিয়াকে স্নেহের সুরে বলেন, 'বাবা ওয়াজেদ, আগামীকাল তোমার শ্বশুর সংবিধানে যে পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছেন, তা করা হলে সেটা শুধু একটা মারাত্মক ভুলই হবে না, দেশে-বিদেশে তাঁর ভাবমূর্তিরও অপূরণীয় ক্ষতি হবে। তৃতীয় তলার বৈঠকখানায় গিয়ে তাঁকে একটু বোঝাও।'

তিনতলায় ওয়াজেদ মিয়া গিয়ে দেখলেন, সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছেন শেখ মুজিব। তারা চলে গেলেই ওয়াজেদ মিয়া কথাটা বলার সুযোগ খুঁজছিলেন। সেই রাতের খাবার তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গেই খান। খাওয়ার পরেই শেখ মুজিব কোনো কথা না বলে শোবার ঘরে চলে যান। ঠিক সেই মুহূর্তে শেখ ফজলুল হক মণি শয়নকক্ষে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দেন। রাত পৌনে একটায় যখন ওয়াজেদ মিয়া দেখা করার আশা ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসেন, তখনো শেখ মুজিবের সাথে রুদ্ধদ্বার আলাপ চলছিল শেখ মণির।[২৪]

বাকশালের ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনৈতিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগ বহির্ভূত মাত্র ১০ জনকে স্থান দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন সাবেক ন্যাপ (মো.) ও সিপিবি'র। বাকি তিনজনের মধ্যে আতাউর রহমান খান তার সংসদ সদস্যের পদ বহাল রাখার লক্ষ্যে বাকশালে যোগদান করেন। অন্য দু'জন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের নেতা মং প্রুয়ে সাই এবং বর্ষীয়ান

বামপন্থি কৃষকনেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ। ২০ জন ঊর্ধ্বতন আমলা, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, 'ইত্তেফাক' ও 'বাংলাদেশ অব্জারভার'-এর সম্পাদক এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানদেরকেও বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২৫]

অবশ্য অনেকেই অভিযোগ করেন যে, তারা চাপের মুখে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং জোর করে তাদের সম্মতি আদায় করা হয়।[২৫]

'বাকশাল' চালুর আগে শেখ মুজিব তাঁর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী তাজউদ্দীনের কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন– 'আপনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে আমি অনেকবারই বলেছি আমার দ্বিমতের কথা। আর আজ আমার চূড়ান্ত মতামত দিচ্ছি। আমি আপনার এই একদলীয় শাসনের সঙ্গে একমত নই... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনার হাতে এতই ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, সেই ক্ষমতাবলে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা বা আর কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আমরা বক্তৃতায় সব সময় বলেছি একটি সুখী-সমৃদ্ধিশালী দেশের কথা– যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্রের গুণগান করেছি আমরা সব সময়, আজকে আপনি কলমের এক খোঁচায় সেই গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা জারি করতে যাচ্ছেন। বাই টেকিং দিস্ স্টেপ ইউ আর ক্লোজিং অল দ্য ডোর্স্ টু রিমুভ ইউ পিস্ফুলি ফ্রম ইউর পজিশন।'[২৬]

ছয়

১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল উত্থাপন করেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে প্রচলিত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা বাতিল করে 'বাকশাল' ব্যবস্থা চালু করা হয়। উত্থাপনের মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে এই বিল সংসদে পাস হয়। বাকশাল শাসনব্যবস্থায় পদার্পণের আগেই বিশেষ ক্ষমতা আইনের মতো কালাকানুন তৈরি করে নেয়া হয় এবং ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানকেও জরুরি অবস্থা জারির উপযোগী করা হয়।[২৭]

নিবর্তনমূলক বিশেষ ক্ষমতা আইন, জরুরি অবস্থা জারি, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ, মিছিল ও সমাবেশের স্বাধীনতা হরণ, বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে

তাদের নির্বাহী বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও খুন এবং নিবর্তনমূলক আটকাদেশের ক্ষমতার মতো পদক্ষেপগুলো ছিল শাসক হিসেবে পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রিয় সব শাসন পদ্ধতি। সেই শাসক ও শাসন পদ্ধতির নিন্দা ও পরাজয়ের ওপর ভিত্তি করে একাত্তরে যে জনগোষ্ঠীর গর্বিত যাত্রা, তারা মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে একই নোংরা অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করে শত গুণ 'মহিমা'র সঙ্গে।

সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নিবর্তনমূলকভাবে আটককৃতদের মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত কাউকে আটকের কারণ জানানো, আইনজীবীর পরামর্শের সুযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটককৃতকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করার বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়।[২৮]

বাকশাল মূলত ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা 'রিপাবলিক' বা 'প্রজাতন্ত্র'র ভিত্তিকে তছনছ করে দেয়। আরো স্পষ্ট করে বললে, বাংলাদেশ নামের যেই রাষ্ট্র ১৯৭১-এ তৈরি হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রকেই কার্যত ধ্বংস করে দেয়। বাকশাল মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গঠিত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করেছিল দু'ভাবে।

এক. বাকশাল যে আইনে হয়, সেই চতুর্থ সংশোধনী আইন-১৯৭৫-এ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ সংশোধন করে বলা হয়েছিল, 'Effective participation by the people through their elected representatives in administration at all levels shall be ensured, shall be omitted'। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়– সংশোধনের আগের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১-তে প্রশাসনের সর্বস্তরে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণের যে কথা বলা ছিল, এখন তা বাতিল করে দেয়া হলো। অর্থাৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা সোজা বাংলায় শাসক নির্বাচনের ক্ষমতা, আর রাষ্ট্রীয় কাজে রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী হিসেবে জনগণের অংশ নেয়ার ক্ষমতা থাকলো না।

দুই. সংক্ষুব্ধ কোনো নাগরিকের আদালতে যাবার যে মৌলিক অধিকার ৪৪ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত ছিল, বাকশাল সংশোধনীতে সেই ৪৪ অনুচ্ছেদকেই বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। একই সাথে ১০২ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে দেয়া অধিকার অর্থাৎ সংক্ষুব্ধ কোনো নাগরিকের আবেদন শুনতে এবং প্রতিকার দিতে নির্বাহী বিভাগকে আদেশ দেবার আদালতের ক্ষমতাকেও একই সাথে বাতিল করা হয়। সোজা কথায়, চতুর্থ সংশোধনী আইন রাষ্ট্রের নাগরিকের সংক্ষুব্ধ হবার মৌলিক অধিকার রদ করেছিল এবং রাষ্ট্রকে লাগামহীন ক্ষমতা দিয়েছিল। এমন লাগামহীন ক্ষমতা পেলে তা আর রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র থাকে না।

জনগণও আর নাগরিক থাকে না। এটা হয়ে যায় রাজত্ব বা রাজতন্ত্র আর জনগণ হয়ে যায় মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহ্ ও সম্রাটদের আজ্ঞাবহ, অনুগত প্রজা।

বাকশাল বাংলাদেশের মানুষকে 'নাগরিক' থেকে 'প্রজা'তে নামিয়ে এনেছিল, আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র থেকে 'রাজতন্ত্রে' অধঃপতিত করেছিল।

২৫ জানুয়ারি সকাল ১০টায় জাতীয় কবিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভবনে আনার ব্যবস্থা করা হলো। তিনি এলেন। অনুষ্ঠান চলছিল রাষ্ট্রপতির অফিসে। ইতোমধ্যে সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়ে গেছে। সংসদ থেকে বার্তাবাহক দুই মন্ত্রী নুরুল ইসলাম মঞ্জু ও শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন বঙ্গভবনে এলেন মোহাম্মদউল্লাহর পদত্যাগের পত্র শেখ মুজিবের কাছে নিয়ে যাবার জন্য। শেখ মুজিব অপেক্ষা করছেন সংসদে। এই পদত্যাগপত্র পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে স্পিকারের কাছে শপথ গ্রহণ করে তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাবেন। তাদের কোনোমতে একটু সবুর করতে বলে ভেতরে গিয়ে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদউল্লাহকে দিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পদক পরিয়ে দেয়ার কাজ সেরে নেয়া হলো। কোনোমতে চা-পর্ব সেরে কবিকে গাড়িতে তুলে দেয়া হলো।[২৯]

শাহ্ মোয়াজ্জেম ফাইলটি প্রেসিডেন্টের সামনে রেখে বললেন, 'সই করুন। সই করার পর থেকে আপনি আর রাষ্ট্রপতি থাকবেন না।' মোহাম্মদউল্লাহ সাহেবের একটু সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তারা তাকে সে সময় দিতে পারলেন না।[৩০] তিনি একবার শাহ্ মোয়াজ্জেমের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ হেসে বিলটিতে স্বাক্ষর করে দিলেন।[৩০]

ফাইল নিয়ে সচিব কক্ষের বাইরে যেতেই শাহ্ মোয়াজ্জেম বললেন, 'চিন্তার কারণ নেই; লিডার আপনাকে জানাতে বলেছেন, আপনাকে মন্ত্রী করা হবে।' তিনি বললেন, 'শাহ্ সাহেব, তাকে বলে আমাকে পূর্ণ অবসর দেয়া যায় না? রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের পর মন্ত্রিত্ব ভালো লাগবে না, ভালো দেখায়ও না।'

কিন্তু তিনি কেবল মন্ত্রিত্বই নয়, পরবর্তীকালে একজন সাধারণ এমপি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনিই ছিলেন সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি ডেপুটি স্পিকার, স্পিকার, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি এবং এমপি হিসেবে ক্রমান্বয়ে

কাজ করেছেন; দলও করেছেন প্রায় সব ক'টি। ঠাট্টা করে তার রাজনৈতিক সহকর্মীরা বলতেন, 'আপনার শুধু দারোগা হওয়া বাকি আছে!'[৩০]

১৯৭৪-এর ২৮শে ডিসেম্বর সারা দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু মুছে দেয়া হয়। তবে এই সিদ্ধান্ত আকস্মিক নয়। রাজনৈতিক মহল মাসাধিককাল যাবত এমন আশঙ্কার কথাই আলোচনা করে এসেছে। কেননা, গুজব রটেছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা বাতিল করে প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করার ও নিজেকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করার চেষ্টা করছেন।

জরুরি অবস্থা বলবৎ করতে গিয়ে শেখ মুজিব সেই পুরনো 'জুজু'র ভয়ই দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে প্রো-পাকিস্তানিরা এখনো সক্রিয়। কিন্তু অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকার– যে সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে বাংলাদেশের জন্ম থেকে শাসন করে আসছে– ব্যর্থ হয়েছে, সে জন্যই জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে। সরকার যে ওয়াদা পালনে ব্যর্থ হয়েছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখা যায় গ্রাম-বাংলায়, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও পুষ্টিহীনতায় হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করছে, আর যারা বেঁচে আছে তারা সরকারের গুণ্ডাবাহিনীর ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত।[৩১]

পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা সংবাদপত্র 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' শিরোনাম করলো, 'মুজিব একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছেন'

'... বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন।

গত শনিবার ঢাকায় পার্লামেন্টের এক ঘণ্টা স্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধীদল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলো যে, এ ব্যাপারে কোনো বিতর্ক চলবে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় মাস গৃহযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বললেন, 'পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান' (বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র

রচনাতেও ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞরা সাহায্য করেছিলেন)। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে 'ঔপনিবেশিক' ও 'দ্রুত বিচার ব্যাহতকারী' বলে অভিযুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট এখন খেয়াল-খুশিমতো বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন, নাগরিক অধিকার বিন্দুমাত্রও যদি প্রয়োগ করা হয়, তা প্রয়োগ করবে নতুন পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ আদালত।

নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে একটি 'জাতীয় দল' প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল। যদি কোনো এমপি এই দলে যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের সর্বমোট ৮ জন বিরোধীদলীয় সদস্যের ৫ জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তাদের মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশ গেরিলাবাহিনীর নায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী জেনারেল এম এ জি ওসমানী। শোনা যায়, তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

নতুন এই শাসনতন্ত্রের বলে শেখ মুজিব ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসন করতে পারবেন। নতুন শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত জাতীয় পার্লামেন্টের মেয়াদও দু'বছর অর্থাৎ ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে পার্লামেন্ট অধিবেশন বছরে মাত্র দু'বার অল্প সময়ের জন্য বসবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স্-এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

বাংলাদেশের ঘনায়মান আর্থিক ও সামাজিক সংকটে বিদেশি পর্যবেক্ষকগণ সন্দিহান যে, দেশে একনায়কতন্ত্রের আদৌ কোনো প্রয়োজন (?) আছে কিংবা এরকম একনায়কতান্ত্রিক শাসন পরিচালনার পক্ষে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলী শেখ মুজিবের আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশ যে নিশ্চিত দুর্ভিক্ষ ও অরাজকতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, শেখ মুজিবের নতুন ক্ষমতা ও নতুন শাসনতন্ত্র তাতে তেমন কোনো তারতম্য ঘটাতে পারবে কি-না।

এক মাস আগে শেখ মুজিব জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন, কয়েকজনকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং বামপন্থি গেরিলা নেতা সিরাজ শিকদারকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, জরুরি অবস্থা ও জরুরি আইন প্রয়োগে বিন্দুমাত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি-না; যেখানে বর্তমানে সুশাসন বলতে কিছুই নেই।

একদলীয় শাসন সৃষ্টির ফলে দুর্নীতি দূর না হয়ে বরং বাড়তে থাকবে। কেননা, উদ্ধত ও বেপরোয়া আওয়ামী লীগারদের ঠেকাতে কিংবা প্রতিহত করতে পারবেন একমাত্র প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তিনি থাকবেন অতিরিক্ত কাজের চাপে। সরকারবিরোধীরা যতই আত্মগোপন করতে বাধ্য হবে ততই গ্রাম-বাঙলায় চরমপন্থি গেরিলা ও তাদের সহযোগী 'লুটতরাজকারী'দের সমর্থন বাড়তে থাকবে।'[৩২]

আট

বাংলাদেশের মানুষ যে পাকিস্তান আমলের চাইতে খারাপ দিন কাটাচ্ছে সেটা নিরপেক্ষ একাডেমিশিয়ানদের কথা-বার্তাতেও ফুটে উঠেছিল। ডেলওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশনের প্রফেসর উইলিয়াম ডব্লিউ বয়ার বলেন, বহুল প্রচারিত খাদ্যাভাব ও রাজনৈতিক সংগ্রাম বাংলাদেশের সমস্যার অংশমাত্র। এশিয়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে ডেভেলপ্‌মেন্ট এডমিনিস্ট্রেশন সম্পর্কে জ্ঞানান্বেষণে এক মাস কাটিয়ে গিয়েছিলেন প্রফেসর বয়ার।[৩৩]

এক সাক্ষাৎকারে বয়ার বলেন, 'বাংলাদেশে মানবিক প্রচেষ্টার কোনো ক্ষেত্রেই অসুবিধামুক্ত নয়। কল্পনা করুন যে, যুক্তরাষ্ট্রের উইস্‌কন্‌সিন্‌ স্টেট অতিক্রম করতে এক মাস কি তারও বেশি সময় লাগছে– তাহলে বাংলাদেশের পরিবহন সমস্যা উপলব্ধি করতে পারবেন। কোনো কোনো সময় একটা ট্রাক চট্টগ্রাম বন্দর থেকে রাজধানী ঢাকায় এসে পৌঁছতে কয়েক মাস লেগে যায়। যদিও গোটা দেশটা আয়তনে প্রায় উইস্‌কন্‌সিনের সমান। ক্ষুদ্র মন্থর গতিবেগসম্পন্ন খেয়া নৌকায় বড় বড় নদী পার হওয়াটাই এখানকার প্রধান সমস্যা। হয়তো ৫০টি ট্রাক সারিবদ্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে নদী পার হতে, কিন্তু খেয়া নৌকা এক দফায় মাত্র দু'টো ট্রাক নিতে পারে এবং নদী পার হতে কয়েকদিন লেগে যেতে পারে।'

রাজনৈতিক দুর্নীতি দেশটির প্রগতিকে ব্যাহত করছে। ডকে সিমেন্ট বস্তায়

স্তূপীকৃত হয়ে আছে এবং বৃষ্টিতে ভিজে জমাট বেঁধে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মুষ্টিমেয় লোকের অবৈধ লাভের জন্য আমদানিকৃত খাদ্যশস্য দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে, আর লাখ লাখ লোক মরছে অনাহারে। শিল্প-কলকারখানায় উৎপাদন হতাশাব্যঞ্জক।

অনাহারই হচ্ছে পয়লা নম্বর সমস্যা। পার্লামেন্টের একজন সদস্য বয়ারকে বলেন যে, তার জেলায় শতকরা ২৫ জন লোক অনাহারের পর্যায়ে আছে। বাংলাদেশের মাপকাঠিতে এর অর্থ এই যে, আজ একবেলা খাওয়া, তাও অর্ধাহার, কাল উপোস, পরের দিন আবার একবেলা এবং অর্ধাহার।

প্রশাসনিক ব্যাপারেও বাংলাদেশ পিছিয়ে গেছে। বয়ার বলেন, কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ওষুধপত্র বোঝাই একটি মালগাড়ি ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে পড়ে ছিল। যে কর্মচারীটি চার্জে ছিলেন, তিনি বললেন, গাড়ির তালা খুলে ওষুধ বের করার জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রয়োজন। জনৈক আমেরিকান 'এইড অফিসার' নিরাশ হয়ে কয়েকজন শ্রমিককে পয়সা দিয়ে তালা ভাঙিয়ে ক্ষুদে বাঙালি কর্মচারীকে দেখিয়ে দিলেন যে, উপরওয়ালার অনুমোদন আর দরকার নেই। গত জানুয়ারি মাসের চেয়ে এখন অবস্থার হয়তো যৎসামান্য উন্নতি হয়েছে, কিন্তু ১৯৭১ সালের আগেকার দিনগুলোর মতো হয়নি। তখন বাংলাদেশ পাকিস্তানের অংশ ছিল। বয়ারের মতে, প্রায় সকলেই একমত যে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাঙালিরা তখন অধিকতর ভালো ছিল। বাংলাদেশ সফরটি কোনো রকমেই আনন্দদায়ক ছিল না। তেমন কিছু করার মতোও ছিল না। শুধু বই পড়েছি– অনেক বই, বললেন বয়ার।

তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে এত যে সাহায্য পাচ্ছে– ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সাহায্য পেয়েছে এবং এর মধ্যে আমেরিকা দিয়েছে ৫০০ মিলিয়নের উপর– তার কারণ, বাংলাদেশের শোচনীয় অবস্থা দুনিয়ার সর্বত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে। বয়ার বলেন, তিনি বাংলাদেশে থাকতে জনৈক সরকারি কর্মচারী তাকে বলেছেন যে, কোনো দিক দিয়েই বাংলাদেশের গুরুত্ব নেই। বয়ার বলেন, 'মজার ব্যাপার এই যে, বিদেশি কাউকে জিজ্ঞেস করুন, এ দেশে কেন এসেছেন? জবাবে কেউ 'সহানুভূতি'র বিষয়টি বলবেন না। কারণ, এ দেশে ক্ষমতাসীন মহল 'সহানুভূতি'র কথা স্বীকার করতে পছন্দ করে না'।[৩৩]

নয়

‘বাকশাল’ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও ক্ষমতার অংশভোগী করে নিয়েছিল। বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির এক শ’ পনেরোজন সদস্যের মধ্যে ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যত্রয় এবং বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষাকে শেখ মুজিব স্থান দিয়েছিলেন। ‘জাতীয় দলে’র কেন্দ্রীয় কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের স্থান দিয়ে সরাসরি বিধিবদ্ধভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করলেন। বাকশালের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ঘোরপ্যাঁচ ব্যাতিরেকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারি শাসন বলবৎ করা হয়।

পাকিস্তান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব করতো বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠান ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তান সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কিংবা পরিচালনায় প্রকাশ্যে কোনো হস্তক্ষেপ করতো না। শেখ মুজিবই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার অংশীদার করলেন।

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আলাদা অস্তিত্ব, আলাদা আইন-কানুন এগুলোকে তিনি ক্রমে ভেঙে নতুন করে সাজিয়ে, তার মধ্যে সরকার বিরোধিতার বীজকে উপড়ে ফেলেন।

দ্বিতীয়ত, যে আধুনিক শিক্ষাভিমানী পণ্ডিত সমাজ তাঁকে অবজ্ঞা করেন, তাদের অন্তরলালিত অহঙ্কার চূর্ণ করে দেন। বাকশালের আইন এমনভাবে রচনা করা হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদেরও তাঁর আওতার বাইরে থাকার উপায় রইলো না এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সিংহাসনের পেছনে না দাঁড়িয়ে তাদের গত্যন্তর থাকলো না।

তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজের হাতের মুঠোতে পুরে তিনি দেশের মানুষ এবং বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করতে চাইলেন যে, তিনি মন্দ অর্থে একনায়ক নন। দেশের কৃষকসমাজ থেকে শুরু করে সারস্বত সমাজ পর্যন্ত তাঁকে অনুরোধ-উপরোধ করেছে এবং দেশের মানুষের সমবেত প্রার্থনা তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেননি।

এর ফলও শেখ মুজিব পেলেন হাতে-হাতেই। বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্ষমতার অংশ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ উপাচার্য এক পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেই বসলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এমন একজন বলিষ্ঠ নেতা হাজার বছরে জন্মগ্রহণ করেননি। শেখ মুজিবুর রহমান যে বলিষ্ঠ নেতা সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই

উপাচার্য তা প্রকাশ করার জন্য এই সময়কে বেছে নিয়েছিলেন কেন? তিনি তার বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়ে তাদের বাকশালে যোগদানের আবেদনপত্রসহ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে আসলেন। সেই ছবি কাগজে ফলাও করে প্রকাশিত হলো।

এই উপাচার্য ভদ্রলোককে দেশের মানুষ আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে জানতেন। অতটুকু দাসত্ব-মনোবৃত্তি তার কাছ থেকে কেউ প্রত্যাশা করেননি। তার এ ধরনের কার্যকলাপের দু'রকম প্রতিক্রিয়া হলো। তার মতো লোকের পক্ষে তথাকথিত জাতীয় দলের প্রতি এ ধরনের কাণ্ডজ্ঞানহীন তোষামোদি দেখে জ্ঞানী-গুণী সমাজের একাংশ চিন্তিত হয়ে উঠলো, আরেক অংশের 'প্রতিরোধ ক্ষমতাও' দুর্বল হয়ে গেল।

অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তার দহরম-মহরম অন্যান্য উপাচার্য এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত প্রধান ব্যক্তিদের অনেকের মনে ঈর্ষার উদ্রেক করেছিল, সন্দেহ নেই। তিনি যদি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে অত বেশি মাখামাখি করার সুযোগ আদায় করে ফেলেন, তাতে অন্যদের সুযোগ-সুবিধা মাঠে মারা যাবার আশঙ্কা। তাই অন্যরাও উঠে-পড়ে লাগলেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক আবুল ফজল ছাড়া সকল উপাচার্যই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং শিক্ষকদের বাকশালে যোগ দেয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ উপাচার্যদের সহায়তা দিয়ে আসছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বাকশালে যোগদান করার জন্য ভয়-ভীতি এবং নানামুখী চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

প্রত্যেক অধ্যক্ষ বিভাগীয় শিক্ষকদের মধ্যে আবেদনপত্র বিলি করেছিলেন এবং সরকারি প্ররোচনায় তরুণ শিক্ষকদের সই করতে অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য করেছিলেন। অনেক শিক্ষকই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সই করতে চাননি। কিন্তু হুমকি, ভীতি এবং চাপের মুখে তাদের বেশির ভাগই আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন।

যে সকল শিক্ষক সই করেননি, তাদের নাম বাকশাল কেন্দ্রীয় অফিসে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ এই বিদ্রোহী শিক্ষকদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে ধরে নেয়া হবে বলে হুমকি দিয়ে প্রচারণা শুরু করলো।

এই জোর-জুলুম, ভয়-ভীতি-সন্ত্রাসের মধ্যে '৭৫-এর ১৪ আগস্ট সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র পনেরোজন শিক্ষক বাকশালের সদস্যপদের

জন্য আবেদনপত্রে সই করেননি। বাকি সকল শিক্ষকের সইসংবলিত আবেদনপত্র সংগৃহীত হয়ে গেছে।

১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার কথা ছিল এবং তখন হাজারখানেক শিক্ষকের আবেদনপত্র তাঁর সকাশে দাখিল করার কথা ছিল। তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে 'গুরুত্বপূর্ণ' ভাষণ দেবেন এবং তাদের কাছে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি একনিষ্ঠ সমর্থনের প্রতিশ্রুতি চাইবেন। শিক্ষকরাও হাত তুলে তিনি যা বলবেন তার প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হবেন, এমনটাই ছিল কর্মসূচি।[৩৪]

'বাকশাল' ঘোষণার পর ঢাকা শহরের বস্তিগুলো সরকার উচ্ছেদ করে, বস্তিবাসীদের টঙ্গীতে স্থানান্তর করে। বিদেশি সাংবাদিক, যারা স্বল্পকালের জন্য বাংলাদেশ সফরে আসেন তাদের কাছে টঙ্গী একটি চাঞ্চল্যকর 'হরর স্টোরি' হয়ে ওঠে। ১২টি আশ্রয়কেন্দ্র– ১২টি গ্রাম, অসংখ্য ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর– এসব নিয়ে গোটা এলাকা বিশাল এক বস্তির রূপ ধারণ করে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর প্রথম ক্ষমতা প্রদর্শনে শেখ মুজিব বস্তিগুলো ভেঙে সমান করে দিয়ে বস্তিবাসীদের ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সরকারি ক্যাম্পে পুনর্বাসন করেন। টঙ্গীর জন্য বস্তুত কোনো অর্থ বরাদ্দ ছিল না। রেডক্রস খাবার সরবরাহ করছিল।

ঢাকার বস্তিজীবন কঠিন ছিল বটে; কিন্তু অনেক বস্তিবাসীরই চাকরি ছিল। টঙ্গী ক্যাম্পে শতকরা মাত্র ৫ জনের নিয়মিত রোজগারের ব্যবস্থা ছিল। শতকরা ১৫ জন অনিয়মিতভাবে রিক্শা, বেবিট্যাক্সি কিংবা ঠেলাগাড়ি চালাতো, বাকি সবাই একদম বেকার। কর্মসংস্থানের কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি।

বৃষ্টি হলে টঙ্গীর ক্যাম্প জলাভূমিতে পরিণত হবার আশঙ্কা ছিল। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, বৃষ্টি শুরু হলে টঙ্গী ৮ ফুট পানির নিচে ডুবে যাবে। আর তখনই টঙ্গী ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সত্যিকার দুঃস্বপ্ন শুরু হবে– 'শিকাগো ডেইলি নিউজ'-এ টঙ্গী নিয়ে এরকম এক মর্মস্পর্শী রিপোর্ট ছাপা হয়:

হাতেম আলী রিক্শা চালিয়ে তার পরিবারের (সাতজন) ভরণ-পোষণ করতে পারতো। তারপর একদিন সরকার পরিবারসহ তাকে ঢাকার বস্তির বাসা থেকে

জোর করে ট্রাকে উঠিয়ে শহরের বাইরে টঙ্গীতে এনে ফেললো। সেখানে তাকে এক ফালি জমি দিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে বলা হলো। হাতেম আলী ঢাকায় রিক্‌শা চালাতে চেয়েছিল। কিন্তু ৪০ টাকা (প্রায় ৬ ডলার) ঘুষ না দিলে অফিসাররা তাকে লাইসেন্স দেবে না। সে যখন বললো, এই ফি সে দিতে পারবে না, তখন তারা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজিতে তাকে প্রশ্ন করা শুরু করলো। সেও তাদের মুখের ওপর বাংলায় জবাব দিলো– 'ইংরেজি জানবো কেন? যদি ইংরেজিই জানতাম, তাহলে তো কেরানিই হতাম, রিক্‌শা টানতাম না।' সুতরাং হাতেম আলী টঙ্গীতেই রইলো।

আহন বানুর স্বামী যখন রিক্‌শাওয়ালা ছিল, তখন তাদের স্বচ্ছলতা ছিল। আহন বানু নিজেও ঢাকায় আয়া বা বেবিসিটার হিসেবে সপ্তাহে ৩০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) উপার্জন করতো। কিন্তু সরকার তাকে ঢাকার বস্তি থেকে উঠিয়ে টঙ্গীতে নিয়ে এসেছিল।[৩৫]

সূত্র:

১. বাংলাদেশ : জাতি গঠনকালে এক অর্থনীতিবিদের কিছু কথা; নুরুল ইসলাম, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৭, পৃষ্ঠা: ১২৬

২. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ২০৬

৩. কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি; সিপিবি, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা: ১০

৪. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৬

৫. মণি সিংহ : কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সমকালীন রাজনীতি; ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বাঙলায়ন, ২০১২, পৃষ্ঠা: ১৭৭

৬. দৈনিক সংবাদ; ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫

৭. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪১

৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ১৫৩-১৫৪

৯. মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস; গোলাম মুরশিদ, প্রথমা প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১০, পৃষ্ঠা: ২০৭-২০৮

১০. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪০-১৪১

১১. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৩১৪-১৫

১২. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪২

১৩. বাংলাদেশ : দুই দশকের রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় সাংবাদিক আতাউস সামাদ; ২৯ জানুয়ারী থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ এবং Bangladesh : Past two decades and the current decade; Qazi Khaliquzzaman Ahmad (Editor), Bangladesh Unnayan Parishad (BUP), June 1994, p. 456-458

১৪. দৈনিক ইত্তেফাক; ৪ এপ্রিল ১৯৬৪

১৫. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত, ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৩৩০-৩৩১

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৩১-৩৩২

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৩৩

১৮. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৩

১৯. রাজনীতির তিন কাল; মিজানুর রহমান চৌধুরী, অনন্যা প্রকাশ, জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা: ১৫৩-১৫৪

২০. আমার জীবন: আমাদের স্বাধীনতা; মইনুল হোসেন, বিনিময় প্রিন্টার্স লিমিটেড, ২০১৭, পৃষ্ঠা: ১১৩

২১. রাজনীতির তিন কাল; মিজানুর রহমান চৌধুরী, অনন্যা প্রকাশ, জুন ২০০৩, পৃষ্ঠা: ১৬০

২২. নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ; আহমদ ছফা, খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ২০০১, পৃষ্ঠা: ৪৯৯-৫২০

২৩. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৫

২৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ; এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউপিএল, এপ্রিল ২০০০, পৃষ্ঠা: ২৩৪-৩৫

২৫. বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল; মওদুদ আহমদ, জগলুল আলম অনূদিত,

ইউপিএল, ফেব্রুয়ারি ২০১৬, পৃষ্ঠা: ৩৪২

২৬. তাজউদ্দীন আহমদ : আলোকের অনন্তধারা; প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা: সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬, পৃষ্ঠা: ১৬৩

২৭. মুজিববাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ; আলতাফ পারভেজ, ঐতিহ্য, ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃষ্ঠা: ১৪৭

২৮. প্রাগুক্ত; ১৪৮

২৯. রাজভবন থেকে বঙ্গভবন; আবু জাফর, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৬, পৃষ্ঠা: ৩৪৫

৩০. বলেছি বলছি বলব; শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন, অনন্যা প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃষ্ঠা: ২৪১-২৪২

৩১. ফার ইস্টার্ন ইকনোমিক রিভিউ (হংকং); ডেভিড হার্স্ট, ১০ জানুয়ারি ১৯৭৫

৩২. বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর; সম্পাদনা: মুনিরউদ্দীন আহমদ, নভেল পাবলিশিং হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃষ্ঠা: ৬২১-৬২৯, ডেইলি টেলিগ্রাফ (লন্ডন), পীটার গীল, ২৭ জানুয়ারি ১৯৭৫

৩৩. ইভনিং জার্নাল (উইলিংটন ডেলওয়ার); জন ডি গ্রেইটস, ১৩ মে ১৯৭৫

৩৪. নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ; আহমদ ছফা, সম্পাদনা: নূরুল আনোয়ার, খান ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ৪৯৯-৫২২

৩৫. শিকাগো ডেইলি নিউজ; জো গেভ্ল্ম্যান, মার্চ ২৬, ১৯৭৫

৩৬. শেখ মুজিবের সোভিয়েত ইউনিয়নের সফরের ভিডিও দেখতে নিচের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন:

বাইশ অধ্যায়

শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ড

তোমার কি মনে পড়ে, শেখ মুজিবের ফিরে আসার খবর শুনে আমরা কীভাবে খুশির কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম? তোমার কি মনে আছে, সমস্তটা দেশ, সবগুলো মানুষ খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছিল? – কর্নেল ফারুক[১১]

ফারুকের শক্তির উৎস ছিলেন খালেদ মোশাররফ। ফারুক ছিলেন তার ভাগ্নে। নেপথ্যে খালেদ মোশাররফই সব রকম নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাকে। ফারুক যে কিছু একটা করবে, তা খালেদ জানতেন।[৯]

কর্নেল ফারুকের পরিকল্পনা ছিল শেখ মুজিবকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে খালেদ মোশাররফের সামনে হাজির ও বিচারের ব্যবস্থা করা।[১২]

কর্নেল রশিদ বলেছিলেন শেখ মুজিবকে রেসকোর্স ময়দানে এনে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গেই তা কার্যকর করার কথা।[১২]

পূর্ব ঘটনা ১

১৯৭৪ সালের মাঝামাঝির ঘটনা। 'দুষ্কৃতকারী' দমন অভিযানে সেনাবাহিনী সারা দেশে নিয়োজিত। সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ও মুক্তিযোদ্ধা মেজর ডালিমের খালাতো বোন তাহমিনার বিয়ে ঠিক হলো কর্নেল রেজার সঙ্গে। বিয়ের দু'দিন আগে মেজর ডালিম অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কুমিল্লা থেকে ঢাকায় এলেন। ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনস্থ বিখ্যাত লেডিস

চিত্র-কথন:

সুলতানা আহমেদ খুকী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার পরিচিতি এক প্রতিভাবান অ্যাথলেট হিসেবে, দেশজোড়া খ্যাতি। হঠাৎ করে একদিন শেখ কামাল আবিষ্কার করলেন, এই ফুটফুটে মিষ্টি মেয়েটাকে তিনি ভালবাসেন। তবে সমস্যাটা হল, ছোটবেলা থেকে তিনি ডানপিটে স্বভাবের হলেও ভালোবাসার কথা কোনোভাবেই সুলতানাকে জানাতে পারছিলেন না, তিনি বড়ই বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করতে লাগলেন এই ঠান্ডা স্বভাবের মৃদুভাষী মেয়েটার মুখোমুখি হতে গিয়ে। উপায়ন্তর না দেখে নাট্যকর্মী ছোট বোনতুল্য ডলি জহুরকে গিয়ে ধরলেন তিনি। অনেক লম্বা, সুদর্শন, কটা চোখের অধিকারী আর শক্ত পেটা শরীরের সুলতানা কামালকে দেখে তখন অনেকেই কাছে ভিড়তে চাইতো না। ডলি জহুর বহুদিন চেষ্টা করেও সুলতানাকে শেখ কামালের ভালোবাসার কথা বলবার মত সাহস জোগাড় করে উঠতে পারলেন না। হতাশ হয়ে ডলিকে ভীতুর ডিম বলে ভৎসনা করলেন শেখ কামাল। তারপর হঠাৎ একদিন সব ভয় আর দ্বিধা এক পাশে ফেলে হুট করে সুলতানাকে বলে দিলেন তাঁর ভালোবাসার কথা। আর হলেন প্রত্যাখ্যাত। সুলতানা আহমেদ খুকী সরাসরি বলে দিলেন, প্রেম ট্রেম করতে পারবেন না। এতই যদি ভাল লাগে তবে যেন বাসায় লোক পাঠায়। তাই করেছিলেন শেখ কামাল।

দু পরিবারের সম্মতিতে শেখ কামাল ও সুলতানার বিয়ে সম্পন্ন হয়। সুলতানা আহমেদ, ১৯৭৫ এর ১৪ জুলাই শেখ মুজিবুর রহমান এর বড় ছেলে শেখ কামালের বউ হয়ে আসেন বঙ্গবন্ধুর পরিবারে। এরপর থেকেই তিনি সুলতানা কামাল নামে পরিচিত। সদ্য দুর্ভিক্ষ পার হয়ে আসা বাংলাদেশে শেখ মুজিবের পুত্রবধু সুলতানা কামালের গা ভরা গহনা আর মাথায় সোনার মুকুটের ছবি সেইসময়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। ছবিতে বিয়ের সাজে সুলতানা কামাল।

ফটো: সংগৃহীত

ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গণ্যমান্য লোক এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করছিলেন মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রী নিম্মি।

ডালিমের শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে কানাডা থেকে; বিয়েতে সেও উপস্থিত। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবারও উপস্থিত রয়েছে অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় ডালিমের শ্যালক বাপ্পি বসে ছিল। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসে ছিল গাজীর ছেলেরা। ওরা সবাই কমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে ঠাট্টা করে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে গাজীর ছেলেরা বারবার বাপ্পির চুল টানছিল। বাপ্পি রেগে তাদের জিজ্ঞেস করে–

> চুল টানছে কে?
>
> আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা– জবাব দিলো একজন।

মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পড়ে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিল তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দেয়। মেজর ডালিম তখন বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ। সেদিন আবার বিটিভিতে সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' চলচ্চিত্র দেখানোর কথা; তাই অনেকেই তাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন ছবিটি দেখার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল।

ঢাকার এসপি মাহবুব ছিলেন মেজর ডালিমের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন; দু'জনে একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। এসপি মাহবুব খবর পাঠিয়েছেন, অনুষ্ঠানে তার পৌঁছতে একটু দেরি হবে।

এদিকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র খেতে বসেছে। হঠাৎ দু'টি মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকলো লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টি থেকে নামল ১০-১২ জন অস্ত্রধারী কুত্তা। গাড়ি থেকেই চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

> কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বাড় বেড়েছে? তাকে আজ আমি শায়েস্তা করবো।

মেজর ডালিম তখন ভেতরে সবার সঙ্গে খাচ্ছিলেন। কে যেন এসে বললো

গাজী এসেছেন। ডালিমকে তিনি খুঁজছেন।

> হঠাৎ করে গাজী এসেছেন– কী ব্যাপার?

ডালিম বাইরে এলেন। বারান্দায় আসতেই ৬-৭ জন স্টেনগানধারী ডালিমের বুকে-পিঠে-মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। ঘটনার আকস্মিকতায় ডালিম হতবাক অপ্রস্তুত। সামনে এসে দাঁড়ালেন ভীষণভাবে ক্ষীপ্ত স্বয়ং গাজী।

তার ইশারায় অস্ত্রধারীরা সবাই তখন ডালিমকে টানা-হেঁচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ে উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে ডালিমের এস্কর্ট সৈনিকরা রয়েছে। ডালিম ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কী করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যাদান করা হয়নি তখনও। কী কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেটাই বুঝতে পারছিলেন না। হঠাৎ ডালিম দেখলেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতোমধ্যে বাইরে হইচই শুনে ডালিমের স্ত্রী নিম্মি এবং বিয়ের কনে তাহমিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দরমহল থেকে। কন্যার মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন–

> ভাইসাহেব, একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্থ করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কী দোষ করেছে ও?

গাজী তার কোনো কথারই জবাব দিলেন না। তার হুকুম তামিল হলো। ডালিমকে জোর করে ঠেলে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। গাড়িতে উঠে ডালিম দেখলেন, আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতর আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। ডালিমকে গাড়িতে তুলতেই তাহমিনার আম্মা এবং ডালিমের স্ত্রী নিম্মি দু'জনেই গাজীকে বললেন–

> ওদের সঙ্গে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেবো না আমরা।

গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। মাইক্রোবাস দু'টি ছিল সাদা রঙের এবং গায়ে ছিল 'রেডক্রস' চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর ডালিমদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে।

এরমধ্যে ডালিমের ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন, বীরবিক্রম প্রথম যোগাযোগ করলেন রেসকোর্সে (বর্তমান সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) আর্মি কন্ট্রোল রুমে; পরে ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা

চিত্র-কথন: ঢাকা ওয়ারীর বলধা গার্ডেনে বা দিক থেকে উপবিষ্ট কাশিমপুরের জমিদার রায় বাহাদুর অতুল প্রসাদ রায় চৌধুরী, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান', 'গাজী গোলাম মোস্তফা ও অনামী প্রসাদ রায় চৌধুরী'। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে তোলা ছবি। এই গাজী গোলাম মোস্তফাই মুজিব আমলে ঢাকার ত্রাস ছিলো, এমনকি সে মেজর ডালিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করেছিলো।

এই গাজী গোলাম মোস্তফাকে শেখ মুজিব রেডক্রসের চেয়ারম্যান করেছিলেন। সে এমনই মহা চোর ছিলো যে সে শেখ মুজিবের কম্বল টাও মেরে দিয়েছিলো। শেখ মুজিব বলেছিলেন, সাত কোটি বাঙ্গালীর সাড়ে সাত কোটি কম্বল। আমার কম্বল খান গেল কই গাজী গোলাম মোস্তফা। কে জানতো মুজিবের নিযুক্ত রেড ক্রসের গাজী গোলাম মোস্তফা এভাবে দেশের জনগণের সাথে সাথে মুজিবের কম্বলও মেরে দিবেন। মুজিব ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা পুকুর নয় রীতিমত সাগর চুরি করছে ঐ গাজী গোলাম মোস্তফা। তার হতে কম্বল উদ্ধারতো দূর, তাকে রেড ক্রসের চেয়ারম্যানের পদ হতে অপসারণ পর্যন্ত করতে পারেন নি। মুজিব জেনে শুনে একজন মহাচোরকে একটি স্পর্শকাতর প্রতিষ্ঠানে থাকতে দিয়েছিলেন।

মেজর ডালিমকে হত্যার উদ্দেশ্যে অপহরণ করে এই গাজী গোলাম মোস্তফা সেনাবাহিনীতে যে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সেই আগুনই ১৯৭৫ এর ১৫ আগষ্ট সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছিলো।

ফটো: সংগৃহীত

পৌঁছে দিলেন স্বপন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডালিমকে খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু ডালিমের ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং ডালিমের বন্ধু। তিনি ছুটে গেলেন ডালিমের বন্ধু এসপি মাহবুবের বাসায়, বেইলি রোডে।

ডালিমকে তুলে নিয়ে যাবার কথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেয়া দরকার, কোনো অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোনো বিশ্বাস নেই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু মাহবুবের রেড টেলিফোন বেজে উঠেছে। মাহবুব আস্তে উঠিয়ে নেন রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী নিজেই কল করেছেন, তিনি এসপি মাহবুবকে তাড়াতাড়ি তাঁর বাসায় চলে আসতে বলেন। শেখ মুজিব তখনও পুরো ঘটনা জানেন না। এসপি মাহবুব পুরো ঘটনা শেখ মুজিবের কাছে ব্যাখ্যা করলেন।

এদিকে গাজীর কাফেলা তখন রমনা থানা হয়ে চলেছে আগারগাঁও-এর দিকে। ডালিম চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গাজীর মনে কোনো দুরভিসন্ধি নেই তো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে না তো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ ডালিম বলে উঠলেন–

গাড়ি থামাও!
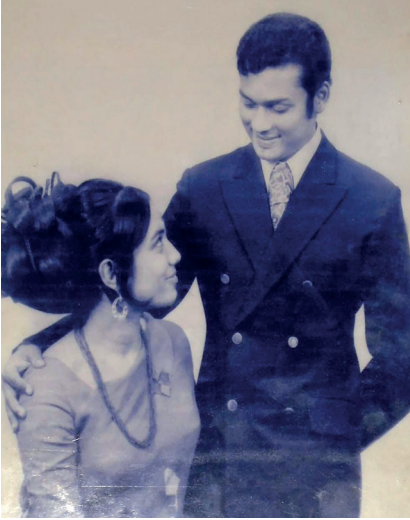
চিত্র-কথন:

মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মি একান্ত মুহূর্তে। আওয়ামী লীগ নেতা গাজী গোলাম মোস্তাফা মেজর ডালিম এবং নিম্মিকে অফিসার্স ক্লাব থেকে অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে যায়। যেই ঘটনার প্রভাব ছিলো সুদূরপ্রসারি।

ফটো: সংগৃহীত

ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিলো। গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়ল। ডালিম তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললেন গাজীকে ডেকে আনতে। গাজী নেমে কাছে এলে ডালিম তাকে বললেন–

> গাজী সাহেব, আপনি আমাদের নিয়ে যা-ই চিন্তা করে থাকেন না কেন, লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোনো কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ডালিমের কথা শুনে কী যেন ভেবে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ি ঘুরিয়ে গাজী এবার চললেন ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির দিকে। কলাবাগান দিয়ে ৩২ নম্বর রোডে ঢুকে মাইক্রোবাসটাকে শেখ সাহেবের বাড়ির গেট থেকে একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় থামতে ইশারা করে গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির ভেতরে। সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সৈনিকরা তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

মেজর ডালিম একবার ওদের ডাকার কথা ভাবলেন। আবার ভাবলেন, এর ফলে যদি গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস্‌ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্ত চিন্তা করতে করতেই হঠাৎ দেখলেন, লিটুর সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে এগিয়ে শেখ সাহেবের বাড়ির গেটে গিয়ে থামল; লিটুই চালাচ্ছিল গাড়ি। গাড়ি থেকে নামল এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভেতরে চলে গেল সে। লিটু একটু এগিয়ে গিয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে রইলো সম্ভবত মাহবুবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। লিটু এবং মাহবুবকে দেখে সবাই আশ্বস্ত হলেন।

মাহবুবের ভেতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেখ রেহানা, শেখ কামাল ছুটে বাইরে এসে সবাইকে ভেতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুর রক্তক্ষরণ দেখে শেখ মুজিব ও অন্য সবাই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন।

গাজীকে উদ্দেশ করে গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। বললেন: এটা কি করেছিস? চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মি এবং ডালিমকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তাহমিনার আম্মা ঠিকমতো হাঁটতে পারছিলেন না। শেখ কামাল, শেখ রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেল। শেখ মুজিবের কামরায় তখন ডালিম, নিম্মি আর গাজী ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। নিম্মি দুঃখে-গ্লানিতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। শেখ মুজিব ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মতো কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন।

চিত্র-কথন: ভারতের তুমুল জনপ্রিয় ফুটবল ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এর খেলোয়াড়, ক্লাব কর্তাদের সাথে শেখ মুজিবুর রহমান। ছবিতে জাতীয় চার নেতাদের একজন সৈয়দ নজরুল ইসলামকেও দেখা যাচ্ছে।

১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ত্রিমুকুট জয় করেছিল। অর্থাৎ আইএফএ শিল্ড, ডুরান্ড কাপ ও রোভার্স কাপ জিতেছিল। ওই বছর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের অনুরোধে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বাংলাদেশ সফরে গিয়েছিল। বাংলাদেশ একাদশের সঙ্গে পাঁচটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলেছিল। এর মধ্যে দু'টি ম্যাচ ড্র হয়। তিনটি ম্যাচ জেতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খেলোয়াড় অমিয় ভট্টাচার্য জেতা তিনটি ম্যাচের প্রত্যেকটিতেই গোল করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে নৈশভোজে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সব সদস্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সকল খেলোয়াড়কে একটি পালতোলা নৌকোর স্মারক উপহার দিয়েছিলেন। সেইসাথে আরো, উপহার দেন তসরের পোশাক আর মানপত্র।

ফটো: সংগৃহীত

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিলো, আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোস্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিড্ন্যাপিং-এর খবর পাওয়ার পর পরই ইয়ং অফিসাররা যে যেখানেই ছিল সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মিকে। সমস্ত শহরে হইচই পড়ে গেছে। গাজীরও কোনো খবর নেই। গাজীকে এবং তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্ন তন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ মুজিবের মুখটা কালো হয়ে

গেল। ফোন পেয়েই তিনি সবার সামনেই আর্মি চিফ শফিউল্লাহকে হটলাইনে বললেন–

> ডালিম, নিম্মি, গাজী সবাই আমার এখানে আছে; তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।

ফোন রেখে গাজীকে উদ্দেশ করে শেখ মুজিব বললেন–

> মাফ চা নিম্মির কাছে।

গাজী শেখ মুজিবের হুকুমে নিম্মির দিকে এক পা এগোতেই সিংহীর মতো গর্জে উঠল নিম্মি।

> খবরদার! তোর মতো ইতর লোকের মাফ চাইবার কোনো অধিকার নেই, বদমাইশ!

ডালিম অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মিকে শান্ত করতে পারেননি। শেখ মুজিব নিম্মির কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন–

> মা তুই শান্ত হ'। হাসিনা-রেহানার মতো তুই-ও আমার মেয়ে। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করবো। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করেছে গাজী! কিন্তু তুই মা শান্ত হ'। বলেই শেখ রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মিকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন।

শেখ রেহানা এসে নিম্মিকে উপরে নিয়ে গেল। ইতোমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার সাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছেন। শেখ মুজিব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাহ্‌কে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ্‌ রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে অপারেশন কমান্ডার মেজর মোমেনের সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন–

> হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ্‌ বলছি, প্রাইম মিনিস্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মি, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিস্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার সৈনিকদের ফিরিয়ে নাও এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। মেজর মোমেন অপর প্রান্ত থেকে জেনারেল শফিউল্লাহ্‌কে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার এবং তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে তার হাতে সমর্পণ না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ্‌ তাকে

চিত্র-কথন: সামরিক বাহিনীর বিষয়ে মুজিবের 'রিজার্ভেশন'

সামরিক বাহিনীর বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের এক ধরনের 'রিজার্ভেশন' অর্থাৎ, আপত্তি বা অনিচ্ছার মনোভাব অথবা সংরক্ষিত মনোভাব ছিল। সমসাময়িক কালে এশিয়া, আফ্রিকার বহু দেশে এবং খোদ পাকিস্তানে রাষ্ট্র পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ ও এর বিরূপ প্রভাব তাঁর মধ্যে তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে থাকতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর রাজনীতি ও রাজনৈতিক সঙ্গী-সাথীদের ভূমিকা ও ক্রিয়াকলাপ সামরিক বাহিনীকে 'দেশরক্ষার' বিশেষ দায়িত্বে কিংবা তাগিদে কখনো উদ্বুদ্ধ করে তুলবে কি-না সে প্রশ্নেও একটা অমীমাংসিত অবস্থানে ছিলেন, বলা যায়।

স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর দেখা গেল, ভারতের ইচ্ছা ও পরামর্শ এবং প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অনেকের মতো তিনিও চান না, বিশাল আকারের সুসংগঠিত শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে। শুধুমাত্র আধা-সামরিক বা মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুলে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার প্রয়োজন মেটাতে চান, যার প্রাথমিক নমুনা হিসেবে পাওয়া গেল 'রক্ষীবাহিনী'কে। এই 'রক্ষীবাহিনী'কে তিনি 'বিকল্প সেনাবাহিনী'র আদলে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এটাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরাসরি তাঁর নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং তাঁর 'রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক বাহিনী' হিসেবেই ব্যবহার করতেন।

১৯৭৩-এর ৬ অক্টোবর আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়। মিসরের নেতৃত্বে আরব মুসলিম দেশগুলোর এই যুদ্ধে নীতিগতভাবে সংহতি প্রকাশ করে মুজিব সরকার মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতকে বিমান ভরে চা-পাতা পাঠান। যুদ্ধক্ষেত্রে

সৈনিকদের দেহ-মন সজীব ও সতেজ রাখার এই চা-পাতার ফিরতি শুভেচ্ছা হিসেবে ত্রিশটি টি-৫৪ ট্যাংক ও এর কামানের চার শ' গোলা বাংলাদেশে উপহার পাঠান প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাত। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে এটা ছিল এক বিশেষ সংযোজন।

এই ট্যাংক বহর '৭৪-এর জুলাই মাসে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছালে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন অধিনায়ক কর্নেল ফারুক রহমান। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব প্রথমে এই ট্যাংক উপহার গ্রহণ করতেই রাজি হননি। তিনি প্রকৃতপক্ষে এটা নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, এইসব ট্যাংক যেন কোনো সময়ই অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। সবগুলো ট্যাংক উত্তরবঙ্গের রংপুর সেনানিবাসে পাঠানোর কথা বলা হলেও ঢাকা সেনানিবাসেই রয়ে গেল। তবে এর সব গোলা জয়দেবপুর সেনানিবাসে অর্ডন্যান্স্ ডিপোতে তালাবদ্ধ করে রাখা হলো।

স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রথম থেকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছিলেন। ঢাকায় এসে পৌঁছালে মিসরের উপহার ট্যাংকগুলো দেখতে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। ছবিতে ঢাকা সেনানিবাসের কোনো এক স্থানে ট্যাংক পরিদর্শনের সময় একটি ট্যাংকের উপরে উঠে সুরক্ষা 'ঢাকনা' খুলে এর অভ্যন্তরে যোদ্ধা সৈনিকদের অবস্থান ও যুদ্ধে এর নানামুখী ব্যবহার এবং কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ। সৈনিক ও অধিনায়করা প্রধানমন্ত্রীকে এর নানা রকম কারিগরী দিক ও ব্যবহারিক কলাকৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন।

কিন্তু সেসব কিছু ছাপিয়ে তাঁর মধ্যে কি দুশ্চিন্তার কোনো ছায়া পড়েছিল? তাঁর চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে কি কোনো রকম দুর্ভাবনা রেখাপাত করেছিল? স্থলযুদ্ধের 'চলমান দুর্গ'রূপী অসাধারণ শক্তিধর বৃহদাকার এই যুদ্ধাস্ত্রটি কি তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল?

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব এই ট্যাংকগুলো অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না– এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! ১৫ আগস্টের ঘটনায় এই ট্যাংক একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। মুজিবের পরম নির্ভরতার নিজস্ব রাষ্ট্রীয় বাহিনী 'রক্ষীবাহিনী' তার সদর দপ্তরে কয়েক হাজার সৈনিকসহ এই বহরের মাত্র একটি ট্যাংকের সামনে স্থির-নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, বিন্দুমাত্র ভূমিকা নেবার চেষ্টা করেনি।

ফটো: সংগৃহীত

অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল। অবশেষে শফিউল্লাহ্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে অপারেশন কমান্ডার-এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ মুজিব তখন ডালিমকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সঙ্গে কথা বলতে। ডালিম অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলেন–

হ্যালো স্যার; মেজর ডালিম বলছি। সবকিছু নিয়ন্ত্রণে, প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায়বিচার করবেন।

মেজর মোমেন ডালিমের কথাতেও নরম হলেন না। বরং তিনি বললেন, অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের কোনোভাবেই ছেড়ে দেয়া সামরিক বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ডালিম অনুরোধ জানিয়েছিলেন মেজর মোমেন যেন নিজে এসেই পরিস্থিতি দেখে যান।

মেজর মোমেন নিজে না এসে ক্যাপ্টেন ফিরোজকে পাঠান ৩২ নম্বরে অবস্থা দেখার জন্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়লেন। ফিরোজ ডালিমের বাল্যবন্ধু। এসেই ডালিমকে জড়িয়ে ধরলেন।

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ করে সবার সামনেই ডালিম বলেছিলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন, সেই ক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের

চিত্র-কথন:

২৭ জুলাই ১৯৭৫, জন্মদিনে নানি এবং দুই মামা শেখ কামাল ও শেখ রাসেলের সাথে শেখ হাসিনার বড় ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়। দুদিন পর জয়-পুতুল আর শেখ রেহানাকে নিয়ে স্বামী ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়ার কর্মস্থল জার্মানিতে চলে যান শেখ হাসিনা। আর কদিন পরই ঘটে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ।

ফটো: সংগৃহীত

সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কী? মেজর মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

বাইরে বেরিয়ে মেজর ডালিম দেখলেন ৩২ নম্বর রাস্তায় গাড়ির ভিড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা যারা জানতে পেরেছে কিড্‌ন্যাপিং-এর ব্যাপারটা তাদের অনেকেই এসে জড়ো হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ডালিমদের দেখে সবাই ঘিরে ধরলো। সবাই জানতে চায় কী প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘন্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ডালিম ফিরে এলেন লেডিস ক্লাবে। এসপি মাহবুবও এলেন সঙ্গে।[১]

সুবিচারের আশ্বাস দিলেও তা ভঙ্গ করে শেখ মুজিব 'সেনা শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে' মেজর ডালিম ও মেজর নূরসহ আটজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে তৈরি হলো দারুণ উত্তেজনা। সেনা প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ্ এই দুই তরুণ অফিসারকে বরখাস্ত না করার জন্য জোর সুপারিশ করলেও শেখ মুজিব তা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী।[২]

পূর্ব ঘটনা ২

বাহাত্তর সালের মাঝামাঝি নওগাঁ জেলার আত্রাই অঞ্চলে 'পূর্ব-পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি' ওহিদুর রহমান ও টিপু বিশ্বাসের নেতৃত্বে 'শ্রেণিশত্রু খতমে'র অভিযান শুরু করে। এই খতম অভিযানের বিরুদ্ধে সেনা ব্রিগেড নামানো হয়। এই সেনা ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল শাফায়াত জামিল। শাফায়াত কঠোর হাতে 'শ্রেণিশত্রু খতমে'র অভিযান দমন করেন। সংঘর্ষে স্থানীয় অনেক তরুণ নিহত হয়।

নূর চৌধুরী ছিলেন শাফায়াত জামিলের অধীনে একজন ক্যাপ্টেন। তিনি ছাত্রজীবনে ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপ করতেন। সংগত কারণেই এই চীনাপন্থিদের মধ্যে ক্যাপ্টেন নূরের পরিচিত অনেকেই ছিলেন। তিনি শাফায়াত জামিলের কঠোর হাতে 'বিদ্রোহ দমন পদ্ধতি'র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হয়নি। পরে তদ্‌বির করে তিনি ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন এবং সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের এডিসি নিযুক্ত হন। সরকারের বিরুদ্ধে নূরের তখন থেকেই প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং বিদ্বেষ।[৩] জিয়ার

স্টাফ অফিসারের কামরাতে প্রায়ই তার মতোই ক্ষুব্ধ অফিসারদের আনাগোনা চলতো।[৪]

একই রকম দায়িত্ব দিয়ে টাংগাইলে 'কাদেরিয়া বাহিনী'র কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করার জন্য শাফায়াত জামিলকে পাঠানো হয়েছিল। কর্নেল শাফায়াত জামিল ৪৬ ব্রিগেড নিয়ে অভিযান চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারদলীয় চাপের মুখে তিনি সেনাবাহিনীকে মাঠ থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।[৪]

এ বিষয়ে মুজিব সরকার উৎখাতের প্রধান পরিকল্পনাকারী কর্নেল ফারুক বলেছিলেন, 'এর অর্থ ছিল এ রকম যে, আমাদেরকে অনাচার, দুর্নীতি দূর করতে হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ দেখলেই থমকে দাঁড়াতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই এক দুঃখজনক ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছিল।'[৫]

পূর্ব ঘটনা ৩

১৯৭৩ সালের ৬ অক্টোবর শুরু হয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। মিসরের নেতৃত্বে ১৯ দিনব্যাপী এই যুদ্ধে আরব বিশ্বের পরাজয় হয়। শেখ মুজিব মুসলিম বিশ্বের এই যুদ্ধের প্রতি নৈতিক সংহতি প্রকাশ করে মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দাতকে বিমান ভরে চা-পাতা পাঠান। এ সময় এক বিশেষ চিঠিতে মুজিব বলেছিলেন, ন্যায়সংগত এই যুদ্ধে বাংলাদেশের সরাসরি কিছু করার সুযোগ নেই। তাই যুদ্ধরত সৈনিকদের দেহ-মন সজীব রাখতে এই চা-পাতা পাঠাচ্ছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ; মরুভূমির বুকে যা শক্তি জোগাবে মুসলিম যোদ্ধাদের। যুদ্ধকালীন কঠিন সময়ে শেখ মুজিবের এই উপহারের ফিরতি শুভেচ্ছা হিসেবে ৩০টি টি-৫৪ ট্যাংক ও ট্যাংকের ৪০০ গোলা বাংলাদেশে উপহার পাঠান আনোয়ার সা'দাত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে যা ছিল বিশেষ সংযোজন। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে সেই ট্যাংকবহর বাংলাদেশে পৌঁছালে চট্টগ্রাম বন্দরে ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে সেগুলো গ্রহণ করেন কর্নেল ফারুক রহমান।[৬]

শেখ মুজিব প্রথমদিকে মিসরের এই ট্যাংক উপহার গ্রহণ করতেই রাজি ছিলেন না। তিনি প্রকৃতপক্ষে এটা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন, যেন ওই সকল ট্যাংক কোনো কালেই অন্তত তাঁর বিরুদ্ধে কেউ ব্যবহার করতে না পারে। ট্যাংকের সকল গোলা জয়দেবপুরে অর্ড্ন্যান্স্ ডিপোতে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল।[৭]

এই ট্যাংকগুলোকে উত্তরবঙ্গের রংপুরে পাঠানোর প্রস্তাব করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধা

সেনা অফিসার মইনুল হোসেন চৌধুরী। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন, ঢাকায় এ ধরনের ট্যাংক রাখার প্রয়োজন নেই এবং প্রশিক্ষণ দেয়ারও সুযোগ-সুবিধা নেই। পাকিস্তান আমলে নিয়ে আসা প্রথম ট্যাংকগুলোও সার্বিক বিবেচনায় রংপুরেই পাঠানো হয়েছিল এবং সেখানে ট্যাংক রেজিমেন্টও ছিল। তবে মইনুল হোসেন চৌধুরীর মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়নি। ট্যাংকগুলো ঢাকা সেনানিবাসেই থাকে।[৮]

পূর্ব ঘটনা ৪

দৃশ্যপট: নারায়ণগঞ্জ

১৯৭৪ সালে অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্ব সেনাবাহিনীকে দেয়া হয়েছে। তখন কর্ণেল ফারুক তার ব্যাটালিয়ান নিয়ে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে দায়িত্ব পালন করছেন। কর্ণেল তাহের তখন নারায়ণগঞ্জ ড্রেজারের ডাইরেক্টার। তাঁর বাসায় এক দিন কর্ণেল ফারুক একটি ফোক্সওয়াগেণ গাড়ী নিয়ে হাজির। ড্যাসবোর্ডে একটি চাইনীজ পিস্তল। সোজাসুজি তিনি কর্ণেল তাহেরকে বললেন,

> স্যার, এ পিস্তল দিয়ে আমি শেখ মুজিবকে হত্যা করবো। আপনি আর কর্ণেল জিয়াউদ্দিন দেশ চালাবেন।[৯]

দৃশ্যপট: মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের বাসা, ঢাকা

১৪ আগষ্ট **১৯৭৫**, ধানমণ্ডি তিন নম্বর রোডের বাসায় ডালিম শেখ মুজিবের মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সাথে দেখা করতে এসেছে। ডালিম তাকে ডেকেছে। তিনি বাসা থেকে নামেননি। কারণ মেজর ডালিম তার সাথে আগেও যোগাযোগ করেছিল এবং প্রস্তাবও নিয়েও এসেছিল। তাই মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান জানতেন মেজর ডালিম কী কথা বলতে এসেছিল। তাই তিনি নামেন নাই এবং দরজাও খুলেননি। ডালিমরা মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে জানিয়েছিল শেখ মুজিবকে উৎখাত করা হবে। যদিও তাঁকে খুন করা হবে তা বলেনি--তবে তাকে বাসা থেকে নিয়ে যাবে এবং মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান হেনার নেতৃত্বে ক্ষমতা নেয়া হবে। শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলীর কাছে মন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান হেনা বলেন যে, মেজর ডালিমের ক্ষমতা গ্রহণের প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি।

চিত্র-কথন: আমাদের জাতিগত ব্যর্থতাও বটে!

’৭২-এর আগস্ট, হানাদারদের কবল থেকে স্বদেশ মুক্ত হয়েছে আট মাসও হয়নি। জনগণের প্রিয় নেতা দেশে ফিরে এসেছেন সাত মাস হয়নি। যুদ্ধজয়ী জাতি তখনো উঁচু মাত্রার মনোবলের অধিকারী। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ আর তার নতুন পরিচালকদের চিন্তা-চেতনা ও কার্যকলাপ জাতির দৃঢ় মনোবলের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে শুরু করেছে।

সমগ্র জাতির আকাশচুম্বী প্রত্যাশা আর বুকভরা ভালোবাসাকে সঙ্গী করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব সাত মাসও হয়নি। দেশবাসীর নৈতিক আর বস্তুগত প্রত্যাশা এবং আবেগমথিত ভালোবাসা তখন মিলেমিশে একাকার। এর কোনোটিকেই ছাড়তে নারাজ উঁচু মর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি।

এই রকম সময়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব। দেশের সেরা চিকিৎসকরা তাঁকে বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নেয়ার পরামর্শ দিলেন। এপেনডিসাইটিস ও গলব্লাডারে পাথরজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন মুজিব।

বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের মানুষের প্রতি গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন ব্রিটিশ সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। মুজিব চলে গেলেন ব্রিটেনে। সফল অস্ত্রোপচারে রোগমুক্ত হলেন। প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও আরোগ্যলাভের জন্য

হাসপাতাল ছেড়ে এসে উঠলেন লন্ডনের বিখ্যাত ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে। এখানে তাঁকে দেখতে এলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এড্ওয়ার্ড্ হিথ্।

নবীন অনুন্নত-পশ্চাদ্পদ রাষ্ট্র বাংলাদেশ– কিন্তু শোষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করায় বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর ও শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র হয়েও ব্রিটেন এই নব্য জাতি-রাষ্ট্রকে প্রীতি ও মর্যাদার চোখে দেখতে শুরু করেছিল মুক্তিযুদ্ধ চলার সময় থেকেই।

ক্ল্যারিজেস্ হোটেলে বাংলাদেশের অসুস্থ প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে যে গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ ও সদ্ভাব প্রকাশ করেন, তার চোখে-মুখে যে শ্রদ্ধা-প্রীতি ও বন্ধুসুলভ অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তা রাজনৈতিক ইতিহাসের বিষয়ে সচেতন, সংবেদনশীল ও অনুরাগী বাংলাদেশি নাগরিকমাত্রেরই গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

বোঝাই যায় যে, একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর নতুন জাতীয় উত্থানকে উন্নত ও সভ্য ব্রিটিশ জাতি গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিল এবং সেটা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে, আর মুজিব তখন সেই জাতির কর্ণধার পুরুষ। স্বভাবত-ই তখন তাঁর স্থান ছিল ব্রিটিশ জাতির মনের মণিকোঠায়।

কিন্তু আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্য– আমরা, আমাদের জাতীয় নেতৃত্ব আমাদের অবস্থানকে, আমাদের লক্ষ্য ও কর্তব্যকে বহাল রাখতে পারিনি! ব্যক্তিগত ও জাতীয় নৈতিকতা এবং যথার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্মে অটুট-অটল থাকতে পারিনি। ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছাড়িয়ে এ আমাদের জাতিগত ব্যর্থতাও বটে!

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

পূর্ব ঘটনা ৫

দৃশ্যপট: ১৩ আগস্ট ১৯৭৫ ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাসা: পুরোনো গনভবন

সবে সন্ধ্যা হয়েছে। দেখা করতে এসেছেন মন্ত্রীসভার আরেক সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক ইউসুফ আলী। সৈয়দ নজরুল ইসলাম পাঞ্জাবী পরে পায়চারী করছেন। ইউসুফ আলী সালাম দিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম কোন উত্তর দিলেন না। খুব গম্ভীরভাবে পায়চারী করছেন। অধ্যাপক ইউসুফ আলীও উনার সঙ্গে পায়চারী করছেন। কোন কথা বললেন না। কিছুক্ষণ পর উনি অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে বেশ একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন,

ভাবছেন কী?

স্যার কি হয়েছে? অধ্যাপক ইউসুফ আলী জানতে চান।

কী হতে বাকি আছে। আমাদের পায়ের তলায় মাটি নেই- নিজেদের ঘর সামলাতে পার না, আমরা আবার কথা বলি। আমি আপনাকে বলি নাই আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিনের পর দিন কি হচ্ছে। কেউ কথা শোনে না আমার, কারও কথা শোনে না। এখন কি অবস্থা হবে?

কী হবে?

পায়ের তলায় মাটি আছে?

স্যার কার কথা বলছেন আপনি?

কার আবার? বঙ্গবন্ধু।

কেন? কি হয়েছে?

যা দেখছি এতো ভালো মনে হচ্ছে না। আমার কাছে লোক আসছিল আমার কাছে পাওয়ার দেবার প্রস্তাব নিয়ে আসছিল। কেন? কামরুজ্জামান হেনা সাহেবও ঐ দিনই আমাকে বলেছিলেন আজও উনি আমাদের নেতা। ওনাকে দিয়ে চলবে না। ক্ষমতা আমাকে নিতে হবে এটা কেমন কথা। উনিতো আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান না।

আপনি ৩২ নম্বর যান সেখানে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলেন। দেখেন কী করতে পারেন।

না তিনি যখন সব কথা খুলে বলতে চান না, তখন আর কী করব।

তাহলেতো চলবে না। আপনার জন্য আপনি না যান, দেশের জন্য, আমাদের জন্য যান। আজকে যাবেন?

না।

তারপর ঠিক হলো পরদিন সৈয়দ নজরুল ইসলাম যাবেন শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে। সে সুযোগ আর হয়নি।[১০]

মূল ঘটনা

১৫ আগস্ট ঘটনার প্রধান পরিকল্পনাকারী ল্যান্সার রেজিমেন্টের লে. কর্নেল

চিত্র-কথন: লন্ডনে চিকিৎসা শেষে শেখ মুজিব জেনেভায় জেনেভা হ্রদের পাশে জেনেভা হোটেলে। সাথে ডাঃ আকরাম সাঈদ।

এপ্রিল ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু মাঝেমধ্যে বদহজম, পেটের নিম্নাংশে চিনচিনে ব্যথা ও পিত্তথলির সমস্যায় আক্রান্ত হন। পিজি হাসপাতালের (বর্তমান বিএসএমএমইউ) পরিচালক ডা. নুরুল ইসলাম ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ডায়াগনোসিস করেন, বঙ্গবন্ধুর পিত্তপ্রদাহ ও পিত্তে পাথর হয়েছে, অপারেশন প্রয়োজন। পিত্তপাথরের মতো একটা অতি সাধারণ অপারেশনের চিকিৎসা বাংলাদেশে না করে চিকিৎসার জন্য তিনি বিলেতে যান।

১৯৭২ সালের ৩০ জুলাই লন্ডনের হারলে স্ট্রিটে প্রাইভেট হাসপাতাল দ্য লন্ডন ক্লিনিকে শল্য বিশেষজ্ঞ স্যার এডওয়ার্ড মুইর, এফআরসিএস ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ডা. নজরুল ইসলাম এফআরসিএস শেখ মুজিবের সার্জারী করেন- যদিও পিত্তনালিতে কোনো পিত্তপাথর পাওয়া যায়নি। তারা বঙ্গবন্ধুর প্রদাহযুক্ত পিত্তথলি ও অ্যাপেনডিক্স অপসারণ করেন। লন্ডন ক্লিনিকে কয়েক দিন অবস্থানের পর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য বঙ্গবন্ধু সুইজারল্যান্ডে যান এবং জেনেভা শহরে জেনেভা হ্রদের পাড়ে জেনেভা হোটেলে প্রায় দুই সপ্তাহ বিশ্রাম নেন।

যেই জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেই সদ্য ভূমিষ্ঠ রাষ্ট্রের যিনি কাণ্ডারী ছিলেন হতাশাজনকভাবে সেই রাষ্ট্রের শীর্ষ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উপরে তিনি তার নিজের শরীরের মামুলি চিকিৎসার জন্য আস্থা রাখতে পারলেন না।

ফটো ক্রেডিট: সংগৃহীত

সৈয়দ ফারুক রহমান এবং তার প্রধান সহযোগী টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল খন্দকার আব্দুর রশিদ। এই দু'জন ছিলেন নিকটাত্মীয়– ভায়রা ভাই। ফারুক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। অত্যন্ত স্পিরিটেড, ড্যাশিং, প্রবল আবেগপ্রবণ– রেজিমেন্টের গৌরব ও পতাকা সমুন্নত রাখতে সদা সচেতন। তার সকল শক্তির উৎস ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ। পারিবারিক সম্পর্কেও ফারুক ছিলেন খালেদের ভাগ্নে। নেপথ্যে খালেদ মোশাররফই সব রকম নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিয়েছেন ফারুককে। ফারুক যে কিছু একটা করবে, তা খালেদ জানতেন।[১১]

কর্নেল ফারুক সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন কি-না সেটা নিয়ে বিশেষ সভা হয়। যেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধে অংশ নিলে মুক্তিযোদ্ধা সেনা অফিসারের স্বীকৃতি মিলতো, কর্নেল ফারুকের যুদ্ধে যোগ দেয়ার সময় তার থেকে কয়েক ঘণ্টা কম ছিল। সেই সভায় ফারুকের পক্ষ সমর্থন করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত জোরালো বক্তব্য রাখলে কয়েক ঘণ্টার ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও তাকে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তবে তাকে দু'বছর সিনিয়রিটি দেয়া হয়নি।

ফারুকের প্রধান সহযোগী কর্নেল আবদুর রশিদ ছিলেন টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার। ধীর-স্থির ও নরম সুরে কথাবার্তার মানুষ। পঁচাত্তরের মার্চ মাসে কর্নেল রশিদ ভারতে গানারি স্টাফ কোর্সশেষে ঢাকা ফিরলে তাকে যশোরে আর্টিলারি স্কুলে পোস্টিং দেয়া হয়। সেখান থেকে কর্নেল ফারুকই তার ভবিষ্যৎ 'মহাপরিকল্পনা'র কথা চিন্তা করে তার গুরু খালেদ মোশাররফকে ধরে রশিদের পোস্টিং করিয়ে নেন ঢাকায় টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টে।

মুজিব হত্যাকাণ্ডে অন্য যে সব আলোচিত অফিসার, তারা ছিলেন উক্ত দুই ইউনিটের বাইরের। তাদের মধ্যে ছিলেন মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, হুদা, পাশা, রাশেদ প্রমুখ। বাকি জুনিয়র অফিসাররা বিভিন্ন ইউনিটের ছিলেন। আশ্চর্য বিষয় হচ্ছে, সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অফিসার, কেউ কেউ 'বিভিন্ন কারণে বহিষ্কৃত বা অপসারিত'। কর্নেল ফারুক নিজে আলাদাভাবে বহু আগে থেকেই বিভিন্ন সমমনা আর্মি অফিসার এবং কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালিয়ে আসছিলেন।[১২]

১২ আগস্ট ১৯৭৫, দিনটি ছিল কর্নেল ফারুকের বিবাহবার্ষিকী। ওই দিনই প্রথম ফারুক তার ভায়রা কর্নেল রশিদকে তার গোপন পরিকল্পনার কথা

বলেন। রশিদ প্রথমে চমকে যান, কিন্তু পরে ফারুক তাকে বলেন– দেখ রশিদ, আমি ঘটনা ঘটাতে যাচ্ছিই, মরি আর বাঁচি। তখন ধরা পড়লে আমি তোমার নাম বলবোই, কারণ তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি।[১২]

পার্টিশেষে অনেকক্ষণ তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। রশিদের পয়েন্ট ছিল, এ কাজে আরো কিছু অফিসার দরকার এবং তা জোগাড় করতে হবে। ফারুক তাতে রাজি হন। 'সরকার উৎখাত অপারেশন' পরিকল্পনার পুরো দায়িত্বভার কর্নেল ফারুকের হাতে থাকে এবং রাজনৈতিক দিকটি কর্নেল রশিদের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। ফারুকের মাধ্যমেই ডালিম, নূর, হুদা, রাশেদ, পাশা, শাহরিয়ার এদেরকে দলে আনা সম্ভব হয়। মেজর ডালিম ও মেজর নূর চৌধুরী তখন আর্মি থেকে 'বরখাস্ত'। শাহরিয়ারও 'অবসরপ্রাপ্ত'। বজলুল হুদা মিলিটারি ইন্‌টেলিজেন্সের অফিসার ছিলেন। মেজর পাশা এবং মেজর রাশেদ চৌধুরীকেও 'অবসর' দেয়া হয়। সিনিয়র অফিসার বেশ ক'জনের সঙ্গেও কথা হয়। তারা দোদুল্যমান থাকলেও মৌন সমর্থন দেন।[১৩]

ফারুক মেজর ডালিমকে এ নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে বলেছিলেন– 'তোমার কি মনে পড়ে, শেখ মুজিবের ফিরে আসার খবর শুনে আমরা কীভাবে খুশির কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম? তোমার কি মনে আছে, সমস্তটা দেশ, সবগুলো মানুষ খুশিতে পাগল হয়ে উঠেছিল! এই মানুষটাকে প্রায় দেবতার আসনে বসানো হয়েছিল!'[১৩]

দুই

ফারুক নানা পরিকল্পনার মধ্যে প্রথমে ভেবেছিলেন, শেখ মুজিবকে সুকর্নোর মতো গদিচ্যুত করে একটি 'প্রাসাদে' আটকে রাখা হবে।[১৩]

মুজিব প্রায়ই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে 'বেড়াতে' যেতেন। আর এই ভ্রমণের জন্য তিনি হেলিকপ্টারকেই পছন্দ করতেন। ফারুক শেখ মুজিবকে হেলিকপ্টারে মারার পরিকল্পনাও করেছিলেন। স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত তখন ফ্লাইট কন্ট্রোল অফিসার। ফারুক লিয়াকতকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যখন মুজিবকে নিয়ে হেলিকপ্টার আকাশে উড়বে, তার আগেই পিস্তলসহ ফারুক সঙ্গে থাকবেন। তারপর রেডিও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়ে মুজিবকে গুলি করে মারা হবে এবং মুজিবের মৃতদেহ সুবিধাজনক একটা নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। তারপর তারা গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে থাকবেন, যেন কিছুই ঘটেনি।

ইতোমধ্যে রশিদ এবং অন্যরা নিচে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।[১৩]

কর্নেল ফারুকের মতে, তার ‘ফাইনাল প্ল্যান’ ছিল শেখ মুজিবকে বন্দি করে ক্যান্টনমেন্টে এনে তার বস্ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের সামনে হাজির করা এবং বিচারের ব্যবস্থা করা। কর্নেল রশিদ বলেছিলেন, তাকে ধরে এনে রেসকোর্স ময়দানে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে প্রাণদণ্ড প্রদান করে সঙ্গে সঙ্গেই তা ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে কার্যকর করার কথা।[১৪]

ফারুক জেনারেল জিয়ার সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। ১৯৭৫-এর ২০ মার্চ বিকেলে কর্নেল ফারুক জেনারেল জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। যদিও শেখ মুজিবকে হত্যা করতে যাচ্ছেন সে কথা বলেননি। তবে দেশে দুর্নীতি, খুন-রাহাজানি ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করতে করতে কর্নেল ফারুক বলেছিলেন, দেশে একটা পরিবর্তন প্রয়োজন। জিয়া বললেন, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো আমরা বাইরে গিয়ে কথা বলি।’ ফারুক আবার বললেন, আপনার সমর্থন ও নেতৃত্ব কামনা করি।[১৫]

জেনারেল জিয়া বলেছিলেন, ‘আমি দুঃখিত। আমি এ ধরনের কাজে নিজেকে জড়াতে চাই না। তোমরা জুনিয়র অফিসাররা যদি কিছু একটা করতে চাও, তাহলে তোমাদের নিজেদেরই তা করা উচিত। আমাকে এসবের মধ্যে টেনো না।’[১৫]

এরপর জেনারেল জিয়া তার এডিসিকে বলে দিয়েছিলেন, কর্নেল ফারুক যেন আর তার কাছে না আসেন।

এদিকে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত স্টাফের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রুহুল কুদ্দুস ছিলেন খ্যাতনামা শৌখিন হস্তরেখা বিশারদ। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে প্রেসিডেন্টের হাত দেখার সুযোগ হয়েছিল তার। মুজিবের হাত দেখে এতই ভড়কে গিয়েছিলেন যে, কালবিলম্ব না করে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে ‘লম্বা চিকিৎসা ছুটি’র নামে ইউরোপে পাড়ি জমান।[১৬]

আগস্টের ১০ তারিখে শেখ মুজিবের এক প্রিয় ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষে তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সবাই ঢাকায় জড়ো হয়েছিল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে সেরনিয়াবাতের ছেলেরা খুলনা থেকে বেশ ক’জন বন্ধু-বান্ধবও সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তারা সবাই ঢাকায় অবস্থান করছিল। কারণ, ১৪ আগস্ট ছিল সেরনিয়াবাতের মায়ের চেহলাম। ফারুক আর রশিদ যখন আঘাত হানার চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে আসেন, তখন শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সবাই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের আলোচ্য বাড়ির মাত্র আধা বর্গমাইল এলাকার ভেতরে অবস্থান করছিল।[১৬]

রক্ষীবাহিনীর লৌহমানব, শক্তিধর কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান এ সময় ইউরোপে ছিলেন। তার জায়গায় একজন তুলনামূলক জুনিয়র অফিসার কাজ করছিলেন এবং এই প্রথমবারের মতো তিনি এ ধরনের দায়িত্বে কাজ করছিলেন। সুতরাং সাধারণভাবে রক্ষীবাহিনী কোনো দুর্ঘটনা মোকাবিলার জন্য যতটা প্রস্তুত থাকে, ওই সময়ে তারা অতটা প্রস্তুত ছিল না।[১৬]

শেখ মুজিবের বাসভবন বেশ কিছুদিন ধরে রেকি করা হলো। রেকি করেছিলেন কর্নেল ফারুক নিজেই। প্রতিদিনই রাত দশটার কাছাকাছি সময়ে ময়মনসিংহ রোডের উপর একটি রিক্সা থেকে একজন বিষণ্ন চেহারার লোক বেরিয়ে আসতো। লেকের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ করে ৩২ নম্বর রোডের ভেতরে ঢুকে পড়তো। লোকটার গায়ে বুশ-শার্ট, পরনে লুঙ্গি আর পায়ে চপ্পল। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঠাণ্ডা বাতাসে বিশ্রামরত ওই এলাকার গৃহভৃত্যদের থেকে লোকটাকে খুব একটা আলাদা মনে হতো না। একটামাত্র পার্থক্য ছিল– 'মৃত্যুর দূত'। বিষণ্ন মানুষের বেশে কর্নেল ফারুক রহমান 'মৃত্যুদূতে'র মতো শেখ মুজিবের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।[১৭]

ফারুক-রশিদের অভ্যুত্থান পরিকল্পনা যেভাবে এবং যে রকম হালকাভাবে প্রণয়ন করা হয়, তাতে বাস্তবায়নের পথে কোথাও সামান্যতম বাধা পেলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো। এ ধরনের অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় ফারুক-রশিদ মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েছিলেন।[১৮]

ফারুক-রশিদের অপরেশনের প্ল্যান মোটেই বিস্তারিত (ডিটেইল্ড্) কিছু ছিল না। মূল আক্রমণ পরিকল্পনা শুধু ফারুকই জানতেন। ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে ফারুক প্রথমবার অফিসারদের গন্তব্যস্থল, টার্গেট ইত্যাদি দেখিয়ে দেন। অফিসারদের নিয়ে এটাই ছিল ফারুকের প্রথম অপারেশনাল বৈঠক এবং ব্রিফিং। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণ পরিকল্পনা গোপন থাকায় কেউ কিছুই জানতে পারেনি। এটাই ছিল তাদের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। মূল টার্গেট ছিল ৩২ নম্বর রোডে শেখ মুজিবের ৬৭৭ নম্বর বাড়ি।[১৮]

ফারুক-রশিদ তাদের অপারেশনে অন্তত একটি বেঙ্গল ইনফ্র্যান্ট্রি রেজিমেন্ট সঙ্গে নেয়ার জন্য খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ঢাকায় অবস্থিত বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর অফিসারদের ওপর তারা পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছিলেন

না। শেষ মুহূর্তে জয়দেবপুরে অবস্থিত ১৬ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মেজর শাহজাহান কথা দেন, ১৪ অগাস্ট মধ্যরাতে মূল দলের সঙ্গে মিলিত হবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেজর শাহজাহান কথা রাখতে পারেননি।

অপারেশন-পরবর্তী কার্যক্রমের যাবতীয় প্ল্যান ছিল কর্নেল রশিদের। রশিদ ছিলেন ধীর-স্থির ও নিখুঁত প্রকৃতির লোক। রেডিও স্টেশন দখল, নতুন রাষ্ট্রপ্রধানকে ধরে আনা, সশস্ত্রবাহিনী প্রধানদের একত্র করা– এসবই সম্ভব হয়েছিল কর্নেল রশিদের পরিকল্পনায়। কর্নেল ফারুক টার্গেট দখল ও বিধ্বস্ত করেই খালাস, কিন্তু পরবর্তী দুরূহ কাজগুলো যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিপুণভাবে সামাল দেন, তিনি হলেন কর্নেল রশিদ।

১৫ আগস্ট ভোররাত চারটায় (১৪ আগস্ট দিবাগত রাত্রিশেষে) ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত থেকে অপারেশন শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন গ্রুপের অফিসাররা নিজেরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং কোনো নির্দেশের অপেক্ষা না করে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন তারা নিজেরাই। যেমন- রেডিওতে মুজিব হত্যার তাৎক্ষণিক ঘোষণা তাদের মূল কর্মসূচিতে না থাকলেও মেজর ডালিম তার নিজ উদ্যোগে সকালবেলা রেডিও থেকে ঘোষণা দেন, যার মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ছিল তাৎক্ষণিক এবং ব্যাপক।[১৪]

১৪ আগস্ট সন্ধ্যাবেলায় লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি ও সমাজবিজ্ঞানী আহমদ ছফা একজন ভগ্নিস্থানীয়া হাউজ টিউটরের বাসায় গিয়ে হাজির হন। সরকার-বিরোধিতার কারণে ভয়ে কেউ-ই ছফার সঙ্গে প্রকাশ্য সম্পর্ক রাখতে চাইতেন না। সারা দিন তিনি কিছু খাননি এবং কিনে খাওয়ার পয়সাও নেই। লাজ-শরমের মাথা খেয়ে তাকে কিছু খাবার দিতে বলেন। মহিলা পলিথিনের ব্যাগে কিছু মোয়া দিয়ে বললেন– ছফা ভাই, এগুলো পথে হাঁটতে হাঁটতে আপনি খেয়ে নেবেন। আপনাকে বসতে দিতে পারব না।

সে সময় ছফার সঙ্গে তার বন্ধু অরুণ মৈত্র ছিলেন। অরুণ ইস্টল্যান্ড নামে একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থাতে কাজ করতেন। অরুণের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বলাকা বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি আসেন। অরুণ ছফাকে বললেন, সময়টা আপনার জন্য অনুকূল নয়। আপনি কোনো নিরাপদ জায়গায় চলে যান। পরামর্শটা দিয়ে

চিত্র-কথন:

গণভবন লেকের পাশে শেখ মুজিব ও মনসুর আলী। আগস্ট ১৪, ১৯৭৫ বিকেলে তোলা ছবিটাই দুজনের জীবনের শেষ ছবি।

ফটো: সংগৃহীত

অরুণ বাসায় চলে গেলেন।

উদ্দেশ্যহীনভাবে ছফা বলাকা বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। কিছু দূর যেতেই দেখেন একখানা খোলা জিপে সাঙ্গপাঙ্গসহ শেখ কামাল। একজন দীর্ঘদেহী যুবক কামালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো– দেখ কামাল ভাই, আহমদ ছফা যাচ্ছে। কামাল নির্দেশ দিলেন: হারামজাদাকে ধরে নিয়ে আয়। ছফা প্রাণভয়ে দৌড়ে নিউমার্কেটের কাঁচাবাজারের ভেতর ঢুকে পড়েন।[১৯]

শহরের বিভিন্ন স্থানে ছিল খামোখাই উত্তেজনা। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা ১৫ আগস্ট। তার বক্তৃতা দেয়ারও কথা ছিল। গোপনে একটা ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছিল যে, ঐ সভাতেই 'জনগণের দ্বারা তাকে আজীবন প্রেসিডেন্ট' ঘোষণা করা হবে।[১৬]

ওদিকে নোয়াখালীর কাছে একটি ভারতীয় সামরিক হেলিকপ্টার দেশে ফেরার পথে পাখির সঙ্গে 'ধাক্কা খেয়ে' বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মারা গেলেন ভারতীয় পাইলট ও ক'জন আরোহী। বিকালে আর্মি টেনিসকোর্টে নিত্যদিনকার মতো সিনিয়র অফিসারদের টেনিস জমে উঠেছিল।[২০]

১৫ আগস্ট শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসাকে কেন্দ্র করে আগের দিন

সারা রাত ধরে পাহারা দিচ্ছেন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ। আগের দিন ১৪ আগস্ট বিকালের দিকে কে বা কারা শামসুন্নাহার হলের সামনে একটা পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ টানিয়ে দিয়েছিল, তারপর ক্যাম্পাসে দুই-তিনটা গ্রেনেডও বিস্ফোরিত হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের আগমন উপলক্ষে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়ানো-ছিটানো বিশ্ববিদ্যালয়ে সাজানো-গোছানোর কাজ চলছিল। রাস্তার এবড়ো-থেবড়ো গর্তগুলোতে সুরকি পড়েছে। রোলার ঘুরছে, পীচের আস্তরণ বসেছে। গত এক পক্ষকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে, কলাভবনে, বাণিজ্যভবনে, বিজ্ঞানভবনে জোর মেরামতির কাজ চলছে। অনেকদিন অনাদরে মৃত জন্তুর কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা ন্যাড়ামুড়ো দেয়ালগুলো চুন-সুরকির প্রসাধন-স্পর্শে হেসে উঠেছে। সমস্ত এলাকাটায় একটা সাজ সাজ রব, তাড়াহুড়ো-ব্যস্ততা এসব তো আছেই।

রাতের আঁধারে শক্ত হাতে আলকাতরা দিয়ে দাবড়া করে লেখা শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে চ্যালেঞ্জ করা দেয়াল লিখনসমূহ নতুন চুনের প্রলেপের তলায় ঢাকা পড়েছে। সুন্দরীর ললাটের সিঁদুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সুউচ্চ শুভ্র প্রাচীরের কপোলদেশে শিল্পীর নিপুণ তুলিতে লেখা সুন্দর লিখনমালা দৃষ্টিকে দূর থেকে টেনে নিয়ে যায়– শেখ মুজিব বাঙালি জাতির ত্রাণকর্তা, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মহানায়ক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার লৌহমানব ইত্যাদি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন, তাই বিশ্ববিদ্যালয় নানা রঙের চিত্রলেখায় সেজে উঠেছে। চারদিকে একটা উৎসবের হাওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছায়াঢাকা কালো কালো সাপের শরীরের মত চিকন বাঁকা রাস্তাগুলোর মোড়ে মোড়ে উল্লসিত অভিনন্দন বুকে ধারণ করে রাতারাতি ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে নানা রঙের প্ল্যাকার্ড। তোরণরাজি মাথা তুলেছে। আগামীকাল ১৫ আগস্ট সকাল দশটায় তিনি আসছেন।

প্রায় এক পক্ষকাল ধরে দিনে-রাতে কাজ চলছে। উপাচার্যের আহার নেই, নিদ্রা নেই। সাড়ে সাত লাখ টাকা নগদে দিয়েও তিনি স্বস্তিবোধ করতে পারছেন না। দৈবাৎ যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, আর সেখানেই যদি 'মহামানবে'র দৃষ্টি আটকে যায়, তিনি মুখ দেখাবেন কেমন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতির এটা প্রথম আনুষ্ঠানিক আগমন। তিনি শুধু রাষ্ট্রপতি নন, বাঙালি জাতির পিতা, মুক্তিদাতা, বাংলার হাটের মানুষ, ঘাটের মানুষ, মাঠের মানুষের বন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান!

সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের হোমরা-চোমরা কর্মীদেরও ব্যস্ত দিন কাটছে। তারা দিবসে কাজের তদারক করে, রজনীতে পাহারায় থাকে। বাংলাদেশে তো দুষ্টু

লোকের অভাব নেই! রাষ্ট্রপতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অলুক্ষুণে কোনো দেয়াল লিখন লিখে যেতে পারে, অনেক অর্থব্যয় ও শ্রমের শিল্পকর্মগুলোর অঙ্গহানি ঘটাতে পারে, সুন্দর চিত্রলেখাসমূহের লাবণ্যহানি করতে পারে– এরকম কিছু ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই আগেভাগেই এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

আগাম নিরাপত্তার পুরো দায়িত্বটা রাষ্ট্রপতির জ্যেষ্ঠপুত্র শেখ কামাল স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার দীর্ঘদেহ ও বাহুবিশিষ্ট বন্ধুদের নিয়ে অবিরাম চরকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের গোঁড়া সমর্থক ছাত্র এবং শিক্ষকদের মনোভঙ্গিটা এরকম যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চরণ ফেলামাত্রই বাংলাদেশে একটি অভিনব যুগের অভ্যুদয় ঘটবে!

শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনটা ছিল কৌশলগত দিক দিয়ে তাঁর নতুন শাসনতান্ত্রিক বিধি চালু করার পথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। রাষ্ট্রের সকল প্রতিষ্ঠানে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনের পর দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে আভূমি নত হয়ে অধীনতা স্বীকার করবে, এটাই ছিল শেখ মুজিবের এই অশ্বমেধ যজ্ঞের শেষ অংক।[২১]

শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের অনুষ্ঠানকে সফল করার মূল দায়িত্বে ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। ১৪ আগস্ট রাত ১২টা নাগদ শেখ কামাল মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে বললেন–

> সেলিম ভাই, কাজ তো চলছেই, আপনি অনুমতি দিলে আমি না হয় একটু বাসায় যাই।
>
> আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যেতে পার তবে শর্ত একটি– কাল তুমি প্রেসিডেন্টের গাড়িতে আসতে পারবে না, আগে এসে ডিউটিতে সময়মতো যোগ দিতে হবে।

শেখ কামাল সেই রাতে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরিয়ে প্রথমে বক্শীবাজারের দিকে তার শ্বশুরবাড়ি গেলেন। সেখানে তার স্ত্রী সুলতানা কামাল ছিলেন। শেখ মুজিবের বড় পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, এক উজ্জ্বল অ্যাথ্লেট। সুলতানা কামালের বাবা দবির উদ্দিন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী। স্ত্রীকে নিয়ে সেই রাতে শেখ কামাল ৩২ নম্বরে চলে গিয়েছিলেন।[২২]

১৪ আগস্ট ছিল নিয়মিত নৈশকালীন ট্রেনিং। ফারুক ওই রাতেই আঘাত হানার পরিকল্পনা করেন। তা না হলে পরবর্তী ট্রেনিং রাত পেতে দেরি হয়ে যাবে।[১৪]

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠল টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কামানবাহী শক্‌ট ও অন্য যানগুলো। ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ইউনিট লাইন থেকে ১০৫ এমএম কামানগুলো টেনে নিয়ে চললো ভারী ট্রাকগুলো নতুন এয়ারপোর্ট অর্থাৎ হযরত শাহ্‌জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এয়ারপোর্টটি তখন চালু হয়নি। সবাই মনে করলো, নিষ্ঠাবান দু'টি ইউনিট রাত্রিকালীন ট্রেনিংয়ে কর্তব্য পালনে এগিয়ে যাচ্ছে।[২০]

রাত দশটা। ক্যান্টনমেন্টের উল্টো প্রান্ত। বেঙ্গল ল্যান্সারের টি-৫৪ ট্যাংকগুলো রাজকীয় স্টাইলে একটি একটি করে গড়িয়ে গড়িয়ে ইউনিট লাইন থেকে বেরিয়ে পড়ল। তারা এয়ারপোর্টের কাছে মিলিত হলো টু-ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের সঙ্গে। এয়ারপোর্টের বিরান বিস্তীর্ণ মাঠে সমবেত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুই শক্তিশালী যান্ত্রিক ইউনিট। ১৮টি কামান, আর ২৮টি ট্যাংকের সংযোগ ঘটেছে ক্যান্টনমেন্টের দক্ষিণ প্রান্তে। মহাদুর্যোগের ঘনঘটা আরো ঘনিয়ে এলো।[২০]

কালো ঘন অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে এয়ারপোর্ট। কোথাও এক টুকরো আলো নেই। অন্ধকারে জমে উঠল উর্দিপরা 'নটরাজ'দের আসন্ন রক্তাক্ত নাটক। কমান্ডাররা দ্রুতপদে এদিক-ওদিক ছুটছেন। সৈনিকরা ভালো করে বুঝে উঠতে পারছে না, কী ঘটতে যাচ্ছে? রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন অভ্যুত্থানের অন্যান্য নায়ক মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর হুদা, মেজর শাহরিয়ার, মেজর পাশা, মেজর রাশেদ চৌধুরী প্রমুখ।[২৩]

রাত গড়িয়ে চললো। অন্ধকারে মহাব্যস্ত ফারুক, রশিদ। সৈনিকরা সুশৃঙ্খলভাবে জড়ো হয়ে নির্দেশের অপেক্ষায়। আসল ব্যাপার তারা কিছুই জানে না। ফারুক-রশিদ এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে সৈনিকদের উৎসাহ দিচ্ছেন: এবার হয় করবো, নয় মরবো। সাবাস্ গোলন্দাজ! সাবাস্ ট্যাংকার! তোমরাই তো শ্রেষ্ঠ সৈনিক! তোমরাই তো দেশের সূর্যসন্তান! দেশ আজ রসাতলে– বিক্রি হয়ে গেছে ভারতের কাছে। উর্দিপরা গর্বিত সৈনিকরা সব চক্রান্ত নসাৎ করবেই![২৩]

ফারুক-রশিদ উভয়েই স্পিরিটেড অফিসার। সৈনিকরা হলো রক্ত-মাংসের 'রোবোট'। তারা চলে কমান্ডারের নির্দেশে, কোনো যুক্তিতে নয়। কমান্ডারদের নির্দেশে তারা শুধু এগিয়ে যায়, অন্ধভাবে আগুনেও ঝাঁপ দেয়। এক্ষেত্রেও হলো তাই।[২৩]

পনেরো আগস্টের প্রথম প্রহরে কর্নেল ফারুক সকল অফিসারকে এয়ারপোর্টের পাশে অবস্থিত হেড কোয়ার্টার স্কোয়াড্রন অফিসে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন।[২৩]

কমান্ডার কর্নেল ফারুক টেবিলের ওপর ছড়িয়ে দিলেন ঢাকা নগরীর ম্যাপ। কালো ইউনিফর্ম পরা ফারুক রহমান; পিঠে ঝুলছে স্টেনগান, দৃঢ় চেহারা নিয়ে অভিজ্ঞ কমান্ডারের মতো তিনি তার 'অপারেশন অর্ডার' শুনালেন অফিসারদের। ম্যাপে টার্গেট চিহ্নিত করাই ছিল। প্রধান টার্গেট ৩২ নম্বর রোডে শেখ মুজিবের বাড়ি সরাসরি আক্রমণ করা হবে। আক্রমণের দায়িত্বে তারই ইউনিটের বিশ্বস্ত অফিসার মেজর মহিউদ্দিন।

বাড়িটিকে ঘিরে ধরা হবে দু'টি বৃত্তে— ইনার আর আউটার। ইনার বৃত্তের গ্রুপ বাসার উপরে সরাসরি আক্রমণে অংশ নেবে। আউটার বৃত্তের গ্রুপ রক্ষীবাহিনীর কিংবা বাইরের অন্য যেকোনো আক্রমণ ঠেকাবে। আউটার বৃত্তের অফিসার থাকবে মেজর নূর চৌধুরী ও মেজর হুদা। ২৭ নম্বর রোড, সোবহানবাগ মসজিদ, লেক ব্রিজ এরিয়ায় রোড-ব্লক সৃষ্টি করা হবে।

প্রধান টার্গেট শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণের সঙ্গে একই সময় আক্রমণ চালানো হবে ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মণি এবং আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে। ফারুক মেজর ডালিমকে শেখ মুজিবের বাড়ি আক্রমণে উপস্থিত থাকতে বললেন, কিন্তু ডালিম 'পূর্ব সম্পর্কের' অজুহাতে সেই আক্রমণ গ্রুপে না থেকে স্বেচ্ছায় সেরনিয়াবাতের বাড়িতে আক্রমণের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। গ্রুপ কমান্ডার মেজর ডালিমকে হেভি মেশিনগান সংযোজিত দ্রুতগতির একটি জিপ দেয়া হলো। সঙ্গে দেয়া হলো প্রচুর অ্যামুনিশন এবং এক প্লাটুন ল্যান্সার সৈন্যসহ একটি বড় ট্রাক।[২৩]

শেখ মণির বাসায় আক্রমণের দায়িত্বে থাকলেন ফারুকের পরম বিশ্বস্ত রিসালদার মোসলেমউদ্দিন। শাহ্‌বাগে রেডিও স্টেশন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও নিউমার্কেট এরিয়ার নিরাপত্তা গ্রহণে থাকেন মেজর শাহরিয়ার। এই গ্রুপটি সম্ভাব্য বিডিআর আক্রমণের মোকাবিলা করবে; তার সঙ্গে রইলো এক কোম্পানি সৈন্য।[২৪]
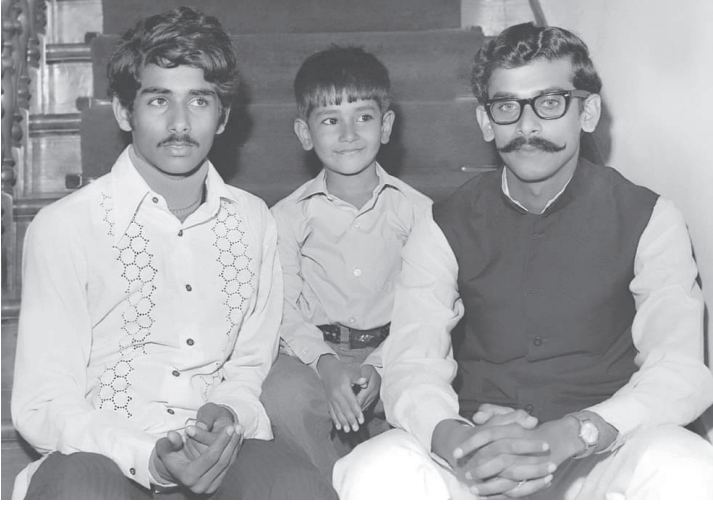
চিত্র-কথন:

১৯৭৩ সালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তোলা শেখ মুজিবের তিন পুত্র, তিন সহোদর শেখ কামাল ও শেখ জামালের মধ্যমণি হয়ে বসে আছে শেখ রাসেল। শেখ জামালকে সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে স্যান্ডহার্স্ট এ পড়তে পাঠানো হয়েছিলো।

১৯৭১ এ শেখ জামাল পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে মগবাজার অথবা কাছাকাছি কোনো এলাকার এক ফ্ল্যাট থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়েছিলেনে ১২ মে ১৯৭১ এবং ধানমন্ডির বাড়ি ২৬, সড়ক ৯এ (পুরনো ১৮) তে বন্দি অবস্থায় ছিলেন। এই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তিনি মুজিব বাহিনীতে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ শেখ জামাল বাড়িতে ফিরে আসেন।

শেখ জামাল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লং কোর্স এর প্রথম ব্যাচের কমিশন্ড অফিসার। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যখন তিনি হত্যার শিকার হন তখন তিনি সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন।

অন্যদিকে শেখ কামাল ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। রাজনীতি ছাড়াও খেলাধুলায় ছিলো শেখ কামালের দারুণ আগ্রহ। আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ কামাল।

ফটো: সংগৃহীত

অপারেশনের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল রক্ষীবাহিনীকে প্রতিহত করা। শেখ মুজিবের বাড়ি যখন আক্রান্ত হবে, তখন প্রবল প্রতি-আক্রমণের আশঙ্কা ছিল সাভার ও শেরেবাংলা নগরে অবস্থিত কয়েক হাজার রক্ষীবাহিনী থেকে। টোটাল অপারেশন কমান্ডার কর্নেল ফারুক তার ট্যাংক বাহিনী নিয়ে 'রক্ষীবাহিনী'কে প্রতিহত করার দায়িত্ব স্বয়ং কাঁধে তুলে নিলেন। ২৮টি ট্যাংক এবং ৩৫০ জন সৈনিক নিয়ে লড়বেন রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে।[২৪]

২৮টি ট্যাংক দিয়ে একত্রে জমাটবাঁধা রক্ষীবাহিনীর ৩ হাজার সৈনিকের একটি দলকে অকেজো করে দেয়া তেমন কোনো কঠিন কাজ নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফারুকের ট্যাংকগুলো ছিল একেবারে শূন্য, কোনো গোলাবারুদই ছিল না এতে।[২৩] ফারুক জানতেন ট্যাংক দেখে জীবনের ভয়ে পালাবার চেষ্টা করবে না– এমন সাহসী লোক খুব কম পাওয়া যাবে। আর কে-ই-বা তাদের অতটা পাগল ভাববে যে, এই সেনারা রক্ষীবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য এক বহর একেবারে ফাঁকা ট্যাংক নিয়ে এত বড় ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াবে?[২৬]

কর্নেল রশিদের অবস্থান ছিল কোথায়? কর্নেল রশিদের প্রধান কাজ ছিল অপারেশন-পরবর্তী অবস্থা সামাল দেয়া ও সার্বিক রাজনৈতিক সমন্বয় সাধন। তিনি সরাসরি কোনো টার্গেট আক্রমণের দায়িত্বে ছিলেন না। তার ১৮টি কামান এয়ারপোর্টেই যথারীতি গোলা ভর্তি করে যুদ্ধাবস্থায় তৈরি রাখা হলো। কামানগুলোর ব্যারেল রক্ষীবাহিনী হেড কোয়ার্টার ও প্রধান টার্গেট শেখ মুজিবের বাড়ির দিকে তাক করা। প্রয়োজনমতো কমান্ডারের নির্দেশে টার্গেটের ওপর সেই অবস্থান থেকে ভারী গোলা নিক্ষেপ করা হবে। ৩২ নম্বর রোড এবং রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টার রইলো দূরপাল্লার কামানগুলোর রেঞ্জের মধ্যেই।[২৪]

ছয়

অবাক ব্যাপার! ওই রাতে সমস্ত ঘটনার প্রস্তুতি চলছিল আর্মি ফিল্ড ইনটেলিজেন্স ইউনিটের পাশে, কয়েক শ' গজ দূরেই। তারা সবাই তখন ব্যারাকে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন। কর্নেল ফারুক রহমান তার ট্যাংক বাহিনীর ২৮টি ট্যাংক নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে যাত্রা শুরু করলেন। ট্যাংকের ঘড় ঘড় শব্দে সমগ্র ক্যান্টনমেন্ট ও বনানী এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠলো।[২৭]

তিনি ৪৬-তম ব্রিগেডের ইউনিট লাইনের একেবারে ভেতর দিয়ে সংকীর্ণ

বাইপাস রোড ধরে শাফায়েত জামিলের পদাতিক ব্রিগেডের অবস্থানের আশেপাশের এলাকা কাঁপিয়ে সদর্পে সামনে এগিয়ে চললেন। এতগুলো ট্যাংকের বিকট শব্দে কমান্ডার শাফায়েত জামিলের নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার কথা! কারণ ট্যাংকগুলো এগিয়ে যাচ্ছিল তার বাসার ঠিক পেছন দিয়েই।[২৭]

মাঠে জমায়েত বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা প্যারেড ও ছোটাছুটি করছিল। তারা অবাক বিস্ময়ে তাদের লাইনের একেবারে ভেতর দিয়ে ট্যাংকগুলোর সদর্প যাত্রা অবলোকন করছিল। কেউ কেউ হাত নাড়ল কিন্তু কেউ বুঝতে পারল না কিছুক্ষণের মধ্যে কী ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ফারুক তার লিডিং ট্যাংক নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তায় এসে এয়ারফোর্স হেলিপ্যাডের উল্টো দিকে একটি খোলা গেট দিয়ে অকস্মাৎ ডানদিকে মোড় নিয়ে পুরাতন এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়লেন। তাকে অনুসরণ করছিল মাত্র দু'টি ট্যাংক। বাকিরা পথ হারিয়ে কমান্ডারকে দেখতে না পেয়ে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সোজা এয়ারপোর্ট রোড ধরে ফার্মগেটের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।[২৭]

কমান্ডার ফারুক দ্রুতগতিতে যখন পুরাতন এয়ারপোর্টের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হন, তখন তাকে মাত্র একটি ট্যাংক অনুসরণ করছে। সেটাও বিকল হয়ে থমকে পড়লো। এতে ফারুক মোটেই ভীত হলেন না। তিনি এয়ারপোর্টের দেয়াল ভেঙে তার ট্যাংক নিয়ে রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টারের সামনে উপস্থিত হলেন। সেখানে সারি বেঁধে কয়েক শ' রক্ষীবাহিনী সৈন্য অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। একটি ট্যাংকের যুদ্ধংদেহী উপস্থিতি দেখে তারা বেশ ঘাবড়ে গেল।[২৭]

কর্নেল ফারুক তার ট্যাংক চালককে নির্দেশ দিলেন– ধীরে ধীরে সামনে দিয়ে চলতে থাকো। ওরা আক্রমণ করলে সোজা ট্যাংক ওদের ওপর তুলে গুঁড়িয়ে দেবে। এছাড়া তাদের আর কিছু করবার ছিল না, কারণ ট্যাংকে কামানের গোলা ছিল না। তারা অসহায়, কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি। তারা দেখলো রক্ষীদের তরফ থেকে কোনো আক্রমণাত্মক রি-অ্যাক্‌শন নেই। তারা ভয় পেয়ে গেছে।[২৮]

এদিকে কর্নেল ফারুকের পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণকারীরা তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ভোর পাঁচটার মধ্যেই তিনটি টার্গেট ঘেরাও করে ফেলেছে।[২৯]

১২টি ট্রাক বা বড় লরি ও কয়েকটি জিপে করে আক্রমণকারী ল্যান্সার ও আর্টিলারির প্রায় ৫০০ জন সশস্ত্র সৈনিক ধানমন্ডি ও আশেপাশের এলাকা ছেয়ে ফেলেছে। প্রধান টার্গেট ৩২ নম্বর রোডে শেখ মুজিবের বাড়ি মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে আউটার ও ইনার দু'টি বৃত্তে ঘেরাও করে ফেলা হয়েছে। কর্নেল রশিদের নির্দেশে একটি কামান এনে শেখ মুজিবের বাড়ির বিপরীতে মাত্র ১০০ গজ দূরে লেকের ওপারে স্থাপন করা হলো। বাড়ি আক্রমণকারী ল্যান্সারের সৈন্যরা ৫টি ট্রাকে করে এসে একেবারে বাড়ির প্রধান গেটের কাছে সশব্দে নামতে শুরু করলো। গেটে ঢুকতে গেলে আর্টিলারির প্রহরারত সৈনিকরা তাদের বাধা দিয়ে বসলো। এ নিয়ে ওই সময় নিজেদের মধ্যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুরু হয়ে যায়।[২৯]

ভোর সোয়া ৫টা। আক্রান্ত হয়েছে ধানমন্ডি এলাকায় বিভিন্ন টার্গেট-পয়েন্ট। চারিদিকে ছুটছে বুলেট। গোলাগুলির শব্দে সমগ্র এলাকা প্রকম্পিত। আক্রান্ত হয়েছে শেখ মণি ও সেরনিয়াবাতের বাসভবন। মেজর ডালিম ও রিসালদার মোসলেমউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রায় একই সময়ে দু'টি বাসভবন আক্রান্ত হয়েছে। তবে মূল টার্গেট শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে আক্রমণ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব ঘটছিল। ট্যাক্‌টিক্যাল প্ল্যান অনুযায়ী সৈন্যদের পজিশন করতে এবং কামান, মেশিনগান স্থাপন করতে সময় লাগছিল। আক্রমণকারীদের নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও বিভ্রান্তির জন্যও কিছুটা সময় নষ্ট হয়।[৩০]

আনুমানিক সাড়ে ৫টার দিকে রাষ্ট্রপতির বাড়িতে আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। বাড়ি আক্রান্ত হয়েছে দেখে কর্তব্যরত পুলিশও পাল্টা গুলি চালাতে থাকে। ওই সময় ছাদের উপর থেকেও গুলির প্রত্যুত্তর দেয়া হয়। উভয় পক্ষে তুমুল গোলাগুলিতে মুহূর্তেই পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। এ রকম গোলাগুলির মধ্যে শেখ মুজিব অসম সাহসে সশরীরে নিচে নেমে আসেন এবং কর্তব্যরত পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। তিনি ধরে নেন, এগুলো জাসদ বা 'সর্বহারা' দলের চোরা আক্রমণ। ডিউটিরত পুলিশ অফিসার নুরুল ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, শেখ মুজিব মনে করেছিলেন এবার হয়তো তার সাহায্যার্থে আর্মির লোকজন এসে গেছে। তাই তিনি 'সেম সাইড' হয়ে যাবে মনে করে পুলিশকে ফায়ারিং বন্ধ করতে বলেন। এরপর তিনি উপরে চলে যান। এতে আক্রমণকারী সৈন্যরা বিনা বাধায় বাড়িতে ঢোকার সহজ সুযোগ পেয়ে যায়।

চিত্র-কথন: ১৫ আগস্টের পর সুশৃঙ্খল নগরী

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, সামরিক বাহিনীর তরুণ সেনানায়কদের হস্তক্ষেপে সপরিবারে নিহত হয়েছেন 'বাকশাল' নামক অশ্রুতপূর্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতির আওতায় একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রাষ্ট্রপ্রধান ও একইসাথে সরকারপ্রধান প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান। সারা দেশের মতো রাজধানী ঢাকাতেও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় কোনো প্রতিবাদ হয়নি, কোনো মিছিল বের হয়নি। রাজধানীতে কোথাও, কোনো এলাকায় আইনশৃঙ্খলায় সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

ঘটনার পর পর রাজধানীতে সান্ধ্যআইন জারি করা হলেও পরে তা প্রত্যাহার করা হয়। নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সড়ক মোহনায় সেনা মোতায়েন করা হয়। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও সড়ক মোহনায় মোতায়েন করা হয় ট্যাংক। ছবিতে প্রেসিডেন্টের সরকারি দপ্তর বঙ্গভবনের পাশে সামরিক বাহিনীর একটি ট্যাংক মোতায়েন দেখা যাচ্ছে। এর পাশ দিয়ে কিছু রিক্শা ও পথচারীর চলাচলও দেখা যাচ্ছে। ছবিতে বঙ্গভবনের স্টাফ কোয়ার্টারের অংশটি ধরা পড়েছে। মূল বঙ্গভবন এর ঠিক পশ্চিম দিকে।

দৃশ্যমান সড়কে রিক্শাগুলো চলেছে পূর্বদিকে, এবং সড়কটি পূর্বদিকে গিয়ে উত্তরে বাঁ-দিকে মোড় নিয়েই ঢাকার প্রধানতম বাণিজ্যিক এলাকা মতিঝিলের প্রধান সড়কে মিশে গেছে। তার ডানদিকেই রামকৃষ্ণ মিশন এবং মিশন রোড ও কেএম দাস লেন আবাসিক এলাকা। ছবিতে গম্বুজশোভিত বঙ্গভবনের দক্ষিণের প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে, এর ঠিক বিপরীতে সড়কের অপর পাশে 'দৈনিক ইত্তেফাক' ভবন। এবং এই ভবনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সংযোগ সড়ক।

ফটো ক্রেডিট: এলামি স্টক ফটো

শেখ মুজিব যখন গোলাগুলির মধ্যে আক্রান্ত ছিলেন, তখন তিনি বাসা থেকে বিভিন্ন দিকে ফোন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল জামিলকে ফোনে পেয়েছিলেন। তাকে বলেন, জামিল তুমি তাড়াতাড়ি আসো। আর্মির লোক আমার বাসা আক্রমণ করেছে। শফিউল্লাহ্‌কে ফোর্স পাঠাতে বলো। জামিল ফোন পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার লাল রঙের প্রাইভেট কার হাঁকিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান, ৩২ নম্বর রোডে। কিন্তু সৈন্যদের গুলিতে বাসার কাছেই তিনি নিহত হন।[৩০]

সেনা প্রধান শফিউল্লাহকে ফোন করে বলেন, 'শফিউল্লাহ্, আমার বাসা তোমার ফোর্স অ্যাটাক করেছে। কামালকে হয়তো মেরেই ফেলেছে। তুমি তাড়াতাড়ি ফোর্স পাঠাও।[৩০]

শফিউল্লাহ্ বললেন, স্যার 'Can you get out, I am doing something'. এরপর তার ফোনে আর শেখ মুজিবের সাড়া পাওয়া যায়নি। শফিউল্লাহ্ ফোনে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পান। তখন ভোর আনুমানিক ৫টা ৫০ মিনিট। শফিউল্লাহ্ দাবি করেছিলেন, তিনি ফোন করেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে। তাকে ১ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুভ করাতে বলেন। শাফায়াত জামিল বলেছেন, 'শফিউল্লাহ্ আমাকে কোনো নির্দেশ দেননি। তিনি শুধু বিড়বিড় করেছেন, কেঁদেছেন। কোনো অ্যাক্শন্ নিতে বলেননি।'[৩০]

তিনি রাষ্ট্রপতির সাহায্যার্থে একজন সৈন্যও মুভ করাতে পারলেন না।

গেটের কাছে গার্ডদের হট্টগোলে শেখ কামাল জেগে যান। তিনি কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে উপর থেকে স্টেনগান হাতে নিচে রিসিপশন রুমের দিকে ছুটে যান। সেখানে পুলিশের একজন ডিউটিরত অফিসারও ছিলেন। প্রথমে কামাল ভেবেছিলেন হয়তো জাসদ অথবা 'সর্বহারা' গ্রুপের হামলা। কামাল সেখান থেকে সেনারক্ষীদের ব্যবস্থা নিতে বলেন, কিন্তু তারা নীরব থাকে। কামাল এবার আসল ব্যাপার বুঝতে পারেন। তিনি আক্রমণকারী সৈন্যদের ওপর গুলি ছোঁড়েন। একজন সৈনিক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। এরপরই উভয় পক্ষে শুরু হয়ে যায় তুমুল গোলাগুলি। মুহূর্তেই পুরো এলাকা পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।[২৯]

আর্মির ৫/৬ জন গেট ঠেলে ছুটে এসে কয়েক গজ দূর থেকে কামালের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে 'ওরে বাবারে!' বলে ছুটে গিয়ে তিনি রিসিপ্শন রুমে পড়ে যান। সেখানেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[৩১]

শেখ মুজিব বারান্দায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাঁর চশমা মুছছিলেন। তখন তাঁর পরনে ছিল একটা ধূসর বর্ণের চেক লুঙ্গি আর সাদা পাঞ্জাবি। তাঁর মুখে সিঁড়িঘরের বাতির আলো পড়ছিল। সিঁড়িঘরের লম্বা প্রশস্ত কাঁচের জানালায় পাশের বাড়ি থেকে ভয়ার্ত শেখ জামালের বন্ধু তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। তাঁর পাশে দু'জন পোশাকধারী লোকও ছিল। বাসার একজন গৃহকর্মীকে এক পাশে দেখা যাচ্ছিল। একটু নিচে সিঁড়ির মাঝখানে ২/৩ জন পোশাকধারী লোক অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়েছিল।

আক্রমণকারী অফিসারদের অধিনায়ক মেজর মহিউদ্দিন আমতা-আমতা করে বলছিলেন: স্যার, আপনি আসুন! শেখ মুজিব তাকে চড়া কণ্ঠে ধমকে বলে ওঠেন, 'তোরা কী চাস্, তোরা কী করতে চাস্?'[৩২]

তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে মেজর মহিউদ্দিন দারুণ ঘাবড়ে যান। আক্রমণ অভিযান ঝিমিয়ে আসে। তিনি আসলে রাষ্ট্রপতিকে ধরে বন্দি করে বাইরে নিয়ে যেতে চাইছিলেন।

এই সময় মেজর হুদা এসে হাজির হন, কড়া কণ্ঠে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলেন এবং রাষ্ট্রপতিকে তার সঙ্গে নিচে নেমে আসতে বাধ্য করেন। তিনি বারান্দার মুখে এসে দাঁড়ান। ঠিক এই সময় মেজর নূর চৌধুরী সিঁড়ির গোড়ায় এসে উপস্থিত হলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সম্ভবত শেখ মণিকে হত্যা করে মোসলেমউদ্দীনও এই মুহূর্তে মেজর নূরের পাশে উপস্থিত হন। দু'জনই উত্তপ্ত, উত্তেজিত। নিচে পড়ে আছে গুলিবিদ্ধ কামালের মৃতদেহ। এবার আর রক্ষা নেই! আক্রমণকারীদের একজন উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠেন– Get aside Huda, Why are you wasting time - সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে বার্স্ট ফায়ার! দাঁড়িয়ে থাকা শেখ মুজিব সিঁড়ির উপর লুটিয়ে পড়লেন।[৩৩]

শেখ মুজিবের প্রাণহীন দেহ সিঁড়ি দিয়ে কিছুদূর গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেল। তাঁর ধূমপানের প্রিয় পাইপটা তখনো ডান হাতে ধরে রেখেছিলেন।

কিন্তু আক্রমণকারীদের মিশন তখনো পুরো সম্পন্ন হয়নি। সেটা পূরণ করতে কিছুক্ষণ পরে ল্যান্সার আর আর্টিলারির সেনাদের নিয়ে আসেন মেজর আজিজ পাশা আর রিসালদার মোসলেমউদ্দীন। পাশা তার সঙ্গীদের নিয়ে দোতলায় যান। সেখানে ছিলেন সুবেদার ওয়াহাব জোয়ারদার। তারা গিয়ে প্রধান শোবার ঘরের দরজার ওপর গুলি করেন। তখন দরজা খুলে দেন বেগম মুজিব। সেখান থেকে ঘাতকরা রাসেল, শেখ নাসের এবং বাড়ির এক ভৃত্যকে নিচে নিয়ে যান।
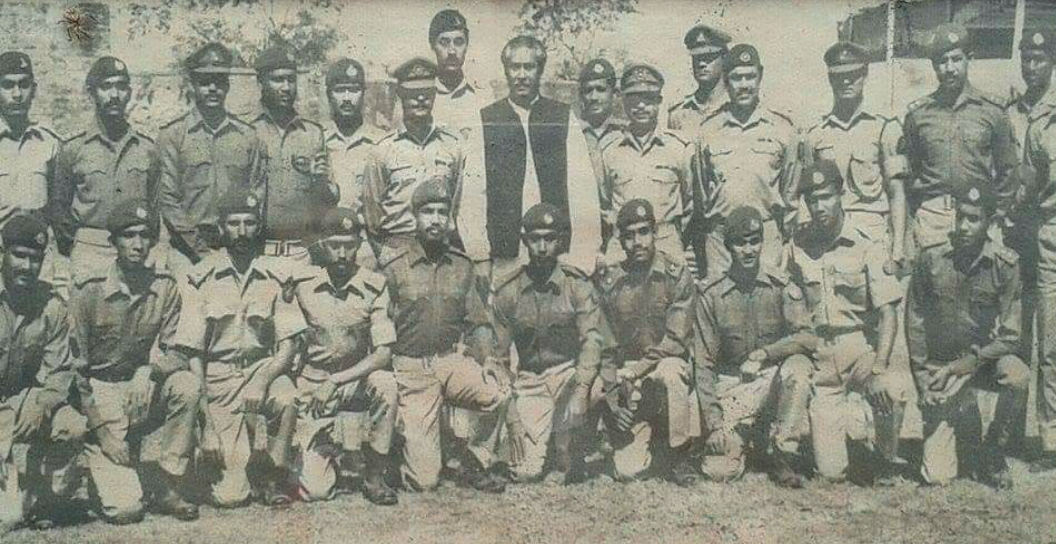
চিত্র-কথন:

একসাথে শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান, শফিউল্লাহ, খালেদ মোশাররফ, কর্ণেল ফারুক ও রশিদ ৭০ এর দশকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে।

***ফটো:** সংগৃহীত*

আক্রমণকারীরা ডিউটিরত ১৪/১৫ জন পুলিশ ও বাড়ির কিছু লোকজনকে ধরে এনে লাইন করে দাঁড় করান এবং বিক্ষিপ্তভাবে তাদের ওপর গুলি চালান। একজন পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় বাড়ির উপরের তলায় ভীষণ গোলাগুলি ও মেয়েদের আর্তচিৎকার শোনা যাচ্ছিল। একজন সৈনিক শেখ নাসেরকে ধরে ওপর থেকে নিচে নিয়ে আসে। তাকে প্রথমে লাইনে দাঁড় করায়। তিনি কাতর কণ্ঠে বলেন, 'স্যার, আমি রাজনীতি করি না। কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করে খাই।' তারা তাকে পাশের বাথরুমে নিয়ে যায় এবং গুলি করে।[৩১]

বেগম মুজিবকে সিঁড়ি পর্যন্ত আনলে তিনি স্বামীর লাশ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তখন তাকে আবার নিয়ে যাওয়া হয় শোবার ঘরে। সেখানে বেগম মুজিব, শেখ জামাল এবং শেখ মুজিবের দুই পুত্রের সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীদের এসএলআর ও স্টেনগানের গুলিতে হত্যা করেন মেজর পাশা আর রিসালদার মোসলেমউদ্দীন। কামাল আর জামালের স্ত্রীদের হাত থেকে তখনো মুছে যায়নি বিয়ের মেহেদি।

এই সময় একজন সৈনিক শিশু রাসেলকে ধরে নিচে নিয়ে আসে। ভীত-বিহ্বল রাসেল পিএ মুহিতকে চিনতে পেরে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'ভাইয়া, ওরা আমাকে মারবে না তো?' মুহিত তাকে আশ্বস্ত

করে বলে, 'না ভাইয়া, মারবে না।'[৩১]

শিশু রাসেল মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য কাঁদতে থাকে। নিচে নিয়ে ঘাতকরা রাসেলকে প্রথমে বসিয়ে রেখেছিল গেটের পাশে পাহারাদারের চৌকিতে। তাকে হত্যা করা হবে কি-না সম্ভবত সে সিদ্ধান্ত তারা তখনো নিতে পারেনি। ওদিকে মায়ের কাছে যাবে বলে রাসেল তখন কাঁদছিল। পাশা একজন হাবিলদারকে তখন হুকুম দেন রাসেলকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যেতে। সেই হাবিলদার দোতলায় নিয়ে গিয়ে একেবারে কাছে থেকে গুলি করে। তার মাথার একটা অংশ উড়ে গিয়েছিল। আধ ঘণ্টার ওপর বাসার ওপরে-নিচে থেমে থেমে বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি চলতে থাকে। বহু খাকি ও কালো পোশাকধারী সৈন্য বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা ছিল আর্টিলারি ও আর্মার্ড কোরের সৈনিক। তারা যার যার মতো যত্রতত্র গুলি চালাতে থাকে।[৩৪]

৩২ নম্বর রোডের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডে বাড়ির উপরের তলায় নিহত হন শেখ জামাল ও বেগম মুজিবসহ ৫ জন। সিঁড়িতে রাষ্ট্রপতি মুজিব। নিচতলায় শেখ নাসের, শেখ কামাল ও জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর। এদের সবাইকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করার পেছনে মেজর নূর, মেজর হুদা, মেজর পাশা এবং রিসালদার মোসলেমউদ্দীন প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেন। কর্নেল জামিলকে গুলি করা হয় বাড়ির বাইরে। জওয়ানরা হত্যাকাণ্ডে বিশেষ আগ্রহী ছিল না।[৩৪]

এই পরিস্থিতির মধ্যে শেখ মুজিবের বাড়ি লক্ষ্য করে মেজর মহিউদ্দিন (আর্টিলারি) মাত্র ১০০ গজ দূর থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ করেন। গোলা লেকের পাড়ে এসে সশব্দে আঘাত করে। কামানের গোলার শব্দে সমস্ত এলাকা কেঁপে ওঠে। দ্বিতীয় গোলা ব্যারেল একটু উঁচু করে ছোঁড়া হলো। এবার কামানের গোলা সশব্দে ওই বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে মোহাম্মদপুরে পতিত হয়।[৩৫]

অভিযান সমাপ্ত হলো। রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান মারা পড়লেন। সিঁড়িতে পড়ে রইলো তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ। অভিযানে মারা পড়লেন তাঁর পরিবারের উপস্থিত ছোট-বড় সকল সদস্য। শুধু পরিবারের দু'জন সদস্য দেশের বাইরে থাকায় সৌভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে গেলেন। তাদের একজন শেখ হাসিনা অন্যজন শেখ রেহানা।[৩৫]

রক্ষীবাহিনীর ৪০/৫০ জন সৈনিক ছিল ওই বাড়ির নিরাপত্তার দায়িত্বে এবং কোনো রকম 'বিপদের ঝুঁকি' না নিয়ে তারা প্রথম সুযোগেই আত্মসমর্পণ করে। তাদের নিরস্ত্র করে ওখানেই মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়।[৩৫]

শেখ মুজিবের বাড়িতে যখন আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল, তখন অন্যান্য গ্রুপ সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির বাসায় আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল।[৩৬]

মেজর ডালিম এক প্লাটুন ল্যান্সার সৈন্য নিয়ে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়ি আক্রমণ করেন ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে। পাহারারত পুলিশকে নিরস্ত্র করার জন্য প্রথমেই এক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করা হয় বাড়ি লক্ষ্য করে। গুলির শব্দে বাসার সবাই জেগে ওঠে। সেরনিয়াবাতের বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ উর্দিপরা লোকজন দেখে দোতলা থেকে তার স্টেনগান দিয়ে গুলিবর্ষণ করেন। সেরনিয়াবাত জেগে উঠে শেখ মুজিবের বাড়িতে ফোন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ঠিক এমন সময় আক্রমণকারীরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সেরনিয়াবাতকে সরাসরি গুলি করে হত্যা করে। ঘরের ভেতর সৈন্যরা নির্বিবাদে যত্রতত্র গুলি চালাতে থাকে। সবাইকে ধরে নিয়ে ড্রইংরুমে জড়ো করে। তারপর নির্দয়ভাবে সবার ওপর বার্স্ট ফায়ার করে।[৩৭] নিহত হন শেখ মুজিবের ভগ্নিপতি পানি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণমন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তার পরিবারের অন্য পাঁচ সদস্য; মিন্টো রোডের বাসায় আবদুর রব সেরনিয়াবাতের সাথে নিহত হয়েছিলেন আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কনিষ্ঠ পুত্র আরিফ সেরনিয়াবাত, মেয়ে বেবি সেরনিয়াবাত ও আরজু মনি (শেখ ফজলুল হক মনির স্ত্রী), আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর চার বছরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকান্ত আবদুল্লাহ বাবু এবং হাসানাতের চাচাত ভাই শহীদ সেরনিয়াবাত। সেই রাতে অলৌকিকভাবে ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পান আবদুর রব সেরনিয়াবাতের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এবং গুলিবিদ্ধ হয়েও বেঁচে যান স্ত্রী আমিনা বেগম (শেখ মুজিবের বোন, হাসানাতের মা) ও পুত্রবধু শহীদ সুকান্ত বাবুর মা সাহান আরা বেগম।[৩৯]

সেরনিয়াবাতের বড় ছেলে আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান। তার স্টেনগানের গুলি শেষ হয়ে গেলে গোলাগুলির সময় লুকিয়ে থাকেন। আক্রমণকারীরা তাদের হত্যাকাণ্ড শেষ করে চলে গেলে হাসনাত বেরিয়ে এসে পেছন দিকের দেয়াল টপকে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান।[৩৭]

রিসালদার মোসলেমউদ্দীন দুই ট্রাক সৈন্য নিয়ে শেখ মণির বাসায় উপস্থিত হন। তখন ভোর ৫টা ১০ মিনিট। নিত্যকার অভ্যাসমতো তিনি ভোরবেলা

ঘুম থেকে উঠে ড্রইংরুমের দরজা খুলে দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলেন, এমন সময় খোলা দরজা দিয়ে মোসলেমউদ্দীন সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়েন। শেখ মণি তার দিকে তাকিয়ে তার আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করতে করতেই মোসলেমউদ্দীন সরাসরি খুব কাছ থেকে স্টেনগান থেকে বার্স্ট ফায়ারে তাকে হত্যা করেন। এই সময় শেখ মণির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী তার সাহায্যার্থে ছুটে এলে মোসলেমউদ্দীন তার ওপরও গুলিবর্ষণ করেন।[৩৭]

নয়

সকাল ৬টা, 'রেডিও বাংলাদেশ' থেকে ইথারে ভেসে এলো মেজর ডালিমের বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা– 'স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে'। হতভম্ব বাংলাদেশ! এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত![২৯]

১৯৭৫-এর ২১ জুলাই ঢাকায় আয়োজিত এক সভায় শেখ মুজিব 'বাকশালে'র মনোনীত জেলা গভর্নরদের উদ্দেশে বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'আজ বাকশাল সদস্যদের সতর্ক থাকার কারণ এই যে, বাংলাদেশের জনগণ খুব বেশি প্রতিক্রিয়াপ্রবণ। তারা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে; এই কথা তোমাদের মনে রাখা ভালো। তোমরা জীবনভর নিবেদিতপ্রাণ কাজ করে যাবে; যদি তোমরা একটা ভুল কর, তাহলে তোমরা বাংলাদেশের মাটি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এইটা বাংলাদেশের আইন।' দুর্ভাগ্যক্রমে শেখ মুজিব নিজেই তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করলেন না।[৩৮]

তাঁর মহাকাব্যিক রাজনৈতিক জীবনের রক্তাক্ত, নির্মম আর ভয়ঙ্কর পরিসমাপ্তি ঘটলো। স্বাধীন বাংলাদেশের রক্তস্নাত জন্মের সঙ্গে যেই নামটি অবিচ্ছেদ্যভাবে উচ্চারিত, বাঙালির আধুনিক ইতিহাসের সেই মহানায়ক স্বাধীনতার মাত্র চার বছরের কম সময়েই জনগণের আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়ে 'প্রবল স্বৈরাচারি' হয়ে উঠেছিলেন। সেই শেখ মুজিব, যাঁকে তাঁর দেশের মানুষ ভালোবেসে 'বঙ্গবন্ধু' নামে ডাকতেন, এক অদ্ভুত বিষাদময় প্রত্যুষে তাঁর নিজের বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বুলেটবিদ্ধ হয়ে রক্তের সাগরে ডুবে রইলেন। সেই রক্তের সাগর মন্থন করে ইতিহাস তাঁকে আবার কীভাবে উদ্ধার, বিচার-বিশ্লেষণ এবং প্রতিষ্ঠা করবে সে দায় কেবল ইতিহাসের– কোনো আরোপিত ব্যবস্থা সে দায় বহনে অক্ষম, সে দায়িত্ব পালনের অযোগ্য।

সূত্র:

১. যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি; রাষ্ট্রদূত মেজর (অব.) শরিফুল হক ডালিম বীরউত্তম, নবজাগরণ প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃষ্ঠা: ৪২৭-৪৩৫

২. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ১৬

৩. জাসদের উত্থান পতন : অস্থির সময়ের রাজনীতি; মহিউদ্দিন আহমদ, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৮১

৪. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ, পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২০

৫. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৫৩

৬. বাংলাদেশ : অ্যা লিগ্যাসি অব ব্লাড; অ্যান্থনি ম্যাস্কার্নহাস, সবুজপাতা, ২০১৮, পৃষ্ঠা: ৮৩

৭. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস; অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৮৪

৮. এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য : স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল (অব.) মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম, মাওলা ব্রাদার্স, এপ্রিল ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৫৯

৯. ওয়ারেছাত হোসেন বেলাল, বীরপ্রতীক, স্মৃতিচারণ উপলক্ষে বলেনঃ আজকের কাগজ, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারী ১৯৯২

১০. ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড; অধ্যাপক আবু সাইয়িদ; চারুলিপি প্রকাশন; ২০১৫; পৃষ্ঠা: ২৮৬-২৮৮

১১. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৩

১২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ২৪-২৫

১৩. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৫৫-৫৬

১৪. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৭

১৫. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদঃ মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৫৯-৬০

১৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৭৯-৮০

১৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৫৭

১৮. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৬

১৯. আহমদ ছফা; খণ্ড: ৭, পৃষ্ঠা: ১৪১

২০. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৭-২৮

২১. নির্বাচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধ; আহমদ ছফা, সম্পাদনা: নূরুল আনোয়ার, খান ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ৪৯৯-৫২২

২২. বঙ্গবন্ধু পরিবার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শেখ আবদুস সালাম, বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬

২৩. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ২৯

২৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩০

২৫. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস, অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৮৩

২৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৮৪

২৭. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল (অব.) এম এ হামিদ পিএসসি, হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৩, পৃষ্ঠা: ৩১

২৮. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩২

২৯. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৪

৩০. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩

৩১. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৫

৩২. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৭

৩৩. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৪২

৩৪. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৩৫-৩৬

৩৫. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৪৩

৩৬. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৪৫

৩৭. প্রাগুক্ত; পৃষ্ঠা: ৪৬

৩৮. বাংলাদেশ : রক্তের ঋণ; অ্যান্থনী ম্যাসকার্নহাস; অনুবাদ: মোহাম্মদ শাহজাহান, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃষ্ঠা: ৬৫

৩৯. সাহান আরার চোখে এখনও ভাসে ভয়াল রাতের স্মৃতি; দৈনিক সমকাল; পুলক চ্যাটার্জি, বরিশাল ব্যুরো, ১৫ আগস্ট, ২০১৭